প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

৩য় বর্ষ। মাঘ, ১৩০৭। ১ম সংখ্যা।

পুরাতনের বিদায়গ্রহণ।

ইংরাজী জানুয়ারি মাস হইতেই প্রয়াসের বর্ষ গণনা হয়। সে হিসাবে এই নববর্ষে প্রয়াস তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। দুই বৎসরকাল প্রয়াসের সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, আজ আমরা পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত। এই বৎসর হইতে প্রয়াস সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে আর প্রকাশিত হইবে না। প্রয়াস-সমিতি প্রয়াসের স্বত্বাধিকারী হইলেন। প্রয়াস-সমিতির হস্তে ইহার সম্পাদন-ভার ন্যস্ত করিয়া, আজ আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। এই অল্পদিনের মধ্যে আমরা হস্তান্তরিত করিলাম কেন, সে সম্বন্ধে প্রয়াসের অনুগ্রাহক ও গ্রাহক-বর্গের নিকট আমরা কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। পাঠকবর্গের সহিত দুই বৎসরের যে সম্বন্ধ, সে-সম্বন্ধ ছিন্ন করি কেন?

যে উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত আমরা প্রয়াসের প্রচারে প্রবৃত্ত হই, সে উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা প্রয়াসের দ্বিতীয়বর্ষে বলিয়াছি; নবীন লেখক-

দিগকে উৎসাহ দিবার জন্যই প্রয়াসের জন্ম;—ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, —ইহাই আমাদিগের প্রয়াস। সে প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাঠক পাইয়াছেন। কিন্তু সে প্রয়াসের প্রতিবন্ধক কি, তাহা সাধারণে অপ্রকাশিত। প্রতিবন্ধক অনেক। অন্যান্য প্রতিবন্ধকের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধক—আমাদিগের সময়াভাব। সাহিত্য-সেবকের কার্য্য-ক্ষেত্র বিস্তৃত; কিন্তু সেবকের সংখ্যা কম। এই জন্যই প্রয়াস-প্রচার-কার্য্যে যতটা মনোযোগ, যতটা উদ্যম, যতটা সময়ক্ষেপণ আমা-দিগের কর্ত্তব্য, তাহা আমরা পারিয়া উঠি নাই। প্রয়াসও মনোমত হয় নাই,—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই। প্রয়াসের নিয়মিত প্রচারেও ব্যাঘাত ঘটি-য়াছে। যাহা মনোমত হইল না, যাহার সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব হইল না, তাহা রাখিয়া লাভ কি? কাজেই প্রয়াসের মঙ্গলকামনায়, প্রয়াসের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন জন্য ইহা হস্তান্তরিত না করিব কেন?

প্রয়াসের প্রচার-ভার, প্রয়াস-সমিতি কর্ত্তৃক স্ব-ইচ্ছায় নবীন উদ্যমে গৃহীত হওয়ায় আমরা শুভ আশা করিতেছি। এই প্রয়াস-সমিতির সহিত পাঠকের পরিচয় নাই। পরিচয় করিয়া দিতেও আমরা রাজী নহি। সমিতি কার্য্যের দ্বারা পরিচিত হইতে পারিবেন, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। কথায় আমরা আর কি পরিচয় দিব?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

কার্য্যাধ্যক্ষ,

সাহিত্য-সেবক-সমিতি।

নূতনের নিবেদন।

পুরাতনের বিদায় গ্রহণ" হইতে পাঠক জানিতে পারিবেন, যে এই ইংরাজী নব বর্ষ হইতে প্রয়াস-প্রচারের ভার প্রয়াস-সমিতি গ্রহণ করিলেন। সাহিত্য-সেবক-সমিতির সহিত প্রয়াসের আর কোন সংস্রব রহিল না। প্রয়াসের সার্ব্ববিষয়িক উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়াস-সমিতি গঠিত হইল। সে উদ্দেশ্যের কত দূর সম্পূরণ হইবে, তাহা ভবিষ্যতে বিচার্য্য।

এই সংখ্যার প্রয়াসে আমরা আমাদিগের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যের পরিচয় দিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আছে। সাহিত্য-সেবক-সমিতির নিকট হইতে প্রয়াস পত্রিকা গ্রহণ করিবার জন্য আমরা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না। সময়ের অল্পতা বশতঃ যথাসম্ভব সত্বর আমাদিগকে ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করা অসম্ভব। যেরূপ ভাবে ভবিষ্যতে প্রয়াস প্রচারিত হইবে, তাহার কোন পরিচয়ই আমরা এই সংখ্যায় দিতে পারিলাম না। ভরসা করি, যাঁহারা এত দিন প্রয়াসকে প্রীতি-চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের এ ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। এই সংখ্যায় প্রয়াসের পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে আমরা কেবল এই করিলাম যে, এখন হইতে ইংরাজী বৎসরের হিসাবে প্রয়াসের বর্ষ গণনা হইবে না; বাঙ্গালা মাঘ মাস হইতেই প্রয়াসের বর্ষগণনা হইবে। বাঙ্গালা কাগজের ইংরাজী কোষ্ঠি কি ভাল? প্রয়াসের আকারেরও পরিবর্ত্তন হইল। ষোলপেজি চারি ফর্ম্মার স্থানে আটপেজি ছয় ফর্ম্মা প্রয়াসের কলেবর ধার্য্য করা গেল।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

কার্য্যাধ্যক্ষ,

প্রয়াস-সমিতি।

ভিক্টোরিয়া।

১

ভিক্টোরিয়া, তুমি মা আমার!
ইংলণ্ডের রাজরাণী, ছিল মা ইংরাজি বাণী,
ছিল মাগো ইংরাজ আকার;
কিন্তু এ ভারতে জানি, ভারতের মহারাণি,—
ভারত-সন্তান 'সাঙ্গপাঙ্গ' মা তোমার।
ভিক্টোরিয়া, কোথা মা আমার!

২

ইতিহাসে আছে কি এ গুরুভক্তি পাঠ?
কার' আবাহন তরে, দেশে নাই নারী-নরে,
ষ্টেশনে গমন মা, তোমার বিরাট।
গেলে 'ষ্টেশন' পরে, তব মুন্সী-মার তরে,
গুরুভক্ত নারী, সঙ্গে নাহি রাজঠাট,
ভিক্টোরিয়া মা আমার নহে ত সম্রাট্!

৩

শ্বেত পুত্র মাঝে হীন,—কাল ঘৃণা করে;—
তুমি মা জগত আলো, বেষ্টিত তোমার কালো,
কাল ভালবাস মাগো, খ্যাত ধরা'পরে।
কালা লোক সঙ্গে তব, এ গৌরব জানে ভব,
কালার হৃদয়োচ্ছাস লহ পদোপরে,
ভিক্টোরিয়া 'মা' বলে মা, কালা শ্রদ্ধাভরে।

৪

ভিক্টোরিয়া কোথা মা আমার?
বাঙ্গালী সন্তান দীন, তুমি দীন-পুত্রাধীন,

কালার আশ্রয় তব হৃদয়-আগার।
তুমি মা বাঙ্গালী তরে, ব্যথা নে'ছ হৃদিপরে,
কেশব সেনের মৃত্যু দৃষ্টান্ত তাহার।
ভিক্টোরিয়া কোথা মা আমার!

৫

বিশুদ্ধ কবির জিহ্বা—শাস্ত্রের বচন,
ভক্তি-পুষ্প করি দান, নহে মা, এ বাক্যভান,
স্বর্গ হতে উপহার কর মা গ্রহণ।
আমি মহাভাগ্যবান্, করি তোরে শ্রদ্ধাদান,
হীন বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা নাহি মা বারণ।
ভিক্টোরিয়া মা আবার হবে কি কখন?

নাট্যাচার্য্য—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

আদর্শ-রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে যেরূপ পৃথিবী-ব্যাপী শোকের পরিচয় অনুভূত হইয়াছে, সেরূপ আর কোন নৃপতি বা রাজ্ঞীর তিরোধানে হইয়াছে কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। ইংলণ্ডের কনক-সিংহাসন দেবীশূন্য, ভারতবর্ষের কল্পনাধিষ্ঠাত্রী জননী কাল-সিন্ধুজলে বিসর্জ্জিত; কিন্তু কেবল ইংলণ্ডের নহে, কেবল ভারতবর্ষের নহে, ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-সংবাদে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে কেন্দ্রে শোকতপ্ত শোণিত-ধারা যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে উথলিয়া উঠিয়াছিল। জীবনে মরণে গৌরবময়ী, ভিক্টোরিয়ার ন্যায় রাজ-রাজেশ্বরীর পদস্পর্শ সুখ, পৃথিবীর ভাগ্যে বিরল!

তেষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার শাসন-সময়ে ইংরাজ-রাজত্বের আশাতীত বিস্তৃতি হইয়াছিল বলিয়া, ভিক্টোরিয়া পৃথিবী-পূজিতা নহেন; যে সকল সদ্গুণ কেবল মনুষ্যের নহে, সম্রাজ্ঞীর নহে, দেবী-দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই সকল আকাঙ্ক্ষিত সদ্গুণে ভূষিতা

কালার আশ্রয় তব হৃদয়-আগার।
তুমি মা বাঙ্গালী তরে, ব্যথা নে'ছ হৃদিপরে,
কেশব সেনের মৃত্যু দৃষ্টান্ত তাহার।
ভিক্টোরিয়া কোথা মা আমার!

৫

বিশুদ্ধ কবির জিহ্বা—শাস্ত্রের বচন,
ভক্তি-পুষ্প করি দান, নহে মা, এ বাক্যভান,
স্বর্গ হতে উপহার কর মা গ্রহণ।
।।মি মহাভাগ্যবান্, করি তোরে শ্রদ্ধাদান,
হীন বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা নাহি মা বারণ।
ভিক্টোরিয়া মা আবার হবে কি কখন?

নাট্যাচার্য্য—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া।

আদর্শ-রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে যেরূপ পৃথিবী-ব্যাপী শোকের পরিচয় অনুভূত হইয়াছে, সেরূপ আর কোন নৃপতি বা রাজ্ঞীর তিরোধানে হইয়াছে কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। ইংলণ্ডের কনক-সিংহাসন দেবীশূন্য, ভারতবর্ষের কল্পনাধিষ্ঠাত্রী জননী কাল-সিন্ধুজলে বিসর্জ্জিত; কিন্তু কেবল ইংলণ্ডের নহে, কেবল ভারতবর্ষের নহে, ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-সংবাদে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে কেন্দ্রে শোকতপ্ত শোণিত-ধারা যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে উথলিয়া উঠিয়াছিল। জীবনে মরণে গৌরবময়ী, ভিক্টোরিয়ার ন্যায় রাজ-রাজেশ্বরীর পদস্পর্শ সুখ, পৃথিবীর ভাগ্যে বিরল!

তেষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার শাসন-সময়ে ইংরাজ-রাজত্বের আশাতীত বিস্তৃতি হইয়াছিল বলিয়া, ভিক্টোরিয়া পৃথিবী-পূজিতা নহেন; যে সকল সদ্গুণ কেবল মনুষ্যের নহে, সম্রাজ্ঞীর নহে, দেবী-দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই সকল আকাঙ্ক্ষিত সদ্গুণে ভূষিতা

অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এই শুভ সম্মিলনের ফল আমাদিগের মহারাণী ভারতেশ্বরী।

আলেকজান্দ্রিণা ভিক্টোরিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ২৪ শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যকার তারিখ হইতে গণনা করিলে সে আজ ৮২ বৎসরের কথা। ইংলণ্ডের আপামর-সাধারণ এই নবপ্রসূত কন্যার দীর্ঘ জীবন ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিল। কেননা, অপুত্রক চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর এই কন্যাই ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধিকারিণী। বৃদ্ধ কেণ্টের আনন্দের সীমা রহিল না। কুসুম-কান্তি কন্যার ভবিষ্যৎ গৌরব কল্পনা করিয়া কেণ্ট সময় সময় তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিতেন,—"দেখ দেখ, এই কন্যাই ভবিষ্যতে তোমাদের রাণী হইবেন।" কিন্তু এ আনন্দভোগ কেণ্টের অদৃষ্টে সহিল না। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি নববিবাহিতা পত্নীকে শোক সাগরে ডুবাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কেণ্টের মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়ার সকল ভার তাঁহার জননীর উপর পড়িল। এই রমণী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরীর শৈশব-হৃদয়ে তিনি যে সুশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে তাহারই শ্যাম-ছায়ায় বসিয়া তাঁহার অসংখ্য প্রজাবর্গ জুড়াইয়াছিল।

বালিকা ভিক্টোরিয়া,—বিধবা ডচেস্ অব্ কেণ্টের নয়নানন্দ-পুত্তলী ভিক্টোরিয়া, নির্জ্জন কেন্‌সিংটন রাজভবনে, শিক্ষয়িত্রী ব্যারনেস্ লেজেনের তত্ত্বাবধানে, নানা-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। এই নির্জ্জন বাসে বালিকার ধ্যান জ্ঞান ছিল,—তাঁহার গুণময়ী জননী; শৈশব-ক্রীড়ার সাথী ছিল,—তাঁহারই হৃদয়ের অনুরূপ ফুলরাশি, ও স্বভাব-সুন্দর বৃক্ষলতা; কার্য্য ছিল,—অধ্যয়ন এবং জননীর নিকট উপদেশ গ্রহণ। সংসারের পঙ্কিলতা তাঁহার বাল্যজীবন মলিন করিতে পারে নাই। এই শৈশব-সঞ্চিত পবিত্রতাই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবন গৌরবপূর্ণ করিয়াছিল।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ইহলোকের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। ২০শে জুন তারিখ তাঁহার মৃত্যুর দিন। কিশোরী ভিক্টোরিয়া তখন কেন্‌সিংটন-প্রাসাদে তাঁহার জননীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে কাণ্টারবারীর আর্কবিশপ ও মার্কুইস অব্ কেনিংহাম এই সংবাদ লইয়া কেন্‌সিংটন-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সুপ্তোত্থিতা ভিক্টোরিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগেরও অবসর পাইলেন না; অশ্রুপূর্ণ

অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এই শুভ সম্মিলনের ফল আমাদিগের মহারাণী ভারতেশ্বরী।

আলেকজান্দ্রিণা ভিক্টোরিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ২৪ শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যকার তারিখ হইতে গণনা করিলে সে আজ ৮২ বৎসরের কথা। ইংলণ্ডের আপামর-সাধারণ এই নবপ্রসূত কন্যার দীর্ঘ জীবন ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিল। কেননা, অপুত্রক চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর এই কন্যাই ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধিকারিণী। বৃদ্ধ কেণ্টের আনন্দের সীমা রহিল না। কুসুম-কান্তি কন্যার ভবিষ্যৎ গৌরব কল্পনা করিয়া কেণ্ট সময় সময় তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিতেন,—"দেখ দেখ, এই কন্যাই ভবিষ্যতে তোমাদের রাণী হইবেন।" কিন্তু এ আনন্দভোগ কেণ্টের অদৃষ্টে সহিল না। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি নববিবাহিতা পত্নীকে শোক সাগরে ডুবাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কেণ্টের মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়ার সকল ভার তাঁহার জননীর উপর পড়িল। এই রমণী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। সসাগরা ধরণীর অধী-শ্বরীর শৈশব-হৃদয়ে তিনি যে সুশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে তাহারই শ্যাম-ছায়ায় বসিয়া তাঁহার অসংখ্য প্রজাবর্গ জুড়াইয়াছিল।

বালিকা ভিক্টোরিয়া,—বিধবা ডচেস্ অব্ কেণ্টের নয়নানন্দ-পুত্তলী ভিক্টোরিয়া, নির্জ্জন কেন্সিংটন রাজভবনে, শিক্ষয়িত্রী ব্যারনেস্ লেজেনের তত্ত্বাবধানে, নানা-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। এই নির্জ্জন বাসে বালিকার ধ্যান জ্ঞান ছিল,—তাঁহার গুণময়ী জননী; শৈশব-ক্রীড়ার সাথী ছিল,—তাঁহারই হৃদয়ের অনুরূপ ফুলরাশি, ও স্বভাব-সুন্দর বৃক্ষলতা; কার্য্য ছিল,—অধ্যয়ন এবং জননীর নিকট উপদেশ গ্রহণ। সংসারের পঙ্কিলতা তাঁহার বাল্যজীবন মলিন করিতে পারে নাই। এই শৈশব-সঞ্চিত পবিত্রতাই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবন গৌরবপূর্ণ করিয়াছিল।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ইহলোকের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। ২০শে জুন তারিখ তাঁহার মৃত্যুর দিন। কিশোরী ভিক্টোরিয়া তখন কেন্সিংটন-প্রাসাদে তাঁহার জননীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। অতি প্রত্যূষে কাণ্টারবারীর আর্কবিশপ ও মার্কুইস অব্ কেনিংহাম এই সংবাদ লইয়া কেন্সিংটন-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সুপ্তোত্থিতা ভিক্টোরিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগেরও অবসর পাইলেন না; অশ্রুপূর্ণ

তাঁহার চির-আরাধ্য দেবতাকে হৃদয়মন্দিরে অকৃত্রিম ভক্তি ও অনুরাগের সহিত অভিষিক্ত করিলেন। ইংলণ্ডের সিংহাসনলাভে ভিক্টোরিয়ার যে আনন্দ, প্রিন্স আলবার্ট কনসর্টের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ। প্রিন্স আলবার্ট, মহারাণীর মাতুল লিওপল্ডের ভ্রাতা ডিউক-অব-কোবার্গের কনিষ্ঠ পুত্র; সম্পর্কে মহারাণীর মামাত ভাই। শৈশব হইতেই উভয়ে উভয়ের পরিচিত ছিলেন। উভয়ে উভয়ের সদ্‌গুণে আকৃষ্ট ছিলেন; আজ উভয়ে উভয়ের জীবন-পথের সহ-যাত্রী হইলেন। এই পরিণয়ের পর হইতেই ভিক্টোরিয়ার জীবননাটকের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ভিক্টোরিয়ার স্বামীভক্তির কথা পাঠ করিলে মনে হয় বুঝি, আমাদের সীতা সাবিত্রীর আদর্শে তাঁহার জীবন গঠিত।

বিবাহের ৯ মাস পরে, মহারাণীর প্রথম কন্যা ভিক্টোরিয়া এডিলেড মেরি লুইস জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান জার্ম্মাণীর অধীশ্বর ইঁহারই পুত্র। ইহারই এক বৎসর পরে, আমাদিগের নবীন নৃপতি সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্ম হয়। ইংলণ্ডের ভাবী রাজার জন্মদিনে ইংলণ্ড আনন্দোৎফুল্ল হইয়া নবকুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিল।

এইরূপে সংসারের সর্ব্ববিধ সুখে, চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যায় পরি-বেষ্টিতা হইয়া রাজ্য-সংক্রান্ত নানাবিধ অশান্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে করিতে, ইংলণ্ডেশ্বরী গৌরবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজসংসারে কোন প্রকার অশান্তির উদ্রেক হইল না।

দিন ত সমান যায় না; ইংলণ্ডেশ্বরীর দিনও ত সমান যাইবার নহে। ইহার পর হইতেই মহারাণীর জীবনে পারিবারিক শান্তির হ্রাস হইতে লাগিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মহাকালের করকা-হিম-করস্পর্শে, মহারাণীর জীবন শান্তিহীন হইয়া উঠিল। যে পিতৃহীনা বালিকা অপরিমেয় মাতৃস্নেহে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের জননী হইয়াছিলেন, এই বৎসরেই সেই মাতৃস্নেহ হইতে তাঁহাকে চিরবঞ্চিত হইতে হইল। ৭৬ বৎসর বয়সে ডচেস্ অব কেণ্ট ইহলোক ত্যাগ করিলেন। "স্বর্গাদপি গরী-য়সী" জননী চলিয়া গেলেন; সে শোকবহ্নি নির্ব্বাপিত না হইতেই, তাঁহার সংসারের সকল সুখের শেষ হইল। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রাজকার্য্যের গুরু-আলোচনায়, জীবনের সর্ব্ববিধ-কার্য্যে যিনি সসাগরা

ধরণীর অধীশ্বরীর সর্ব্বস্বময় ছিলেন, সেই লোকপ্রিয়, সচ্চরিত্র, ধীমান্ এলবার্ট কন্‌সর্ট সমস্ত ইংলণ্ডকে শোক-প্লাবিত করিয়া, রাজ-সংসারকে শ্রীহীন করিয়া, ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ে বজ্রপাত করিয়া, ইহলোকের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। যে অতুলনীয়া পতিভক্তি ও পতিসেবার জন্য ভিক্টোরিয়া সর্ব্বদেশের রমণী-সমাজে চিরপূজিতা, ৪২ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে সে স্বামীসেবা হইতে চিরবঞ্চিতা হইতে হইল। স্বামীর পবিত্র স্মৃতি সযত্নে হৃদয়ে পুষিয়া ভিক্টোরিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন মাত্র, তাঁহার জীবনের শান্তি মুছিয়া গেল।

ইহার পর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত, মহারাণী যেমন নানাবিধ দুর্ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া, একদিকে সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার পুত্র পৌত্র ও অগণিত পরিবারবর্গের মধ্যে কত আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত শোক তাঁহাকে প্রতিপদেই বিকল করিয়াছে; বহির্জ্জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে যেমন কুবেরের ভাণ্ডার, অজেয় বাহিনী ও বৃহস্পতি-তুল্য মন্ত্রীবর্গে পরিশোভিত করিয়াছিলেন, অন্তর্জ্জগতের ওই সকল দুর্ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার কবিবার জন্যও তেমনই তাঁহাকে উন্নত জ্ঞান, অপরিসীম ধৈর্য্য, অতুল ধর্ম্মবিশ্বাস, একান্ত পতিভক্তি, অকপট সরলতা প্রভৃতি মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের সকল সদ্‌গুণে ভূষিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবনীর আলোচনা করিলে মনে হয়, আমরা কেবল অপ্রতিহত-প্রভাব-সম্পন্না সম্রাজ্ঞীর জীবনী পাঠ করিতেছি না, বুঝি কোন ঋষিকন্যার পূতজীবন-কাহিনী পাঠ করিতেছি। একদিকে সাম্রাজ্য-ব্যাপী বিপ্লব, বজ্রনিপাতের ন্যায় ঘটনারাশি, চর্চিষ্টবিদ্রোহ, ক্যানেডার বিদ্রোহ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ, চীন ও পারস্যের প্রথম বিভ্রাট, অশান্তি যুদ্ধ, জুলুযুদ্ধ, মিশরে আরবী পাশার বিদ্রোহ, রুষের সহিত পঞ্চদেশ বিভ্রাট, শিখযুদ্ধ, আফগানযুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ, নরশোণিতে পৃথিবীরঞ্জিত, পৃথিবীস্থ সর্ব্বত্রই ইংরাজের রক্তিম নিশান উড্ডীন, তাহার মধ্যে অক্ষুণ্ণপ্রভাবসম্পন্না, তেজোগর্ব্বময়ী, লক্ষ্মীরূপা, রমণী-ললামভূতা, আদর্শ-রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পৃথিবী-শাসনোপযোগিনী ভীমা মূর্ত্তি,—সে মূর্ত্তি দেখিলে সাগর শিহরে, পর্ব্বত মস্তক অবনত করে, বিপুলকায়া ধরা পদতলে লুটাইয়া রহে,—আবার অন্যদিকে, স্নেহপ্রেম-উদ্বেলিত, পরবেদনা-পরিতপ্ত করুণার পূর্ণ-

প্রতিমা, মহামহিমাময়ী বিশ্বজননী ভিক্টোরিয়ার সৌম্যমূর্ত্তি,—সে মূর্ত্তি দেখিলে তাপিতের বেদনা বিদূরিত হয়, পীড়িত হৃদয়ের অবসাদ ঘুচিয়া যায়, জড় চেতনা-প্রাপ্ত হয়, পৃথিবী ক্রোড়ে উঠিতে চায়! এইরূপ অদ্ভুত-তত্ত্বের সম্মিলনে ভিক্টোরিয়ার জীবন গঠিত। এ অমূল্য জীবনের সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়াও অসম্ভব।

এইরূপ বিপুল গৌরবে, সিজারের স্বপ্নের বহির্ভূত সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, পৃথিবীবিজয়াভিলাষী নেপোলিয়ানের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া ইংলণ্ড ও ভারতের অধীশ্বরী গত ২২ শে জানুয়ারি ইহকালের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বর্গরাজ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ন্যায় রাণীর জীবনী ইতিহাস কখনও আপনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতে পারে নাই! হায়! মা, তুমি চলিয়া গেলে, আমাদের কি হইবে?

ভিক্টোরিয়ার স্থূল জীবন-বৃত্তান্ত, অতি সংক্ষেপে, দুই চারি কথায় আমরা উল্লেখ করিলাম মাত্র, ঘটনার পর ঘটনা-স্রোত তাঁহার জীবনের ও রাজত্বের উপর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার সকল উল্লেখ এখানে অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজের ইতিহাসে তাহা চির-অঙ্কিত হইয়া রহিবে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা মেরুদণ্ডের স্বরূপ কাজ করিবে। ভিক্টোরিয়ার সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালে ইংলণ্ডের যে সার্ব্ববিষয়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইংলণ্ড তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। আর আমরা? সেই পুণ্যময়ীর সুশাসনের শান্তি-ধারা বরিষণে, অশান্তির খর-তাপ-ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর জীবনে যে সার্ব্ববিষয়িক উন্নতির বীজ উপ্ত হইয়াছে, আমাদের ভবিষ্যদ্-বংশধরগণ তাহার নয়ন-বিমোহন ফল-পুষ্পের অঞ্জলি লইয়া ভিক্টোরিয়ার অক্ষয় নামে উৎসর্গ করিবে! আমাদের কি ছিল, কি হইয়াছে! ইংলণ্ডের সেক্ষপীয়র ছিল, মিল্টন ছিল, গোল্ডস্মিথ, সেলি, বায়রণ, কাউপার ছিল, বেলে, জনসন্, স্কট ছিল, তাহার পর টেনিসন, থ্যাকারে, ডিকেন্স, সুইনবোর্ণ, ফ্রুড, মেকলে, কার্লাইল জন্মিলেন, সংগ্রথিত কুসুম-হারের সৌন্দর্য্য ফুটিল। আমাদের সে বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনি, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, কল্পনার কোন উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে ধ্যান-মগ্ন ছিলেন, তাহার সম্যক্ সন্ধান রাখিবার শক্তি ও অবসর আমাদিগের ছিল না; কিন্তু আজ এই ভিক্টোরিয়ার যুগে আমরা যে সকল অপার্থিব রত্ন লাভ করিয়াছি, সে রত্ন এ দরিদ্র বাঙ্গালীর ভগ্ন কুটীরে না জন্মিলে, রাজ-রাজ্ঞে-

শ্বরের শিরোভূষণ হইত। এই শুভযুগে আমাদিগের শিশির-কাতর সাহিত্য-কুঞ্জে নব-বসন্ত-সমাগম-প্রফুল্ল মুখরিত-বিহঙ্গ-কলধ্বনি, নিদ্রালস-বিভোর বাঙ্গালীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছে; এই শুভ যুগে আমাদিগের জড়-প্রায় জাতীয়-জীবনের নব অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইয়াছে। এই পুণ্য-ময়ীর রাজত্বে আমাদিগের ধর্ম্মজীবনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে তেজঃ-সম্পন্ন করিয়াছে; এই আদর্শ রাজ্ঞীর সুশাসন-কালে, আমাদিগের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আজ আমরা কেবল ভবিষ্যতের নহে, বর্ত্তমানের কীর্ত্তি লইয়াই জন-সমাজে পরিচয় দিতে পারি।

ভারতবর্ষের এই সর্ব্ব-কল্যাণ-বিধান-ময়ী দেবী পরলোকে! ইংলণ্ড হাহাকার করিতেছে, পৃথিবী শোকচিহ্ন ধারণ করিতেছে। আর আমরা? আমাদের এই দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িত বাঙ্গালীর শুষ্ক হৃদয়-ভাণ্ডারে যে কয় বিন্দু শোণিত সঞ্চিত আছে, তাহা অশ্রুকণায় পরিণত করিয়া তাঁহার বিয়োগ-জনিত শোক প্রকাশ করিব!

আহ্বান-গীতি।

(১)

সেইত গো আসে ঊষা, হেসে হেসে গান গেয়ে,
সেইত গো চারিদিক ফুলে ফুলে যায় ছেয়ে,
সেইত প্রভাত-বায়ু আসে ওগো পায় পায়,
সে আমার হাসিমাখা সোণামুখী কোথা হায়!
আয়রে তুই ঊষার হাসি ঊষার কিরণ,
আয়রে তুই ফুলের বাস ফুলের জীবন।

(২)

সেইত গো চকাচকী গান গায় মুখে মুখে,
সেইত সরসী-জলে মরাল ভাসে গো সুখে,

সেইত কমল-দল পথ পানে শুধু চায়,
সে আমার কমলিনী কোথা ভুলে রহে হায়!
আয়রে সরসী-বুকে ঊষার প্রতিমা খানি,
ফুলময়ী স্নিগ্ধতনু সুরময়ী বীণাপাণি!

(৩)

সেইত মধ্যাহ্ন আসে, নীরবে বকুল ছায়,
আলসে অলস অলি মৃদু মৃদু গুঞ্জরায়,
হরিণী সে পথ ভুলে কাছেতে দাঁড়ায় এসে,
দেখি তার দুটী আঁখি কারে মনে পড়ে শেষে,
আয়রে করুণাময়ী সে নয়নে ভেসে ভেসে,
দেখি তোরে দেখি শুধু আঁখি মেলি অনিমেষে।

(৪)

যাইতে নিকুঞ্জদিকে ঝাঁ ঝাঁ করে কেন মন?
শূন্য আঁখি শূন্যে চেয়ে, শূন্য দেখে এ ভুবন।
শুধু সে নীলিমাময়ী ধূ-ধূ-ধূ আকাশ-পার,
তুই আমি কত দূরে, আছে কিরে সীমা তার?
আয়রে নীলিমাময়ী আয় তুই বুকে আয়,
তুই যে রে শূন্যময়ী, আমিও যে শূন্য হায়।

(৫)

সেইত গো সন্ধ্যা আসে, ফুল খসে, ফুল হাসে,
সেইত সুবাস-ভরে অঞ্চল লুটায়ে আসে।
নয়নে কি যেন ভাসে, কি স্বপ্ন কি ঘুম ঘোরে,
কোথা তুই স্বপ্নময়ী কোথা তুই বল মোরে।
আয়রে সুবাসময়ী স্বপ্নময়ী ছায়া কায়া,
ছায়াতে ছায়ায় মিশে হ'য়ে যাব দেবমায়া।

(৬)

আঁধারে আঁধারে ঘুরে, তুলি কত ফুল-রাশি,
আঁধারে আঁধারে ঘুরে, গড়ি কত ফুল-বাঁশী।

লতিকা দোলায় দুলে করিব রে দুল দুল,
আয়রে বিস্মৃতিময়ী, ইহ জনমের ভুল,
আয়রে আয়রে কাছে, এ জীবন দিব তোরে,
প্রাণ হতে প্রাণ চুরি আঁধারে করিরে ওরে।

(৭)

সেইত গো আসে নিশি, ফুটে তারা দিশি দিশি,
আঁধারে আলোতে মরি কি মধুর মিশামিশি।
এত ক'রে বাসাবাসি আছে ওই শূন্য প্রাণে,
ওর চেয়ে শূন্য এ যে আয় তুই এই খানে।
আয়রে নক্ষত্রময়ী আঁধার পরাণে মোর,
নক্ষত্র-কিরণময়ী বীণাটী লইয়ে তোর॥

(৮)

সুনীল আকাশ বুকে শুভ্র মেঘদল পাশে,
সেইত অলস চাঁদ স্বপ্নঘোরে ডুবে, ভাসে,
নীরব জ্যোৎস্না-রাশি আকাশে হাসিয়া চায়,
কোথা তুই হাসিময়ী দেখা দিবি আয় আয়।
কোথা আছি, কোথা নাই, প'ড়ে যেন নদীকূলে,
কথা নাই ব্যথা নাই এ জীবন যাব ভুলে॥

দেশীয় নাটক ও নাট্যভূমির বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহার অবনতির কারণ।

দলাদলি ও কবির লড়াই যেমন আমাদের জাতীয়-ধর্ম্ম, তেমনি অকাল-পক্কতা ও অকাল-মৃত্যু আমাদিগের মৃত্তিকার ধর্ম্ম। এ মাটীতে যাহাই জন্মে, তাহাই অকালে পক্কতা লাভ করে, আর সেই অকাল-পরিপক্কতা-দোষেই তাহা পাকিয়াই মাটীতে মিশায়। এই অকাল পক্কতার দোষেই হউক, আর গুণেই হউক, আমাদের অনুষ্ঠিত যে কোন কার্য্য-সূচনায় সর্ব্ব-গ্রাসী ভাব-ধারণ করে, আর পরিশিষ্টে বিশ্বামিত্রের বিশ্বসৃষ্টির ন্যায় তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোন্ মহাশূন্যে মিশায়, তাহার সন্ধানও কেহ পায় না। এ মাটীরও পোড়া কপাল, আর আমাদেরও পোড়া কপাল। এ মৃত্তিকায় যদি এত উর্ব্বরা শক্তি ছিল, তবে তাহাতে স্থিতি-বিধায়ক গুণ ছিল না কেন?

অন্যের কথা যাউক, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—অভিনয় ও আভিনয়িক সাহিত্য। আমাদের দেশে স্ফুটনোন্মুখ নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশালা কিরূপে বিকৃত হইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

স্তিমিত-প্রায় দীপশিখার ন্যায়, সন্তাপ-ভার-পীড়িতা দগ্ধহৃদয়া হিন্দু-বাল-বিধবার প্রতিকৃতির অনুরূপ বাঙ্গালাভাষা, বাঙ্গালীর আঁধার কুটীরে জীবন-উষ্ণতা-লেশ-শূন্য সংস্কৃত সাহিত্যের নিস্পন্দবক্ষে, আপনার অপরিমিত সৌন্দর্য্য-ছটা শতছিন্ন মলিন অঞ্চলের অন্তরালে লুকাইয়া, যে দিন দরবিগলিত নয়নে অভিশাপগ্রস্ত বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাদেশের কল্যাণের জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিত, সে দিনের কথা মনে করিতে হইলে, আমাদিগকে স্মৃতিসিন্ধুর সুদূর তলদেশে অবগাহন করিতে হয় না। সে আজ বড় বেশী দিনের কথা নহে,—যে দিন খনিগর্ভস্থ মণিমালার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা অনাদরের মৃত্তিকা-স্তূপের অন্তরালে বিদলিত হইত। শুভক্ষণে কার্য্য-বীর ইংরাজ এ দেশে পদার্পণ করিলেন,—নবীন-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানা-লোকোদ্দীপ্ত ইংরাজের সংস্পর্শে, সহস্র বৎসরের শান্তিহীন পরাধীনতায়,

যাহা আমরা ভুলিয়াছিলাম, তাহাই আবার চিনিতে শিখিলাম। ইংরাজী সাহিত্যের তুষার-ধবল সৌন্দর্য্যে আকর্ষিত হইয়া "সুন্দর"কে চিনিলাম। তখন, সেই অশেষ-সৌন্দর্য্য-সম্পন্না, বীণা-মোক্ষ-গুণ-ময়ী বেদবেদান্ত-বেদাঙ্গ-কবিতা-কাব্যকলা বিভূষিতা, কর্পূর-কুন্দেন্দু-ধবল-প্রভা, বাণী বিদ্যাদায়িনী দেবীপ্রতিমাকে মনে পড়িল। তখন দেশের সুসন্তানগণ বুঝিতে পারিলেন, ভারতীর মানস-কন্যা যে ভাষা,—সে শ্রীময়ী, সে গৌরবময়ী, সে সৌন্দর্য্যময়ী, সে ভবিষ্যৎযুগের শান্তি-সুধা-শ্রীময়ী, সে বর্ত্তমানের আশাময়ী ভাষা, হেলায় অবজ্ঞায় বিনষ্ট হইবার নহে। অমনি সহস্র বৎসরের দুষ্কৃতির অনুশোচনা-সুপ্ত হৃদয় জাগাইয়া দিল; করুণায় হৃদয় আবার কাঁদিয়া উঠিল। অতীতের কোন শুভ মুহূর্ত্তে শবর-নিহত ক্রৌঞ্চমিথুনের বিয়োগান্ত দৃশ্যে যে আদিম কবির গুরুভার-পীড়িত হৃৎস্তর ভেদ করিয়া শোকপ্রবাহ ভাষাকে শ্লোকময়ী করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহারই বংশধরগণ আবার চক্ষুর জলে, ভাষার মলিন কায়া কান্তিময়ী করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গালীর এই স্মরণীয় দিনে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির এই সূচনার সূত্রপাতকালে, বাঙ্গালীর কবি ঈশ্বরচন্দ্র, করুণার পূর্ণমূর্ত্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মনীষা-সম্পন্ন অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রতিভার বরপুত্র অমর-কাব্যকার শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি ভারতীর বিজয়ী সন্তানগণ আবির্ভূত হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র উপেক্ষিতা ভাষার চরণ-সরোজ-যুগে সযত্নে নূপুর পরাইয়া তাহাকে শব্দময়ী করিয়া তুলিলেন। বিদ্যাসাগর নগ্নপ্রায় ভাষাকে বিচিত্র পট্টবস্ত্রে বিশোভিতা করিয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। আর মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ শিল্পকুশলিগণ বিবিধ সাহিত্য কানন হইতে, বিবিধ-ভাব-পারিজাত চয়ন করিয়া ভাষাকে দিব্যমাল্য-ধারিণী করিলেন। নিরাভরণা ভাষা এইরূপে অলঙ্কারময়ী হইল। অমনি সেই নব সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে, মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনিত হইল। মাতৃস্তন্যদুগ্ধের অমৃতধারার সহিত যে ভাষার অমৃতধারা আস্বাদন করিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছিলাম, সেই ভাষায় আবার কাব্য স্ফুরিল,—উপন্যাস, নাটক, গীতিকাব্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের শত অঙ্গ বিকশিত হইল,—যাহা হারাইয়াছিলাম, যাহা ভুলিয়াছিলাম, পুণ্যময় পূর্ব্বপুরুষগণের সুকৃতি-বলে তাহাকে পাইলাম,—তাহাকে চিনিলাম, কাব্য-উপন্যাসাদি উচ্চকলাবিদ্যার সঙ্গে এই শুভযুগে আমাদের দেশের নাট্যশালার নাটকের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হইল।

পণ্ডিত রামনারায়ণ, প্রতিভাবান্ মধুসূদন, পরিহাস-রসিক রায় দীনবন্ধু, বাঙ্গালাদেশের প্রথম নাট্যকার। কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব, কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, নীলদর্পণ, বঙ্গীয় নাট্যযুগের আদিম নাটক। আর স্মরণীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, কবি শ্রীমধুসূদন, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র খ্যাতনামা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-প্রমুখ মহাত্মাগণ বঙ্গদেশে প্রথম নাট্য-শালার স্থাপনকর্ত্তা। এই আদিমযুগের নাটক ও নাট্য-শালার বিকাশ-চেষ্টা বড় সুন্দর,—বড় আশাপ্রদ। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের জন্য আন্তরিক অনুরাগ এই সকল নাটকে বিদ্যমান্। যে বৈদেশিক নাটকের আদর্শে এই সকল নাটকের গঠন, সেই আদর্শের তুলনায় এই সকল নাটক অপরিপুষ্ট হইলেও যথার্থ নাটকের বীজ এই সকল গ্রন্থে অঙ্কুরিত। ভিত্তি যাহার নিঃস্বার্থপরতার উপর,—উদ্দেশ্য যাহার জননীতুল্যা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন, সে শুভকার্য্য যে এইরূপ উচ্চভাব-সমন্বিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উচ্চভাব অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের পরবর্ত্তী নাটক গঠিত হইল না। মধুসূদন, দীনবন্ধু, যে ভাবে নাটকের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকের সে ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, সহজ ও সরলপথে সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সহজভাবে নাটকের ক্রম-বিকাশে একটা সুবিধা হইল এই যে, নাটক বুঝিবার জন্য সাধারণকে বিশেষ চিন্তা-শক্তির পরিচালনা করিতে হইল না। কিন্তু ইহাতে অন্যদিকে একটা মহা অনর্থপাত হইল এই যে, একবারে সহজ-সাধ্য হওয়ায় নাটকের গাম্ভীর্য্য ও তাহার ভাব-বৈচিত্র্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া নাট্যশালাকে কেবল একটা রঙ্গ-রহস্যের আধার করিয়া তুলিল। এই যুগের নাটক এবং নাট্যশালার উন্নতি ও অবনতির গতি লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহা অনুমিত হইবে।

নাটকের এই নূতনযুগে আমরা দেখিলাম কি? দেখিলাম,—যাত্রার ভাঙ্গা আসরে, পাঁচালী ও হাফ্ আখ্ড়ার তালিমি বৈঠকে পর্দ্দা উল্টাইয়া আমাদের দেশে যাত্রার সুরে পেশাদারি থিয়েটারের দল বসিয়াছে। দেখিলাম,—চিরপ্রচলিত কথকতায় যে রাম-রাবণ ও কুরু-পাণ্ডবের আখ্যা-য়িকা বিবৃত হইত, অতি প্রাচীন কাল হইতে যে যাত্রার ভীমার্জ্জুনের অমানুষিক চীৎকারে আমরা বিমোহিত হইতাম, ধ্রুব-প্রহ্লাদের করুণ ক্রন্দনে এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত, তাহাই পরি-

মার্জ্জিত, পরিপুষ্ট ও প্রণালী-বদ্ধ হইয়া আভিনয়িক সাহিত্যে বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সেই দুজ্জের্য়-চরিত্র রাম রাবণ, ধ্রুব প্রহ্লাদ ও ভীম ঘটোৎকচ প্রভৃতি পুরুষ-চরিত্র আর সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি নারী-চরিত্র অভিনীত হইয়া সহজেই জন-মন আকর্ষণ করিতেছে। এইরূপে, সেই পুরাতনের সহিত নূতনের সম্মিলনে, সেই দেশীয় যাত্রার সহিত বৈদেশিক নাট্যশালার সংমিশ্রণে, আমাদের দেশে অধুনা-প্রচলিত নাটক ও নাট্যশালার সৃষ্টি। তাই আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "আগমনী" "রাবণবধ" "নলদময়ন্তী" ও "ধ্রুব-প্রহ্লাদ-চরিত্র" নাটকাকারে প্রথম অভিনীত, ও সেই যাত্রা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত সুরে রাম-রাবণ ও সীতা-দময়ন্তী চরিত্র অভিনয় করিয়া, আমাদের দেশের আধুনিক অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত নাটক ও নাট্যশালার তুলনায় এইরূপ রাম-রাবণের পালা বাঁধা ও তাহার অভিনয় করা যদিও অস্বাভাবিক, ও যাহাদের দেশে নাট্য-সাহিত্য উচ্চকল্পে স্ফুরিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিজনক ও অরুচিকর; তথাপি আমাদের দেশে নাট্য-সাহিত্যের এই প্রথম উন্মেষে, এইরূপ নাটক ও তাহার তদনুযায়ী অভিনয় কেবল বর্ত্তমানে সুন্দর ও ক্ষণিক প্রীতিপ্রদ নহে, ইহা ভবিষ্যৎ নাট্যযুগেরও গৌরব-স্থল; এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা এ দেশে নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিবেন, তাঁহাদেরও শিক্ষার স্থল। বিশেষতঃ আবার যখন দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দেশের অধুনা এই নাট্যযুগের আদিম অবস্থায়ও দেশীয় রঙ্গমঞ্চে রামায়ণ-মহাভারতের পুঁথি পাঠ করার মধ্যেও উচ্চ সাহিত্যের অঙ্গীভূত অনেক কাব্য-উপন্যাসাদি গ্রন্থ নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, তখন স্বতঃই মনে হইয়াছে যে, আমাদের দেশে এই নব-প্রতিষ্ঠিত নাট্যভূমি, কেবল অষ্টাদশ পুরাণের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, স্বাধীন-কল্পনা-শক্তি-বর্জ্জিত ক্ষীণ-বপু হইবে না; নাটকাকারে এইরূপ সৎ-সাহিত্যের খসড়া করিতে করিতে, সে একদিন প্রকৃত নাটকের জনয়িত্রী হইবে। ফলেও হইয়াছে তাহাই। যে রঙ্গ-ভূমিতে কেবল কৃষ্ণকথা কথিত হইয়াছে, সেই রঙ্গ-ভূমিতেই প্রফুল্ল, হারানিধি, মুকুলমুঞ্জরা, চণ্ড প্রভৃতি নাট্যশালার নিজস্ব নাটক অভিনীত হইয়া নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যভূমির, এবং এ দেশে যিনি ইহার প্রবর্ত্তক, তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে,—দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে,—বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু দুরদৃষ্ট বুঝি এ দেশের অবিচ্ছিন্ন সাথী। আমাদের দেশে নাটক ও

নাট্যশালার এইরূপ দ্রুত-বিকাশ ও দ্রুত-উন্নতি দেখিয়া কে মনে করিয়াছিল যে, এই অত্যল্প কাল মধ্যে যাহা এতদূর উন্নতি-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আবার এত শীঘ্র মলিন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে? কিন্তু হায় অকাল-পক্কতা! যাঁহাদের শক্তিপ্রয়োগে নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালার এই আশাতীত বিকাশ, তাঁহাদের শক্তির কোন্ গুণে জানি না, তাহারই আবার এই অকাল-পক্কভাব ও অকাল-মৃত্যুবৎ অবস্থা। আধুনিক নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার সামান্য আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

আজিকালিকার রঙ্গ-ভূমির অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে রঙ্গভূমি হইতে যেন নাটকের যুগ চলিয়া গিয়াছে, যেন উচ্চ অঙ্গের নাটকের উপর্য্যুপরি অভিনয়ে নট ও দর্শক সম্প্রদায় অবসাদগ্রস্ত, যেন চব্য, চূষ্য আহারের পর স্বাদুতার অবিরাম আস্বাদে ক্লান্তজিহ্বার অম্লরসাস্বাদনের লালসাবৰ্দ্ধিত। তাই এখন নাটকের স্থান অধিকার করিয়াছে,—কুৎসিৎ-রহস্যরঙ্গপূর্ণ গীতিনাট্য ও প্রহসন; তাই উচ্চভাবের স্থান গ্রহণ করিয়াছে,—দৃশ্যপটাবলীর চাক্‌চিক্য ও অভিনেত্রীগণের কঙ্কণ-ঝঙ্কার; আর উন্নত চরিত্রের অভিনয়ের পরিবর্ত্তে আদৃত হইতেছে,—খেমটার নাচ ও ভাঁড়ের কর্ত্তব্! বলিহারি মাটীর গুণ! আধুনিক থিয়াটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ দেশের সম্মুখে হলপ পড়িয়া ইহার কিন্তু একটা কৈফিয়ৎ দেন বড় সুন্দর! তাঁহারা বলেন যে, দর্শক-বৃন্দ যাহা দেখিতে ভালবাসেন, তাহাদের সেইরূপ অভিনয়েরই প্রশ্রয় দিতে হয়, এবং রঙ্গমঞ্চে সেইরূপ রঙ্গরসেরই অবতারণা করিতে হয়। তাঁহারা আরও বলেন, "যে দেশের নাট্যশালায় চণ্ড, ম্যাক্‌বেথ ও কালাপাহাড় প্রভৃতি নাটক, দর্শকের প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, সে দেশের নাট্যশালায় 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' ও 'বৌ মা' অভিনয় করিবারই উপযুক্ত স্থান; ভাল নাটক অভিনয় করিতে গিয়া কি শেষে উপবাস করিয়া মরিব।" কিন্তু একথা কি ঠিক? সাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া কি সৎসাহিত্যের বিকাশ? সাধারণের মুখ চাহিয়াই কি সেক্ষপীয়ার ছত্রিশখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন? এতাবৎ সাধারণের মতামত, সূচনা হইতেই কোন্ উচ্চ কার্য্যকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছে? কোন্ দেশের কোন্ কার্য্য সাধারণের ভরসায় হইয়াছে? সাধারণের কথা যাহাকে ইংরাজিতে (mob) বলে, তাহা ত জলবুদ্বুদ মাত্র, সে ত কর্দ্দমপিণ্ড,

কুম্ভকার যেমনি ইচ্ছা তেমনি তাহাকে গড়িবে। এই কর্দ্দমপিণ্ডের হুকুমে যদি দুনিয়া চলিত, তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী ঘুরিত না; মান্ধাতার আমল হইতে উদয় অস্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া সূর্য্যদেব ক্ষয়িত-মূল পাদপের ন্যায় এত দিনে ধরাশায়ী হইতেন। এবম্বিধ সাধারণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, কেবলমাত্র সাধারণের তৃপ্তিসাধন করিয়া দু পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য যে কাজ করে, তাহার নিজত্ব কোথায়? তাহার মহত্ব কোথায়? ঐ রঙ্গালয়ে অভিনয়-নিপুণা হাব-ভাব-গঠিতা বেশ্যার সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়? কোনরূপ মহত্বের আকাঙ্ক্ষা না লইয়া আমাদের দেশে যিনি নাটক ও নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধন করিতে গিয়াছেন, তিনি আমড়াগাছে আম ফলাইতে গিয়াছেন মাত্র,—দেশের উপকার করিতে যান নাই। আর ইহারই অনুসরণ করিয়া যে সকল যুবক আজি কালি নাটক ও নাট্যভূমির চর্চ্চা করিতে গিয়া হীন আমোদজনক খেমটার নাচ নাচিয়া লোক ভুলাইতেছেন, তাঁহারা কেবল আমড়াগাছে আম ফলাইবার চেষ্টা করিতেছেন না,—তাঁহাদের আমড়ার আঁটি চোষাই সার হইতেছে। কাজেই আমাদের দেশে নাটক ও নাট্যভূমির এরূপ দুর্দ্দশা না হইবে কেন?

আর এক কথা—কেবল সাধারণের উপর দোষ দিলেই বা চলিবে কেন? সাধারণে যখন প্রথম অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল, তখন সে ত আবুহোসেনের স্বপ্ন লইয়া যায় নাই। সাধারণে দেখিতে গিয়াছিল,—নাটক ও তাহার অভিনয়,—যাহা এ দেশে সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ অভিনব। আর তোমরাই বরং তাহাদের সমক্ষে যত নীচবৃত্তি-জাত প্রহসন ও গীতিনাট্যের কুৎসিত চিত্র ধরিয়া তাহাদিগের অভিনয়-দর্শনের লালসা ও আগ্রহ বিকৃত করিয়াছ,—সাধারণের মধ্যে কুৎসিত সাহিত্যের অপবিত্র আকর্ষণশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছ। সেই অসৎ-সাহিত্যের প্রভাব এখন দর্শকবৃন্দের উপর এতদূর কার্য্যকর যে, এখনকার দর্শকবৃন্দ আর ভাল নাটকের অভিনয় দর্শনে সহজে সম্মত হয়েন না। 'চণ্ড' ও 'কালাপাহাড়' দেখিয়া মাথা ঘামাইতে কয়জন মূর্খ সহজে স্বীকৃত হয়—যদি কেবল "মজা" দেখিবার অবসর তাহার জুটে? কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের দেশের এই উন্নতিপ্রবণ রঙ্গ-ভূমির অবনতির কারণ কেবল দর্শকবৃন্দ নহেন, পরন্তু এদেশে যাঁহারা রঙ্গ-ভূমির সৃষ্টি করিয়া দর্শকের দলবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অমনোযোগিতা ও শক্তি-হীনতাই এই অবনতির অন্যতম কারণ।

কাজ করিব বলিয়া,—জননী-স্বরূপা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিব বলিয়া,—যাহা এ দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহারই প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিব বলিয়া,—সুকুমার আভিনয়িক শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিব বলিয়া যদি এ দেশে সাধারণ-রঙ্গভূমি কার্য্য করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, এত অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশে রঙ্গভূমির এ অধঃপতন হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে যাঁহারা রঙ্গভূমির প্রবর্ত্তক, তাঁহাদের সে গুরুত্বের জ্ঞান কোথায়? সাহিত্যের মুখে কালি দিয়া,—দেশের মুখে কালি দিয়া,—ভাষা ও ভাবের মুখে কালি দিয়া যাঁহারা ব্যাস-সনকাদির সাধনার চরম বস্তু আদর্শদেব পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে, ডুরি ধরিয়া নাচাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, দেশের ও সাহিত্যের উপকার করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের থাকিলেও সে আকাঙ্ক্ষা যে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে, তাহা স্থির। ফলেও হইল তাহাই। রঙ্গভূমির ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য যাহার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে, তাহার সংগ্রহ আদৌ হইল না; হইল কি? না,—শত বর্ষের গর্ভবেদনার পর পর্ব্বতের মূষিক-প্রসব! নাটক থাকিল যবনিকার অন্তরালে, অভিনয়-চর্চ্চা রহিল বেমালুম নেপথ্যে, আর অরুচি-বৃক্ষের অপুষ্ট ফল অকালে পাকিয়া উঠিল—"প্রহসন!" এ দেশে যাহার অর্থ—যতদূর সম্ভব মুখ বিকৃত করিয়া, কোন ব্যক্তিবিশেষকে কিম্বা কোন সমাজবিশেষকে অভদ্রোচিত ও অশ্রাব্য ভাষায় ছড়া কাটিয়া, নাচিয়া, ঢং দেখাইয়া গালি দেওয়া। হায়, অকাল-পক্কতা! স্ফুটনোন্মুখ নাট্যসাহিত্য-প্রসূনের অভ্যন্তরে তুমিই বোধ হয় পিশাচের মূর্ত্তি ধরিয়া অসময়ে এই প্রহসন-কীট সৃষ্টি করিয়াছিলে। সাহিত্যের এবম্বিধ আবর্জ্জনায় নরকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গের অপেক্ষা গরীয়সী জননীর মুখ-নিঃসৃত চিরপবিত্র ভাষার কোন্ সৌন্দর্য্য ইহাতে ফুটিয়া উঠে, তাহা তুমিই বলিতে পার!

শতাধিক বর্ষ নাটকের চর্চ্চায় ও তদভিনয়ে যাহারা অবসাদগ্রস্ত, যে দেশের নাট্যকার অধুনা সকল দেশের নাট্যকারের গুরুস্থানীয়, সাহিত্য হইতে মনুষ্যত্বের উপাদান সংগ্রহ করিয়া যাহারা প্রত্যক্ষভাবে আজ জগতের পূজ্য, হেলায় যাহারা সাগর-তরঙ্গে পা' রাখিয়া গাহিতে পারে "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্", তাহারাই একদিন আরামে বিরামে চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য, গুরুভারপীড়িত দেহের ক্লান্তিনিবারণ করিবার

নিমিত্ত, চুরুট টানিতে টানিতে রঙ্গমঞ্চে গিয়া, গীতিনাট্য ও প্রহসনের চুট্‌কি-চটক দেখিয়া হাসিতে পারে, আমোদ উপভোগ করিতে পারে, কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের দেশে নাট্য-সাহিত্যের এই প্রথম অঙ্কুর,—যে দেশের লোকের অন্নাভাবে শরীর অবসন্ন, মস্তিষ্ক শুষ্ক ও দুর্ব্বল,—সৎসাহিত্যের অভাবে মন অপ্রশস্ত, কল্পনা সীমাবদ্ধ, হৃদয় নীরস, ধৃতি গুরুভার ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী,—যাহাদিগকে সাহিত্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে,—জগতের সমক্ষে আজ যাহারা শিশু হইতে অক্ষম, স্ত্রীলোক হইতেও পরিশ্রম-কাতর, আর পশু হইতেও হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য, সে দেশে সাহিত্যের দোহাই দিয়া, ইতর জনোচিত ময়ূর-পক্ষীতে খেম্‌টা নাচাইয়া, কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া, অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া, দুইদশ জন ইতর-স্বভাব-সুলভ লোক ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার কি এই উপযুক্ত অবসর? এ দেশে সাহিত্যের উন্নতি করিব বলিয়া, লোকশিক্ষা দিবার ভান করিয়া নাট্য-সাহিত্যে ও নাট্যমঞ্চে যাঁহারা অকালে এইরূপ চিন্তালেশ-পরিশূন্য, অপ্রাসঙ্গিক ও হীন আমোদ-জনক সং রং ঢং ঘটিত সাহিত্যের প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে সমাজের শত্রুতা করিয়াছেন, দেশের শত্রুতা করিয়াছেন, ভাব-ময়ী ভাষা—যিনি জননীর প্রকৃতি-স্বরূপা, সেই চিরব্রীড়া-নম্রতা-শীলতা-সম্পন্না ভাষার লজ্জা-শীলতার হানি করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত নাট্যশালার যে আজি এইরূপ দুর্দশা হইবে,—'প্রফুল্ল' "বুদ্ধদেব" ও "বিল্বমঙ্গলে"র পার্শ্বে তথায় যে "সপ্তমীতে বিসর্জ্জন," 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'বৌ মা' এবং তৎপদানুসরণ-প্রসূত 'আলিবাবা,' 'মজা' ও 'থিয়েটার' দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

আমাদের দেশের রঙ্গভূমির অবনতির আর এক প্রধান কারণ—ইহার বহু-বিস্তৃতি। *এ বাঙ্গালাদেশে এমন নগর নাই, নগরে এমন গ্রাম নাই, গ্রামে এমন* পল্লী নাই, যেথানে—বলিতে লজ্জা হয়—থিয়েটারের আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল থিয়েটারের আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্য-সমাজের কোন উচ্চ কার্য্য করিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, যাহারা আবাল্য নৈতিক বল হারাইয়া সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে, তাহারাই এই সকল থিয়েটারের অনুষ্ঠানকর্ত্তা। কেন এরূপ হইল? রঙ্গভূমির এরূপ লাঞ্ছনা কি আদর্শের-দোষেই ঘটে নাই? প্রকাণ্ড

রঙ্গালয়েই যখন আমরা বিনা-আপত্তিতে "কে পোয়াতি ইত্যাদি," "ভগ্নি, প্রেম দিব ধামায় ধামায়," "ঘোষজা বুড়ার কচি বৌ বেরিয়ে গিয়েছে," প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত কলাপ আমাদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগিনী, জননীকে শুনাইতে লইয়া যাইতে পারি, তখন আমাদের দেশের অশিক্ষিত বর্ণজ্ঞান-শূন্য লোকেই যে থিয়েটার করিতে সাহসী হইবে, তাহা কি বড় কথা?

রঙ্গভূমির এবম্বিধ অবনতির আর একটী প্রকৃষ্ট কারণ,—প্রথম হইতেই শিক্ষিত-সমাজ কর্তৃক সাধারণ রঙ্গভূমি অনাদৃত ও উপেক্ষিত। আদরও নাই, শাসনও নাই; আছে কেবল, সময় সময়—কিসের খাতিরে জানি না,—চাটুকার-বৃত্তি কোন কোন দেশীয় সংবাদপত্রের অযথা তোষা-মোদ বৃষ্টি। মাসিমার অত্যধিক আদরে ও উপেক্ষায় ভুবন বিদ্যালয়ে সামান্য চুরি হইতে হাত পাকাইয়া, যখন ক্রমশঃ খ্যাতনামা চোর হইয়া উঠিল, এবং শেষে যখন বুঝিল যে, তাহার ক্ষণভঙ্গুর দেহের পরিণাম ফাঁসি-কাষ্ঠে, তখন একবার তাহার সেই মাসীকে মনে পড়িয়াছিল; গোপনে কিছু বলিবে বলিয়া, সে তাহার ফাঁসীর কারণ মাসীকে নিকটে ডাকিয়া, তাহার কাণ কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছিল। ভুবনের কিছু শিক্ষা হউক বা না হউক, কর্ণহীনা মাসীর যে কিঞ্চিৎ চৈতন্যলাভ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশীয় সংবাদ-পত্রগণ, ঐরূপ মাসীর ন্যায় চিরকাল যে রঙ্গভূমির ইতরজনোচিত রঙ্গ-রহস্যে হাততালি দিয়া বাহাদুরী দেখাইলেন, অধুনা সেই রঙ্গমঞ্চে নিত্যগঠিত সং-সম্পাদকের নাসা-কর্ণহীন আত্মমূর্ত্তি দেখিয়া ও আগাগোড়া 'চাবুক' খাইয়াও—তাঁহাদের চৈতন্য হইল না! হায়, মাসী-ধর্ম্মী সম্পাদক! তোমা-দের জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি, তা তোমরাই বলিতে পার।

এদেশে নব-প্রতিষ্ঠিত নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার আভাস-মাত্র আমরা এই প্রবন্ধে দিলাম। জানি না, কবে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে, আমাদের দেশে নাটক ও নাট্যশালার এবম্বিধ হীন অবস্থা বিদূরিত হইবে। অধুনা যাঁহারা নবীন উদ্যমে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ,—তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের লক্ষ্যকে কিঞ্চিৎ উচ্চভাব-সমন্বিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অনেকটা সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু এ মহৎ উদ্দেশ্যের কণামাত্র যদি তাঁহাদের না থাকে, দেশের লোককে আমোদের

সঙ্গে সৎশিক্ষা দিব, তাহাদের ক্ষীণ কল্পনাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিব, নাটকের ও অভিনয়ের উচ্চভাব সমাজ-শরীরে প্রবাহিত করিয়া সমাজকে সরস করিব, আদর্শের পরিস্ফুট চিত্র অভিনয় করিয়া দেশের লোককে মানুষ করিব, এই মহতী উদ্দীপনা যদি তাঁহাদের হৃদয়ে না থাকে, তাহা হইলে এবম্বিধ আবর্জ্জনাপূর্ণ অভিনয় ও আভিনয়িক-সাহিত্যের অবতারণা করিয়া, যে বেশ্যা দেশের সর্পবিশেষ,—সমাজের সর্প বিশেষ, অবাধে সেই সর্পকে গললগ্ন-ভূষণ করিয়া, কেবল আত্ম-তুষ্টিসাধন করিবার জন্য সমাজের বুকে বসিয়া, কুৎসিত আচরণ দৃশ্যপটাবলীর অভ্যন্তরে রাখিয়া ঢাকিয়া, কালিমাস্পৃষ্ট মুখ পাউডারে রঞ্জিত করিয়া, ভাবহীন, স্বভাব ও সহৃদয়তাহীন, বিকৃতস্বরে সাহিত্যের দোহাই দিয়া, অভিনয়ের ভান করিতে বসিয়া সমাজ-শরীরে বিষপ্রবাহ সঞ্চারিত করিবার প্রয়োজন কি,—হে সয়তান,—যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তুমিই তাহার যথার্থ উত্তর দিতে পার! হায়, মধুসূদন, দীনবন্ধু! তোমাদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য-মন্দিরে এই প্রেত-নৃত্যের অবসান কতদিনে হইবে? এ শ্মশানে আবার কবে ফুল ফুটিবে? কবে দেশের মতি-গতি ফিরিবে,—দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে?

কবি-সঙ্গীত।

১

অসীম সৌন্দর্য্য রাশি,
দিগন্তে গিয়েছে মিশি,
কে তুমি গো ত্রিদিব ললনা?
অলক্ষ্যে দাঁড়ালে আসি,
অধরে মধুর হাসি,
মূর্ত্তিমতী মোহিনী কল্পনা।

তোমার অঞ্চল ছায়,
পুলকিত মম কায়,
সচকিতে মেলিনু নয়ন,—
পলক না পালটিতে,
কোথা গেলে সুরসুতে!
সঙ্গোপনে এ খেলা কেমন?

কত দিন গেল চ'লে,
কে তুমি জানিনু ব'লে,
কত যে গো করিনু সাধনা,
পূর্ণ না করিলে আশা,
এ কেমন ভালবাসা,
এ তোমার কেমন ছলনা?
কবে যে আসিয়া তুমি,
তোমার এ লীলাভূমি
রচিয়াছ আমার হৃদয়ে;—
গাঁথিয়ে কুসুম মালা,
কখন কর যে খেলা;
থাক কোন্ নিভৃত নিলয়ে,—
কিছুই জানিতে মোরে,
দিবে না কি ভাল ক'রে?
কেবলি কি স্বপ্নাভাস-সম,—
শাশ্বত সুরভি-ঘ্রাণ,
তোমার এ অভিজ্ঞান,
রেখে যাবে স্নিগ্ধ মনোরম?

(২)

আধ আধ জাগে প্রাণে,
কোন দিবা অবসানে,
বসেছিনু কোন নদীকূলে।
শিশু-হৃদে নব রাগে,
স্ফুরিত আনন্দ জাগে,
বহে বায়ু হৃদয় মুকুলে।
অস্তাচল-অভিগামী,
বিষণ্ণ বাসর-স্বামী,
চেয়ে রয় আকুল নয়ানে।
ডোবে সে সোণার কায়,
তথাপি বারেক চায়,
কি ভাবিয়া পূরবের পানে।
তটিনী লহরী তুলে,
নাচিতেছে কুতূহলে,
গাহিতেছে সুললিত গান।
সে শিশু-হৃদয়ে কত,
উঠে নব সুখ-স্রোত,
মগ্ন ক'রে দেয় মগ্ন-প্রাণ!
এলো থেলো কেশ-বাশে,
সায়াহ্নের রক্তবাস,
লুটাইছে পশ্চিম গগনে।
তটিনী সে ছবি সুখে,
গরবে ধরিয়া বুকে,
মাধুরী ছড়ায় ফুল্ল মনে!
পুলকিত কবি কায়,
মন্দ মন্দ বহে বায়,
কুসুম-সৌরভ বিতরণে।
না জানি সে কি তরঙ্গ,
এলায়ে দিতেছ অঙ্গ,
মায়াময় গোধূলি কিরণে!

(৩)

কি উদাসে ভাবে ভোলা,
সেই স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
তুমি বুঝি হেরি অবকাশ,—
আমার অজ্ঞাতে আসি,
উদার হৃদয়ে পশি,
রচিলে তোমার লীলাবাস?
নব তরু ফুলে ফলে,
সাজালে ব্রততী দলে,
হৃদয়ে রচিলে কুঞ্জবন।

মধুর সৌরভ বাস,
স্নিগ্ধজ্যোতি পরকাশ,
অভিনব নন্দন-কানন।
নব শ্যাম-কুঞ্জতলে,
রঞ্জিত কুসুম-দলে,
স্বজিয়া অপূর্ব্ব সিংহাসন,—
বসিলে সে সিংহাসনে,
নিভৃতে প্রশান্ত মনে,
দেব-বীণা করিয়া গ্রহণ।
ধীরে বীণা করে তুলি,
সঙ্গীত-সৌরভ ঢালি,
দিলে তার নীরব ঝঙ্কার।
সে নিশীথে সেই সুর,
পশিল মানস-পুর,
স্বপ্নরাজ্য করিল বিস্তার।
সেই নিশি অবসানে,
কি ভাব আসিল প্রাণে,
হেরিলাম বিমল প্রভাত।
রঞ্জিত অরুণ করে,
স্নিগ্ধ সুধা-ধারা ঝরে,
রত্নশৈলে অমিয় প্রপাত।

(৪)

আজ গরজিছে মেঘ,
প্রবল বায়ুর বেগ,
ঘন ঘন হ'তেছে বর্ষণ।
"মেঘদূত" লয়ে করে,
বসিয়ে আবেগ-ভরে,
ধীরে ধীরে করি অধ্যয়ন।
যক্ষের মরম-ব্যথা,
কিবা সুললিত গাথা!
কি মধুর বিলাপ-বচন!
কি মলিন-বেশা মরি
বিরহ-কাতরা নারী!
মলিন সে বিলাস ভবন!
কিবা প্রকৃতির শোভা,
স্নিগ্ধকর মনোলোভা,
কি অসীম কবির রচনা!
তিরপিত করে প্রাণ,
ভোলায় সংসার-জ্ঞান,
দূরে যায় মানস-ভাবনা।
দিব্য-কাব্য-সুধাপানে,
পুলক-বিহ্বল প্রাণে,
"মেঘদূত" করি সমাপন,—
তোমারে লভিব ব'লে,
হৃদয়ের তলে তলে,
করিলাম কত অন্বেষণ।
কাব্যের আলেখ্য গুলি,
তুমি ধীরে করে তুলি,
দেখাইলে করিয়া প্রাঞ্জল।
তোমার সিগিধ দৃষ্টি,
রচিল নবীন সৃষ্টি,
ধরিল সে শোভা সমুজ্জ্বল।

(৫)

এখনো মরমে গাঁথা,
নব সুখ-স্বপ্ন যথা,
লীলাময়ি! তব লীলা খেলা।
তবু এ রহস্যজাল,
বিস্তারিয়ে চিরকাল,
রাখিবে কি হে মানস-বালা?

নিজ-নাভি-গন্ধে মুগ্ধ,
না জানিয়া হ'য়ে ক্ষুব্ধ,
মৃগ যথা ভ্রমে ভ্রম-বশে,—
হে কল্পনে মনোরমে!
তেমতি ভ্রমিব ভ্রমে,
একবার দাঁড়াও না এসে।
তোমায় নয়ন-কোণে,
স্তিমিত দামিনী দোলে,
পলে পলে দিতেছে আভাস।
এস তবে সৌম্য বেশে,
সম্মুখে দাঁড়াও এসে,
পূর্ণ কর ভক্ত-অভিলাষ।

এস তবে দাও দেখা,
একি গো তোমারি লেখা,
মণিময় খচিত রতনে?
উজ্জ্বল অক্ষর কিবা!
বিতরে বিচিত্র বিভা!
প্রস্ফুটিত হৃদয়-তোরণে!
তুমি কবি আমি কাব্য,
তোমার রচনা নব্য,
আমা হ'তে লভিছে বিকাশ।
দোঁহে মিলি এস তবে,
পান করি কাব্যাসবে,
ভুঞ্জি দোঁহে নন্দন-বিলাস॥

শিল্প-শিক্ষা।

এক সময় ভারতবর্ষ শিল্প-শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তখন নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বিবিধ-শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকিয়া প্রত্যেক বিভাগে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। এখন সেই ভারতবর্ষে শিল্প-শিক্ষার তাদৃশ আদর নাই, ক্রমেই অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তম-রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শিল্পশিক্ষায় উদ্যম ও যত্ন কমিয়া যাওয়ায় বিস্তর লোকের জীবিকা-অর্জ্জনের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়াছে। যতদিন না লোক স্ব স্ব বৃত্তির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া উন্নতির জন্য অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে, যতদিন না স্ববৃত্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেশীয়-শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হইবে এবং যতদিন না দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকের দৃষ্টি মধ্যবিত্ত লোকের প্রতি পতিত হইয়া প্রকৃত সাহায্যের জন্য অদম্য উৎসাহের সহিত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, ততদিন

এ দেশের দুর্দ্দশা মোচনের আশা সুদূর-পরাহত—ততদিন দেশ অবনতির গভীরতম কূপে নিমগ্ন থাকিবে।

জগতে প্রত্যেক জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, লোকের কার্য্য প্রথমে কেবল বাক্যে পর্য্যবসিত হয়; অর্থাৎ বক্তৃতা, বাগ্‌বিতণ্ডা ইত্যাদিতে লোকের মন বিশেষরূপে ধাবিত হয়। ইহা করিলে ভাল হয়, উহা করা উচিত, তাহা না করিলে কি প্রকারে উন্নতি হইবে, ইত্যাদি কথা লইয়া বৃথা-আন্দোলনে সময় অতিবাহিত করিতে প্রথমতঃ অনেকেই পটু। প্রকৃতকার্য্যকর বিষয়ে কেহ তাদৃশ মনোযোগ দিতে প্রস্তুত নহে। ঠিক এইরূপ অবস্থার পর স্বতঃই এমন যুগ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন যত্ন আগ্রহ, উদ্যম অধ্যবসায় প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল তাড়িতবৎ যুগপৎ মানব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্যকারিতা-শক্তি শতগুণে বৃদ্ধি করে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বের বৃথা-আন্দোলিত বিষয় সকল কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। ঐ সকল প্রবৃত্তি পরম্পরার উত্তরোত্তর যতই উৎকর্ষতা-লাভ ঘটিতে থাকে, ততই মানব প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে সমুৎসুক হয়। এরূপ যুগের কথা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া মনে মনে আন্দোলন করিলেও আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হয় এবং ভবিষ্যতে আমাদের দেশের লোক সময়ের পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নতিলাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক সমবেত আলোচনা দ্বারা কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিবার আগ্রহ বা অভিলাষ প্রকাশ করেন না,--ইহাও দেশের অবনতির অন্যতম কারণ বলিতে হইবে। তবে মন্দের ভাল এই যে, পূর্ব্বে যে সকল লোক শিল্প, কৃষি, বা বাণিজ্যের প্রসঙ্গ শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন, এখন সেই সকল লোক যত্ন ও আগ্রহের সহিত ঐ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন ও আলোচনা করিতেছেন। ইহা দেশের পক্ষে সুখের ও সৌভাগ্যের সংবাদ বলিতে হইবে।

শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আন্দোলন বা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কতিপয় ভারত-হিতৈষী, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, উচ্চ-প্রকৃতির ইংরাজ বন্ধু এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। প্রথম

শ্রেণীর খ্যাতনামা লোকদিগের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য সার জর্জ্জ বার্ডউড, ডাক্তার ওয়াট, স্বর্গীয় সারউইলিয়াম হাণ্টার, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বণিক টেলারি সাহেব প্রভৃতি। এই সম্প্রদায়ের অভিমত এই যে, শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে এদেশে উপস্থিত কোন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, এদেশে জাতিভেদ-প্রথানুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্নরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা বংশ-পরম্পরায় যেরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া অপর কোন নূতন কারিকর-শ্রেণীর গঠন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহার যে ব্যবসায় আছে, সেই ব্যবসায় কি কারণে লোপ পাইয়াছে বা পাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার মূল তথ্য অনুসন্ধান করিয়া, যাহাতে সেই ব্যবসায় সেই সকল সম্প্রদায় দ্বারা বজায় থাকে, অথচ উন্নতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়-সাধনে বিশেষরূপে বদ্ধপরিকর ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া যত্ন করা বিধেয় এবং যাহাতে ঐ সকল বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়ীদিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে দেশে ও বিদেশে ব্যবহৃত হয়, তদ্বিষয়ে সাধারণের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আমাদের দেশের লোক নিতান্ত বিরল হইলেও, আমরা কয়েকটী বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তিকে এই শ্রেণীতে দেখিতে পাই,—যাঁহারা কেবল স্রোতে গা ভাসান দিতে চাহেন না। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইনি প্রত্যক্ষতঃ নিজ জীবন এই সম্বন্ধে উৎসর্গ করিয়া, দেশের উন্নতিকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তৎপরে 'নেশান' সম্পাদক স্বনাম-প্রসিদ্ধ সুযোগ্য মনস্বী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রথিত-নামা 'নেশানে' গত ১৯০০ সালের ২৪ শে নভেম্বর তারিখে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ সাধারণের অবগতির জন্য ও সেই বিষয় পাঠান্তে নিভৃতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"The Brahmin boy, however, will not readily become as expert a Carpenter as a Carpenter's son and the Kayastha will not hold the plough as effectually as a Cultivator's boy. Whatever may be true on general principles, in India the industries will not gain by a severance of traditions and a mixing up of occupations."

আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল।—

"On the other hand, the old principles of following the hereditary calling of the family is also falling in abeyance, as the sons of mechanics, when educated, often become clerks. This is a very serious danger. * * * It is in my opinion more important to give men of the artizan classes opportunities of arising in their profession, than to attempt the task of training lads who are from the circumstance of their birth and disposition, unfitted to adopt an industrial corcer."—E. W. Collin, C. S. in "Report of the existing arts and industries in Bengal, 1890."

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ লোকের অভিমত এই যে, শিল্পশিক্ষা-বিস্তারের জন্য আমাদের দেশে শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন। অবশিষ্ট কতকগুলির মত,—জাপান, জার্ম্মাণি, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে আমাদের দেশ হইতে শিক্ষিত যুবক-বৃন্দকে প্রেরণ করিলে, তাহারা বিভিন্নরূপে শিল্পশিক্ষা করিয়া যখন এদেশে ফিরিবে, তখন তাহাদের দ্বারা দেশের বিবিধ বিষয়ে উন্নতি হইবে এবং কার্য্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ রূপে সম্প্রসারিত হইবে।

উভয় শ্রেণীর অভিমত লইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উভয় শ্রেণীর কথা আংশিক ভাবে সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে কেবল প্রথম শ্রেণীর অভিমত লইয়া কার্য্য করিলে চলিবে না; আবার কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেও হইবে না। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাপূর্ব্বক বিশেষ প্রণিধান করিয়া কার্য্য করা উচিত। নতুবা সিদ্ধমনোরথ হইবার আশা নাই। উভয় সম্প্রদায়ের মতের সামঞ্জস্য করিয়া যতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, এ প্রবন্ধে তাহাই বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রথমতঃ আমাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত,—যাহাতে আমাদের প্রাচীন শিল্প বজায় থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বস্ত্রবয়ন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে

বস্ত্রাদি যেরূপ বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত, তাহার ষোড়শাংশের একাংশ আজকাল হয় কি না সন্দেহ। দেশীয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন-দেশ-জাত বস্ত্র আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহার মূল কারণ,—আমাদের দেশের তুলার চাষের প্রতি লোকের আর তাদৃশ আস্থা নাই। তুলার চাষে যত্ন না থাকায় পূর্ব্বে যেরূপ তূলা জন্মিত, এখন আর সেরূপ তূলা উৎপন্ন হয় না। এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তূলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। সেখানে যে তূলা জন্মে, তাহার সূতা দীর্ঘে অনেক বড় হয়; আমাদের দেশের তূলা হইতে সচরাচর যে সূতা প্রস্তুত হয়, তাহা দীর্ঘে তুলনায় অত্যন্ত কম। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীর দেশে যে তূলার চাষ করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশজাত তূলা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশের লোক যদি যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ তূলার চাষ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ক্রমে সেই ভাল তূলার চাষ বিস্তৃতি-লাভ করে এবং তন্তুবায়-কুলের ব্যবসায় ক্রমে লোপ না পাইয়া বরং শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। এখন জাতীয় ব্যবসার অভাবে তন্তুবায়েরা বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। অনেক স্থানে যদিও অনেক তন্তুবায় জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিল্পের প্রতি অনাস্থা,—কি পরিতাপের বিষয়! এই শিল্প-ব্যবসায়ে আমাদের দেশে কাহারও সহানুভূতি নাই, উন্নতি করিবার বা উন্নতিকর কার্য্যে যোগ দিবার কাহারও ইচ্ছা নাই; বরং যাহাতে কোনরূপ উন্নতিকর কার্য্য স্থায়ী না হয়, তদ্বিষয়ে অনেকে যত্নবান্!

দেশের যখন এতদূর জঘন্য অবস্থা, তখন ইহার সংস্কার করিতে হইলে, আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে উপায়ান্তর নাই। বড় দুঃখেই স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন সৎকার্য্যানুষ্ঠায়ী দলের নেতাদিগকে বলিয়াছিলেন,—যদি সমস্ত দেশের দশ-হস্ত পরিমিত ভূমি-নিখাত করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কোন উন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, এবং তখন সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে সফলতালাভ করা সম্ভব-পর,—নতুবা নহে। এ দেশের অস্থি মজ্জা সব পচিয়া গিয়াছে, আর বস্তু নাই।—তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করিতে গেলে, দেশীয় লোকের সহানুভূতি, যত্ন, আগ্রহ, অধ্যবসায় একান্ত প্রয়োজনীয়। যতদিন না দেশের লোকের মতি-গতি ফিরিবে, ততদিন সে আশায় পূর্ণমাত্রায় সফল-কাম হওয়া অসম্ভব। তত্রাপি আমরা নিশ্চেষ্ট বা

নিরুদ্যম থাকিব না,—যে কোন প্রকারে যতটুকু উন্নতি করিতে পারি বা উন্নতির পথের কণ্টক উদ্ধার করিতে পারি, সাধ্যানুসারে ততটুকু করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে চেষ্টা করিব। জগতে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা মনুষ্যের দ্বারা হইয়াছে; যাহা কিছু হইতেছে, মনুষ্যের দ্বারা হইতেছে, এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আরও যাহা কিছু হইবে, মনুষ্যের দ্বারা হইবে! তবে হতাশ হইবার প্রয়োজন কি? তবে, তরঙ্গ দেখিয়া তরণীর হাল পরিত্যাগ করি কেন? আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক, অবশ্য দিন আসিবে, যখন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

আমাদের দেশের তন্তুবায়েরা যে তাঁতদ্বারা বস্ত্রবয়ন করিয়া থাকে, আজকাল ঐ সকল তাঁতে বস্ত্রবয়ন করিয়া ম্যান্‌চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এখন উন্নতির যুগ। সকল জাতি যেমন উন্নতির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছে, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। কি উপায় অবলম্বন করিলে, অল্প সময়ের মধ্যে বেশী বস্ত্র বয়ন করিতে পারা যায়, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের হস্ত-চালিত কল অপেক্ষা বিলাতের কলে বেশী পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হয়; সেইজন্য তথাকার বস্ত্র এখানে অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, আর আমাদের দেশীয় বস্ত্রের মূল্য বেশী বলিয়া লোকে লইতে পারে না। বাজারে সস্তা জিনিসের খরিদদার চিরকালই বেশী। দেশীয় কলের উন্নতি যদি কিছু হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহার চেষ্টা করা কিম্বা বিদেশ হইতে কল আনাইয়া দেশে যাহাতে বেশী পরিমাণে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা একান্ত উচিত। এ সকল কার্য্য করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন; নিঃস্ব লোকের দ্বারা এই সকল গুরুতর কার্য্য হইতে পারে না। ধনী-সম্প্রদায় যদি এদিকে একটু মনোযোগ করেন, তাহা হইলে অনায়াসে হইতে পারে। কয়েক মাস অতীত হইল, সে দিন ভারতীয় শিল্প সমিতির (Indian Industrial Association) এক বিশেষ অধিবেশনে সদাশিব কেলকার নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি এক রকম তাঁত প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে এখন যে সময়ে একখানি বস্ত্র বয়ন হয়, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার উদ্ভাবিত তাঁতে তিনখানি বস্ত্র প্রস্তুত হইবে। এই উদ্ভাবিত কল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে-

ছেন এবং সেই সঙ্কল্প লইয়া তিনি ইংলণ্ড, পারিস প্রভৃতি স্থানের তাঁতে কিরূপ বস্ত্রবয়ন হয়, তাহাই দেখিতে গিয়াছেন। তিনি তাঁহার উদ্ভাবিত তাঁতে বস্ত্রবয়ন-কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে, এবং আমাদের দেশের লোক তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে, একটী বিশেষ অভাব মোচন হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ ভাবে প্রত্যেক শিল্প কি কারণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিত।

সভ্যতা-বিস্তারের সহিত আমাদের দেশে অনেক নূতন ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ দেশে যাহা হইত না, এখন সেই সকল দ্রব্যেরও প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে; যথা—কাচের বাসন, সাবান, দেশলাই, ষ্টীলকলম, বিস্কুট ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ সমুদয় বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে এবং শিক্ষা করিয়া আমাদের দেশে ঐ সম্বন্ধে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তার করিবার অভিপ্রায় করিলে, আমাদের দেশ হইতে শিক্ষিত উন্নতি-শীল ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া প্রতি বৎসর ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠান নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ শিক্ষার জন্য যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত অথবা নিঃস্ব লোকের সন্তান হওয়াই সম্ভব; কয়জন ধনীর সন্তান এরূপ শিল্প-শিক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্যপ্রদেশে যাইতে সম্মত হইবেন? শতকরা একজনও কি না সন্দেহ। মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্রের সন্তান যাঁহারা শিল্প-শিক্ষার জন্য যাইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য দ্বারা না পাঠাইলে, যাইতে সম্পূর্ণরূপে অপারক। সুতরাং এই মহৎকার্য্য সংসিদ্ধ করিতে হইলে, মূলধনের প্রয়োজন। আমাদের দেশের ধনীসম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে, এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য অনায়াসেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন; কিন্তু কেবল ঐরূপ করিলেই যথেষ্ট হইল না। যদি কোন প্রকারে টাকা সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি লোককে য়ুরোপে শিল্প-শিক্ষার জন্য পাঠান যায়, এবং তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া এ দেশে কোনপ্রকার কারখানায় নিজ নিজ শিক্ষিত ব্যবসায় করিতে না পান, তাহা হইলে সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি-স্বরূপ বৃথা হইল। গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের কয়েকজন লোককে কৃষি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য সাইরেনসেস্‌টার কলেজে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা কেহই ঐ বিষয়ে কাহারও কোন সহানুভূতি না পাওয়ায়, কার্য্যক্ষেত্রে

কেহ বা ডেপুটী হইয়াছেন, কেহ বা স্কুল করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের কৃষিশিক্ষা কিছুমাত্র কার্য্যকরী হয় নাই; সমুদয়ই বৃথা হইয়াছে।

তাই বলি, শিল্প শিখিবার জন্য লোক পাঠাইবার খরচ বা তাহাদিগকে স্কলারসিপ দিলে চলিবে না, এ বিষয়ে জাপানবাসীদের সুন্দর প্রশংসনীয় প্রথা আমাদের বিশেষরূপে অনুকরণীয়। জাপান হইতে প্রত্যেক বৎসর কতকগুলি করিয়া শিক্ষিত লোককে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে শিল্পশিক্ষার জন্য পাঠান হয়; কিন্তু তাহাদের প্রথা আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশে যদি কোন ধনী কাহাকেও শিল্পশিক্ষার জন্য ভিন্নদেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার কেবলমাত্র খরচ দিয়াই ক্ষান্ত হন; ভবিষ্যতে সে কি করিবে, তাহার কোন চিন্তা করেন না। জাপানের প্রথা এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর। সে দিন কোন এক খানি ইংরাজী পুস্তকে জাপানবাসীদের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে।—"These youths (Japanese) are sent to Europe with fixed prospects. They know what they are to do and what to earn on return home; they are sent up after settling the projects and schemes for establishing new undertakings."

অর্থাৎ যে জাপানী যুবকেরা য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে শিল্প-শিক্ষা করিবার জন্য যায়, তাহাদের ভবিষ্যৎ আশা এই যে, দেশে ফিরিয়া আসিবামাত্র সেই সম্বন্ধীয় কারখানায় কোন কাজ পাইবে।

আমাদেরও এই মত। আমরা বলি যে, কয়েক জন ধনী একত্র হইয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটী ছাত্রকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী বা জাপান প্রভৃতি স্থানে তাহার যাবতীয় খরচ দিয়া পাঠান। পাঠাইবার কালীন তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সম্ভবতঃ যত টাকা ব্যয় হইতে পারে, অনুমান করিয়া সেই টাকার জীবন বীমা করিয়া দিউন। যদি দৈববশতঃ তাহার অকালমৃত্যু হয়, তাহাতে টাকার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত যে বিষয় শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে পাঠান হইবে, সেই সম্বন্ধে কোন একটী কারখানা খোলা আবশ্যক। সেই সকল ছাত্রদের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত থাকিবে যে, তাহারা শিল্প-শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিলে অন্ততঃ

পাঁচ ছয় বৎসর সেই কারখানায় বেতন লইয়া কার্য্য করিবে; উক্ত সময়ের মধ্যে কোথাও যাইয়া স্বাধীনভাবে সেই কার্য্যের ব্যবসায় করিতে পারিবে না। এরূপ করিলে যে ছাত্র শিক্ষার জন্য গমন করিবে, তাহার ভবিষ্যতের আশা রহিল যে, দেশে ফিরিবামাত্র কাজ পাইবে; অন্নের জন্য চিন্তা করিয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না। আর যাঁহারা ব্যয় করিয়া দেশের উপকারার্থে ঐ সকল ছাত্রকে পাঠাইবেন, তাঁহারাও কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। বরং তাঁহাদের সেই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। দেশের লোকেরও উপকার করা হইল, অথচ লাভবান্ হইতে পারিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক ও বাঞ্ছনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? সেইজন্যই বলিয়াছি, উভয় দলের মতের মধ্যে আংশিক সত্য ও যুক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে। শিল্প-শিক্ষার জন্য কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে কোন ফল হইবে না, কিম্বা দুই চারিটী স্কলারসিপ স্থাপন করিয়া দেশের শিক্ষিত লোককে পাশ্চাত্যপ্রদেশে পাঠাইলেও কিছুই হইবে না। অদ্য আমরা এইখানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম, বারান্তরে এ সম্বন্ধে অন্য আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা-কানন।

শ্মশানে বট।

অসীম অনন্ত ব্যোম মাথার উপরে,
চরণে বহিয়া যায় জাহ্নবীর জল,
চাহিয়া সুদূরে ওই, দূর দিগন্তরে,
কি ভাব আপন মনে দাঁড়াইয়া বল।

অনন্ত পথের যাত্রী প্রতিদিন হায়!
তোর এ ছায়ার কোলে লভিতে বিশ্রাম,
কোথা হ'তে আসে সবে, কোথা চ'লে যায়,
কে জানে, পায় কি তারা ক্ষণেক বিরাম!
আসে দিন, আসে নিশি, আলোক আঁধার,
কালের তরঙ্গ ভঙ্গে জীবন মরণ,
তুই শুধু দাঁড়াইয়া মাঝখানে তার,
জগতের কি রহস্য করিস্ দর্শন?
সাধ হয়—বসি হেথা দিবস রজনী,
মরণ-সঙ্গীত কথা তোর মুখে শুনি।

বরষা।

১

গগনের আলো,
করিয়া চুরি,
আপন হৃদয়ে,
আলোক ভরি,
কে তুমি-সুন্দরী,
আইলে হেথা,
বিজুলিতে মাখা,
চরণ পাতা?

২

আকাশের রঙ,
নিবিড় করি,
নিজের বুকেতে,
রেখেছ ধরি;
ভুবন ভরিয়ে,
গাহিছ গান,
বিরহ বিষাদে,
ছাইছ প্রাণ।

৩

শ্যাম-তরুলতা,
তোমারে পেয়ে,
আকুল—ব্যাকুল
উঠিছে গেয়ে;
নির্ঝরিণী মরি,
হরষে সারা,
ঝর ঝর ঝর,
ঢালিছে ধারা।

৪

গাহিছে চাতক,
শ্রবণ ভরি,
কে জানে কোথায়,
গগন পরি;
প্রেম সুধা তব
করিতে পান,
আকুলিত দেখি,
সবার প্রাণ।

৫

বরষ, তবে গো,
বরষা রাণি!
হরষে ভাসুক
ধরার প্রাণী।
প্রেমময় তব
মধুর গানে,
বাঁধ দেখি সখি!
বাঁধ এ প্রাণে।

লক্ষ্মণ।

মাতৃ-স্নেহ উপেক্ষিয়া, কহ মহাভাগ!
আশৈশব ছায়া-সম হ'লে কার সাথী?
নববধূ উর্ম্মিলার নব অনুরাগ,—
কার তরে মুছায়ে ফেলিলে হ'তে স্মৃতি!
কার তরে শিরে জটা, বল্কল পরিয়ে,—
দণ্ডক অরণ্য-মাঝে করিলে গমন?
অনাহারে অনিদ্রায় আহার যোগায়ে,
নিশীথে কুটীর কার করিলে রক্ষণ?
কার তরে লঙ্কাপুরে ভীষণ সমরে,
দিবানিশি যুঝিলে হে, করি প্রাণপণ?
কার তরে শক্তিশেল বুকে নিলে ধ'রে?
রাজ্য লভি সে যে তোমা করিল বর্জ্জন!—
হে লক্ষ্মণ, ধন্য তব আত্ম-বিসর্জ্জন;
"রামায়ণ" সমুজ্জ্বল তোমার কারণ!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বদেশ-গৌরব।

উঠে স্বর্ণ-চূড়া ভেদি সুদূর আকাশ,
বিদেশীর ধন সেটি, আমাদের নয়;—
কত-রত্ন-শোভা ধরে, ধনীর আলয়,
গরিবের কিবা কাজ ফেলিয়া নিশ্বাস?
হে ভারত-বাসী—ভাবি, তোমাদের চূড়া,
কোথা পাবে? বহুদিন ভেঙ্গেছে সে কালে,
আছে যাহা ভগ্ন-অংশ তিতি অশ্রুজলে,
এখনো যতনে রাখ, ক'রনাক গুঁড়া!
"ছিল" "ছিল"—ব'লনাক, হউক আবার;—
গৌরবের কিবা চিহ্ন দেখাও তোমরা!
যাঁহাদের ছিল প্রভা, রবেন তাঁহারা;
আমরাই পিছাইয়ে রহিব সবার!
কুলীন-সন্তান মত কেন এ হীনতা;—
নিজ-কীর্ত্তি রেখে যাও, ক'রনা ভীরুতা॥

আশার ছলনে।

(১)

দুরাশা ছলনে, ভ্রমিয়া নিয়ত,
কি ফল লভিনু তায়?
বৃথা অবসাদ, বৃথা পরিতাপ,
বৃথাই লাঞ্ছনা হায়!

(২)

আশার মোহিনী, সুমধুর গীতি,
বীণার ঝঙ্কার সনে,
কেন রে আমার, মরমে পশিয়া,
আকুল করিল প্রাণে।

(৩)

দুরাশা মোহেতে, মুগধ হৃদয়ে,
উদাস পরাণ চেয়ে ;
কি জানি কিসের, উদ্দেশে ফিরিনু,
কিসের পিয়াসু হ'য়ে।

(৪)

আশা-মোহে মাতি, সুখ-শান্তি-ছবি,
আঁকিয়া কল্পনা-পটে,
যাপিনু রে এই, জীবন মধ্যাহ্ন,
বিষাদ-সাগর-তটে।

(৫)

শুকাল জীবন, দহিল হৃদয়,
ঝরিল নয়নে নীর ;
তবু ত গেল না, আশা-কুহকিনী,
তেমনি রহিল স্থির।

"অঘোর"

বিবিধ।

অন্ন-যজ্ঞ।—এমন দিন ছিল, যখন এই হিন্দুদেশে, দুই দশজন অতিথি অভ্যাগত ও দীন দরিদ্রকে এক মুঠা অন্ন না দিয়া কোন হিন্দুই আহার গ্রহণ করিতেন না। তখন ঘরে ঘরে অন্নছত্র ছিল, ঘরে ঘরে তখন মা-লক্ষ্মীর পাট ছিল, পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসিয়া অন্ন বিলাইতেন, গৃহে গৃহে তখন অন্ন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। কালচক্রের আবর্ত্তনে সে দিন এখন অতীত—ইতিহাসের অন্ধকার-অধ্যায়ে লুপ্ত। সে কথা এখন গল্প কথা মাত্র। দেশে এখন পার্শিসাড়ীর রাজত্ব। সেক্‌রার বাণী শোধ করিতেই লোকে সর্ব্বস্বান্ত। গরীব দুঃখীকে কে ভাত দেয় ? আমরা এখন এমনই লক্ষ্মীছাড়া !

এ দুর্দ্দিনে এ দেশ-ব্যাপী হাহাকারের মধ্যে কেহ কোন পর্ব্বোপলক্ষে দীন-দরিদ্র আতুরকে আদর করিয়া এক মুষ্টি অন্নদান করিতেছেন, দেখিলে অতীতের সে গল্পকথা এক একবার মনে পড়ে। আর মনে হয়, হায় ! যে দেশের লোক,—গৃহে দীন-দরিদ্র না জুটিলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় পথে পথে অভুক্ত পথিক ও বুভুক্ষু আতুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং ঘটনাক্রমে

অতিথি বিমুখ হইলে যে দেশের লোক বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কুল-দেবতার উদ্দেশে বলিতেন, "ঠাকুর কি পাপ করিয়াছি, যে আজ অতিথির তুষ্টিসাধন করিতে পারিলাম না,"—এ দেশ কি সেই দেশ, এই দেশবাসী আমরা কি তাঁহাদেরই বংশধর!

সে দিন পুণ্যময়ী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ-উপলক্ষে সঙ্গীত-সমাজ যে অন্নযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য দেখিয়া ঐরূপ অতীতের কত কথাই মনে পড়িয়াছিল। সহস্র সহস্র কাঙ্গালী, আহা! পথের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জুড়িয়া বসিয়াছে; বালক-বৃদ্ধ-রমণী, অন্ধ-খঞ্জ-অসমর্থ, সকলে বলিতেছে, "আমাকে দাও, আমাকে দাও" আর সেই অগণিত দর্শকের মধ্যে এই সহবের চির-সুখ-লালিত লক্ষপতি যাহারা, তাঁহারাই নগ্ন-পদে ঘর্ম্মাক্তদেহে, দুই হাতে অন্ন বিলাইতেছেন,—দেখিয়া মনে হইয়াছিল, এখনও বৈদেশিক বিলাস-বিভ্রমে আমাদের নিজস্ব একেবারে বিনষ্ট হয় নাই,—সে অতীতের গল্পকথা আবার প্রত্যক্ষ হইতে পারে,—আবার অমরার লক্ষ্মী এই পতিত ভারতবর্ষে শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে পারেন।

দরিদ্র, দরিদ্রকে ভোজন করায়, সে দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাতে বিস্মিত হই নাই। কেন না, যে দুঃখী, সে ত পরের দুঃখ বুঝে। বড়লোকের ফরমায়েসি কাঙ্গালী-ভোজনও দেখিয়াছি; কিন্তু সে দিন সঙ্গীত-সমাজের অনুষ্ঠাতৃগণ যেরূপ ঐকান্তিকতার সহিত দরিদ্র-ভোজন করাইয়াছিলেন, সেরূপ প্রাণস্পর্শিদৃশ্য ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। দেশের মতিগতি আবার কবে ফিরিবে? কবে এমনি করিয়া আনন্দে ঘরে ঘরে অন্নযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে?

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩০৭। [২য় সংখ্যা।

শিল্প-শিক্ষা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যাঁহারা এ দেশে আজকাল শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। এক শ্রেণীর অভিমত এই যে, এদেশের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী পূর্ব্বে এ দেশে প্রস্তুত হইত, এখন সেই সমস্ত সামগ্রী কেন প্রস্তুত হয় না, বা কি কারণে তাহাদের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তদ্বিষয়ের কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে সেই সকল পুনরায় প্রস্তুত হয়, বা হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিল্প সম্বন্ধে দেশে কোন নূতন অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে যাহাতে প্রাচীন লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রত্যেক লোকের উপরিলিখিত দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের উপদেশানুসারে* কার্য্য করা যে উচিত, তাহা আমরা গতবারে

বিশেষরূপে বলিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিমত নিতান্ত অসার ও চিন্তাশূন্য। তাঁহারা কেবল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, দেশ ক্রমেই অবনতির নিম্নতম সোপানে নিমজ্জিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গ এবং গভর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়া, দেশে কোনরূপ শিল্প-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা বা শিল্পশিক্ষার পদ্ধতি প্রচলন না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। আমাদের বিশ্বাস, শিল্পশিক্ষার অর্থ কি, তাহা এই শ্রেণীর লোক আদৌ বুঝেন না, বা বুঝিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহাদিগকে যদি, শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত, জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব ও নির্ব্বাক্ হইয়া থাকেন—কোনরূপ সদুত্তর দিতে পারেন না। আমরা এ সম্বন্ধে অনেক লোকের সহিত কথোপকথনে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা কোন একটা বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছুই বলিতে পারেন না; অনেকে ছুতার, কামার, এমন কি ডোমের কার্য্যকেই শিল্পশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন এবং সেই ধারণানুযায়ী বলেন যে, শিল্পশিক্ষার জন্য আমাদের দেশে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়-সংস্থাপন নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের মতে উপস্থিত এদেশে শিল্প-বিদ্যালয়ের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। এ দেশে এখনও প্রায় সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে ক্রেতার সংখ্যা না থাকায়, ক্রমেই ঐ সকল সামগ্রীর লোপ হইতেছে। আমরা দিন দিন বিলাসপ্রিয় হইয়া স্রোতে গা-ভাসান দিতে শিখিয়াছি ও বিলাতী দ্রব্যের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি। বিলাতী দ্রব্যের সহিত তুলনায় যদি আমাদের দেশজাত দ্রব্যের অতি সামান্য পার্থক্য হয়, তাহা হইলে আমরা দেশীয় দ্রব্য পরিহার করিয়া অনায়াসে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতে যত্নবান্ হই।

আমরা যদি আমাদের বিলাসিতার মাত্রা কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস করিয়া দেশীয় শিল্পীদিগের উৎসাহ দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেশের অবনতি কখনই এত শনৈঃ শনৈঃ হইতে পারে না। এরূপ কথা আমরা বলি না যে, আমাদের দেশে যে সকল শিল্প বা শিল্পী আছে, তাহাদের উন্নতির আবশ্যক নাই বা আমাদের দেশজাত দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষা মহার্ঘ, সেইগুলি যাহাতে স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত নহে। আমাদের অভিপ্রায়, যে শ্রেণীর দ্বারা জাতিভেদ-

অনুযায়ী আমাদের দেশে পূর্ব্বাপর যে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই দ্বারা যাহাতে সেই কার্য্যের উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত। বিলাতী কাপড় যত কম মূল্যে পাওয়া যায়, সেই-রূপ দেশী কাপড় সেই মূল্যে পাওয়া যায় না; যাহাতে দেশীয় তন্তুবায় সম্প্রদায় ঐরূপ সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি বয়ন করিতে পারে, তাহার উপায়-উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। উক্ত তন্তুবায়-কুলের উন্নতি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি-পাত না করিয়া বস্ত্রবয়ন কার্য্যের জন্য শিক্ষাব দ্বারা অপর এক নূতন দল প্রস্তুত করিবার আবশ্যক নাই। সমস্ত দ্রব্য সম্বন্ধেই আমাদেব এই অভিমত। এখনও আমাদের দেশে শিল্প ও শিল্পী বর্ত্তমান আছে; তাহাদেরই পুনঃসংস্কার করিবার জন্য সমবেত হইয়া চেষ্টা করিলে অধিকতর ফল হইবার সম্ভাবনা। এই সম্বন্ধে মান্দ্রাজ শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Principal Chatterton) চ্যাটারটন সাহেব যাহা বলেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। "The cheap labour and hereditary skill of India's artisans only wants organising and adopting to modern requirements to become an important factor in the industrial development of the country and to accomplish this must be the first aim of any technical education which is likely to be successful." আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপনপক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় আছে। যতদূর সাধ্য আমরা একে একে সেইগুলি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব। ভারতীয়-শিল্প-সমিতি (Indian Industrial Association) একটী শিল্পাগার (Museum), শিল্প-বিদ্যালয় (Technological College) এবং শিল্প-কৃষি-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদির পাঠাগার (Industrial Library) সংস্থাপন-সঙ্কল্প করিয়া ভারতীয় শিল্প-কৃষি-সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ওয়াট সাহেবের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; তিনি তদুত্তরে সমিতির সভ্যবর্গকে লিখিয়াছিলেন যে, আপনাদের প্রস্তাবিত কার্য্য সমাধা করিতে হইলে ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

সমিতির অভিপ্রেত শিল্প-বিদ্যালয়ে, য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে কিরূপে কলে ও তাঁতে বস্ত্র বয়ন করা হয়, কি প্রণালীতেই বা ছিটের কাপড় প্রস্তুত করিতে হয় এবং কি রূপেই বা ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে দ্রব্য

প্রস্তত করিতে হয় এবং এইরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যই বা কিরূপে প্রস্তত করিতে হয়, এই সকল বিষয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়। শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে ঐ রূপ বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, নতুবা এখন যেমন দুই এক স্থানে ছুতার ও কামারের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল সংস্থাপন হইতেছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নয়। ঐরূপ বিদ্যালয় দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা দেশের অনিষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। একটী যথার্থ কার্য্যকর শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপনে যদি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ বা ন্যূনকল্পে ২৫ পঁচিশ লক্ষ টাকাও ব্যয় হয়, তাহা হইলে ঐরূপ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা কি সহজ ব্যাপার? তাহার পর অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করিলেও যে দেশের বিশেষ উপকার হইবে, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। বিদ্যালয় স্থাপন করিলে বর্ত্তমান শিল্পিগণের সন্তানেরা তথায় শিক্ষার জন্য আদৌ আসিবে না, বা আসিতে সম্মত হইবে না। সম্ভবতঃ দুঃস্থ ভদ্রসন্তানেরা ঐরূপ বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য আসিবেন। ভারতীয় জমীদার-সভার (British Indian Association) এক বিশেষ অধিবেশনে বম্বের বিখ্যাত বণিক এস, জে, টেলারি সাহেব ভারতীয় শিল্প বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। টেলারি সাহেব বলেন,—"My personal opinion, which, I can assure you, is based on many years of practical experience and careful study, is, that these Schools of Art in India are a great mistake and a large amount of money is expended thereon annually which money is simply thrown away. In India where the caste system exists, where every father teaches his sons * * * these Schools of Art are useless. The arts are hereditary, taught and maintained by the machinery of caste, which is more powerful than any that Government could create.

"The industrials are, thanks to this caste system, trained without the aid of schools free of charge to Government and schools are therefore superfluous. * * * They (the industrials) will not send them (their sons) to these

Schools of Art, and consequently the schools are frequented by boys of castes other than pucca artizans."

ইহার ভাবার্থ এই যে, সাহেবের মতে এ দেশে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন জন্য অর্থব্যয় করা বৃথা ; এ দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রচলন থাকায় শিল্প-শিক্ষা অতি সহজে সম্পাদিত হয় ; প্রত্যেক শিল্পী তাঁহার সন্তানকে নিজ ব্যবসায় শিক্ষা দেন ; শিল্পিগণ তাহাদের সন্তানদিগকে কোন স্কুল কালেজে শিল্প-শিক্ষার জন্য পাঠাইবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

টেলারি সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকটা সত্য ও সঙ্গত। আমাদের আরও বিশ্বাস যে যদিও কদাচিৎ দুই একটী শিল্পীর সন্তান ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পাঠান্তে নিজ ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া চাকরির প্রত্যাশী হইবেন ; তখন তাঁহারা "হাতে হেতেড়ে" নিজ ব্যবসায় করা অপমান বোধ করিবেন। স্কুল, কালেজ এবং ইংরাজী বিদ্যার এ দেশে এমনই মহিমা ! ভদ্রলোকের সন্তানগণ যাঁহারা শিল্প-শিক্ষা করিবেন, তাঁহারাও সেই সেই বিষয়ে স্বহস্তে কার্য্য না করিয়া চাকরি করিবার জন্যই বিশেষ যত্ন করিবেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার ওয়াটের মত আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তিনি বলেন,—"The objection to the very name of college is that it would draw the wrong community. Instead of the sons of weavers, dyers, etc., we should have the sons of the middle class society crowding its portals in the hope of profitable appointments after a few years training in the names and uses of various parts of the loom or the dyer's vat and the inevitable difficulty would then arise of finding them mills and labourers." সেরূপ হইলে শিল্প শিখিবার বা শিক্ষা দিবার কোন ফলই হইল না। এই যে গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে একটীও কৃষকের সন্তান কৃষি শিক্ষা করিতে আইসে না ; যে কয়েকজন সামান্য সংখ্যক ছাত্র কৃষি-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সকলেই ভদ্র লোকের সন্তান ! কৃষিবিদ্যা শিখিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কানুনগো বা অন্য কোন চাকরি দিবেন, এই বিশ্বাসেই তাঁহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বয়ং কৃষিকার্য্য দ্বারা

জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, অথবা এমন কি কৃষকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া দেশের উন্নতি করিবেন, এরূপ মহৎ সকল্প কাহারও নাই। যে দিন গভর্ণমেণ্ট বলিবেন, যে কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কোনরূপ গভর্ণমেণ্ট চাকরি পাইবেন না—সেই দিনই সমস্ত ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিবেন এবং গভর্ণমেণ্টকে কৃষি-বিদ্যালয় এককালীন বন্ধ করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য শিল্পবিদ্যালয়ে এ দেশে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় জাপান, জার্ম্মেনি, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে জাপানবাসীদিগের প্রথানুসারে কয়েকটী শিক্ষিত যুবককে শিল্পশিক্ষার জন্য পাঠানই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। জাপানীদিগের প্রথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ;—পাঠকবর্গ মাঘ মাসের 'প্রয়াসে' দেখিতে পাইবেন। সেই প্রথা অবলম্বন করিলে অনর্থক নূতন শিল্পিদলের সৃষ্টি করা হইবে না। এখন কোন্ কোন্ শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য ঐ সমস্ত দেশে লোক পাঠান প্রয়োজন, তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণতঃ যে সমস্ত দ্রব্য এ দেশে পূর্ব্বে হইত না, যে সমুদয় সামগ্রীর ব্যবহার ইংরাজদিগের আগমনের পর এখানে প্রচলিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষার জন্য বিদেশে লোক পাঠান নিতান্ত প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ প্রণিধান করিয়া যতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের মতে ইংলণ্ড ভিন্ন অপর দেশ হইতে এখানে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুলি এ দেশে তৈয়ারি হইতে পারে এবং ইংলণ্ডবাসীগণ যে সকল দ্রব্য নিজ ব্যবহারের জন্য অন্য দেশ হইতে ইংলণ্ডে আনয়ন করেন, সেই সমস্ত দ্রব্য যদি আমাদের এখানে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য লোক পাঠাইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

উপরি উক্ত দুই প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিলে দুইটী উদ্দেশ্য একই কার্য্য দ্বারা সংসাধিত হয়। প্রথমতঃ ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিলে আমাদের দেশের অনেক টাকা বিদেশে যাওয়া বন্ধ হয় ; অধিকন্তু, আমরা ইংলণ্ড হইতে কতক টাকাও এ দেশে আনিতে পারি। আর পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যাহা

সাধিত হয়, তাহা অতি মহৎ। যদি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে নিজ নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী করিতে পারি এবং উভয়কে উভয়ের সাহায্যে তাহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য অন্যান্য দেশের মুখাপেক্ষী যাহাতে না হইতে হয়, এরূপ করিতে পারি, তাহা হইলে পরমেশ্বর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে যে সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কোন কালে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রহেলিকা সংগ্রহ।

"Of merry Books this is the chief,
'Tis as a purging pill—
To carry off all heavy grief,
And make you laugh your fill."

ছড়া সংগ্রহ হইয়াছে বটে, কিন্তু বোধ হয় হেঁয়ালী সংগ্রহ হয় নাই। ছড়া হইতে যে সকল তত্ত্বের উদ্‌ভাবন বা আবিষ্কার করিতে আশা করা যায়, প্রাচীন হেঁয়ালী হইতেও তদনুরূপ ফল পাওয়া যায়। বঙ্গ সাহিত্যের চক্ষে ছড়া ও হেঁয়ালীর সমান আবশ্যকতা; তবে ছড়াগুলি প্রায়ই অতি শৈশবাবস্থার আদর-অভ্যর্থনা-সূচক, হেঁয়ালী-গুলি কিছু বয়স্ক বালক বালিকা-দিগের নষ্টামীর প্রমাণ। যদি কোন পাঁচ বৎসরের বালিকা—সম্ভবতঃ আপনার দৌহিত্রী—আসিয়া আপনাকে একটী "অর্থ" জিজ্ঞাসা করে, আর আপনি তাহার উচিত প্রত্যুত্তর দিতে অপারক হয়েন, তাহা হইলে আপ-নাকে "ধেড়ে ইন্দুর" প্রমাণ করিবার পক্ষে আপনার দৌহিত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার। "শব্দ"ই প্রমাণ; তাহার শ্রুতিতে বলিয়াছে, "কাঁচায় তলতল পাকায় সিন্দুর, যে না বলিতে পারে, সে ধেড়ে ইন্দুর।" আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় শিখিলে?" সে বলিবে—"মাসীর কাছে।" মাসী শিখিয়াছেন—তাঁর দিদিমার কাছে। দিদিমা হয়ত মৃত, নহেত স্মরণ-

শক্তি-রহিত। কখনও বা একটী হেঁয়ালী ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত চলিত দেখা যায়, কিন্তু অনেক গুলিতে যেন একটা কাঁচা রঙের গন্ধ ছাড়ে। প্রাচীনতম হেঁয়ালীগুলি যে কোন্ সময়ে বা কি অবস্থায় আবির্ভূত হয়, তাহা সহজে স্থির করা যায় না, এবং হেঁয়ালীগুলির মধ্যে পূর্ব্বাপর সাজাইয়া রাখা বর্ত্তমান অবস্থায় দুর্ঘট। ছড়া ও প্রহেলিকার মধ্যে ভাল ও মন্দ সবই আছে। দেখা যায় যে, কতকগুলি কবিত্ব-ভাবমাখা ও সরস, ও অন্য কতকগুলি নিতান্ত অসংলগ্ন ও অর্থহীন। মেয়েলি ছড়া মাত্রে অর্থপূর্ণ না হইলেও, হেঁয়ালী মাত্রের ঐ গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বালবনিতা সকলেই অনেক হেঁয়ালী বলিয়া থাকেন; সে গুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক হইলেও প্রপিতামহ অবধি শ্রুত হইতেছে বলিয়া হেঁয়ালীপদ-বাচ্য হইয়াছে। যাহাই হউক, অনেকগুলি ছড়া ও হেঁয়ালীর আকার প্রকৃতি দেখিলেই প্রাচীন বলিয়া পরিচিত হয়। সে গুলির একটী বিশেষ লক্ষণ সরলতা। অর্থ বা বাগ্‌বিন্যাস সম্বন্ধে সে গুলির বিশেষ পারিপাট্য নাই, এবং সেগুলি আকারে ক্ষুদ্র। বোধ হয়, এই জাতীয় হেঁয়ালীর দৃষ্টান্ত অধিক পাওয়া যাইবে না; কিন্তু, কয়েকটী সর্ব্বজন-বিদিত আছে, যথা, "একটুখানি জলে, মাছ কিল্ বিল্ করে।" এ সময়ে বাঙ্গালী-হেঁয়ালী-জীবনের নিতান্ত শৈশবাবস্থা। শিশুর ন্যায় নির্ভীকচিত্ত, কখনও অজ্ঞাতসারে ছন্দোবদ্ধ হইতেছে, কখনও এক ছত্রেই কল্পনাহীন হইতেছে। কিন্তু যখন হেঁয়ালী-সাহিত্য সাত বৎসরের শিশুর ভাব ধারণ করিল, তখনই পিতামহ, পিতামহী বা মাতামহ ও মাতামহীর সহিত বিদ্রূপ ও হেঁয়ালী যুদ্ধ আরম্ভ করে। সেই সময়েই অধিকাংশ হেঁয়ালী রচিত হয়। এই সকল হেঁয়ালীর মধ্যে ভাল মন্দ সবই আছে,—রচনাচাতুর্য্যও দেখা যায়, সময়ান্তরে নিস্ফল-কল্পনা-শক্তির দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সফল বা নিস্ফল হউক, এই কল্পনাশক্তি সর্ব্বদাই উচ্ছৃঙ্খল। হেঁয়ালী-সাহিত্যের ইতিহাস এই পর্য্যন্তই শেষ হয় নাই। যৌবন-লাভের প্রারম্ভেও একটু ছেলে-মানুষীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই সময়ের রচিত হেয়ালী গুলিতে নব যৌবনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ছন্দপূর্ণতা, ভাষায় কৃত্রিম লালিত্য, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মভাবও সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত থাকে। হেঁয়ালী-সাহিত্যে এ গুলির আদর নাই, থাকিবার কারণও নাই। কারণ হেঁয়ালীতে আমরা ঐ গুণের বিকাশ সকল দেখিতে আসি নাই, এবং যে শৈশবের মাধুর্য্য টুকু উপভোগ করিতে আমরা নিতান্ত প্রয়াসী হইয়াছিলাম, সে টুকু আমরা

পাই নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে এই জাতীয় হেঁয়ালীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে এস্থলে একটী উদ্ধৃত করিলাম। যথা;—

"তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে।
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে।
উগরয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥"

অর্থাৎ অগ্নি। এই হেঁয়ালী হইতে পরিপুষ্টি ও কৃত্রিমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হেঁয়ালীর এই শেষ জাতি।

মানবজাতির প্রথম হাস্যরসের উদ্রেক হইতেই হেঁয়ালীর উৎপত্তি। একগুণাবলম্বী বা কতিপয় সদৃশ-গুণসম্পন্ন বস্তু দেখিয়া যখন শিশুর মনে সেই সাদৃশ্যটী আঘাত করে, তখনই শিশু শৈশবাবস্থার স্পর্দ্ধার সাহায্যে সেই অতি দূর-সাদৃশ্যটীর উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া একটা হেঁয়ালী রচনা করিয়া তুলে। "একটু খানি জলে, মাছ কিল্‌বিল করে" —বলিলে অন্ন বুঝিতে হইবে। এই হেয়ালীতে দুই বস্তুর একটী সদৃশ-গুণ বাঁছিয়া লওয়া হইয়াছে। মৎস্যরাশি ও তণ্ডুলরাশি উভয়েই কিলবিল করিয়া থাকে, সুতরাং ঐ টুকু সমদৃশ্যই একটী হেয়ালীর যথেষ্ট ভিত্তি। বস্তুতঃ, মৎস্য ও তণ্ডুলের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা প্রবীণতার অসাধ্য, কিন্তু শিশু তাহাতে সম্পূর্ণ দক্ষ। এই প্রকারে অতিদূরভাব দুইটী কোন এক সূত্রে বন্ধন করিয়া সেই দুইটীতে অসদৃশ একটী তৃতীয় ভাব উৎপাদন করিতে পারিলে প্রকৃত হেঁয়ালীর কার্য্য সমাধা হয়।

কতিপয় হেয়ালী নিম্নে সংগৃহীত হইল। আশা করি, আরও সংগৃহীত হইবে। ছড়া ও হেঁয়ালী-গুলিতে সমভাবে জাতীয় প্রেম, কলহ, আমোদ, এমন কি ঘরের কোণের প্রদীপটার একটী তৈলবিন্দু পর্য্যন্তও মিশিয়া আছে; সুতরাং আমাদের Sweet home এর এই কথা গুলি গুছাইয়া রাখিতে বাসনা হয়,—কি জানি, এই গুলি হারালে যেন কর্ত্তব্য-কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইব! একথা নূতন নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "মেয়েলি ছড়া" সম্বন্ধে যে প্রস্তাবনা করেন, তদবধি ছড়া-সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু হেয়ালী গুলি পরিত্যাগ করিয়া ছড়া-সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাহা কিছু পাওয়া যায়, সবই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ছড়া ও হেয়ালী ব্যতিরেকে কতকগুলি কবিতা ও গল্পও বালবনিতার মুখে

শুনিতে পাই। আমার বিবেচনায় সে গুলিরও যথাসাধ্য সংগ্রহ কর্ত্তব্য। সভ্যসমাজ মাত্রেই শৈশবের স্মৃতিচিহ্ন গুলি সযত্নে রক্ষা করে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রহেলিকা সকল সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হয় এবং সেই সংগ্রহের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী-সাহিত্য যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়াছে। আমরাও সেই কার্য্যে ব্রতী। আশা করি, আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

কতকগুলি প্রহেলিকা গল্পমূলক। সেগুলিকে প্রকৃত হেঁয়ালীর স্থান দেওয়া সম্বন্ধে মতামত আছে। বস্তুতঃ কল্পনা-শক্তির উত্তেজনাই হেঁয়ালীর একটী প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ও হাস্যরসের উদ্রেক একত্র সাধিত হইলেই, হেঁয়ালীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়। গল্পমূলক হেঁয়ালীগুলি উত্তর করিতে বা বুঝিতে কতকগুলি ঘটনা-সামঞ্জস্য করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং গল্পমূলক হেঁয়ালীগুলি প্রকৃত হেঁয়ালীর স্থান অধিকার করায় কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। যদিও আপত্তি ঘটে, তথাপি "অধিকন্তু ন দোষায়"।

১। তেশিরে পাতা।
তার ফলে ধরে আটা॥
পাক্‌লে অমৃত লাগে।
বীজ গোটা গোটা॥—(বেল)

২। কাঁচায় কাঁচ কড়াই।
সর্ব্বলোকে খায়।
পাক্‌লে গড়াগড়ি যায়।—(ডুমুর)

৩। নদীর জল টল্ মল্ করে।
একটু খানি কুটো পড়্‌লে সর্ব্বনাশ করে।—(চক্ষু)

৪। এখান থেকে মারিলাম দড়া।
দড়া গেল সেই বামুন পাড়া॥—(শঙ্খ)

৫। হায় তরমুজ করিব কি,
বোঁটা নেই ত ধরিব কি?—(ডিম্ব)

৬। দুই জনে দেখিলাম।—(চক্ষু)
পাঁচজনে তুলিলাম।—(অঙ্গুলি)
দশজনে ছাড়িলাম।—(দুই হাত)
বত্রিশজনে খেলাম।—(দাঁত)

৭। উপরে মাটী, নীচে মাটী।
মধ্যে তামার বাটী॥—(ওল)

৮। এক রত্তি জলে, মাছ কিল্‌বিল্‌ করে।
অভাগা জেলের বেটা না ধরতে পারে॥—(ভাত)

৯। কাল কাল মিছরী
তুই কেন আমায় ছেঁচলী।—(সাপ)
আমিতো পড়ন্ত ঝুলী
তুই কেন আমার তলায় ছিলি ?—(তাল)

১০। কোন কোন গাছে সাজন সাজে—(ফুলগাছ)
কোন কোন গাছে বাজন বাজে—(বাঁস)
কোন কোন গাছে মড়ার মাথা—(তাল)
কোন কোন গাছে শিবের জটা—(সজ্‌নে ডাঁটা)

১১। হল্‌দে পানা গা, খড়্‌কে পানা পা
বন থেকে হুক্কা মারে, শিউরে ওঠে গা।—(বোলতা)

১২। আট পায়ে, আঠার হাঁটু
জল নেই যে স্থানে,
মাছ ধরে খায় সে স্থানে।—(মাকড়শা)

১৩। তিন সিঙে, রিং রিঙে,
মাথায় বোঝা, পাছায় খোঁচা।—(উনুন)

১৪। এক রত্তি দড়ি,
ঘর শুদ্ধ বেড়ী।—(সলিতা)

১৫। ভোঁ ভোঁ করে ভোম্‌রা নয়,
গলায় পইতে, বামুন নয়।—(চরকা)

১৬। জলে তার জন্ম, কারিকরে গড়ে,
ঠাকুর নয়, ঠুকুর নয়, মাথার উপরে চড়ে।—(শোলা)

১৭। অটল ভুঁয়ে পটলমাটী,
হীরা বাধান খাঁচা
কিন্তু সে ফল পাক্‌লে হয় কাঁচা।—(গর্ভস্থ শিশু)

১৮। কোথাও জল নেই,
গাছের আগায় জল।—(ডাব)

১৯। অলি অলি পাখীগুলি
গলি দিয়ে যায়,
পোদ্দারদের বাড়ী গিয়ে
ডিগবাজী খায়।—(টাকা)

২০। দেবতরু গাছে, ফলটী হয় কুঁজো,
তাতে হয় দেবতা পূজো।—(কলা)

২১। যে গাছে পান, সেই গাছে চুণ,
একি গাছের গুণ।—(বটবৃক্ষ)

২২। এক যে আছে দূতি
সে বলে পাতে মুতি।—(লেবু)

২৩। উপরে কাঁসা নীচে কাঁসা,
কাঁসা ঝম্ ঝম্ করে।
বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে
কে নিবোতে পারে?—(রৌদ্র)

২৪। যোগী নয়, ঋষি নয়
ভস্মমাখা গায়,
নাহি মস্তক তাহার,
উদরে জটা বায়।—(কেয়াফুল)

২৫। ওপার থেকে আস্‌ছে হাতী,
কাণ মোটা সোটা,
মুখ দিয়ে বেরুল ছেলে
কি আশ্চর্য্য বল বিধাতা।—(কলাগাছ ও মোচা)

২৬। জমী ধল, বীজ কাল,
ঢাকা মাকা, চোলে গেল।—(চিঠি)

২৭। কায়স্থর য়স্থ ছাড়া, পাঁঠার ছাড়া পা।
লবঙ্গর বঙ্গ ছাড়া, কিনে আন্‌গে যা।—(কাঁঠাল)

২৮। কাঠের বাছুর, পাথরের গাই,
যতদুধ দুই, ততই পাই।—(চন্দন)

২৯। এক থালা সুপারি,
গুণিতে না পারে ব্যাপারী।—(তারা)

৩০। একখানি থালা, দুখানি থালা
আলো ঝম্ ঝম্ করে,
বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে,
কে নিবোতে পারে।—(সূর্য্য)

৩১। এক রত্তি পানি, না শুখাতে জানি।—(জিহ্বা)

৩২। বত্রিশটী ডালে, একটী পাতা ঝোলে।—(ঐ)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

প্রায়শ্চিত্ত।

(গল্প)

১

"আমি শ্রীক্ষেত্রে যাব।"

নরেন্দ্রনাথ কোর্ট হইতে বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র গোলাপসুন্দরী তাঁহাকে উক্তরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

গোলাপ কিঞ্চিদূন অষ্টাদশবর্ষীয়া। গোলাপের নামকরণে তাঁহার মাতামহী কুসুমরাণীর অমর্য্যাদা করেন নাই; গোলাপ এখন যথার্থই পূর্ণবিকশিত গোলাপ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় না, যে তিনি পঞ্চমবর্ষবয়স্কা নলিনী ও দুই বর্ষজাত বসন্তের জননী। তাঁহার অলক্তক-রাগরঞ্জিত পদযুগল, নবদূর্ব্বাদল-হরিতাভ পরিধেয়, যত্ন-বিন্যস্ত চূর্ণকুন্তল, চিন্তালেশ-পরিশূন্য ফুল্লানন ইত্যাদি দেখিলে তাঁহাকে অনুপম-লালিত্যময়ী বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। নরেন্দ্রনাথ গোলাপ-রাধিকার শ্যামস্থলাভিষিক্ত, গাত্রবর্ণও রাধা-প্রাণবল্লভের অনুরূপ, বোধ হয় তদপেক্ষা কিঞ্চিদনুজ্জ্বল। তবে অঙ্গসৌষ্ঠবে শ্যামরায়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের সৌসাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে হইলে কল্পনা-দেবীর কিঞ্চিৎ অনুকম্পার প্রয়োজন। নরেন্দ্রনাথ

ত্রিংশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বাক্যালাপের প্রণালী জানিতেন। সুতরাং তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া অবিচলিত ভাবে বলিলেন।—

"তুমি শ্রীক্ষেত্রে যা'বে কি! তাও কি হ'তে পারে। নলিনীকে দেখিবে কে? খোকা কার কাছে থাকিবে?"

গোলাপ বিরক্তি সহকারে বলিলেন "খোকা দামুর মার কাছে থাকিবে, নলিনীকে বামুন দিদি দেখিবে।"

দামুর মা পরিচারিকা ও বামুন দিদি পাচিকা। নরেন্দ্রনাথের বাটীতে তখন আর কেহ ছিল না।

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "আর তোমাকে লইয়া যাইবেই বা কে?"

গোলাপ প্রত্যুত্তরে কহিলেন "কেন চণ্ডিদাস ঠাকুরপো, শ্যামা পিশি ও পাড়ার আরও কত লোককে লইয়া যাইবে; আমি সেই সঙ্গে যাইব।"

চণ্ডিদাস যুবক ও পল্লীসম্পর্কে শ্বশ্রূপুত্র। আর শেষোক্তা ঠাকুরাণীও সেই সম্বন্ধে পিতৃস্বসা।

"সেকি ভাল দেখায়, লোকে বলিবে কি? আর তোমার কি এখন তীর্থ করিবার বয়স?"

গোলাপ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন,—

"ধর্ম্ম করিতে যাইব, তাতে লোকে যা বলে বলুক।"

নরেন্দ্রনাথের শ্রমক্লিষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসাকাতর বদনে ঈষৎহাস্য আসিল, তিনি বলিলেন "অপোগণ্ড শিশুগুলাকে ও আমাকে কষ্ট দেওয়া ভিন্ন কি তোমার আর কোন ধর্ম্ম নাই?—ধর্ম্মের আর কোন অনুষ্ঠান ত তোমাতে দেখিতে পাই না!"

অগ্নিতে ঘৃত পড়িল। গোলাপ রোষকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"তা দেখিতে পা'বে কেন? চিরকালটা তোমাদের দাসীবৃত্তি করিতে পারিলেই হয়। আমার ত মনে আর কোন সখ যায় না। যেতে দিবে কি না বল। হাঁ—কি—না।"

নরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া এই বিষম সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন,—

"তোমার যে অন্যায় কথা, কি করিয়া——"

গোলাপ বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্, ঢের হয়েছে, টাকা দিতে পারবে না তাই বল।"

এই কথা বলিয়াই তিনি পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং গৃহতল কম্পিত করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ পরক্ষণেই অন্ধকার দেখিলেন ও প্রমাদ গণিলেন।

২

নরেন্দ্রনাথ একখণ্ড কাগজ হস্তে করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। উল্লিখিত কথোপকথন ছয়মাস পূর্ব্বের ঘটনা। আজ কর্ম্মস্থান হইতে বাটী আসিয়াই নরেন্দ্রনাথ পরিজনবর্গের নিকট হইতে অবগত হইলেন, যে তাঁহার পত্নী মধ্যাহ্নকালে স্বীয় ভ্রাতার সহিত বসনভূষণাদি লইয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার শ্যালকের অস্তিত্বের কথা এই প্রথম শ্রবণ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই গোলাপ মাতৃহীনা, এবং তিন বর্ষ অতীত হইল, গোলাপের জরাপীড়িত পিতাও তাঁহার একমাত্র নয়নপুত্তলী কন্যাকে রাখিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার বহুযত্ন-সজ্জিত আবাস-ভবন এখন চর্ম্মচটকার বাসভূমি ও শিবাকুলের আশ্রয়স্থান। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পত্নীর হস্তলিখিত যে একখানি লিপি পাইয়াছেন, সেই খানি পাঠ করিয়াই তিনি এত গভীর চিন্তায় মগ্ন। পশ্চিম-বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট রক্তসন্ধ্যার আলোক এতক্ষণ তাহার ভ্রুকুটী-কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়া অন্তরের ঝন্ঝাবাত ব্যক্ত করিতেছিল। ক্রমে রজনীর ঘনান্ধকার আসিল, নরেন্দ্রনাথ তাহা অনুভব করিলেন না; বোধ হয়, তাঁহার অন্তর্জ্জগতের তিমিররাশি গাঢ়তর। কাগজখণ্ডে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী ছত্র লিখিত ছিল।

"আমি চলিলাম, চিরদিনের মত তোমার গৃহ হইতে বিদায় লইলাম। তোমার হাতে পড়িয়া আমার নারীজন্মের কোন সাধই মিটে নাই; মিটিবার কোন সম্ভাবনাও দেখি না। যাহার অর্থ নাই, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। আমি তোমার গলগ্রহ ছিলাম, আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম। তোমার ছেলে মেয়ে তোমার কাছেই রহিল, তাহারা আমার চক্ষুশূল। আমার পিতা এত অর্থব্যয় করিয়া, আমার ছেলে বেলার সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া, কেন যে তোমার সহিত তাঁহার আদরের মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। পিতা আমার সুখের পথে যে কাঁটা পুতিয়াছিলেন, আমি নিজেই তাহা তুলিলাম। আমার রূপ আছে, পিতৃদত্ত মূল্যবান্ অলঙ্কার ও অর্থ আছে। আমার বাল্যসখাও ধনবান্ এবং আমার

জন্য পাগল। দুজনে দেশ বিদেশে বেড়াইব, যত তীর্থ আছে দেখিব, প্রাণে যাহা চায়, তাহা করিব,—দেখি তৃপ্তি পাই কি না। স্বর্গ নরক পরের কথা, আছে কি নাই, তাহারই বা ঠিক কি? আমার খোঁজ করিও না—সন্ধান পাইবে না।"

প্রথম কয়েক ছত্র পাঠ করিয়া নরেন্দ্রনাথের নয়ন ধারা বহিয়াছিল। যাহার সুখের জন্য তিনি সতত লালায়িত, যাহার চরণে ধূলিকণা বিদ্ধ হইলে তাঁহার বক্ষে শত বজ্র বাজিত, যাহার মূল্যবান্ বসন ভূষণাদির স্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি স্বেচ্ছায় ঋণভারে প্রপীড়িত, যাহার তাড়না, লাঞ্ছনা, অতৃপ্তি, তিনি অহরহঃ সস্মিতবদনে সহ্য করিতেন, সে কি না আজ তাঁহাকে বলিল যে, সে তাঁহার গলগ্রহ ছিল। গোলাপের শৈশব-সম্বন্ধের কথা তিনি জানিতেন। একটী ধনাঢ্য প্রতিবেশীপুত্রের সহিত গোলাপকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ পাত্রটী বিদ্যাহীন, কদাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়াতে তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, এবং বাহ্য-সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ভাবি ব্যবহারজীবী নরেন্দ্রনাথকে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্থানীয় জজ-আদালতে ওকালতী করেন। তিনি যাহা উপায় করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহার পত্নী যেরূপ ঐশ্বর্য্যের অঙ্কশায়িনী হইতে আকাঙ্খা করিতেন, নরেন্দ্রনাথের সেরূপ অর্থাগমের সম্ভাবনা ছিল না—ইহা তাঁহার ইচ্ছা বা যত্নের ত্রুটী বশতঃ নহে, ইহা সময়ের এবং তাঁহার অদৃষ্টের দোষ। গোলাপ কখনই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই, এ বিষয়ে সে অকপট ছিল, কিন্তু তজ্জন্য তিনি স্বীয় মনোবেদনা উপেক্ষা করিয়া মরুভূমিতে রোপিত স্বর্ণলতিকার অধিকতর যত্নের আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেন। পত্নীর স্নেহমমতার অভাব এবং হৃদয়হীনতা তাঁহার অবিদিত ছিল না; কিন্তু তাহার নিকট হইতে আজিকার এই নিদারুণ মর্ম্মাঘাত তিনি কখনই প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার কোমলতম হৃদয়েও বৈর-নির্য্যাতন-চিকীর্ষা বলবতী হইল; কিন্তু নিমেষের মধ্যে তাঁহার অমানুষিক স্নেহপ্রবণতা সে পুরুষভাব বিদূরিত করিল। যাহার সহিত ভাল-বাসাই এক মাত্র সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ চিরতরে ছিন্ন হইয়াছে, সব ফুরাইয়াছে!

তিন দিন পরে নরেন্দ্রনাথের কন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা! মা কবে আসিবেন?"

তিনি বলিলেন "সে আর আসিবে না, সে মরিয়াছে।"

নলিনী কথাটী বুঝিল কি না, তাহা জানিনা ; কিন্তু সে কাঁদিল না। নরেন্দ্র-নাথের পরিজনবর্গ শুনিল যে, পিতৃভবনে যাইবার সময় পথিমধ্যে গোলাপের বিসূচিকা-রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে অশৌচগ্রহণ করিলেন।

৩

নরেন্দ্রনাথ, তিন বৎসর হইল, কর্ম্মস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পরিচারক পরিচারিকা নূতন হইয়াছে। একদিন নলিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

"বাবা, মা ম'রে গেছেন, আপনি কি ঠিক জানেন ?"

নরেন্দ্রনাথ চকিত স্বরে বলিলেন "ঠিক নয় ত কি ? সে কথা কেন ?"

নলিনী নিকটস্থ আম্রকাননের পরপারে অবস্থিত একটী বাটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ বাড়ীর গিন্নিকে ঠিক মার মত দেখিতে, তবে তাঁর চেয়ে কিছু রোগা আর ময়লা।"

নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি করিয়া তাঁহাকে দেখিলে ?"

নলিনী বলিল "তিনি বসন্তকে বড় ভালবাসেন। রোজ ঝি বসন্তকে লইয়া ওঁদের বাড়ী বেড়াতে যায়, তিনি বসন্তকে কোলে করেন, চুম খান, কত খাবার দেন। ঝিকে বারণ করেছিলেন ব'লে সে এতদিন কিছু বলে নাই। কাল সে আমাকে বলিল, যে তিনি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। আমি আজ গিয়াছিলাম। তিনি দৌড়িয়া আমার কাছে আসিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি কেমন তর হ'য়ে ফিরে গেলেন ও ব'লে পাঠালেন, তাঁর বড় অসুখ ক'রেছে, আর এক দিন আমাকে দেখিবেন। আমিও তাঁকে মার মতন দেখে চম্‌কে উঠেছিলাম।

নরেন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে সহসা পরিজন-বর্গকে ডাকিয়া তীব্রস্বরে আদেশ দিলেন "ছেলেদের আজ হতে বাটীর বাহিরে লইয়া যাইওনা। আর আমার অনুপস্থিতিতে কাহাকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিও না।"

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে একদিন রাত্রিকালে নরেন্দ্রনাথ বহির্বাটীর একটী কক্ষে একাকী দীপালোকে পাঠ করিতেছেন। বাটীর সকলেই নিদ্রাভিভূত। সহসা মৃদুপদ-শব্দ শ্রবণে নরেন্দ্রনাথের পাঠে-তন্ময়তা ভঙ্গ

হইল, তিনি দেখিলেন—কক্ষদ্বারে একজন শীর্ণকায় অবগুণ্ঠনবতী দণ্ডায়মানা। রমণী মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন, নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিনিলেন, এবং অস্বাভাবিক কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে কেন?"

রমণী এইরূপ অভ্যর্থনা বোধ হয় প্রত্যাশা করিয়াছিল ; কারণ সে স্থিরভাবে বলিল "আমার প্রাণ লও, আর যাতনা সহিতে পারি না। আজ তিন বৎসর তুষানল ভোগ করিতেছি, আর পারিনা। যে দিন তোমার ঘর ছাড়িয়াছি, সেই দিনই জানিতে পারিয়াছি যে, নরক-ভোগের জন্য আর কোথাও যাইতে হয় না। সেই দিনই মনে হইয়াছিল,—এসে তোমার পায়ে পড়ি ; কিন্তু তখন মরণের ভয় ছিল, আসিতে ভরসা হয় নাই। এখন আর সে ভয় নাই, তাই এসেছি। আমাকে মেরে ফেল, আমার পাপের শাস্তি দাও।"

নরেন্দ্রনাথ অধিকতর কর্কশ স্বরে বলিলেন "মৃত্যুবিধানের ভার আমার হাতে নয়, অন্যত্র যাও। সকলে জানে তোমার মৃত্যু হ'য়েছে, ছেলে মেয়েদের মাথায় আর তোমার কলঙ্কের পশরা নামাইও না।"

রমণী বলিল "ছেলে মেয়ে! উঃ! তাহাদের কথা আর তুলোনা। তাদের মুখ মনে হ'লে আমার জ্ঞান থাকে না। আমি মহা পাতকী। কিন্তু তুমি যে কলঙ্কের কথা বলিতেছ, ঈশ্বর জানেন, সে কলঙ্ক আমাকে স্পর্শ করে নাই ; সে নরকে ডুবিবার আগেই, আমি জানিয়াছিলাম যে, আমার কত সুখ ছিল, আজ সে সুখ পায়ে ঠেলিয়া কি জ্বলন্ত আগুনে আমি ঝাঁপ দিয়াছি।" নরেন্দ্রনাথ এই সময় একবার রমণীর প্রতি ঘোর অবিশ্বাস ও ঘৃণা জড়িত একটী সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন, কিন্তু রমণী তাহাতে অণুমাত্র সঙ্কুচিতা না হইয়া অধিকতর আবেগ-ভরে বলিলেন "বিশ্বাস হয় না! না হউক। কিন্তু আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা বলিব—বলিলে বোধ হয় প্রাণের জ্বালা একটু থামিতে পারে। এক দিনের ব্যবহারেই আমি জানিতে পারি যে, তুমি স্বর্গ,—আর সুখ-আশায় যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে নরকের কীটানুকীট। সেই দিনই তাহাকে ত্যাগ করি। পায়ে ঠেলা ধন বুকে লইবার জন্য বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণের ভয় তখন আরও বেশী ছিল বলিয়া ফিরিতে পারি নাই। দেশ বিদেশে বেড়াইলাম, সঙ্গে বাবার পুরাণ চাকর রামদয়াল ছিল। সে এখনও আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই—সেই এখন আমার এক মাত্র সহচর। কত তীর্থ দেখিলাম, কিন্তু কোথাও মনে

শান্তি পাইলাম না, যাতনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যে ছেলে মেয়েদের কখন আদরের চক্ষে দেখিনাই, তাদের দেখিবার জন্য বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। প্রাণের উপর ভালবাসা অল্পে অল্পে এখন বিষম বিতৃষ্ণায় দাঁড়াইয়াছে। তোমাদের দেখিবার জন্য ফিরিলাম, অনুসন্ধান করিয়া এখানে আসিলাম। ছেলেটীকে কোলে করিয়া, মেয়েটীর মুখ দেখিয়া যাতনা আরও বাড়িল। অহরহঃ তাহাদের চক্ষুর উপর—বুকের উপর রাখিবার ইচ্ছা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আজ ৭ দিন তাহাদের দেখি নাই, যে যন্ত্রণা সহিতেছি---যদি দেখাবার হ'ত, তাহ'লে দেখাইতাম। যদি তাহাদের আমার সহিত দেখা করিতে না দাও, আমাকে মারিয়া ফেল, তোমার পুণ্য হইবে।"

নরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি ক্রমশঃ প্রস্তর-কঠিন হইয়া আসিল, তিনি ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন :—

"যদি তোমার পুত্র-কন্যার উপর কিছু মাত্র স্নেহের সঞ্চার হইয়া থাকে, তুমি এখনই এ স্থান পরিত্যাগ কর। তাহাদের পবিত্র জীবন কলুষিত করিও না, সমাজের চক্ষুতে তাহাদের ঘৃণিত করিও না। তুমি তাহাদের কখন কোন উপকারে আইস নাই, এখন আসিতে পার না। অন্যত্র যাও,—দূরে, যত দূরে পার যাও। নচেৎ তাহাদের কল্যাণের জন্য আমায় অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

রমণী কিয়ৎক্ষণ শূন্যপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে জড়িত স্বরে বলিল "জীয়ন্তে মরণ বড় ভয়ানক। তাহাদের একবার চক্ষুর দেখা দেখিব, তাহাদিগকে পরিচয় দিব না। তাহাতেও কি দোষ আছে? এত অনুতাপে এত নরক-যাতনাতেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?"

নরেন্দ্রনাথ নিয়তি-কঠিন স্বরে বলিলেন "না! স্বার্থত্যাগ কর, অন্যত্র যাও।"

রমণী নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি নিশ্চল দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার দৃষ্টি প্রশ্ন করিল, "একি সেই নরেন্দ্র নাথ!" কিন্তু আর একটী প্রশ্ন বোধ হয় রমণীর অন্তরে যুগপৎ উদিত হইল, "এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ কি? —করুণ বারি-বর্ষণ করকাপাতে পরিণত হইল কেন, তাঁহার হৃদয়ে এত শৈত্য কোথা হইতে আসিল!" রমণী শিহরিল। একটী অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি নরেন্দ্রনাথের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল "তাই হবে।"

নরেন্দ্রনাথ মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তিনি একক। পূর্ব্বোক্ত রমণী আর সে স্থানে নাই।

৪

রজনী আর এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের বাটীর অনতিদূরে উন্নত-তরুরাজি বেষ্টিত অযত্ন-রক্ষিত একটী দীর্ঘিকার ভগ্ন সোপানের উপর অবনত বদনে একটী রমণীমূর্ত্তি উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিক ঘোর তমসাচ্ছন্ন, কিন্তু রমণী এক ভাবেই উপবিষ্ট। বোধ হয়, তিনি আত্মহারা। কতক্ষণ পরে রমণীর বোধ হয় সংজ্ঞা হইল। তিনি একবার নরেন্দ্রনাথের বাটীর দিকে চাহিলেন। দীর্ঘিকা-তটস্থিত বৃক্ষের ঘনপত্রাবলী ভেদ করিয়া একটী ক্ষীণ আলোক-রশ্মি রমণীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। যে গৃহ হইতে ঐ আলোকরেখা আসিতেছিল, সেই খানে নরেন্দ্রনাথের পুত্র ও কন্যা বিরাম-দায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান। একটী উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস রমণীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইল। তাহার অনিবার্য্য ক্রন্দন শব্দ নৈশ গগণের নীরবতা ভঙ্গ করিল। তিনি উদাস নয়নে আকাশের দিকে চাহিলেন। দিগন্ত-ব্যাপী গগনপটে গণনাতীত তারকারাজি তাঁহার নয়ন-পথে পড়িল। নিম্নে চাহিলেন, দেখিলেন—দীর্ঘিকার কালজলে নক্ষত্র-খচিত আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। রমণী উঠিলেন এবং জড়িত পদে ভগ্ন সোপানের আর একস্তর নামিলেন। বুঝি দীর্ঘিকার শান্ত শীতল জল তলে, পঙ্কশয্যায় অনন্ত শয়নের প্রলোভন তাঁহার তাপিত হৃদয়ে বড়ই প্রবল হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মতি-বিপর্য্যয় ঘটিল। বোধ হয়, নরেন্দ্রনাথের সেই নিদারুণ বাক্য তাঁহার কর্ণপটাহে নিশীথ পবন প্রতিশব্দিত করিল, --"এখনও তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।" তখন রমণীর উদাস নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া পড়িল, তিনি দীর্ঘিকা-তট হইতে কম্পিত পদে ফিরিলেন।

নরেন্দ্রনাথ পরদিন অনুসন্ধানে জানিলেন যে, যে বাটীর গৃহিনী তাঁহার পুত্রকে আদর করিত, সে বাটী জনশূন্য।

৫

উক্ত ঘটনার অনুমান পঞ্চবর্ষ পরে নরেন্দ্রনাথ অপরিচিত হস্তাক্ষরে ইংরাজি ভাষায় লিখিত এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। পত্র খানির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

করাচি চিকিৎসালয়।
৮ই এপ্রেল, ১৮৮০

মহাশয়,

আমাদের চিকিৎসালয়ের একজন অবৈতনিক শুশ্রূষাকারিণীর আজ তিন দিবস হইল মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার একটী অন্তিম অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য আপনাকে এই পত্র খানি লিখিতেছি। এই স্বর্গগতা বঙ্গ-রমণীর আমি যে এই অতি অকিঞ্চিৎকর উপকারেও আসিলাম, ইহাতে আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। স্থানীয় দরিদ্রদিগের ইনি মাতৃস্থানীয়া ছিলেন এবং তাহারা ইহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত। কয়েক মাস হইতে বসন্ত রোগ এখানে ভীষণ সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছিল। রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং শুশ্রূষা-কারিণীর অভাবে আমরা বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। সেই সময়ে এই ঈশ্বর-প্রেরিতা রমণী এখানে উপস্থিত হইয়া, নিজ বিপদাশঙ্কার প্রতি কিছু মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া অহরহঃ অবিশ্রান্ত-ভাবে বিনিদ্র-নয়নে পীড়িতদিগের যেরূপ যত্ন ও সহিষ্ণুতার সহিত সেবা করিয়াছিলেন, কোন স্নেহময়ী জননী নিজ সন্তানগণের জন্য ততোঽধিক করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। শুনি-য়াছি, এই রমণী যে যে স্থানে সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাবের কথা অবগত হইয়াছিলেন, সেই থানেই এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে আপনার অপার দয়া-দাক্ষিণ্য ও স্নেহমমতা এবং অলৌকিক শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। অবশেষে এই নগরীতে তিনি আপনার অমূল্য জীবন দানে তাঁহার স্বর্গীয় ব্রত সমাধান করিয়াছেন। আজ শত শত নর নারী তাঁহার জন্য আন্তরিক শোকাশ্রুপাতে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছে।

এই দেবী-স্বরূপিণী রমণীর কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, সে গুলি তাঁহার শেষ ইচ্ছানু-সারে স্থানীয় পীড়িত দিগের শুশ্রূষার জন্য ব্যয়িত হইবে। কয়েক খানি অলঙ্কার তিনি আপনার পুত্র ও কন্যাকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, সে গুলি প্রেরিত হইল। আশা করি, আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন। আর যদি এবিষয়ে আপনার অন্তরে কোন দ্বিধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ও গুলি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবেন, এই তাঁহার শেষ ইচ্ছা। এই রমণী 'মাইজি' নামে এখানে অভিহিতা ছিলেন; কিন্তু আপনি অলঙ্কার

গুলি দেখিলেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইবেন, তিনি এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য,

জে, থরন্‌টন্‌, এম্‌, ডি, তত্ত্বাবধারক।

৭

জনশ্রুতি, নরেন্দ্রনাথের কোন নিকট-আত্মীয়ের বিয়োগ হইয়াছে। তিনি শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়—অশৌচান্তের অব্যবহিত পর দিবস নরেন্দ্রনাথের বহুবর্ষ পূর্ব্বে মৃত পত্নীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তাঁহার দশম বর্ষীয় পুত্রের দ্বারা সমাধা হইল। আর অকস্মাৎ এ বৎসর ঐ কার্য্য উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ দীন দুঃখীদিগকে অশন বসন দানে তাঁহার সাধ্যাতীত অর্থ অকাতরে ব্যয় করাতে লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন নলিনী, নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—

"বাবা, মার যে শীতকালে মৃত্যু হইয়াছিল, তবে এখন তাঁহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কি করিয়া হইবে?—এ যে বসন্ত কাল।"

নরেন্দ্রনাথ অন্যমনে উত্তর দিয়াছিলেন "তোমার স্মরণ নাই।"

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

আল্‌বোলা।

১

কত লোকে কত দুঃখ করে,
কিন্তু নাই মোর কোন জ্বালা;
যা, ঘটে তা, ঘটুক সংসারে,
আমি সুখে টানি আল্‌বোলা।

২

কেহ করে মরণের ভয়,
প্লেগ আর বসন্তের বেলা;
আমি চেয়ে দেখিনি সে দিকে
শুধু বসে টানি আল্‌বোলা।

৩

রাম দাস ভোট নিলে মোর,
আর নিলে আমাদের ভোলা,
কে জানে কে হ'য়েছে যে ফেলো,
আমি সুখে টানি আল্‌বোলা।

৪

জাপানেরা করেছে উন্নতি,
কেহ বলে জর্ম্মাণির পোলা;
কি হইবে সে ভাবনা ভেবে,
আমি ধীরে টানি আল্‌বোলা।

৫

আপিসের ধারিনাক ধার
কবে ছুটী কবেই বা খোলা!
কথন বা পড়িব সংবাদ?
সুখে আছি পেয়ে আল্‌বোলা।

৬

সেয়ারের দর কমে গেল,
বাজারেতে উঠেছে জটলা;
হ্রাস, বৃদ্ধি, সমান আমার,
যথন ল'ভেছি আল্‌বোলা।

৭

বুয়ারেরা লুটিছে রসদ,
বৃটিশেরা দাগিতেছে গোলা;
কুণ্ডলী হইয়া উঠে ধুম,
আমি সুখে টানি আল্‌বোলা।

৮

শুনেছি আমার ছোট যারা,
পসার করেছে তা'রা মেলা।
তাই আর ঘুরিনাক কোর্টে,
সুখে বেশ টানি আল্‌বোলা।

৯

উৎসাহ প্রয়াস, মিছে আর,
অদৃষ্টের পথ আছে খোলা;
আমার কিছুই নাই আশা,
ধরেছি যথন আল্‌বোলা।

১০

মেয়েটার বিয়ে দিবে ব'লে,
গিন্নি বড় হ'য়েছে উতলা;
আমার ভ্রূক্ষেপ নাই তায়,
ব'সে বেশ টানি আল্‌বোলা।

১১

পেয়েছে অগাধ টাকা শশী,
ক'নে কিন্তু হইয়াছে কালা;
যাক্—তায় কি কায আমার?
আমি সুখে টানি আল্‌বোলা।

১২

জামায়ের তত্ত্ব নিতে গিয়ে,
কিরণের বাঁধা গেল বালা;
সংসারের এমনই গতি,
আমি সুখে টানি আল্‌বোলা।

১৩

দেখিতেছি শাসনের চোটে,
বিচার শিকেয় থাকে তোলা;
ছেলেগুলা বিষম দুরন্ত!
আমি সুখে টানি আল্‌বোলা।

১৪

নির্খর্চায় তামাক টানিতে,
নিন্দুকেরা জোটে দুই বেলা;
হুঁকো গুলো ভেঙ্গে ফেলে তাই,
ধরেছি অবাধে আল্‌বোলা।

১৫

লৌকিকতা রাখা হ'ল দায়,
বিবাহের নিমন্ত্রণ মেলা;
মিছে কেন আত্মীয় বাঁধন?
সুখে বেশ টানি আল্‌বোলা।

১৬

বঙ্গে পায় এক চেটে পূজা,
ঘেঁটু, ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা;
মাথায় আগুন জ্বলে যার,
পূজ্য মোর সেই আল্‌বোলা।

১৭

ধন, মান, যশ, এ সংসারে
আর মিছে চায় কোন্——
পাই যদি চক্ষু মুদে সুখে,
টানিতে কেবল আল্‌বোলা।

——

শ্রীরসময় লাহা।

লণ্ডনে প্রথম রাত্রি।

আমি যেদিন বিলাতে প্রথম পদার্পণ করি, সেই রাত্রির একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। আমরা লিভারপুলে নামিয়া লণ্ডনের ট্রেনে উঠিলাম। পাঁচটার সময় তথাকার একটি হোটেলে পৌছিলাম। সেখানে আহারাদির পর পোষাকের ধূলা ঝাড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। অধিকাংশ নাট্যশালাগুলি যে রাস্তায় স্থিত, সেই বিখ্যাত "strand" এর দিকে চলিলাম। তথায় একটি বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে বহু লোকের গতিবিধি দেখিয়া মনে করিলাম, হয়ত কোন বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে। একটু অপেক্ষা করিলাম; মনে করিলাম, একটু জনতা কমিলেই যাইব। কিন্তু কমিবার পরিবর্ত্তে উহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে জানিলাম, ঐ অট্টালিকাটি একটি হোটেল, চতুর্দ্দিক হইতে লোক তথায় আসিতেছে, এবং কোথায় যে ফিরিয়া যাইতেছে, তাহা তাহারাই জানে।

সেই জনতা-স্রোতে মিশিয়া আমিও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি বিদেশী বলিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। বাঙ্গালী-সুলভ চলন ভুলিতে পারি নাই, এজন্য অনেকবার মানুষ চাপা পড়িতে হইয়াছিল। কারণ বিলাতের লোকেরা মরাল-গমনের আদর জানেনা। তাহারা যখন পথে চলে, বোধ হয় যেন তাহাদের ঘরে আগুণ লাগিয়াছে, অথবা বাড়ীতে আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত, সেই জন্য দ্রুত ডাক্তার ডাকিতে যাইতেছে। পাঁচবার রাস্তা পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, দুইবার অম্‌নিবসের

সম্মুখে পড়ি, তিনবার চারিদিক হইতে থিয়েটার-অভিমুখগামী দশ-বার-খানা গাড়ি হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িল। একে গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, কোচম্যানের চীৎকারত আছেই, তার পর সংবাদ-পত্র-বিক্রয়কারী বালক-গণ, এরূপভাবে চীৎকার করিতেছিল, যেন তাহারা ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল লোকে শ্রবণশক্তি-হীন, অথবা যেন প্রত্যেকেই তাহাদের নিকট হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। অনেক কষ্টে সে রাস্তা পার হইয়া অপর একটি রাস্তায় পড়িলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। আমি হোটেলে ফিরিবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু পথ হারাইয়া ফেলিলাম। অনেকক্ষণ এ রাস্তা সে রাস্তা হাঁটিয়াও পথ ঠিক করিতে পারিলাম না। পরে একটা মোড়ের উপর দাঁড়াইয়া কোন্‌দিকে যাইব ভাবিতেছি,—এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক একটা ছোট বোঁচকা দুইহাতে করিয়া আমার দিকে আসিতেছে দেখিলাম। স্ত্রীলোকটি অতি কষ্টে হাঁটিতেছিল, যেন দারুণ ক্ষীণা ও পীড়িতা। আমার নিকট আসিয়া চক্ষুতে রুমাল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মহাশয়, আমি অতি দরিদ্রা, আমার স্বামী অত্যন্ত পীড়িত, এবং কার্য্য করিতে একবারে অক্ষম। আমি এবং আমার সন্তানেরা প্রায় অনাহারে মরিতে বসিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি আত্মীয় স্বজন কেহ নাই?"

"না মহাশয়, আমি অত্যন্ত গরিব, সেই জন্য আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। এককালে আমার অবস্থা ভাল ছিল, তখন আত্মীয়ের বড় অভাব ছিল না।"

"ঠিক বলিয়াছ, সংসারের নিয়মই এই।"

"মহাশয়, আমি যে কত কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করি, তাহা যদি আপনি জানিতেন, ত নিশ্চয়ই আপনার দয়া হইত।"

"তোমাকে অতি ক্ষীণা বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কঠিন পরিশ্রম কর কিরূপে?"

"পেটের দায়ে আমাকে কাপড় কাচিয়া খাইতে হয়" এই বলিয়া রমণী এরূপ কাসিতে লাগিল যে, আমার ভয় হইল বুঝি দম আট্‌কাইয়া মারা যায়। সে কিঞ্চিৎ সুস্থা হইলে, আমি বলিলাম "তুমি কাসির কোন ঔষধ খাও না কেন।"

"আমার সন্তানেরা অনাহারে মরিতেছে, তাদের খাওয়াতে পারি না; নিজে ঔষধ খাব কেমন করিয়া!"

স্ত্রীলোকটির বয়স অল্প, দেখিতেও সুশ্রী, ক্ষীণ দেহে তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় শুনিয়া, আমার বড় দয়া হইল। আমি পকেট হইতে একটি ক্রাউন মুদ্রা বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, "এই নাও, ইহাতে তোমার কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে।"

"ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন, আপনি অতিশয় দয়ালু। এক্ষণে আমি কাসির জন্য ঔষধ কিনিতে পারিব। আপনি যদি এতদূর অনুগ্রহ করিলেন, তবে আর একটি উপকার করিবেন কি? এই কাপড়ের বোঁচকাটা একটু যদি ধরেন, তাহা হইলে আমি রাস্তার ঐ কোণের ডাক্তারখানা হইতে ঔষধটা কিনিয়া আনি। আমার হাত বড় ধরিয়া গিয়াছে"— আমি তাহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহার এই সামান্য প্রার্থনায় অসম্মত হইতে পারিলাম না। সে বোঁচকাটি আমার হস্তে অতি সাবধানে রাখিয়া দিল এবং বলিল, "মহাশয়! দেখিবেন, যেন এই বস্ত্রগুলি খারাপ হইয়া না যায়, তাহা হইলে আমি ইহার কাচিবার মূল্য পাইব না।" আমি অতি সাবধানে দুই হাতে উহা ধারণ করিয়া রহিলাম, স্ত্রীলোকটি ঔষধ আনিতে গেল।

দশ, পনর মিনিট হইল, তবুও সে ফিরিল না; ক্রমে ক্রমে আধ-ঘণ্টা হইল, তখনও তার দেখা নাই। আমার হাত ভারিয়া গেল। বোধ হইল, যেন উহার ভিতরে একটা কি নড়িতেছে, এবং বিড়াল-ছানার মত মিউ মিউ করিতেছে। আমার ভয় হইল, বোধ হয় স্ত্রীলোকটি কাপড় গুলি কাচিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল, শীতের তাড়নায় একটা বিড়াল-ছানা উহার ভিতরে কোন ক্রমে ঢুকিয়াছিল, স্ত্রীলোকটি জানিতে পারে নাই। কি সর্ব্বনাশ! একটা বিড়ালে তাহার বস্ত্রগুলি নষ্ট করিয়া গরিবের যথেষ্ট ক্ষতি করিল। এই কি ভগবানের বিচার! এই ভাবিতে ভাবিতে আমি গ্যাসের নিকটে গিয়া দেখিলাম—সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! উহা বিড়াল-ছানা নয়, একটি ক্ষুদ্র জীবিত শিশু। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। একি বিপদ! শিশুটা তখন কুড়িটা বিড়ালকে থলির ভিতর পুরিলে যেরূপ চীৎকার করে, সেইরূপ চেঁচাইতে লাগিল, এবং হিষ্টিরিয়ার ফিট্ হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভাবে হাত পা ছুড়িতে লাগিল।

ক্রমে আমার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য নর নারী ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এবং

অনেকে দুঃখ, অনেকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। আমি সজল-নয়নে বলিলাম, "আমি বিদেশী, এই বিপদে পড়িয়াছি, তোমরা আমায় রক্ষা কর।" একজন বলিল, "অনেক বিদেশীই এরূপ বিপদে পড়ে। আমরা তোমায় রক্ষা করিতে পারি না। তুমি ছেলেটাকে উহার মার কাছে লইয়া যাও, কোন গোলমাল না করিয়া বুদ্ধিমান্ লোকের ন্যায় পুত্রভাবে মানুষ কর।"

"উহার মাকে কোথায় পাইব। আমি ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানিনা"—

জনতার ভিতর হইতে একজন বলিল, "নেকা সাজিলে চলিবে না। লুকিয়ে পাপ কর্‌তে গেছ্‌লে, সব প্রকাশ হয়ে পড়্‌লো, আর গোলমালে কায কি? উহার মার সঙ্গে মিটমাট ক'রে ফেল, ছেলেটাকেও মানুষ কর। তোমার ছেলে ত চাই—তা বিবাহিতা পত্নীর গর্ভেই হউক—আর উপপত্নীর গর্ভেই হউক"—

আর একজন বলিল, "চল ইহাকে পুলিসে লইয়া যাই; এ ব্যাপারের তদন্ত আবশ্যক।" এই বলিয়া আমাকে চার পাঁচ জন টানাটানি করিতে লাগিল। আমি কাতর ভাবে তাহাদের বুঝাইতে লাগিলাম—কেইবা শোনে? আমি পুলিসে হাজির হইলাম। পুলিস-কর্ম্মচারীকে সমুদয় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিলাম এবং বলিলাম, আমি নবাগত বিদেশী। তিনি সমস্ত লিখিয়া লইলেন, ছেলেটিকে রাখিয়া আমাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!!!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

জাতীয় সাহিত্য।

প্রস্তাবনা।

কি ছিল, কে জানে? পুরাণ কেবল এক বিরাট-কল্পনার আভাষ দিতেছে। সে কল্পনা কি? কিছু ছিল না। ছিল কেবল উদ্বেলিত সলিল-তরঙ্গে ভাসমান পুরুষ,—জড়প্রায়, কার্য্যরহিত! শক্তি শিয়রে বসিয়া সরস-পরশে এই তন্দ্রালস-বিভোর পুরুষকে প্রথম জাগাইয়াছিল। সে জাগরণের ফল—ব্রহ্মা। কিছুই ছিল না, সব হইল—পরিপূর্ণ, অসীম আকাঙ্খাপূর্ণ, অনন্ত শ্রেণীবদ্ধ, চির-নিয়ম-সম্বলিত। এই যাহা বিকশিত হইল, এই অনন্ত-মণি-ধনি-বিভূষিত, চির-সুন্দর, এই বিয়োগ-মিলনমাধুর্য্য-মণ্ডিত চির-রহস্যময় জগৎ, ইহাই মহাকাব্য, বিরাট-সাহিত্য। এ মহাকাব্যের রচয়িতা ব্রহ্মা, চরাচর-বিধাতৃ-সৃষ্টিকর্ত্তা। পৌরাণিক কল্পনায় এই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই আদি কবি। আর এই মহাকাব্যের অনুকরণেই মানবের কাব্যাদি ললিত বিদ্যার বিকাশ।

কি ছিল, কে জানে? এই ঘটনা-প্রবাহ-বেষ্টিত মনুষ্য-হৃদয়ের উদ্বেলিত বাসনা-তরঙ্গে আলস-শায়িত সৌন্দর্য্যজ্ঞান, কবে কোন্ প্রাণময়ী কাব্যসুন্দরীর কুসুম-কোমল-কর-স্পর্শে প্রথম জাগিয়াছিল, কে জানে? বালার্ক-কিরণ-সম্পাতে কঠিন বৃক্ষত্বক্ ভেদ করিয়া যেমন ফুল ফুটিয়া উঠে, তেমনি কাহার অপরূপ কিরণ, ছটায় অমার্জ্জিত মানবের মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কে জানে? সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কোন্ বাল্য ইতিহাসে এ কথা বিবৃত আছে? কোন্ অতীত পুরাণের পবিত্র অধ্যায়ে এ রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে? ইতিহাস এখানে মূক, পুরাণ এখানে নিরুত্তর। ঐ মাতৃক্রোড়ে শায়িত ক্ষুদ্র শিশু, চাঁদ দেখিলে লহরে লহরে হাসিয়া উঠে, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণে দিগন্তের চাঁদ মুষ্টিমধ্যে ধরিয়া রাখিতে চায়, যেন চাঁদ তাঁহার কত আপনার, ঐ ক্ষুদ্র শিশুর বোধাতীত হৃদয়-কাব্যে বুঝি তাহা অব্যক্ত ভাষায় বর্ণিত!—কে সে হৃদয় বুঝিবার স্পর্দ্ধা রাখে? কে জানে, কে বলিবে, কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে মানুষ সুন্দরকে চিনিয়াছিল!

এই স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যজ্ঞানই মানুষকে কবি করিয়াছে। যে উন্মাদিনী

প্রকৃতির আকর্ষণে ও উত্তেজনায় ব্রহ্মার উদ্ভব ও ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ, সেই অব্যাজসুন্দরীর উদ্দীপনায় ও প্রভাবেই কবির উদ্ভব ও কাব্যের সৃষ্টি। এই নিত্য-ভাব-বৈচিত্র্যময়ী সর্ব্বরসোন্মাদিনী প্রকৃতিই কবির জননী—শিক্ষয়িত্রী, সহচরী। কবির সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে এই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। দর্পণস্থ সূর্য্যকিরণের ন্যায়, মানবের হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের এই লীলা-চাতুর্য্যই শিল্প নামে অভিহিত। এই লীলাচাতুর্য্যের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিই সাহিত্য ও তদন্তর্গত কাব্যাদি কলাবিদ্যায়।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান মানুষের যেমন স্বভাবজ ধর্ম্ম, এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভিব্যক্তি কাব্যও তেমনি মানবের চিরসাথী। শিশুর সৌন্দর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক ও সহজাত হইলেও তাহার সম্যক্ বিকাশ-চেষ্টা যেমন তাহার ক্ষমতার অতীত ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ, আদিম অবস্থায়, অমার্জ্জিতবৃত্তি, প্রকৃতির নব-প্রসূত, বনচর মানবের সৌন্দর্য্য-বোধের সম্যক্স্ফুরণও সেইরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। যত দিন গিয়াছে, মানুষ প্রকৃতির সাহায্যে ও শিক্ষায়, সুন্দরকে ও সত্যকে যত চিনিয়াছে, ততই মানবের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৌন্দর্য্য-বোধাত্মক কার্য্যেরও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। এই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ক্রমবিকাশেরই ফল—মানবের হৃদিভাবব্যঞ্জক ভাষা, ভাস্কর্য্য, চিত্র-বিদ্যা, শিল্পকুশলতা, কাব্য প্রভৃতি ললিত সাহিত্য। আর ইহারই চরম পরিণতি—অশেষ সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিবার জন্য—মানবের উত্তম আকাঙ্খা, পরম সত্য লাভের জন্য তাহার অনন্ত-ব্যাকুলতা। এইরূপে মানবের সার্ব্ব-বিষয়িক হিতসাধন করে বলিয়াই এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নাম সাহিত্য।

মানবের মনুষ্যত্বপরিচায়ক এই সকল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ধারাবাহিক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দেশভেদে, প্রকৃতিভেদে এবং এই প্রকৃতির বিভিন্নতাজনিত মনুষ্যসমাজের গঠন ও শিক্ষার তারতম্যে, একই সৌন্দর্য্যজ্ঞান, নানাদেশে নানাভাবে প্রতিভাত। এক বীজ দেশভেদে, ঋতুভেদে এবং মৃত্তিকাভেদে কোথাও ফল-ফুল-পূর্ণ মহামহীরুহ, কোথাও নবকিশলয়মণ্ডিত ক্ষুদ্রপাদপ, কোথাও সামান্য তৃণে মাত্র পরিণত। এই নৈসর্গিক নিয়মবশে যে দেশের যেমন সৌভাগ্য, সেই দেশে তেমনি জ্ঞানের বিকাশ, সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও সুকুমার শিল্পের উন্নতি। এই ভাগ্যগুণে ও নিত্যচঞ্চলা প্রকৃতির এই বিভিন্ন রসাত্মক মূর্ত্তিবৈষম্যের ফলেই, অন্যান্য ভূভাগস্থ মানবমণ্ডলীর অবশচিত্তে চেতনা সঞ্চারিত হইবার বহুপূর্ব্বে, অতীতের

অতি দূর-দিনে অধুনা এই অধঃপতিত ভারতবর্ষে, হিন্দুর মানস-সরোবরে শ্বেত-শতদলবাসিনী বাগ্‌দেবীর প্রথম উদ্বোধন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই প্রাচীন কীর্ত্তির জন্যই হিন্দুর দেশ দেবভূমি। এই ভাগ্যগুণেই গ্রীস ও রোম পাশ্চাত্য দেশের জীবন-গঠনের আদর্শ, এই সৌভাগ্যের বশেই সে দিনের আম-মাংসভুক্ অরণ্যচর ইংরাজের বিভূতি-বৈভবে আজ পৃথিবী চমৎকৃত। এবং এই ভাগ্য-বৈগুণ্যেই এখনও পৃথিবীর নানাদেশের অধিবাসীবর্গ বন-পশু-সহচর, অসভ্য ও ঘৃণিত।

জাতীয় গৌরবের একমাত্র নিদর্শন এই সাহিত্য, জাতীয় মহাকবিগণকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট হয়, সম্পূর্ণতা লাভ করে। এ জাতীয় কবি কে? সূর্য্যকিরণস্থিত বিচিত্রবর্ণসমূহ যেমন ইন্দ্রধনুতে প্রতিভাত, তেমনি এক একদেশে জাতি-বিশেষের সৌন্দর্য্যবোধ সেই সেই জাতির এক একজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়-পটে প্রতিবিম্বিত। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়দর্পণে এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-বোধের প্রতিবিম্ব প্রতিভাত, তিনিই প্রতিভার বরপুত্র, তিনিই জাতীয় মহাকবি। তাঁহার কাব্যে, তাঁহার চিত্রিত শিল্পে, তাঁহার রচনাচাতুর্য্যে, তাঁহার দর্শনে, তাঁহার সমসাময়িক ব্যষ্টি মানবের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, শিক্ষা ও সত্যানুসন্ধানলিপ্সার ভাবসমষ্টি পরিব্যক্ত। এই জাতীয় মহাকবিগণই আবির্ভূত হইয়া অনন্তপ্রবাহমান কালের সীমা নির্দ্দেশ করেন। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন কি? কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি-রচিত মহাচিত্রফলকে সে অতীতযুগ সীমাবদ্ধ। চির-বর্ত্তমান সে যুগের প্রতিচ্ছবি—রামায়ণ। স্বেচ্ছাচারী কালের উপর এইরূপে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ বলিয়াই জাতীয় মহাকবিগণ কালজয়ী, বর্ত্তমানের নিত্য-সহচর। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সকল কালজয়ী চিত্রকরগণ আবির্ভূত হইয়া, দেশের জ্ঞান ও শিক্ষার পরিবর্দ্ধন করেন। তাঁহাদিগের চিত্রণ-চাতুর্য্য হইতে আমরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা অবগত হই, তেমনি কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই সুকুমার শিল্প কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি। অতীত যুগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সাহিত্য, আর বর্ত্তমান যুগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সাহিত্য, বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন হইলেও, একে কিরূপ ভাবে অন্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে জড়িত, উভয় যুগের সাহিত্যে ও শিল্পে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি কোথায়, প্রকৃতি-দত্ত শিক্ষা কিরূপে অবস্থান্তরে বিভিন্ন

ফলপ্রসূ, অতীতের যে সকল চিত্রিত সৌন্দর্য্যরাশি আমাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডারে আছে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার পুনর্বিকাশের চেষ্টা আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার সম্যক্ বিশ্লেষণ ও আলোচনায় আমরা সে তথ্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই; এবং এইরূপ আলোচনাই শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিবার ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত করে।

সৌন্দর্য্য-বোধ হইতেই কাব্যাদি ললিত সাহিত্যের বিকাশ, এ কথা পুরাতন। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কাব্যানুরাগীগণের কি মত, এই প্রাচীন-প্রসঙ্গে আমরা তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্র। অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির উৎ-পত্তি, তেমনি এই সকল কালজয়ী মহাকবিগণের চিত্রিত সৌন্দর্য্যরাশি হইতেই নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। স্ফুটনোন্মুখ বাঙ্গালা সাহিত্য এই পুরাতন ও নূতনের সংমিশ্রণে গঠিত হইতেছে। এইরূপ নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণেই সকল দেশের সাহিত্যই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অতীতযুগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও বর্ত্তমানযুগের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। কি ছিল এবং কি হইয়াছে, কেবল আমাদের দেশের নহে, যে যে দেশের সাহিত্যের সৌন্দর্য্যপ্রভা আমাদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর প্রতিভাত, সেই সকল দেশের সাহিত্যে যে সকল অপূর্ব্ব সুন্দর চিত্রাবলী আছে, তাহার সহিত আমাদের এই নবপ্রস্ফুটিত সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, সামঞ্জস্য কোথায়, পার্থক্যই বা কেন, এই সকল কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমরা কবি ও কাব্য কি, তাহাই বলিলাম।

বারান্তরে কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমি একা।

কতদিন কত আশা হৃদয়ে আসিয়া উঠিয়া, প্রাণ মন উৎফুল্ল করিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম—জীবন এইরূপে যাইবে, কোন বিষাদ বা নিরাশার ছায়া স্পর্শ করিবে না। কিছুদিন পরে সে কুহক ভাঙ্গিয়া গেল। আবার কত দিন নব-বন্ধু-সমাগমে জীবনের স্রোত নূতন ভাবে প্রবাহিত হইয়া আনন্দ-উৎস প্রসারিত হইল। মনে করিলাম, ইহাই মানব-জীবনের অদ্ভুত সুখ এবং শান্তির পরাকাষ্ঠা। কিছুদিন পরে তাহাও ভ্রমাত্মক এবং মরীচিকাবৎ প্রতীয়মান হইল। পুনরায় বিবাহের পর নব সঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইয়া জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবে, অভাবনীয় সুখ-শান্তিলাভ করিয়া বহুদিনের অতৃপ্ত আশা মিটাইব, এই বাসনা বলবতী হওয়ায় প্রাণ মন হৃদয় একত্র সম্মিলিত হইয়া বিবাহে অনুমোদন করিল। বিবাহ হইল, সঙ্গিনী মিলিল, কিন্তু পূর্ব্ববয়সের আশা পূর্ব্ববৎ অতৃপ্ত রহিল; বরং হৃদয়ের ভিতর আরও খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যাহাকে লাভ করিয়া সুখী হইবার কল্পনা মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, তাহার প্রকৃতি আমা হইতে বিভিন্ন। আমি যাহা চাই, সে তাহার বিপরীত চায়। আমি যাহা করি, সে তাহার বিপরীত করে। সুতরাং সুখের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অসুখের একটী স্বতন্ত্র সোপান নির্ম্মাণ করিলাম। এইখানেই পরিসমাপ্তি নহে। আরও অনেক অবস্থা আছে। সন্তান হইল, মনে করিলাম, লোকে পুত্রলাভ করিলে পরম সুখী হয়; আমিও অবশ্য কতক সুখী হইব; কিন্তু কৈ, সুখ কি, সুখ কেমন, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যে দুঃখের আবহমান স্রোতে ভাসিতেছিলাম, সেই স্রোত এখনও সেইরূপ ভাসিতেছি। তট পাইবার আশায় ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, কিন্তু কৈ পোড়া অদৃষ্টে কুল কিনারা কিছুই মিলিতেছে না। আমার এ ক্ষুদ্র জীবন কি এক প্রহেলিকাময়! কিছুদিন পরে মনে করিলাম, সংসর্গ পরিত্যাগ করা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কারণ সংসর্গ করিয়া কৈ একদিনের জন্যও সুখী হইলাম না। একাকী থাকিয়া জাগতিক

কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া নিজ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি সুখলাভ করিতে পারি; এইরূপভাবে কিছুদিন কাটাইতেছি, প্রাণ যেন উদাসপূর্ণ, কিছুতেই মন বসেনা, কিছু করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ নাই, করিতে হয় করিতেছি, করিয়া বিশেষ কোন তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, কি যেন ছিল হারাইয়াছি,—খুঁজিয়া পাইতেছি না, পাইলে যেন পুনরায় সুখী হইতে পারি। যখন এইরূপ মনের অবস্থা, তখন একদিন জনৈক পুরাতন-বন্ধু অকস্মাৎ আসিয়া বলিল;—"বন্ধু! তুমি গন্তব্যপথের বিপরীত দিকে চলিতেছ, তাই তুমি সুখী হইতে পারিতেছ না। যে ভাবে তোমার জীবন পূর্ব্বে অতিবাহিত করিয়াছ, সেই ভাবে করিতে পারিলে এতদিন তুমি উন্নতি লাভ করিতে পারিতে, হতাশ-ভাব মন হইতে কোন্ দূরে পলায়ন করিত; কিন্তু তুমি তখন ভ্রমান্ধ হইয়া ঠিক্ পথ বিপরীত ভাবিয়া, বিপরীত পথ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাই তোমার অবস্থা এরূপ শোচনীয়। আজ তোমার অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত। বাল্য-সুহৃদ্ তুমি, তোমাকে সুখী দেখিলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করি। কি বলিব, আজ তোমার এই কার্য্যের বিষয় ভাবিয়া আমি কিরূপ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইতেছি, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ব্যতীত অপর কেহই অবগত নহেন। মানব-সমাজে অবস্থিতি করিতে হইলে সংসর্গের নিতান্ত প্রয়োজন। সংসর্গ পরিহার করিয়া সংসারে অবস্থিতি একপ্রকার অসম্ভব। তাই বলি, যাহা করিয়াছ, তাহা এখন পরিহার করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া যাও। এ জগতে সুখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। সুখ পাইবার আশায় মানব নানা কার্য্যে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কেহ বলিবে না যে, সে প্রকৃত সুখ লাভ করিয়াছি,—আর তাহার আশা নাই, আকাঙ্খা নাই। সকলেই কোন না কোন প্রকার অসন্তোষজনক অভিযোগ করিবে। ইহাই যদি জগতের সকল লোকের অবস্থা, তবে তোমার পক্ষে স্বতন্ত্র হইবে কেন? তুমিত জগৎছাড়া নও। কার্য্য করিয়া যাও, মনে এই কথা ঠিক বুঝিয়া রাখ, কিছুই কিছু নহে, কেহ কাহারও নহে। এ জগৎকার্য্য-ক্ষেত্রে সকলে কাজ করিতে আসিয়াছে মাত্র। কার্য্য করিতে হইলে পরস্পর পরস্পরের সহিত যেমন সম্বন্ধ নিরূপণ আবশ্যক, সংসারেও সেইরূপ

আত্মীয়স্বজনে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে জড়িত হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, চিন্তা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহার কোন প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। সকলে স্বতন্ত্র ভাবে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, স্বতন্ত্র ভাবে ইহলোক হইতে তিরোহিত হইবে। জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ে ইহাই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যে কেহ কাহারও নয়, সকলে একাকী আসিয়াছে, একাকী চলিয়া যাইবে। তবে কেন লোকের উপর বৃথা অভিমান করিয়া নিজ মনের উপর অশান্তি আনয়ন কর।”

বন্ধুর কথাগুলি অতি সারগর্ভ এবং উপদেশপ্রদ ভাবিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম—শেষে অনেকক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া নিজ জীবনের কথা আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলাম, জগতে আমি একাকী। সংসারের সঙ্গী প্রকৃত সঙ্গী নহে, কেবল কয়েক দিনের জন্য খেলা করিবার সঙ্গী স্বরূপ জগদীশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি আত্মীয়স্বজনে পরিবেষ্টিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। কি ভয়ঙ্কর প্রহেলিকা-পরিপূর্ণ এই মানব জীবন! এ জীবনের রহস্য ভেদ করা অতীব কঠিন। কি আশ্চর্য্য মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমরা জগতের কার্য্যে জীবন, যৌবন, ধন, মান, সম্ভ্রম সমর্পণ করিয়াছি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। জানি আমি সকলই মিথ্যা, বুঝি সকলই অলীক, দেখি সকলি ফক্কিকার-ময়, তত্রাপি মায়ার নিগড় ছেদন করিতে সক্ষম হইনা। ইহাই বিচিত্রতার বিচিত্রতা! আমরা সকলে কি কাজে যে ব্যস্ত, কি জন্য দৌড়াদৌড়ি করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। এ সকল করিবার সময় যথেষ্ট পাই, কিন্তু আসল কাজের সময় কিছু পাইনা; ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়! অপর কিছু বুঝি না বুঝি, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত “আমি একা।”

একা আসিয়াছি ভবে একাই যাইতে হবে।
একাকী জীবন ল'য়ে কার্য্য অবসান ভবে॥

কবিতা-কানন।

মাতা ভিক্টোরিয়া।

তুমি মাগো, পুণ্যবতী, এসেছিলে হেথা,
পুণ্য-ব্রত রমণীর করিতে পালন;
ধরণীর অধীশ্বরী, করিলে শাসন,
একমাত্র হৃদি-দানে—অসীম মমতা!
ধরাধাম পবিত্র সে, তব পুণ্য-কথা
ঘরে পরে, হৃদিস্তরে, আছে সিংহাসন,
দেখাইতে মূর্ত্তি তব—বিমল আনন—
শুভ্র-কান্তি, শুভ্রকেশা—মূর্ত্তি পবিত্রতা!
সম্রাজ্ঞী বলিয়ে শুধু না ছিল গৌরব,
দুঃখী তাপী আত্মহারা তবু তোমা পেয়ে;—
কি মাধুরী, কিবা ভরে, কিসের সৌরভ,
যাহাতে প্রতিভা আর শক্তি রহে চেয়ে?
তুমি মাগো, জ্যোতির্ম্ময়ী, কমলার হাসি,
তোমারে হারায়ে সবে ফেলে অশ্রুরাশি!

সমাপন।

মন হয়েছিল ঠিক্—জানিতাম স্থির,
পূরিবে সকল আশা মোর পৃথিবীর,
সকলি স্বপন হ'ল, নয়নের নীর
রহিল কেবল!

২

নহি আমি রূপবান্, সে ত তা জানিত,
তথাপি যে সে আমার হইবে বলিত,
এখন বুঝিনু, যত সে ভালবাসিত,
সবি তার ছল!

৩

দরিদ্র অতীব আমি, তাহাও তাহার
ছিল জানা, তবুও সে দীন অভাগার,
বলেছিল মুছাইবে নয়ন আসার,
জুড়াইবে মন!

৪

আমারে হেরিলে, তার চারু দু'নয়নে,
তরল বিদ্যুৎ যেন খেলিত সঘনে,
মনে হ'ত যেন তার বাঁধা মোর সনে,
জীবন, মরণ!

৫

কি জানি কি ভাব এল পরাণে তাহার,
কি জানি হইল কেন প্রেমের বিকার,
না জানি কি দোষ হেরি এই অভাগার
দ'লে গেল মন!

৬

বলিল না দুটো কথা বিদায়-সময়,
বলিল না কোথা যাবে, এমনি নিদয়,
ক'রে গেল মরুভূমি স্থধু এ হৃদয়,
আশা-সমাপন!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

বিদায়-গীতি।

(কোনও বিচারকের প্রতি)

যাবে ফেলে চলে এতদিনে,—
কবে হবে দেখা, মনে রবে আঁকা,
নিজ গুণে নেছ কিনে।
যে দেখেছে তব স্নেহভরা হাসি,
সে হাসির সেই হবে অভিলাষী,
সরল বান্ধব, ভুবনে দুর্লভ,
ঋণী আছি সবে সৌজন্যের ঋণে।
যথা যাবে পাবে সম যশোগান,
নাহি তব অরি—মিত্র সর্ব্বস্থান,
সর্ব্বত্র সমান—তোমার ধীমান্!
রব ম্রিয়মান মোরা তোমা বিনে।
পেলে অবকাশ ক'র কভু মনে,
তব দরশন মাগে বন্ধুগণে,
তব প্রিয় ভাষ, সতত প্রয়াস,
তব স্মৃতি-মধু হৃদয়-নলিনে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পূর্ণিমা নিশি।

১

আজি কিবা সুবিমল পূর্ণিমা রজনী!
শরতে সুনীলাকাশে শুভ্র জ্যোছনায়,
যেন মৃদু মৃদু হেসে, ধীরে ধীরে যায় ভেসে
সহ যত তারাদল নভোজ্জ্বল মণি,
উজলিয়া দশ দিশি আলোক ছটায়।

২

কুলু কুলু রবে ধীরে যেতেছে বহিয়া,
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নগেন্দ্রনন্দিনী,
চন্দ্র রশ্মি জলে পড়ি, জলে ঝিকিমিকি করি
তরঙ্গে চাঁদের ছায়া উঠিছে কাঁপিয়া,
নিস্তব্ধতা আছে সব ব্যাপিয়া অবনী।

৩

ধরিয়াছে ধরা কিবা মনোরম শোভা!
উচ্চে নীচে সমভাবে সুষমা ছড়ায়,
ফুটি ফুল্ল ফুলগুলি, রয়েছে নয়ন তুলি,
ছড়া'য়ে সুগন্ধ রাশি সুবিমল বিভা,
হেরিতে কুমুদ-কান্তে গগনের গায়।

৪

আহা কি স্বর্গীয় শোভা নাহিক উপমা!
শীতলিছে চরাচর স্নিগ্ধ সমীরণে,
ঈষৎ বৃক্ষের ডালে, হেলি পুষ্পগুলি দোলে
তা দেখি আকাশে যেন হাসিছে চন্দ্রমা,
হাসিছে অচলবালা মাণিক-ভূষণে।

৫

মৃদুল হিল্লোলে কাঁপে সরসী-জীবন,
পতি দরশন পে'য়ে ফোটে কুমুদিনী,
অধরে সুধার হাসি, নয়নে অমিয় রাশি,
আবরি কনকবপু গোলাপী বসনে,
হাসিছে প্রকৃতি সতী সুচারুহাসিনী।

৬

শুধু আম্রশাখে ডাকে কোকিল পাপিয়া,
নব দূর্ব্বাদলে বসি জোনাকের পাঁতি,
ধরেছে সুন্দর শোভা, জগজ্জনমনোলোভা,
হেরি কি আনন্দে হৃদি উঠি উথলিয়া,
জগতে অতুলনীয় পূর্ণিমার রাতি।

৭

জাহ্নবীর উভকূলে র'য়েছে শোভিয়া,
ঈষৎ অনিলে দোলে নব দূর্ব্বাদল,
জাহ্নবী তরঙ্গ গুলি, বায়ুভরে হেলি দুলি,
তরঙ্গে তরঙ্গে বারি বিকীর্ণ হইয়া,
পড়ি নব দূর্ব্বাদলে শোভে মুক্তাফল।

৮

হাসিছে জগত আজ হৃদয়ের হাসি,
ধ'রেছে মোহন শোভা সমস্ত অবনী,
গগনে সুধাংশু আজি, শোভন শোভায় সাজি,
হাসাইছে ভূমণ্ডলে নভঃ কোলে বসি,
ভূতলে স্বর্গের শোভা পূর্ণিমা রজনী।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

বিবিধ।

আশ্চর্য্য নহে।

১ম বালক। আমার খুড়ো ম'রে দশ হাজার টাকা রেখে গেছেন।

২য় বালক। তার আর আশ্চর্য্য—কি? আমার খুড়ো ম'লে সমস্ত পৃথিবীটা রেখে যাবেন।

১ম বালক। (অপ্রস্তুত হইয়া) আমার খুড়োর ঘরে একটা সাপ আছে, তার মাথায় জটা।

২য় বালক। (পুনরায় অপ্রস্তুত করিবার জন্য) আমার খুড়োর ঘরে যে সাপ থাক্‌বে, তার পায়ে মোজা!

চমৎকার সাগর-দৃশ্য।

থিয়েটরে একদিন সাগবের অভিনব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। সাগরের দৃশ্য—অবশ্য পাঠকের অজ্ঞাত নাই, একখানা রং‌করা ক্যাম্বিশ মাত্র পাতা থাকে। দৈবক্রমে সম্মুখস্থ দৃশ্যপটের সহিত এই কাপড় খানি আট্‌কাইয়া যায়। যথা সময়ে ড্রপ্‌সিন্ তুলিবার ঘণ্টা পড়িল, এবং সেই সঙ্গে এই সমুদ্র আঁকা কাপড়খানিও উঠিয়া গেল। দর্শকবৃন্দ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, কতকগুলি লোক ষ্টেজের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া হাত পা ছুড়িয়া ঢেউ দিবার অনুকরণ করিতেছে। ইহাদের চক্ষু মুদিত —পাছে ধূলা পড়ে—তাই সমুদ্র উঠিয়া যাইবার পরও ইহারা এইরূপ বীভৎস অভিনয় করিতে লাগিল। শেষে দর্শক-বৃন্দের করতালি ধ্বনিতে চক্ষু উন্মীলিত হইলে ইহারা পলাইয়া বাচে।

সহরের মান।

সহরের বড়লোক।—কাল রাত্রিতে আমার বাড়ীতে ভয়ানক চুরি হ'য়ে গেছে। আপনি কাগজে ছাপিয়ে দিন। আর লিখে দেবেন যে, চোরেরা তাড়াতাড়িতে সৌভাগ্যক্রমে ৫।৭ হাজার টাকার গহনাপূর্ণ বাক্‌সটা দেখ্‌তে পায়নি এবং রূপার বাসনের সিন্দুকটাও ভারি বলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। কিন্তু হাত বাক্সের ভিতর যে ২০০০৲ টাকা নগদ ছিল, তাহা অপহৃত হইয়াছে।

সম্পাদক।—মহাশয়! এসব কথা ছাপ্‌লে—পুনরায় আপনার বাড়ী চুরি হ'তে পারে।

সহরের বড়লোক।—তা'হোক্ মশাই। এসব না লিখ্‌লে যে মান থাকে না। এতবড় বাড়ীতে একটা চুরি হ'ল, আর সাধারণে যদি জানে যে, চোরেরা গহনা বাসনে একশত টাকাও পায় নাই—তা হ'লে—

দুদিক রক্ষায় পরিত্রাণ।

প্রথমা স্ত্রী। ঝি, জানালাটা খুলে দিয়ে যাও ত।

দ্বিতীয়া স্ত্রী। না ঝি খুলোনা, তা'হলে ঠাণ্ডা লেগে আমি ম'রে যাব।

প্রথমা স্ত্রী। তুমি খোলনা ঝি, এধারে গরমে আমি দম আটুকে মরি যে।

দুই স্ত্রীর এইরূপ ঝগড়াতে স্বামীর ঘুমের বড় ব্যাঘাত হইতেছিল। তিনি এতক্ষণ চুপ্ করিয়া সহিতেছিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করাতে বলিয়া উঠিলেন—"নাও ঝি জানালাটা খুলে দাও, একটা ঠাণ্ডা লেগে মরুগ; তারপর বন্ধ করে দাও, আর একটা হাঁপিযে মরুগ। এ ছাড়া আজ আর নিস্তার নাই।"

নিগ্রোর রং।

নিগ্রোজাতি ঘোর কৃষ্ণকায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের শ্বেতকায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু এক সপ্তাহের পর তাহাদের রং ক্রমে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়।

বিবির সাহস।

সার্কাসের ম্যানেজার।—কে হে সাজঘরে অমন চীৎকার ক'র্‌ছে?

সার্কাস-বালক।—ওই যে নতুন বিবি বাঘের খেলা দেখাবে ব'লে এসেছে, সে একটা নেংটি ইঁদুর মাড়িয়ে ফেলেছে ব'লে চেঁচাচ্চে।

পসারে অন্তরায়।

একজন কবি বড়ই দুঃখে বলিয়াছিলেন "কবিতা লিখে আমি অনেক দিন গুছিয়ে নিতে পাত্তেম, কেবল কতকগুলো মরা কবি থেকেই ব্যবসা মাটি ক'ল্লে।"

সমালোচনা।

সন ১৩০৮ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা।—

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা গণিত ও কলিকাতা, ৬৬ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ হিন্দুধর্ম্ম-যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পঞ্জিকার গণনার সহিত বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রচলিত পঞ্জিকার গণনার বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কাশীর পঞ্জিকার গণনার সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গণনার বিশেষ মিল দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ—বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের মতে ৪ঠা আষাঢ় রথযাত্রা, কাশীর পঞ্জিকার মতে তাহাই, কিন্তু কলিকাতার অন্যান্য প্রচলিত পঞ্জিকার মতে ১লা শ্রাবণ রথযাত্রা ; ঐ রূপ বিশুদ্ধ পঞ্জিকা ও কাশীর পঞ্জিকার মতে ১০ই ভাদ্র সোমবার ঝুলনযাত্রা, কিন্তু কলিকাতার প্রচলিত পঞ্জিকার মতে পূর্ব্ব দিবস রবিবার ঝুলনযাত্রা। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা ও কাশীর পঞ্জিকার মতে ৪ঠা কার্ত্তিক রবিবার দুর্গোৎসব, কিন্তু কলিকাতার প্রচলিত পঞ্জিকার মতে ৩রা কার্ত্তিক শনিবার প্রথম পূজা। এরূপ মতের পার্থক্য থাকায় হিন্দু মাত্রেরই ক্রিয়া-কলাপ কোন মতানুযায়ী করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাদের হিন্দু সমাজের নেতা পণ্ডিত মণ্ডলী সমাবেত হইয়া স্থিরীকৃত না করিলে আর কে করিবে? আমাদের বিনীত নিবেদন, পণ্ডিত মণ্ডলী ইহার একটী স্থির মীমাংসা করেন। সূর্য্য গ্রহণের গণনায়ও পরস্পরের অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। ২৫ শে কার্ত্তিক সোমবার ইংঘণ্টা ১২।২৩ মিনিটে স্পর্শ ও ৩।৩৬ মিনিটে মোক্ষ, ইহাই গুপ্তপ্রেসের মত ; কিন্তু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের মতে ইংঘণ্টা ১২।৩০ মিনিটে স্পর্শ ও ৩।৫২ মিনিটে মোক্ষ। এখন এই বিষয় পণ্ডিতমণ্ডলী প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার গণনা ঠিক এবং কাহার গণনা ভুল, অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারেন। বিশুদ্ধ পঞ্জিকার ছাপা উত্তম এবং কাগজ সুন্দর।

রঙ্গালয়।—নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা ; কলিকাতা, ৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটার হইতে শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপা সুন্দর। কোনও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার এরূপ সুন্দর মুদ্রাঙ্কণ দেখি নাই। লেখকশ্রেণীর মধ্যে যাঁহাদের নাম দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিলে "রঙ্গালয়" সর্ব্বজন সমাদৃত হইবে, আমাদের এরূপ আশা আছে।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ] চৈত্র, ১৩০৭। [৩য় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

শ্রীম-কথিত।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাই! চল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিতে যাই। ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র; ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে মার্চ্চ।

মধ্যাহ্নের ভোজনের পর ভগবান্ রামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা,—চৈত্রমাসের গঙ্গা, বেলা ২টার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। তন্মধ্যে, ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুত অমৃত, মধুর-কণ্ঠ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য,

যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবল্লীলা গুণগান করিয়া আবাল-বৃদ্ধের কত কতবার মন হরণ করিয়াছেন। রাখালের অসুখ হইয়াছে—এই কথা ভগবান্ রামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্তদের বলিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দেখ, রাখালের অসুখ হইয়াছে। সোডা (soda) খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! (রাখালের প্রতি) রাখাল! তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

(পরমহংস দেবের সমাধি।)

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ নারায়ণ বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন। একদিকে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ-আত্মা বালক ভক্ত রাখাল,—অপর দিকে ঈশ্বর-প্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু, সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। ঠাকুর সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও "গোবিন্দ" এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ সেই ভাব। ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির। গোবিন্দনাম করিতে করিতে ভক্তাবতার রামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির। ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন সব চলিয়া গিয়াছে। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীর-মাত্র ইহলোকে পড়িয়া রহিয়াছে। আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় ছেলের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি? এই সময়ে গেরুয়া-কাপড়-পরা অপরিচিত একটী বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও আসন গ্রহণ করিলেন। পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। আপনাপনি বলিতে লাগিলেন।—

(গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গেরুয়া দৃষ্টে) আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পর্লেই হ'লো! (হাস্য)। একজন ব'লেছিলো, "চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী"। আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক্ বাজায়। (সকলের হাস্য)

" বৈরাগ্য তিন চার প্রকার আছে। সংসারের জ্বালায় জ্ব'লে গেরুয়া বসন প'রেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। হয়ত কর্ম্ম নাই,—গেরুয়া প'রে কাশী চ'লে গেল। তিনমাস পরে ঘরে পত্র এলো, "আমার একটী কর্ম্ম হইয়াছে, কিছু দিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।" আবার সব আছে, কোন অভাব নাই,—কিন্তু ভাল লাগে না, ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে, সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্ ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটী না হয়, তা'হলে ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা ব'লতে বা ক'র্‌তে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে শাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হ'চ্চে, আর বাহিরে গেরুয়া, বড় ভয়ঙ্কর!

(মিথ্যা ও নববৃন্দাবন নাটক।)

" এমন কি, অভিনয়েও যারা সৎ, তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। কি একটা আন্‌লে, ক্রস্ (Cross); আবার জল ছড়াতে লাগ্‌লো, ব'লে—শান্তিজল!! একজন দেখি, মাতাল সেজে মাত্‌লামি ক'র্‌ছে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। কু—বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ রাখায় দোষ হয়। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ হ'য়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখ্‌লে মিথ্যার রঙ ধ'রে যাবে।

(কেশব সেন ও খোসামুদে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একদিন নিমাইসন্ন্যাস কেশবের বাড়ীতে দেখিতে গি'ছিলাম। যাত্রাটী কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ ক'রেছিল। একজন কেশবকে বল্লে 'কলির চৈতন্য হ'চ্চেন আপনি।' কেশব আবার আমার দিকে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে, "তা'হ'লে ইনি কি হ'লেন?" আমি বল্লাম, "আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।" কেশবের রজোগুণ ছিল, লোক-মান্যের ইচ্ছা ছিল।

(নিত্যসিদ্ধ ও রাগভক্তি।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি) রাখাল টাখাল এই—সব ছোক্‌রা, এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য

সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরের ভালবাসা। যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব—বসান শিব নয়।

"নিত্যসিদ্ধ একটী থাক্ আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখন সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।

"সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে, আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

"নিত্যসিদ্ধ; যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয়-রসের দিকে যায় না।

"সাধ্য সাধনা ক'রে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান ক'রতে হ'বে, এই রূপ ক'রে পূজা ক'রতে হ'বে, এসব বিধি-বাদীর ভক্তি। যেমন ধান হ'লে, মাঠ পার হ'তে গেলে, আল দিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হ'বে।

"রাগভক্তি, প্রেমভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধি নিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া,—আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা একদিক্ দিয়া গেলেই হ'লো। বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ'লো।

"এই রাগভক্তি, এই অনুরাগ, ঈশ্বরের এই ভালবাসা, না এলে তাঁহাকে লাভ হয় না।"

অমৃত। মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

(সমাধিতত্ত্ব,—সবিকল্প ও নির্বিকল্প।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনেছো, আরসুলা কুমুরেপোকা চিন্তা ক'রে কুমুরে পোকা হ'য়ে যায়? কি রকম বোধ হয় জানো? যেমন হাঁড়ীর মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

অমৃত। একটুও কি অহং থাকে না?

রামকৃষ্ণ। হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। যেমন সোণার একটু কণা সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়; যেমন বড় আগুন, আর তার একটী ফিন্‌কী। বাহ্যজ্ঞান চ'লে যায়, কিন্তু

প্রায় তিনি একটু অহং রেখে দেন—বিলাসের জন্য। আমি তুমি থাক্‌লে তবে আস্বাদন হয়।

"কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম জড় সমাধি, নির্ব্বিকল্প সমাধি। তখন কি অবস্থা হয়, মুখে বলা যায় না। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গি'ছিলো। একটু নেমেই গ'লে গেল। তদাকারকারিত। তখন আর কে উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!"

সদৃশ চিত্রাবলী।

আইভ্যান্‌হো, দুর্গেশনন্দিনী এবং বঙ্গবিজেতা উপন্যাসত্রয়ের প্রধান চরিত্র কয়টীর সৌসাদৃশ্যের কথা সর্ব্বজন-বিদিত। আইভ্যানহো ও রাওয়েনা (Rowena) জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা এবং সুরেন্দ্রনাথ ও সরলা গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা-স্থলাভিষিক্ত। তাহারা প্রণয়ী এবং তিনটী প্রণয়ী-মিথুনের মিলনপথই প্রথমে কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম আকার ধারণ করে, কিন্তু পরিশেষে পরিণয় তাহাদের বিচ্ছেদ-বেদনার চিরশান্তি দান করে। রেবেকা (Rebecca), আয়েষা এবং (বঙ্গবিজেতায়) বিমলা, তিনটী নিরাশ প্রণয়াকাঙ্খিনী, প্রত্যেকেই গ্রন্থের নায়ককে একান্ত মনে ভালবাসিয়াছিল এবং প্রত্যেকেরই প্রণয়বাসনা পরিতৃপ্তির পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় ছিল এবং প্রত্যেকেই প্রেমপূজায় আপনার ইহজীবনের সুখাশা উৎসর্গ করিয়াছিল।

এরূপ সৌসাদৃশ্য অনুকরণের ফল না হইতে পারে। বিভিন্ন মানব-অন্তরের কল্পনা পৃথক্‌ হইলেও এই পার্থক্যের মধ্যে সাদৃশ্য-সংঘটন বিচিত্র নহে। বঙ্কিম বাবু বলিতেন, যে, তিনি দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্ব্বে আইভ্যানহো উপন্যাস পাঠ করেন নাই। রেবেকা ও আয়েষার চরিত্রগত,—এমন কি তাহাদের মুখনিঃসৃত বাক্যের মধ্যেও বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও, বঙ্কিম বাবু যে স্কটের (Sir walter Scott) অনুকারী নহেন, এ বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করিবার আমাদের কোন বিশেষ কারণ নাই।

দুইজন স্বাধীন লেখকের চিন্তাস্রোত, কল্পনা ও অনুভূতি একমার্গে ধাবিত হইবার উদাহরণ সাহিত্যজগতে বিরল নহে। আইভ্যানহো ও দুর্গেশ-নন্দিনী পাঠ হেতু যদি বঙ্গবিজেতার কোন কোন চরিত্র প্রথমোক্ত পুস্তক-দ্বয়ের তুল্যাবস্থাপন্ন চরিত্রগুলির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ছায়া পড়িয়া থাকে, তাহাতেও রমেশ বাবুর প্রতি দোষারোপ করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। তিনি বঙ্গবিজেতায় যে স্বতন্ত্র ঘটনা-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, সে গুলির উৎকর্ষ অপকর্ষের উপরই বঙ্গবিজেতার সুখ্যাতি অখ্যাতি প্রধানতঃ নির্ভর করে। যাহাহউক, সেই পুরাতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া মাননীয় গ্রন্থকারগণের কাহারও অপযশ-ঘোষণা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা সদৃশ-চরিত্রগুলির অনতিবিস্তৃতভাবে তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। ভবিষ্যতে নায়ক নায়িকা চরিত্রগুলির বিষয় উত্থাপন করিবার বাসনা রহিল। এবারকার আলোচ্য—

রেবেকা, আয়েষা ও বিমলা।

আইভ্যানহো উপন্যাসের রেবেকা, দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা এবং বঙ্গবিজেতার বিমলা তিনটী চরিত্রই এক উপাদানে গঠিত। সংসার-উপবনে সমজাতীয় বৃক্ষের তিনটী দুর্লভ কুসুম। ফুলের সহিত উপমা দিতে হইলে এই রমণী-ত্রয়ের নামে আমাদের দেশীয় বেল, যুঁথিকা, গোলাপ, মল্লিকার কথা মনে পড়ে না; বিদেশীয় কুসুমরাণী বৃহজ্জহরী চম্পকের (Magnolia Grandiflora) কথা মনে পড়ে। বেল, যুঁথিকা, গোলাপ, মল্লিকার স্নিগ্ধসুরভি কোমল-মাধুরী এই রমণীত্রয়ে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু যখন আমরা ইঁহাদের মোহিনী রূপমাধুরীর সহিত যৌবনদীপ্ত সমুন্নত বরবপুর কথা স্মরণ করি, যখন আমরা ইঁহাদের অতলগভীর প্রেম, করুণা, হৃদয়তার সহিত অদম্য তেজ, সহিষ্ণুতা ও মহান্ আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করি, তখন আমাদের মনে পূর্ণবিকশিত বৃহজ্জহরী চম্পকের অমল-ধবল কোমলে-কঠিন আয়ত দলগুলির কথা, সুদূরবিসারী মোহকর পরিমলের কথা মনে পড়ে। রমণী-সুলভ কোমলতার সহিত দুর্লভ শক্তি, সহিষ্ণুতা ও তেজের বিমিশ্রণই ইঁহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। ইঁহাদের প্রেম প্রাবিট্-সমাগমে স্রোতস্বিনীর কূলপ্লাবক শীতবক্ষ-সলিলরাশির ন্যায় বিশাল, গভীর ও বেগবান্, এবং ইঁহাদের সহিষ্ণুতা হিমগিরির ন্যায় উন্নত, অচল ও অটল।

গাছের সকল ফল সম-আয়তন, সমপরিপুষ্ট বা তুল্যরূপ নধর ও বিমল হয় না। এই রমণীত্রয়ের চরিত্রে সেইরূপ সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা সংক্ষেপে সেই তারতম্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইব।

যখন আমরা এই রমণীত্রয়ের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তখন তিনজনেই অনূঢ়া, রূপবতী, যুবতী; তিন জনেই অক্ষত-হৃদয়, তিন জনেই মাতৃহীনা; এবং তিন জনেরই পিতা ঐশ্বর্য্যবান্; কিন্তু সাধারণের চক্ষুতে ঘৃণার্হ। বিমলার পিতা সতীশচন্দ্র বিশ্বাসঘাতক, বন্ধুহন্তা ও পরস্বাপহারক; রেবেকার পিতা আইজাক (Isac) খৃষ্টীয়দিগের ঘৃণিত, অর্থলোলুপ ইহুদী (Jew); আয়েষার পিতা কৎলুখাঁ একজন কামাশক্ত অত্যাচারী নবাব। তিন জনেই পিতার পরমাদরভাগিনী। বিমলা ও রেবেকার পিতৃস্নেহ অসীম। বিমলা পিতার মঙ্গলের জন্য, পিতাকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য, পিতাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদা ব্যাকুলিতা এবং পিতার মৃত্যুতে তিনি জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন। রেবেকা পিতার অর্থপিপাসা দমন করিবার জন্য, পিতাকে অত্যাচারীর পীড়নহস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য, তাঁহাকে দুঃখে সাঁন্তনা এবং বিপদে সাহস দিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যগ্র। আয়েষার পিতা বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েন নাই, সুতরাং বিলাস-রত পিতাকে কোনরূপ অসাধারণভাবে স্নেহ দেখাইবার তিনি অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই; কিন্তু আয়েষার পিতৃস্নেহ অন্তঃসলিলা হইয়াও খরস্রোতা, কৎলুখাঁর তাহা অবিদিত ছিল না;—তাহার বিভীষিকাময় অপঘাত-মৃত্যু সময়ে আয়েষার নামই তাহাকে শান্তি দিয়াছিল।

তিন জনের প্রেমানুরাগ-সঞ্চারের সাদৃশ্যের মধ্যে প্রভেদ আছে। বিমলার হৃদয়ে প্রেমের উদ্ভব কেবলমাত্র রূপতৃষা হইতে, রেবেকার কৃতজ্ঞতা, বীরত্বানুরাগ ও করুণা হইতে এবং আয়েষার পরদুঃখ-কাতরতা হইতে। রেবেকা ও আয়েষার প্রণয়-সঞ্চারে রূপের প্রভাব ছিল না এরূপ নহে, কিন্তু রূপ আদি বা একমাত্র কারণ নহে। বিমলা মহেশ্বরের মন্দিরে অজ্ঞাতকুলশীল নিদ্রালস সুরেন্দ্রনাথের রূপ-বহ্নিতে পতঙ্গবৎ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথের সুপ্তিভঙ্গে উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইবামাত্র, বিমলা আপনার অটুট হৃদয়টী এককালীন হারাইলেন। এই "চোখের দেখা হঠাৎ প্রণয়" বর্ত্তমান কালের যুবতী-পরিণয় বিস্তারের সময় অস্বা-ভাবিক না ঠেকিলেও, বিমলার প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ ব্যাপারটী বঙ্গীয়-

শ্রোতার কর্ণে বড়ই বেসুরা লাগে। এই কটাক্ষ-বিনিময়ের পরদিন সেই দেবমন্দিরে যুবক-যুবতীর যখন পুনঃ সাক্ষাৎ হইল, তখন বিমলার" বিদ্যুদ্দাম-স্ফূরণ-চকিত" ঈক্ষণে প্রোৎসাহিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বিমলার সহিত বাক্যালাপ সংস্থাপন করিলেন। এবং কয়েকটী কথা আদান প্রদানের পর বিমলা যেমন শুনিলেন যে, সুরেন্দ্রের গন্তব্য স্থান মুঙ্গের, ও আকৃতি দেখিয়া অনুমান করিলেন যে, তিনি বীরপুরুষ, অমনি বিমলা তাঁহার পিতার রক্ষার জন্য সুরেন্দ্রকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিলেন। বিমলার পাপাত্মা পিতা সতীশচন্দ্র তখন পরের অনিষ্ট সাধন ও স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষে মুঙ্গেরে গমন করিয়াছিল এবং সেখানে তাহার বিপদ সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই অনুরোধে বিমলার পিতৃস্নেহ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু একজন অপরিচিত পুরুষকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলা অসঙ্গত অনুরোধের মত বোধ হয় এবং তাঁহার কটাক্ষপ্রভাব যে ব্যর্থ হয় নাই, বিমলার এই বিশ্বাসের কথা জানাইয়া দেয়। পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বিমলার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বিমলা আপনাকে "ভিখারিণী" পরিচয় দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটু বিমোহন হাস্য করিলেন যে, সুরেন্দ্র "অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন" ও প্রণয়-সম্ভাষণটা (Courtship) পরিপক্ক করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন।—

"ভিখারিণি! এবার বলুন দেখি, আপনার আবার ভিক্ষা কিসের? ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতেহি তৎ।"

অবশ্য বিমলা একথার সরল উত্তর প্রদান করেন নাই, কিন্তু তিনি আরক্ত গণ্ডে চঞ্চলচরণে এরূপ হাবভাবের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন যে, তাহাতে যদি সুরেন্দ্রনাথ বিমলার মনোভাব অবগত হইতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার চক্ষুচিকিৎসালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িত।

অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বিমলার পরপুরুষের সহিত প্রথম সাক্ষাতে এরূপ ব্যবহার পাশ্চাত্য কামদেবের (Cupid) অন্ধত্ব সপ্রমাণ করে বটে, কিন্তু ভারতীয় রতিদেবীর স্বভাবসুলভ লজ্জাটীরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করে।

রেবেকার প্রণয় বিমলার ন্যায় সহসা সমুদ্ভূত হয় নাই, সে প্রণয়ের ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে হইয়াছিল। এই প্রণয়-সঞ্চারের প্রথমস্তর

কৃতজ্ঞতা, দ্বিতীয় বীরত্ব পূজা, তৃতীয় করুণা; রূপ ও যৌবন হৃদয়ের এই ভাবগুলির সম্মিলন স্থাপন করে, এবং এই সম্মিলনের চরমোৎকর্ষ প্রেম। আইভ্যানহো, প্রথমতঃ একজন অর্থলুণ্ঠন-প্রয়াসী প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর (Brian de Bois-Guilbert) আক্রমণ হইতে রেবেকার পিতা বৃদ্ধ আইজাককে সতর্ক করেন, পরে বিপদসঙ্কুল পথে তাঁহার রক্ষণভার গ্রহণ করিয়া, প্রত্যক্ষ দর্শনের পূর্ব্বে পিতৃস্নেহ-পরায়ণা রেবেকার মনে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার করিয়াছিলেন। পরে অ্যাশবির দ্বন্দ্বযুদ্ধ (Tournament at Ashby) স্থলে আইভ্যানহোর সর্ব্বজয়ী বীরত্ব, বিক্রম ও সমর-নৈপুণ্য, অপরাপর গুণগ্রাহী দর্শকের ন্যায় রেবেকাকেও মুগ্ধ করে। তৎপরে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য আইভ্যানহোকে যখন অনুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া রেবেকা নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ করুণা *তাঁহাকে পীড়াকাতর দুর্ব্বল শয্যাশায়ী আইভ্যানহোর প্রতি* অধিকতর আকৃষ্ট করিল। পরিশেষে আইভ্যানহোর যৌবনোন্মেষিত রূপ-জ্যোতিঃ পীড়া-শয্যা-পার্শ্বে নিশিদিন নিভৃতে নিরীক্ষণ করিয়া রেবেকার হৃদয়ের পূর্ব্বভাব গুলি বিমিশ্রিত হইয়া প্রেমে পরিণত হইল। সে প্রেম গভীর অথচ অব্যক্ত।

আয়েষার হৃদয়েও অনুরাগের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগ দেখা গিয়াছিল। বিপন্নের প্রতি দয়া এবং পরদুঃখ-কাতরতাই এই পূর্ব্বরাগের প্রথম সোপান। অস্ত্রাঘাত-জনিত শোণিত-স্রাবে হতচেতন অবস্থায় বন্দী জগৎসিংহ আয়েষার পিতৃভবনে আনীত হইলে, নবাব-পুত্রী কেবলমাত্র করুণার বশবর্ত্তী হইয়া জগৎসিংহের শুশ্রূষাভার নিজ করে গ্রহণ করেন। পরে পীড়া-শয্যা-শায়িত রাজপুত্রের জীবন-মরণ-সংগ্রামে জীবন-আশা সংশয়-বিচলিত চিত্তে দিন দিন লক্ষ্য করিতে করিতে যুবরাজের পুরুষোত্তম দিব্য কান্তি আয়েষার হৃদয়-ফলকে ভুবনেয় বর্ণে চিত্রিত হইয়া যায়। আয়েষা জগৎসিংহের বিক্রমের কথা, তাঁহার উচ্চবংশের কথা সমস্তই অবগত হইয়া-ছিলেন, সুতরাং যুবরাজের রূপে আকৃষ্ট হইলেও আয়েষা, বিমলার ন্যায় কোন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির বাহ্যসৌন্দর্য্য দেখিয়াই চিত্তহারা হয়েন নাই। আয়েষার প্রেম রেবেকার ন্যায় তাঁহার হৃদয়েই লুক্কায়িত থাকিত; কিন্তু ওস্মানের শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তিতে তেজস্বিনীর হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগে, তাই কুক্ষণে তিনি একবার যুবরাজের সমক্ষে আত্মবিস্মৃতা হয়েন এবং

এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য আয়েষা পর-মুহূর্ত্ত হইতে আজীবন অনুতাপ করিয়াছিলেন।

রেবেকা, আয়েষা ও বিমলা তিন জনেরই প্রণয়-পাত্রের প্রাণমন এক একটী অন্য রমণীর নিকট পূর্ব্ব হইতে বিক্রীত ছিল; পরস্ব অপহরণ করিতে রমণীত্রয়ের কেহই প্রয়াস পান নাই। রেবেকার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই আইভ্যানহো লেডী রাওয়ানাকে ভালবাসেন, একথা তিনি অবগত হইয়াছিলেন এবং রেবেকা যে জাতি-সম্ভূতা, সেই ইহুদি জাতির ব্যক্তিমাত্রেই আইভ্যানহোর চক্ষুতে ঘৃণার্হ, একথাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। আইভ্যানহোর উপেক্ষা-দৃষ্টি রেবেকা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন; যখন রেবেকা ও রাওয়েনা উভয়েই তুল্যরূপ বিপদ-গ্রস্তা, একজন পরাক্রান্ত শত্রুর দুর্গে (Front de Boeuf castle) বন্দিনী, তখন রাওয়েনার বিপদের কথা ভাবিয়াই, রেবেকা উত্থান-শক্তি-রহিত আইভ্যানহোকে উদ্বিগ্ন ও ম্রিয়মান হইতে দেখিলেন, তাঁহার জীবন-দাত্রী শুশ্রূষা-কারিণী রেবেকার দুরবস্থার কথা একবার ভ্রমেও আইভ্যানহোর মুখে আসিল না। সুতরাং রেবেকার প্রেম প্রথম হইতেই নিরাশ, প্রথম হইতেই সে প্রেম প্রতিদানের অপ্রত্যাশী। এবং এ জগতে বিনিময়ের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই বুঝি রেবেকা সেই প্রেমকে অপার্থিব অমূল্য রত্ন জ্ঞানে, অতি যত্নে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সে রত্ন, জ্বালাময়ী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার মনোভূমি বিদগ্ধ—ছারখার করিতে লাগিল, তথাপি রেবেকা দুই হস্তে প্রাণপণে বুক চাপিয়া সে রত্নকে ধরিয়া রহিলেন,—ফেলিতে পারিলেন না।

আয়েষাও জানিতেন যে, তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্বকে পাইবার পথে অনন্ত পর্ব্বত দণ্ডায়মান; তিনি জানিতেন যে, যুবরাজ ইতিপূর্ব্বেই তিলোত্তমাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি যবনী, এবং জগৎসিংহ হিন্দু ও তাঁহার পিতৃ-বৈরী। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও আয়েষার প্রেম অদম্য বেগে শত মুখে জগৎসিংহের দিকে প্রধাবিত হইল। যে প্রেম বলে "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে", এ সেই প্রেম; রেবেকার প্রেমের ন্যায় এ প্রেমেরও দানেই শেষ। আয়েষা নিজেই জগৎসিংহকে লিখিয়াছিলেন "আমি যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট কিছু চাহিনা।"

আশায় নৈরাশ্য, প্রকৃত পক্ষে রেবেকা ও আয়েষা উভয়েরই হয় নাই, কারণ তাঁহাদের প্রণয় প্রথম হইতেই নিরাশ। বিমলার মনে প্রথমে মিলনাশা জাগরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই দুরাশা তাঁহার নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফল। বিমলা প্রণয়-পাত্রকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন, সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় অপরের অধিকৃত কি না একথা জ্ঞাত হইবার অবসর তিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। অজ্ঞাত-কুলশীল পরপুরুষকে অকস্মাৎ প্রাণ সমর্পণ করিলে নৈরাশ্যের বিশেষ সম্ভাবনা, একথা ভাবিবার প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হইলেও যে অষ্টাদশবর্ষীয়া বুদ্ধিমতী যুবতী বিমলা চিন্তা করেন নাই, এটী তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। প্রথমে মনে হইতে পারে বটে, যে, বিমলার হৃদয়ে আশা পোষিত হইবার একটী অনুকূল কারণ বিদ্যমান ছিল, যাহা আয়েষা বা রেবেকার পক্ষে প্রযুজ্য নহে। সেটী ধর্ম্ম ও জাতির মিলন—সুরেন্দ্রনাথের যজ্ঞোপবীত বিমলাকে জানাইয়া দিয়াছিল, যে, তিনি ব্রাহ্মণ—বিমলাও ব্রাহ্মণ-বংশীয়া। কিন্তু রেবেকা ও আয়েষার পক্ষে ধর্ম্ম বা জাতিগত প্রতিবন্ধক দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া জ্ঞান করিবার কোন বিশেষ কারণ ছিল না। খ্রীষ্টান ও ইহুদীর বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ নহে, এবং জগৎসিংহের পিতৃস্বসা আকবরসাহের পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। সুতরাং মিলনের বাধা রেবেকা, আয়েষা ও বিমলা তিন জনের পক্ষেই এক,—প্রণয়ে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব। বিমলা যখন অবগত হইলেন যে, সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে ভালবাসেন এবং সরলার বাগ্‌দত্ত স্বামী, তখন তাঁহার অন্তরে ঘোর নৈরাশ্য দেখা দিল। পরে তিনি যখন অবগত হইলেন যে, তাঁহার পিতা সরলার পিতৃহন্তা ও সর্ব্বস্বাপহারক, তখন বিমলা পিতার পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সরলার ভাবিস্বামিকে প্রাপ্ত হইবার আশা ত্যাগ করিলেন। গ্রন্থকার বিমলার এই ত্যাগ-স্বীকারকে অসাধারণ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কোন বস্তুর প্রাপ্তি হইলে বা প্রাপ্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার ত্যাগ হইতে পারে। কিন্তু বিমলা সুরেন্দ্রের প্রণয় প্রাপ্ত হয়েন নাই বা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনাও তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। সুরেন্দ্র যদি বিমলাকে চাহিতেন, তাহা হইলে সে প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিলে বিমলার ত্যাগ-স্বীকার হইতে পারিত। পরন্তু সুরেন্দ্র সরলাকে যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, সে ভালবাসা বিমলার সহস্র চেষ্টাতেও বিচলিত

হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং বিমলা যে পরের জন্য আত্মত্যাগ করিলেন, এ বিশ্বাস তাঁহার ভ্রান্ত-অন্তর-প্রসূত আকাশ-কুসুম মাত্র। বিমলা যে টুকু পাইয়াছিলেন,—সুরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার নিজের আসক্তি—আমরা দেখাইব যে তিনি তাহা জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিমলার প্রেম বেগবান্ এবং প্রাণস্পর্শী, কিন্তু সে প্রেম মিলন ও তৃপ্তি আশায় পরিপোষিত হইয়াছিল, সে প্রেম অসহিষ্ণু এবং সে প্রেম শেষ অবধি প্রতিদান-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল ছিল। অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা দমন করিবার জন্য বিমলা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, সুরেন্দ্রনাথও তাঁহার প্রণয়-প্রার্থী এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিমলা একবার মুখেও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন বটে "আপনি আমাকে জন্মের মত বিস্মৃত হউন। * * * বিধাতা আপনার প্রেমাকাঙ্খিনী সরলাকে সুখে রাখুন।" কিন্তু আমরা দেখাইব,—সুরেন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন, ইহা বিমলার আন্তরিক কথা নহে। দুঃখিনী বিমলা!

তিনটী রমণীর অপর এক এক জন অনভিলষিত পুরুষ প্রণয়াকাঙ্খী ও পাণিগ্রহণাভিলাষী হওয়াতে তাঁহাদের একনিষ্ঠা বা সতীধর্ম্ম পরীক্ষিত হইয়াছিল। বিমলাকে তাঁহার পিতার শনি—কু-পরামর্শদাতা ও শত্রু শকুনি বিবাহ করিবার জন্য উৎপীড়ন করিয়াছিল। শকুনি বিমলার প্রেম চাহে নাই; তাহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার পিতার ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রমের উত্তরাধিকারী হওয়াই শকুনির প্রধান ইচ্ছা। বিমলা নরাধম শকুনিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, এবং শকুনি স্তোকবাক্যে তাঁহাকে ভুলাইতে অকৃতকার্য্য হইয়া পাশব-বলপ্রয়োগের ভয় দেখাইলে, বিমলা নিজ বক্ষে ছুরিকা প্রবেশ করাইতে উদ্যতা হইয়া সে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

রেবেকার প্রণয়-প্রার্থী হইয়াছিল,—একজন প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়িক যোদ্ধা—নাইট্ টেম্পলার (Knight Templar—Brian de Bois Guilbert)। প্রথমে রূপ-মোহ, পরে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য টেম্পলারকে রেবেকার প্রতি আকৃষ্ট করে। বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা দেখিয়া বিমলার ন্যায় রেবেকাও সতেজে সুউচ্চ দুর্গশিখর হইতে আপনাকে পাতিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু রেবেকার সতীত্ব পরীক্ষা বিমলা হইতে কঠিনতর হইয়াছিল। টেম্পলার রেবেকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিল, বল পরিত্যাগ করিয়া কাতর মিনতি আরম্ভ করিয়াছিল। সে রেবেকার জন্য

আপনার বীরত্ব-গর্ব্ব, মানসম্ভ্রম, ধর্ম্ম সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে কোন বহুদূর দেশে যাইয়া উভয়ের পরিণয় সম্মিলনের ধর্ম্মগত বাধা (টেম্পলারদের অবিবাহিত থাকিতে হইত) অতিক্রম করিয়া রেবেকাকে প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য, অনন্তসুখ ও প্রেমের চিত্র দেখাইয়াছিল। এক সময়ে টেম্পলারের প্রেমগ্রহণই রেবেকার আসন্ন-মৃত্যু দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার অনন্যোপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এ সমস্ত প্রলোভন হৃদয়ে দলিত করিয়া, রেবেকা তাঁহার নিরাশ-প্রণয়ে একনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

আয়েষার প্রণয়-পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম। ওস্‌মান আয়েষার খুল্লতাত-পুত্র। আয়েষা ওস্‌মানকে সহোদরাধিক ভালবাসিত। এই ভগিনীস্নেহ আয়েষার অন্তরে শৈশবে অঙ্কুরিত এবং আজীবন পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ পিতার মৃত্যুর পর জগৎসিংহের প্রতি প্রণয় ব্যতীত এই ভগিনীস্নেহই আয়েষার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। ওস্‌মানের রূপ, যৌবন, সহৃদয়তা, বীরত্ব, সকলই ছিল, সে আয়েষার পিতার সিংহাসনে ন্যায়তঃ আরূঢ় হইয়াছিল, এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মমতে ওস্‌মানই আয়েষার পাণিগ্রহণে প্রকৃষ্টরূপে অধিকারী। তেজস্বিনী রমণীর পক্ষে পাশব বল বা ভয়ের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ, কিন্তু যখন বিষাদিত অন্তরে, সানুনয়-বিনয়ে, সজলনেত্রে, প্রণয়ের দীন ভিখারী বেশে ওস্‌মান আয়েষার হৃদয়দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন করুণাময়ীর কি কঠোর পরীক্ষা হইয়াছিল! একদিকে অনন্ত দুঃখ ও নৈরাশ্য, অন্যদিকে অপার প্রেমপূজা ও শান্তিসুখ। কিন্তু সতীরমণী দুঃখকেই প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া, শৈবাল-কণ্টকদাম-পরিবেষ্টিত নবাবান্তঃপুরের পঙ্কিল সলিলে প্রফুল্ল শতদল পদ্মের ন্যায় শোভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন।

রমণীসুলভ কোমলতা, নম্রতা এবং লজ্জাশীলতা, আমরা এই রমণীত্রয়ের মধ্যে হিন্দুনারী বিমলার নিকটই অধিকতর প্রত্যাশা করি; কিন্তু সে আশায় আমরা নিরাশ হইয়াছি। দেশ, কাল ও জাতির কথা স্মরণ রাখিলে আমরা দেখিতে পাই, রেবেকা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা। তিনি পুরুষের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরালে থাকিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী বীরদিগের পরস্পরের শোণিতপাতে ব্যথিত হইতেন। পরদুঃখ-কাতরতা, ধর্ম্মপ্রবণতা, সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

পরন্তু তিনি দুইবার পুরুষোচিত নির্ভীকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—একবার অমূল্য রত্ন সতীধর্ম্ম রক্ষার জন্য, আর একবার কুসংস্কারী নির্ম্মম টেম্প-লারদিগের অবিচার ও অধর্ম্মে মর্ম্মান্তিক উৎপীড়িত হইয়া। রেবেকার এই তেজ-প্রদর্শন তাঁহার স্বভাবের দীপ্তি উজ্জ্বলতর করিয়াছে, ম্লান করে নাই।

আর আয়েষা! আয়েষার সকলই কোমল, সকলই মধুর, সর্ব্বত্রই তাঁহার সহিষ্ণুতা ও করুণার অপূর্ব্ব বিকাশ। তাঁহার তেজ ও মনের বল আত্মদমনেই প্রকাশ পায়। একবার মাত্র তিনি প্রবল উত্তেজনায়, ওস্‌মানের শ্লেষবাক্যে আত্মবিস্মৃতা হইয়া তাঁহার অভ্যন্তরের তেজ বাহিরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মবিস্মৃতি ক্ষণিকের জন্য—পর-মুহূর্ত্তেই তাঁহার করুণ ও মধুর স্বভাব মেঘমুক্ত নব অরুণরাগের ন্যায় জগৎসিংহ ও ওস্‌মানকে বিমোহিত করিয়াছিল।

বিমলার সহিষ্ণুতা ও পরোপকার-স্পৃহা জাজ্জ্বল্যমান; কিন্তু তাঁহার নারীসুলভ কোমলতা ও বিনম্রস্বভাব তিনি সময়ে সময়ে অকারণে ভুলিয়া যাইতেন। তিনি শকুনিকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি যে নিজ বক্ষোপরি ছুরিকা স্থাপন করিয়াছিলেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই না; তাঁহার পুরুষ-বেশে বিপদ-সঙ্কুল সুদূর মুঙ্গেরে গমন ও দাসীবেশে দুর্বৃত্ত পাঠান-সেনা-নিবাসে অব-স্থান, হিন্দুকুল-নারীর পক্ষে অস্বাভাবিক বোধ হইলেও, তাঁহার উদ্দেশ্য পরো-পকার ইহা মনে করিয়া আমরা তাঁহার এই দুঃসাহসিক কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনা; কিন্তু, কারাবদ্ধ সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কথোপ-কথনটী স্মরণ করিলে, তাঁহার স্বভাবের কোমলত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশেষ রূপে সন্দিহান হই। বিমলার অনুরোধে, কারাগার হইতে নারীবেশ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে সুরেন্দ্রনাথ অস্বীকৃত হইলে, বিমলা নারীজাতির অবমাননা বোধে ক্রোধে আরক্ত-নয়না হইয়া সুরেন্দ্রকে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিলেন। নারীজাতির প্রতি কোনরূপ অসম্মান করা সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নয়, এবং কোমলতা-গুণে পুরুষগণ নারীজাতির নিকট চিরপরাজিত, সুরেন্দ্রনাথ এই-রূপ সান্ত্বনা-বাক্য বিনম্রভাবে বলিলে, বিমলা পুনরায় রোষে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং নারীজাতির সহিষ্ণুতা ও স্বকীয় নির্ভীকতা ও বীরত্ব সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ আত্মগরিমাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। বিমলার এইরূপ কথায় কথায় ক্রোধ ও আত্মগর্ব্ব, বড়ই কর্কশ বলিয়া বোধ হয়।

আহত অবস্থায় শুশ্রূষা করিয়া প্রণয়পাত্রের জীবন-রক্ষার উপায় স্বরূপ হইবার সুযোগ বিমলা, আয়েষা এবং রেবেকা প্রত্যেকেরই ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ বিষয়েও একটু প্রভেদ আছে। আয়েষা ও রেবেকা করুণার বশবর্ত্তী হইয়া এই শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রণয় তখনও তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। কিন্তু বিমলা যখন সুরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষা করেন, তখন তিনি সুরেন্দ্রকে ভালবাসেন, সুতরাং বিমলার পীড়িত-সেবা-কার্য্যে একটু স্বার্থের যোগ আছে। বিমলা একাধিক বার নিজ জীবনভয় ও নির্য্যাতন-ভয় উপেক্ষা করিয়া সুরেন্দ্রনাথের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ একবার বিমলাকে আসন্ন-মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে কারামুক্ত করিবার জন্যই বিমলার সে বিপদ ঘটিয়াছিল; আর বিমলা নিজেও সে পরিত্রাণ সুরেন্দ্রনাথের নিকট প্রার্থনা করেন নাই। প্রিয়তমের মঙ্গলের জন্য শারীরিক ক্লেশ ও নির্য্যাতন কি পরিমাণে মনুষ্যে সহ্য করিতে পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা বিমলা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি আয়েষা ও রেবেকা কাহারও নিকট পরাজিতা নহেন। আয়েষাও পিতার নিকট নির্য্যাতন-ভয় উপেক্ষা করিয়া জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। জগৎসিংহের নিকট তিনি কোনরূপ প্রত্যুপকার প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু রেবেকাকে একবার বাধ্য হইয়া আইভ্যানহোর নিকট প্রত্যুপকার প্রার্থনা করিতে হয়। রেবেকা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম আইভ্যানহোকে তাঁহার জন্য একবার জীবন-মরণ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় রেবেকার চরিত্রের নির্ম্মলতা-সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু রেবেকার এই কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে আমাদের মনে সে সন্দেহ স্থান পায় না। আইভ্যানহোকে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত না করিলে, কুসংস্কারী নির্দ্দয় টেম্পলারদিগের অধর্ম্ম-বিচারে রেবেকার জীয়ন্তে দগ্ধ হইয়া মৃত্যু হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মৃত্যুভয় রেবেকা তুচ্ছ করিত; যদি টেম্পলারগণ তাঁহার সতীনামে কলঙ্ক রোপণ না করিত, এবং যদি এই কলঙ্ক বা সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে রেবেকা কখনই আইভ্যানহোকে ব্র্যায়ান ডি গিলবার্টএর সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেন না। পরন্তু ধর্ম্মে অটল-বিশ্বাসিনী রেবেকার মনে ধর্ম্মের জয় সম্বন্ধে

কোন সন্দেহ ছিলনা। আইভ্যানহো যুদ্ধে নিশ্চিত জয়ী হইয়া ধর্ম্মের গৌরব যে অক্ষত রাখিবেন, এ বিশ্বাস ধর্ম্মপ্রাণা সতীসাধ্বীর মনে দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল। তথাপি যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যকালে, রেবেকার মন হইতে আপনার ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি আইভ্যানহোকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আইভ্যানহো সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

এক্ষণে এই রমণী-তিনটীর চরিত্রের শেষ চিত্রটী দেখাইলেই আমাদের বক্তব্যের শেষ হয়। সুরেন্দ্র ও সরলার যখন সুখ-সম্মিলন হইল, বিমলা সে চিত্র দেখিতে পারিলেন না। অনতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে বিমলা শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রিয়তমের চির-ঈপ্সিত মিলন-সুখের দিনে বিমলার নিজ প্রণয়-নৈরাশ্য এরূপ প্রবল আকার ধারণ করিল যে, তিনি সুরেন্দ্র ও সরলার বিবাহ-দিবসে মনের উৎকট উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল-চিত্ত (Hysterical) হইয়া আপনার ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটাইলেন। সুরেন্দ্রের নিকট আসন্ন-মৃত্যু-শয্যায় শায়িত বিমলার শেষ অনুরোধ—"আমাকে স্মরণ রাখিও।"

হায় বিমলা! তুমি শেষ রাখিতে পারিলে না! তোমার সহিষ্ণুতা আত্মদমন কোথায় গেল! তোমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা কেন প্রকাশ করিলে? তোমার নিজের অদৃষ্টে সুখ মিলিল না বলিয়া দয়িতের হৃদয়ে পরম সুখের দিনে বিষাদ-কালিমা ঢালিয়া দিলে! তোমার শেষ অনুরোধ যে নীতি-ধর্ম্ম-বিগর্হিত, একথা কি মনে হইল না?

রেবেকা ও আয়েষার শেষ ব্যবহারের সাদৃশ্য পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে এই সাদৃশ্যের মধ্যে একটী বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। আইভ্যানহো এবং রাওয়েনার বিবাহের দিবসদ্বয় পরে একদিন রেবেকা রাওয়েনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি-লেন। তিনি রাওয়েনাকে আপনার বহুমূল্য রত্নাভরণ অর্পণ করিলেন এবং রাওয়েনার স্নেহ-মমতা-কোমলতা-মাখান সুন্দর মুখখানি দেখিয়া আইভ্যানহো যে সুখী হইলেন, এই কথা ভাবিয়া নিজ দুঃখের মধ্যেও সুখ অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি নিজে যে অসুখী এবং ইহজীবনের সমস্ত সুখাশা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, একথা রাওয়েনার নিকট গোপন রাখিতে পারিলেন না। রেবেকা বিদায় গ্রহণ সময়ে বলিলেন যে, তিনি কোন বহুদূর দেশে চলিলেন, সেখানে দুঃখ-ব্রতধারিণী অপরাপর নারীগণের সহিত

তিনি পরহিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবেন। এ জীবনে ইংলণ্ডে আর ফিরিবেন না! যদি তাঁহার বিষয় আইভ্যানহো কখন জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে এই কথা জ্ঞাপন করিতে বলিয়া রেবেকা বাওয়েনার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

আয়েষা তিলোত্তমার নিকট বিদায় গ্রহণ সময়ে যে ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন, সে মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী চিত্রের তুলনা নাই। সে রাত্রিতে তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আয়েষা প্রাণেশ্বরের সুখচিন্তায় সেই শুভ সুখ-পরিণয়-উৎসবে, আপনার প্রাণের ব্যথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না, পরন্তু হাস্য-কৌতুক-প্রফুল্লতায় সকলকে উৎফুল্ল করিলেন। রেবেকার মত তিনিও আপনার রত্নালঙ্কারে তিলোত্তমাকে ভূষিতা করিয়া দিলেন এবং তিলোত্তমার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি দেখিয়া প্রীতমনে ভাবিয়াছিলেন, "এ সরল প্রেম-প্রতিম মুখখানি দেখিয়া ত বোধ হয়, প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না।" এবং বিধাতার নিকট নব-দম্পতিকে সুখে রাখিবার জন্য অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর একটী কায করিয়াছিলেন, যাহা—বিমলা দূরের কথা, রেবেকাও করিতে পারেন নাই। তিনি তিলোত্তমাকে অঙ্গীকার করাইয়াছিলেন যে, তিলোত্তমা কখন আয়েষার নাম পর্য্যন্ত জগৎসিংহের নিকটে উল্লেখ করিবেন না;—উদ্দেশ্য, পাছে আয়েষার স্মৃতি যুবরাজের মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিষণ্ণ করে। আয়েষা যে ইহজীবনের সুখদুঃখ জগদীশ্বরের পদে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তিনি এ জীবনে আর জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, একথা জগৎসিংহ পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন।

আয়েষা ও রেবেকার চরিত্র এত সুন্দর যে, উভয়ের মধ্যে তারতম্য করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আয়েষার চরিত্রই উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমাদের মনে হয়। যদি রেবেকাকে আদর্শ করিয়া আয়েষা ও বিমলার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আয়েষা-চরিত্রে আদর্শের উৎকর্ষ-সাধন হইয়াছে, বিমলার চরিত্র আদর্শের নিকটে পৌঁছিতে পারে নাই, অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

বিধির বিধান।

(গল্প)

"সুশীলাকে ভালবাসায় তোমার নৈতিক দোষের কথা বলিতেছি না; তাহাকে ভালবাসিলে পরিণামে উভয়কেই ক্লেশ সহিতে হইবে, সুখী হইতে পারিবে না, জীবন-ভার বহন করা দুর্ব্বিষহ হইবে। আর শৈলকে প্রতারণা করাই কি তোমার উচিত? সে তোমাকে কত ভালবাসে, তাহারই কি এই পুরস্কার?"

"দেখ ভাই, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি সব একে একে চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে ভবিষ্যতে যে আমায় যাতনা ভোগ করিতে হইবে না, এরূপ একবারও মনে করি নাই। তবে ভালবাসিলেই যে পরে একবারে জীবন অসুখের আকর হইবে, ইহা যে অভ্রান্ত সত্য, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ওটা মনে করা তোমার উপন্যাস-পাঠের ফল। আর শৈলের কথাও অনেক ভাবিয়াছি, সে ইহা জানিলেই তাহার কষ্ট, কিন্তু জানিবে কিরূপে? ধর্ম্মতঃ একটু পাপ আছে, তাহা আমি বুঝিতেছি; কিন্তু এখন আর হয় না, অনেকটা অগ্রসর হ'য়েছি।"

"দেখ, তুমি বড়ই ভুল করিতেছ, বোধ হয় সুশীলা তোমার হৃদয়ের অনেকটা অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। বলিলে—শৈল জানিবে কিরূপে; তুমিই মোহে অন্ধ হইয়াছ, কিন্তু তোমার শৈল অন্ধ হয় নাই। তোমাকে এতদূর হইতে ফিরান এখন কঠিন। তুমি কিনা বলিলে—আমার কথা গুলি উপন্যাস-পাঠের ফল। জেনো উপন্যাসও সত্য হয়। যাহা হউক, আমার কথা যদি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে কিছু দিনের জন্য এখান হইতে কলিতায় যাইয়া সুশীলাকে ভুলিতে চেষ্টা কর। আমার কথা আপাততঃ তীব্র বোধ হইলেও, পরে ইহার মধুরতা বুঝিতে পারিবে।"

"তুমি, দেখিতেছি, আমাকে একবারে বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথ, না হয় গোবিন্দলাল করিয়া তুলিলে। আমি কি শৈলকে ভালবাসি না? তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, সে এখানে আসিলে কি আর আমি সুশীলাকে

এ রকম ভালবাসিব? সুশীলার মুখখানি দেখিলে আমার কেমন বড় কষ্ট হয়, বালিকাকে একবারে নিরাশ করিতে ইচ্ছা হয় না। সে যতই সুন্দরী হউক, আমার শৈলের সহিত তুলনা হইতে পারে না। মনে ক'রোনা, আমি তার রূপে মুগ্ধ হইয়া অন্ধ হইয়াছি।"

সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব অল্পই আছে, অস্তগমনোন্মুখ ম্লান রবি-কিরণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া উচ্চ তরুরাজির শিরোভাগ উজ্জ্বল করিয়াছে। গ্রীষ্ম-কালের এই সময়টী অতীব মনোরম। চন্দননগরের যে অংশে ফরাসী সাহেবেরা বাস করিয়া থাকে, সে স্থানে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর কল কল তান ও স্বল্প কিরণোজ্জ্বল জীর্ণ পতাকার পত পত শব্দ শ্রবণ এবং স্থানে স্থানে পূর্ব্ব-গৌরবের ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করিয়া স্বতঃই যেন সেই প্রাচীন সময়ের ফরাসী-রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তি হৃদয়ে অস্ফুট ভাবে জাগরিত হয়। সমস্ত সহরের মধ্যে এই স্থানটী অতি রমণীয়, বায়ুসেবনের সম্পূর্ণ উপযোগী। শ্বেতকায়া ফরাসী-রমণীরা নানা বর্ণের মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাপার্শ্বস্থিত রাজ-পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মৃদু পাদ-বিক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। সাহেবেরা কেহ পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছে, কেহ বাইসিকেল চড়িয়া বেড়াইতেছে, আবার কোথাও বা রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক-গণ লম্বা লম্বা জামা পরিয়া বাঙ্গালী যুবকদিগের সহিত একত্র বসিয়া নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতেছে, রমণীগণকে সম্মুখে দেখিলে টুপি খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। সাহেবদের ছোট ছোট বালক-বালি-কারা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আবাব কোন স্থানে বাঙ্গালী যুবকগণ একত্র হইয়া হয়ত রবিবাবুকে সেলির সহিত তুলনা করিতেছে; কেহ অপরিস্ফুটতা-দোষের ব্যাখ্যা করিতেছে। আবার কোন সমালোচক উহাই রবিবাবুর গুণ, তাহাই বুঝাইতেছে। কোন যুবক তাহার আত্মীয়-বিরহ-জনিত দুঃখে কাতর হইয়া তৃণাচ্ছাদিত নদীতটে বসিয়া সেই বিষয় চিন্তা করিতেছে। আবার কেহ হয়ত গঙ্গা-সলিল-লম্বিত জেটির শেষভাগে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে, না হয় গান গাহিতেছে।

অনতিদূরে উচ্চচূড়-শোভিত, গথিক-কারুকার্য্য-বিশিষ্ট গির্জ্জা-সংলগ্ন "দুপ্লে পার্ক" নামক সুরম্য রাজকীয় উদ্যানটী যেন একখানি চিত্রপটের ন্যায় দেখাইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে প্রথমেই উদ্যানের লতা-

মণ্ডপগুলি অধিকার করিতেছে। দূর হইতে শ্বেতবর্ণের প্রস্তর-নির্ম্মিত উলঙ্গ ও অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ নারীমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যেন বোধ হইতেছে, তাহারা যামিনী আগত-প্রায় দেখিয়া উদ্যানস্থিত যুবকদিগের ভ্রূকুটিপূর্ণ কটাক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে বুঝিয়া তাহাদের সরল প্রপীড়িত নত মুখমণ্ডল চন্দ্র-দর্শনে-কুমুদিনী-সম প্রস্ফুটিত হইতেছে। প্রতিপদের চন্দ্র দুই দণ্ড পরেই উদিত হইল। উদ্যানের লোকেরা ক্রমে ক্রমে স্থান ত্যাগ করিয়া কেহ গৃহে গমন করিল, কেহ চন্দ্রালোকের মধুর হিল্লোলে সেই প্রশস্ত পথের পার্শ্বস্থিত ফুটপাথে বেড়াইতে লাগিল। কচিৎ কোন শ্বেতাঙ্গ যুবক তাহার অপরিণীতা প্রণয়িনীকে লইয়া বিরলে একখানি লৌহনির্ম্মিত বেঞ্চে বসিয়া, হাতে হাত রাখিয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, প্রেমালাপে মত্ত। বড় মধুর—বড় পবিত্র। বারদুয়ারীর দুরন্ত ঘড়িতে ক্রমে ৮টা বাজিল, উভয়ের অনিচ্ছা সত্বেও সেই সুখের ক্ষণ-মিলন আবার একদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইল। এখন সেই ভগীরথী-তীরের প্রাকৃতিক শোভা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইলেও মুখরিত অবস্থা অনেক কমিয়াছে; কেবল সেপাইদিগের অস্পষ্ট মালাবারি ভাষায় কথা-বার্ত্তা স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা দুই দশজন আছেন, তাঁহারা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র। এই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে যাহারা হৃদয়ের বন্ধুর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, গৃহে গমন করিতে হইবে ভাবিয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা সুখী। আর যাহারা বিগত জীবনের অস্ফুট সুখস্মৃতি মাত্র সম্বল লইয়া সুনীল আকাশের চারুচন্দ্রিমা দর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, আর তাহার শূন্য গৃহের বিভীষিকাময় ছবি সম্মুখে আসিয়া কিরূপে দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিবে, সেই চিন্তা আনয়ন করিয়া তাহাকে আকুল করিতেছে, সেই দুঃখী। হায়! প্রস্তর-নির্ম্মিত অপ্সরা-তুল্য রমণীর বাসনা পূর্ণ হইয়াও হয় না। এখনও সেই বিজন উদ্যানের একটি লতা-বিতানের নিম্নে বসিয়া দুইটী যুবক কথোপকথন করিতেছে। তাহারা আপন চিন্তাতেই মগ্ন, আপন হৃদয়ের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন, বাহ্যিক হাস্যময়ী প্রকৃতির কোমল সৌন্দর্য্য-উপভোগের সময় নাই। রাত্রি ৯টা বাজিল শুনিয়া তাহাদের চমক ভাঙ্গিল, উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মৃদু পদবিক্ষেপে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল।

এই দুইটী যুবকের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ একটি, অপরটির নাম মোহন।

(১)

অমিশ্র সুখ কাহারও ভাগ্যে কখন ঘটিয়া থাকে কি? বোধ হয়, কখন ঘটেনা। তবে হেমেন্দ্রনাথের ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কেন? চন্দ্রে কলঙ্ক, ভালবাসায় বিরহ, কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক আছে, তাহা কে না জানে; তবে কেন মানব কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ সুখের আকাঙ্ক্ষা রাখে? কোন পার্থিব সামগ্রী বোধ হয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জগতে মানবের অভিলষিত সামগ্রী কি? যদি পুরুষ হন—তবে ধন, বিদ্যা, মান আর প্রেমময়ী প্রিয়তমা পত্নী। আর যদি স্ত্রীলোক হন—তবে ধনীর গৃহিনী, রূপবতী আর চির-সধবা হইয়া পতির ভালবাসা প্রাপ্ত হওয়া। হেমেন্দ্রনাথের কোন অভাবই ছিলনা, শৈলের ন্যায় দেব-দুর্লভ পত্নী লাভ করা, সাধারণ লোকের অদৃষ্টে ঘটে না। পার্থিব সকল প্রকার সুখের অধিকারী হইয়াও তাহার মানসিক সুখের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দুঃখময় সংসারে যাঁহার সকল দুঃখের মধ্যে প্রিয়তমা ভার্য্যা বা তদভাবে কোন মনোমত বন্ধু থাকে, তবে তিনি অসুখী হইয়াও কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুখী। শৈল হেমেন্দ্রনাথকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, অসুস্থ দেহে আপন সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া স্বামী যাহাতে সুখী হইতে পারেন, সেই চিন্তায় সদা রত থাকিত। হেমেন্দ্র শৈলকে যে ভালবাসিত না, তাহা নহে। শৈলের যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে কখন বিস্মৃত হইত না। তাহার সামান্য পীড়া হইলেই চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইত, প্রয়োজন হইলে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও তাহার শুশ্রূষা করিত। তাহার সুখে সে সুখী হইত, দুঃখে দুঃখী হইত। ভালবাসার লোকের সহিত যেরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, হেমেন্দ্র সেইরূপেই করিত। আর তাহার ভালবাসা যে শুধু বাহ্যিক ছিল, তাহা নহে; বাস্তবিক সে তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত।

পাঠক, এইবার বিপদে পড়িলাম। বলিলাম "হেমেন্দ্রনাথ শৈলকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত।" যদি তাহাই হয়, তবে সে এত অসুখী কেন? আমাদের বিশ্বাস একব্যক্তি এক সময়ে দুই জনকে এক শ্রেণীর ভালবাসা সমভাবে বিতরণ করিতে পারে না। হেমেন্দ্র সুশীলাকে ভালবাসার কোন

বাহ্যিক নিদর্শন না দেখাইলেও তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিত; অথচ শৈলের প্রতি ভালবাসার বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রমাণ না পাইয়া কিরূপে বলি যে, সে তাহাকে ভালবাসিত না। অনেক সময় অনেক বিষয় বুঝিয়াও বুঝাইতে পারা যায় না, তাহা বুঝাইবার কথা ভাষায় আছে কি না জানিনা। গোলাপের সৌরভের সহিত যূথিকার সৌরভের পার্থক্য যেমন আঘ্রাণ দ্বারাই জানিতে পারা যায়, অন্য প্রকারে বুঝিতে পারা অসম্ভব, সেইরূপ শৈলের প্রতি ভালবাসার সহিত সুশীলার প্রতি ভালবাসার পার্থক্য বুঝান অসম্ভব। যিনি কখন হেমেন্দ্রনাথের মত অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তিনিই এই বিভিন্নতা বুঝিতে পারিবেন। কাননে শত শত কুসুম প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু সকলগুলির সেই মনোমোহকারী সৌরভ থাকে না। কত শত বীণায় তান ঝঙ্কারিত হইয়া স্বর-লহরী বাতাসে মিশাইয়া যায়, কিন্তু সকলগুলিরই চিত্তহারিণী মোহিনী শক্তিটুকু থাকে না। দিনে দিনে কত ভালবাসার দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে প্রেমের সুবর্ণ দীপ্তি সকলগুলিতে থাকে না! শৈলের সহিত ভালবাসাতে হেমেন্দ্র নাথের সেই আকর্ষণী শক্তিটুকু ছিল না, বীণার মোহিনী শক্তিটুকু ছিল না, কুসুমের মনোমোহকারী সৌরভটুকু ছিল না।

(২)

বাল্যকাল হইতে হেম প্রতিবাসী-কন্যা সুশীলাকে একটু যত্নের চক্ষে দেখিত; সুশীলা তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত মনে করিত। হেমেন্দ্রনাথের সেই যত্ন কালে ভালবাসায় পরিণত হইতে পারে, তাহা সে তখন বুঝিতে পারে নাই বা চিন্তা করিবার তখন সময় পায় নাই। তাহার পিতার চিকিৎসার্থে যখন প্রায় বৎসরেক কাল পরিবারের সকলে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিল, তখন হেমকে প্রায় একাই বাটীতে থাকিতে হইত। সেই বৎসর তাহাকে বি, এ পরীক্ষা দিতে হইবে; কলিকাতায় পাছে পড়ার কোন ব্যাঘাত হয়, ইহাই তাহার বাড়ীতে থাকিবার একটী অন্যতম কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন "অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে।"

এই সময় হইতেই সেই শৈশবের প্রোথিত বীজ ভালবাসারূপ মহান্ তরুর অঙ্কুররূপে দেখা দিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুশীলা বিধবা হইয়াও বৈধব্যযন্ত্রণা কিরূপ তাহা জানিত না। অতি শৈশবে তাহার বিবাহ হয় এবং অল্পদিন পরেই স্বামীর মৃত্যু হয়; সুতরাং স্বামী যে কি সামগ্রী, তাহা জানিবার আর সময় পায় নাই। নিশা অবসানে উষার প্রথম আলোকের ন্যায়, বয়সের সহিত ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে আনন্দ, প্রেম ও নবীন আশা সকল বিকশিত হইতে লাগিল। নবজাত কোমল লতিকা আশ্রয়-লাভের আশায় যেমন একটী আশ্রয়-তরু অন্বেষণ করে, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি সেইরূপ একটী আধারের অন্বেষণ করে। সুশীলা সেই কান্তমূর্ত্তি যুবক হেমেন্দ্রকেই আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অসীম ভালবাসা স্থাপন করিবার উপযুক্ত আধার বিবেচনা করিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল।

প্রথম প্রথম হেম যখন সুশীলার কথায়, তাহার সকরুণ চাহনিতে একটু নূতনত্ব লক্ষ্য করিল, তখন সে অনেক চিন্তা করিয়াছিল। তাহাকে ভালবাসায় পাপ আছে কি! তাহাকে তাহার স্ত্রীর নিকট বিশ্বাস-হন্ত্রী হইতে হইবে কি! ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া প্রথম মনে করিয়াছিল, সুশীলার সহিত যাহাতে আর অধিক সাক্ষাৎ না হয়, সেই চেষ্টা করিবে; কিন্তু এরূপ স্থলে যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইল। চিত্ত দমন করিতে পারিল না। শৈল জানিতে পারিলেই তাহার কষ্ট; কিন্তু সে জানিবে কিরূপে? অতএব ইহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সুশীলার অদৃষ্টাকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন থাকিলেও, আমার ক্ষমতা থাকিতে হতভাগিনীর নব আশা-কুসুম যদি কোরকে বিনষ্ট হইয়া হৃদয় চির মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাহাতে কি আমার সামান্য মাত্রায়ও পাপ নাই! এই নিষ্কলঙ্ক চাঁদ উঠিতে না উঠিতেই জলদে ঢাকিয়া ফেলিবে, ইহা কখনই বিধাতার অভিলষিত হইতে পারে না, ইত্যাদি অনেক প্রকার মানসিক তর্ক বিতর্কের পরে হেম ঠিক করিল,—সুশীলাকে শৈলের অজ্ঞাতে ভালবাসিলে কোন দোষ বা পাপ নাই।

এই সময় হইতে দুইটী হৃদয় একটি অদৃশ্য সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া ক্রমে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক মাস হেম শৈলকে পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পারিত, তাহাকে মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুইবারও দেখিতে যাইত; রজনীতে একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার কথা ভাবিত। সময়ে সময়ে সুশীলাকে ভালবাসার জন্য পাছে শৈলের প্রতি ভালবাসার হ্রাস হইয়া

পড়ে, সে চিন্তাও করিত। কিন্তু ক্রমে তাহার মনের গতি ফিরিতে লাগিল। হেম যে এই মনোভাব-পরিবর্ত্তন একবারেই বুঝিতে পারিতে-ছিলনা, তাহা নহে; সে বাস্তবিক এই সময় একবার সুশীলাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, প্রাণের শৈলকে পার্শ্বে রাখিয়া সে স্থান সুশীলার মূর্ত্তি অধিকার করিতেছে ভাবিয়া ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়াছিল। অশ্ব ও রশ্মির সাহায্যে রথের গতি ফিরান যায়, কিন্তু মনোরূপ রথের গতি কোনরূপে ফিরান যায় না।

শৈল কলিকাতায় থাকিতে যখন স্বামীর পত্রে, স্বামীর কথায়, স্বামীর প্রত্যেক ব্যবহারে, প্রত্যেক ভাবভঙ্গিতে প্রথম কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিল, তখন কিছু বুঝিতে পারিল না। এক আধবার সুশীলার কথা মনে হইলেও সরলাবালা সহজে সে চিন্তা মনে স্থান দিতে পারিল না। সপ্তাহ-অন্তর পত্রের স্থানে মাসের মধ্যে একখানি পত্র দানেও বিরত দেখিয়া মনে করিল, বোধ হয়, পরীক্ষা নিকট; সেই কারণে পত্র লিখিবার সময় পান না। ভারতের রমণী এই জন্যই এত উচ্চ।

হেমেন্দ্রনাথের পিতা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া সপরিবারে পুন-রায় বাটী আসিলেন। বাটীর অপর কেহ হেমের প্রফুল্ল আননে একটি অস্পষ্ট চিন্তারেখা না দেখিতে পাইলেও, শৈল তাহা দেখিয়াছিল। তাহার বোধ হইল, তাহার সন্দেহ মিথ্যা হয় নাই। হেম পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে যায়, শয়ন করে, কথা কয়, চেষ্টা করিয়াও অন্ততঃ প্রেমের কথা উত্থাপন করে, কিন্তু শৈল কি তাহাতে ভুলিতে পারে। নন্দন-কাননজাত পারিজাত কি কখন সৌরভহীন কিংশুক পুষ্পের সমতুল্য হইতে পারে। রমণীরা স্বামীর প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তিখানি অবলোকন করিয়া সংসারের সকল যাতনা ভুলিতে পারে, কিন্তু যথার্থ প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সহস্র-গুণ যত্ন পাইয়াও, একদণ্ড জীবন যাপন করা তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে। রমণী-দিগের ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ বোধ হয় আর নাই। শৈল দুই একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বামীর মুখ হইতে তাঁহার মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিল; এবং বুঝিয়াছিল যে, তাহাতে তিনি অন্তরে ব্যথিত হন। এই নিমিত্ত সে বিষয়ে আর কোন কথা কহিল না, নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিত।

এইরূপে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল, শৈলও শুকাইতে লাগিল।

(৩)

দুই বৎসর পূর্ব্বে হেমেন্দ্রনাথের সহিত যে ব্যক্তি আলাপ করিয়াছেন, এখন তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিলে নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, এখন আর সে হেম নাই। তাহার সকল বিষয়েরই অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; সকল কার্য্যেই শৈথিল্য, সকলেতেই যেন এক উদাস-ভাব, সকল কর্ত্তব্য-পালনেই অবহেলা। মনুষ্য ভালবাসায় অন্ধ হইয়া অনেক কর্ত্তব্য দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু হেমের তাহা নয়। শুধু যে শৈল শুকাইতে লাগিল, তাহা নয়, হেমের মনেও কোন সুখ ছিল না। তাহার সুন্দর অবয়বের সেই কমনীয় কান্তি ক্রমে মলিন হইয়াছে। আর সেই বিকচ-কুসুম-তুল্য বিধবা বালা সুশীলা, সেই কি সুখী ? সেও সুখী নয়। এখন আর সে বালিকা নয়। তাহার অদৃষ্টাকাশের অন্ধকার জলদমালার ভিতর লুক্কায়িত ! অনন্ত দুঃখের বিভীষিকা মূর্ত্তি সে এখন দেখিয়াছে ! বঙ্গ-বিধবা কি, তাহা বুঝিয়াছে ; আর বুঝিয়াছে,—তাহা হইতেই হেমের ও শৈলের সকল অসুখের উৎপত্তি। তাহার হৃদয়-মুকুরে এত শীঘ্রই যে ভবিষ্যৎ-দুঃখের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবে, সে বিষয়ের কোন কথা সে একবারও মনে করে নাই। নববসন্তাগমে-নবপল্লবের ন্যায় তাহার হৃদয়ে যখন নব প্রেম সঞ্চারিত হইয়া জগৎকে মাধুরীময় সুখের স্থান বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, সেই সময়ের সহিত তাহার বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিয়া এখন সে বুঝিয়াছিল যে, সকল সুখেরই একটা সীমা আছে।

পূর্ব্বের মত দিনের পর রাত্রি, আবার রাত্রির পর দিন, শীতের পর গ্রীষ্ম, আবার গ্রীষ্মের পর শীত, পূর্ণিমার পর অমানিশা, আবার অমানিশার পর পূর্ণিমা যাইতে লাগিল ; তেমনই বাগানে ফুল ফোটে, আকাশে চাঁদ উঠে, পাখিতে গান গায় ; তেমনই নববসন্তাগমের সহিত প্রাণীমাত্রেই হৃদয়ে শান্তি-বারি সেচন করে ; কিন্তু হেমের মনে শান্তি কোথায় ? শান্তি তাহার নিকট চিরবিদায় লইয়াছে। বোধ হয় এক্ষণে পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই, যাহাতে হেম শান্তি পাইতে পারে। মৃণ্ময়পাত্র একবার ভাঙ্গিলে আর যোড়া লাগে না।

চিকিৎসা-অভাবে পাংশু-আচ্ছাদিত-অগ্নিসম শৈলের দুরারোগ্য পীড়া নানা মানসিক ক্লেশে ও শারীরিক অযত্নে পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে ;

কিন্তু এবারে সে রোগের কথা কাহাকেও বলে নাই, তাহার এখন মৃত্যুই একমাত্র কামনার বস্তু। পূর্ব্বের মত সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল, কিন্তু অতি কষ্টে। জীর্ণ শরীর ক্রমেই জীর্ণ হইতে লাগিল। এ প্রকারে আর কত দিন থাকিতে পারে? শীঘ্রই তাহাকে শয্যাশায়িনী করিল। আর পীড়া লুক্কায়িত রহিল না। শৈলের পীড়ার বৃদ্ধির সহিত হেমের অন্তর হইতে সুশীলার প্রণয়াচ্ছাদিত যবনিকা অপসারিত হইয়া শৈলের প্রতি সেই প্রগাঢ় প্রেমের ছবি উদিত হইতে লাগিল। তাহার যথেষ্ট অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে।

শৈলের চিকিৎসা রীতিমতই হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই হইল না। হেম দিন রাত শৈলের পার্শ্বে থাকে, অবশ-দেহে তাহার শুশ্রূষা করে। শৈল সহস্র নিষেধ করিয়াও তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না। শৈল এখন যেমন সুখী, তেমনি দুঃখী। সে বুঝিয়াছে যে, হেমের ভালবাসা আবার ফিরিয়াছে, বা সেই পূর্ব্ব ভালবাসার উপর পতিত সেই মলিন আবরণ উন্মোচিত হইয়া বৃষ্টিবারি-বিধৌত গোলাপের ন্যায় অধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। তাই তাহার পুনরায় বাঁচিবার সাধ হইয়াছে। কিন্তু হায়! মানবের সকল সাধ পূর্ণ হয় না। যদি তাহা হইত, তবে এই পৃথিবীই স্বর্গ হইত। শৈলের দুঃখ হেমের জন্য; সে মরিলে হেম পাগল হইবে, এইজন্য আর হেমকে ছাড়িয়া যাইতেও তাহার প্রাণ চায় না। পুরুষের মন যতই পাষাণ হউক না কেন, রমণী-মন সুকোমল কুসুম-দলবৎ সদাই কোমল। আর যথার্থ ভালবাসার বন্ধন, যত ঘাতপ্রতিঘাত হউক না কেন, একবারে ছিন্ন হয় না।

শৈলের জীবনের দিন সংক্ষেপ হইতে লাগিল। সকলেই তাহার প্রাণের আশা ত্যাগ করিল, চিকিৎসকেরাও নিরাশ হইল। তাহারা বলিল "মৃত্যু নিশ্চয়। তবে কাশরোগ—বলা যায় না—দুই দিনেও হইতে পারে, আবার দুই মাসও থাকিতে পারে।"

সুশীলা ইদানীং শৈলের সহিত দেখা শুনা এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিল; কিন্তু শৈলের মৃত্যুকালে একবার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। শত কারণে প্রজ্বলিত তাহার হৃদয়ের অনলশিখা অতীত-সহচরী শৈলের কাছে কিয়ৎপরিমাণে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে ভাবিয়া, একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হইল। সে ভাবিতে লাগিল, শৈলদের বাটীতে এ পোড়ার মুখ কেমন করিয়া দেখাইবে!

হেম-সুশীলার গুপ্তপ্রণয় কেবলমাত্র দুই তিনজন ছাড়া আর কেহ জানিত না। কিন্তু পাপীর মন সদাই শঙ্কিত; তাহারা মনে করে, তাহাদের পাপ সকলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে। যাহা হউক, সুশীলা অবশেষে লজ্জার মাথা খাইয়া, মর্ম্মবেদনা সহ্য করিয়া, তাহার অন্তর্নিহিত অধিকতর বেদনার লাঘবাশায় বহু দিবস পরে বাল্যসখি শৈলকে দেখিতে গেল।

মানুষের মৃত্যুকালে বুঝি দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি প্রবল রিপুগণ আধিপত্য করিতে পারে না। শত্রু মিত্র বুঝি সকলেই সে সময় সমান হয়। না—না ভুলিয়াছি, শৈল যে দেবী, দেবী-হৃদয় চিরদিনই পবিত্র। সে হৃদয়ে দ্বেষ, হিংসা, পাপ কোন কালেই স্থান পায় না। আমরা পাপী, সেই কারণেই বুঝি সকলকেই আপন আপন আদর্শানুসারে গঠিত করিয়া লই। শৈল অতিশয় হর্ষ সহকারে সুশীলাকে পার্শ্বে বসিতে বলিল। সে আহ্লাদিত হইল, কিন্তু নয়নপ্রান্তে একবিন্দু জল পড়িল। আমরা কখন বলি জগৎ সুখের স্থান, আবার কখন বলি দুঃখের স্থান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়। যেমন লাল কাচের ভিতর দিয়া আলোক আসিলে লাল দেখায় এবং সেই আলোক নীল কাচের মধ্য দিয়া আসিলে নীল দেখায়; সেইরূপ আমরাও দুঃখের সময় সকলই দুঃখময়, আবার সুখের সময় সুখময় দেখি। শৈল বুঝিয়াছে যে, তাহার স্বামীর মন আবার ফিরিয়াছে। তাই এখন সে সুখী, জগৎকেও সুখের স্থান দেখিতেছে। পূর্ব্বকথা সব ভুলিয়াছে, তাই সে সুশীলাকে দেখিয়া সুখী হইল। শৈল সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও ধীরে ধীরে সুশীলাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসিল। সুশীলা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। তৎপরিবর্ত্তে কেবল কাঁদিল। শৈল সে কথা বিস্মৃত হইতে বলিল, কিন্তু সে কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারে! শৈল যদি তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলের নিকট কর্ণ লইয়া শুনিতে পারিত, তবে সে সব কথা শুনিতে পাইত; সে কেবল মুখেই প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে সুশীলা যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেল "শৈল! দেবতার জিনিস কি পাপীতে চুরি করিতে পারে? আমি বড় পাপী, আমায় দয়া ক'রে কি ক্ষমা ক'রবে?"

হেমের যাতনার উপর যাতনা, শৈল তাহারই জন্য মরিতে যাইতেছে। এ চিন্তায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সে আর সেই

ছিন্নমূল-শুষ্কলতিকাপ্রায় শৈলের নিকট অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহার বড় ইচ্ছা, কেবল তাহার পাপকথাগুলি বলিয়া তাহার নিকট ক্ষমা চায়, কিন্তু বলিবার সুবিধা পায় না। শৈলের সমক্ষে তাহার মুখে আর অন্য কথা বড় আসে না, কেবল বলে "শৈল আমার দশা কি হবে? আমায় কি ক্ষমা ক'রবে না?"

উপসংহার।

আজ শৈলের শেষ দিন। সকলের সহিত কথা কহিল, সুশীলাকে ডাকাইয়া তাহার সহিত কথা কহিল। অনেক দিন পরে আজ হেমেন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়িল—তিন বৎসর পূর্ব্বে সেই লতা-বিতানের নিম্নে বসিয়া মোহন বলিয়াছিল "উপন্যাসও সত্য হয়"—তাহাই আজ মনে হইল। তাহার জীবনটা যে স্বপ্নময় বা প্রহেলিকাময়, তাহা তাহার মনে হইল। আর সেই স্বপ্নের ঘোর আজ কাটিল। মোহনের কথা দৈববাণী বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল।

আজও আকাশে চাঁদ রহিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে কিরণ পৃথিবী হাসাইয়াছিল, আজও সেই কিরণ; সেই চাঁদ—তবে একটু মলিন! না—না, চাঁদ মলিন নয়; তাহার ক্ষমতা বুঝিয়াছি। কৈ আজ ত সেই মুখে শতগুণ জ্যোৎস্না ঢালিয়াও কিছু উজ্জ্বল করিতে পারিতেছে না। উজ্জ্বলকে উজ্জ্বলতর করিতে অনেকে পারে। হেম এক সময় যে মুখ শত শত চুম্বনেও পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই, আজ একবার মনের আবেগে সেই মুখ চুম্বন করিল। শৈল অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়াছিল, একবার হেমের দিকে চাহিল, কিছু বলিতে পারিল না। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় সুবর্ণপ্রদীপ আর একবার হাসিল, পর মুহূর্ত্তেই চিরদিনের জন্য নিবিল।

শৈল! এ পৃথিবী তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। আর তোমাকে পৃথিবীর কপটতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ম্লান করিতে পারিবে না। যাও তুমি সেই পবিত্রপুরে, পৃথিবীর দুষ্ট বায়ু তথায় পশিতে পারে না। আর নরাধম হেম! তুমি এই নরকরূপ সংসারে থাকিয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া জগতের উদাহরণস্থল হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাক। দেখিবে, মোহনের কথা ঠিক, শত শত উপন্যাস বাস্তবজীবনের অন্তর্ভূত। সুশীলা! তোমার জীবনের প্রথম অঙ্ক মাত্র অভিনীত হইল! দেখিলে ত কত বিষাদময়!

জানিবে—প্রত্যেক অঙ্কগুলিই এইরূপ বা ইহাপেক্ষা অধিক বিষাদে পূরিত। বিধবা বালা! সংসারের পথ অতীব পিচ্ছিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই পদস্খলন সম্ভব,—অতি সাবধানে চলিও। সহসা কাহাকেও অধিক বিশ্বাস করিও না। জানিও, শত হেমচন্দ্রও তোমায় সুখী করিতে পারিবে না। তোমাদের জীবনে যাহা ঘটিল, তাহা নূতন নয়। জানিবে ইহাই বিধির বিধান।——

শ্রীহরিহর শেঠ।

চীনের কথা।

১

জীবন শুধু ভাব্‌না আর সন্দেহ'তে ভরা,
যদিও মানুষ গুণে সবার বড়,
ছোট ছোট ছাতা মাথায় বেড়াই আমরা,
দীর্ঘ বেণীর করি আড়ম্বর।

২

আমরা পুঁতি বেদানা গাছ, করি ফলের চাষ,
বাগানেতে খেলি আপন মনে,
পালখ গাঁথা পাখা নিয়ে বসে খাই বাতাস,
আলাপ করি রঙ্গিণীর সনে।

৩

নানা রঙ্গের নানা ফুল আমরা তুলে আনি,
নৌকা নিয়ে মাছ ধর্‌তে যাই,
প্রাণটা কিন্তু আছে যথা মাটীর থালা খানি,
এই আছি এই নাই।

৪

বেড়িয়ে বেড়িয়ে গাছের তলে নিদাঘ কুঞ্জবনে,
নদীবুকে নৌকায় তুলে পাল,
সহসা যে চূর্ণ হ'ল দু'জন আঁকা চীনে,
ভাঙ্‌ল যেমন চীনে মাটীর থাল।

শ্রীরসময় লাহা।

ফুলের মুক্তি।

(প্রথম অংশ।)

ফুলজাতি অতি সামান্য সরল অবস্থা হইতে বিবর্ত্তন-প্রণালীতে জটিল উচ্চতর শ্রেণীতে উপস্থিত হয়—কালে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। পরিপূর্ণাবয়ব উদ্ভিদ্ মাত্রে এক সরল প্রকৃতি জৈবনিক হইতে উদ্ভূত। বিনা আবেগে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের আশ্রয়ে লালিত হইয়া সেই জৈবনিক উত্তরোত্তর উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু অনন্ত বিকার মধ্যে সেই জৈবনিক সদাই পরিচীয়মান। উন্নতি সীমাবদ্ধ; সীমান্তে বা বিবর্ত্তনের শেষ সোপানে আরূঢ় হইয়া জাতিবিশেষ জাতিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে; বিবর্ত্তনের শেষসীমায় পদার্পণ করিয়া সেই জাতি সংসার হইতে অপসৃত হয়,—সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। সুতরাং পূর্ণবিকাশেই মুক্তি।

জাতি-বিবর্ত্তন স্বীকার করিলে, জাতিগত ব্যক্তিগণের বিবর্ত্তনও বক্তব্য; কারণ ব্যক্তিসমষ্টির নাম জাতি। আমরা ফুলজাতির বিবর্ত্তন স্বীকার করি, সুতরাং ফুলমাত্রের বিবর্ত্তন ও পূর্ণবিকাশে মুক্তি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। ফুল বা উদ্ভিদ্ মাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু এককালজাত ফুল বা গাছ এককালে মুক্তিলাভ করে না। যেগুলির উন্নতি কোনও কারণ বশতঃ স্তম্ভিত হয়, প্রাকৃতিক অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলে, সেগুলি পূর্ণতা লাভ করে। অপূর্ণাবস্থ বৃক্ষের অঙ্গ কাটিয়া অন্য কলম প্রস্তুত করা যায় বটে, কিন্তু পূর্ণাবস্থায় নীত হইলে অর্থাৎ সমগ্র বৃক্ষটী দারুময় হইলে, নিতান্ত নীরস অসার হইয়া পড়ে। সে বৃক্ষের বীজ হইতে উদ্ভিদত্ব সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে। এ বৃক্ষের পুনর্জন্মের আশা নাই; ইহা জাতিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। পূর্ণাবস্থায় জাতিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ ও অপূর্ণাবস্থায় জাতিত্বে পুনরাবৃত্তির আবেগ দেখা যায়। সুতরাং একটী মুক্তাবস্থা, অপরটী বদ্ধাবস্থা।

উন্নতির উপযোগী প্রাকৃতিক সাহায্যের তারতম্যানুসারে বিবর্ত্তনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এবং প্রাকৃতিক সাহায্য কোনও কারণবশতঃ পরিবর্ত্তিত হইলে, জাতিগুণ পরিবর্ত্তিত হয়, এবং প্রাকৃতিক আশ্রয় কোনও অংশে হীনতর হইলে, জাতীয় অবনতি হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, উদ্যানবাসী উত্তমাঙ্গ পারাবতজাতিকে অনালোকিত অরণ্যে রাখিয়া দিলে, উক্ত জাতির সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ঘটনাটীকে "পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন" বলা যায়। এই প্রত্যাবর্ত্তনের মূল-কারণ—উন্নত অবস্থার উপযোগী দ্রব্যের অভাব। বিবর্ত্তন ও প্রত্যাবর্ত্তনেই সংসারচক্র ঘুরিতেছে—বিবর্ত্তনে মুক্তি, প্রত্যাবর্ত্তনে বন্ধন।

জীব সত্য, জীবদেহের মুক্তি ও বন্ধন সত্য—কিন্তু, আত্মা, আত্মার উন্নতি ও বিবর্ত্তন, অবনতি ও প্রত্যাবর্ত্তন, মুক্তি ও বন্ধন সত্য বা মিথ্যা? আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যে বস্তুর অস্তিত্বই প্রমাণ-সাপেক্ষ, সেই বস্তুর উন্নতি বা অবনতি কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। জীবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষপ্রমাণ, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে "আমিত্ব"ই প্রমাণ। আত্মাভিমান আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। কিন্তু আত্মার বিবর্ত্তন যদি সত্য ঘটনা হয়, তবে আত্মার বিবর্ত্তন কি জীব-বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে শাসিত হইয়া থাকে? এতৎ সম্বন্ধে দুটী প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়ে;—প্রথম, আত্মার বিবর্ত্তন সত্য কি না!—দ্বিতীয় যদি সত্য হয়, তাহা কি প্রণালী-মতে শাসিত হয়? কিন্তু এই প্রশ্নদ্বয়ের মীমাংসার পূর্ব্বেই আত্মা শব্দটী কি অর্থে ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমরা চলিত ভাষায় যাহাকে মন বলি, পাশ্চাত্য দর্শনে যে পদার্থকে (mind) বলিয়া অভিহিত করেন, বৈশেষিক দর্শন যাহাকে জীবাত্মা বলিয়া উদ্দেশ করেন, সেই পদার্থকেই আমরা আত্মা বলিতেছি। আত্মা ত্রিগুণাত্মক—বিজ্ঞান, বাসনা ও চিত্ত, (মুক্তিকোপনিষৎ) Congition, Volition, ও Emotion. এই ত্রিগুণাত্মক পদার্থকে মন না বলিয়া আত্মা বলাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ যাহা সুখাদি উপলব্ধির কারণ, তাহাই হিন্দুদর্শনে মন বলিয়া অভিহিত। মন ইন্দ্রিয়, কিন্তু আত্মা পদার্থ; সুতরাং উক্ত পদার্থটী আত্মা বলিয়া অভিহিত করা যাইতেছে।

প্রাকৃতিক তেজঃ-প্রভাবে পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া জৈবনিক অভি-নব গুণের আস্পদ হইয়া উঠে। মধুবিন্দু সদৃশ অঙ্গহীন জৈবনিক সর্ব্ব-

শরীরের সংকোচ ও বিকাশের দ্বারা খাদ্যাহরণ করিয়া থাকে; ইহাই তাহার প্রাণ-ধারণের একমাত্র উপায়। কিন্তু জীব-সোপানে উচ্চতর শ্রেণী-গুলি ক্রমশঃ অঙ্গবিশিষ্ট হইয়া উঠে ও তাহাদিগের অবয়ব ক্রমশঃ জটিল-তর হইতে থাকে; পরন্তু সেগুলি আদিম জৈবনিকের অবস্থা হইতে বিবর্ত্তিত, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই বিবর্ত্তনের বিশদ বিবরণ সময়া-ন্তরে সংকলন করিবার মানস রহিল। সরল হইতে জটিল, সমত্বিত্ব (১) হইতে ভিন্নত্বে (২) অগ্রসর হওয়াই বিবর্ত্তনের লক্ষণ।

জীবসম্বন্ধে জৈবনিকের অনুরূপ, অধ্যাত্ম সম্বন্ধে আত্মারও একটী সরল অবস্থা কল্পনা করা যায়; কিন্তু সে অবস্থা কোন্ প্রাণীতে দ্রষ্টব্য, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। বিজ্ঞান, চিত্ত এবং বাসনা বিষয়ক ক্রিয়াকলাপ অনু-সন্ধানে দেখা যায়, যে, মানব ও পশু চরিত্রের স্থূল প্রভেদ সত্ত্বেও সারাংশে উভয়ই সমগুণ-বিশিষ্ট। অনেক সময়ে মনুষ্য ও বানর জাতির কার্য্য প্রায় সমগুণাবলম্বী। বানরজাতি ও মনুষ্যজাতি উভয়েরই বিবেচনাশক্তি আছে, কিন্তু মনুষ্য যতদূর বিবেকী, বানর ততদূর নহে। বানর কদাচিৎ আত্ম-সংকার করে, এবং তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি তাহার জাতিত্বে সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বানরের গুণসমূহ, মনুষ্যে উন্নত ও পরিপুষ্ট আকারে বর্ত্তমান, এবং তদ্ব্যতীত মনুষ্যের অন্যান্য গুণ আছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের নাম বিবর্ত্তন; পশুচিত্তের বিবর্ত্তনে মানব-চিত্তের প্রকাশ। বানর অবস্থা জীবাত্মার বিবর্ত্তনের শেষ সীমা নহে। বানর অবস্থায় জীবা-ত্মার পূর্ণ বিকাশ হয় না, সুতরাং বানর অপেক্ষা উচ্চতর মনুষ্যাকারে জীবাত্মা উপনীত হয়েন। জীবাত্মার পূর্ণভাব পরমাত্মা। হিন্দুশাস্ত্রে বলিতে-ছেন, মনুষ্যরূপে জীবাত্মার পূর্ণতালাভ সম্ভব; পাশ্চাত্য-দর্শনানুসারে মনুষ্য-সৃষ্টির শেষ সোপান। কিন্তু নব্য দার্শনিক বলিতেছেন—স্বাভাবিক উন্নতির বশে জীবাত্মার পূর্ণ বিকাশের নাম যদি মুক্তি হয়, তবেই মুক্তি সত্য, —নচেৎ মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

(১) Homogeneity.

(২) Heterogeneity.

দীপ-শিখা।

দীপ-শিখা! মৃৎপাত্রে তৈল-সংযোগে প্রথম তোমায় দেখি। শিশুকালে ক্ষিপ্র-হস্তে তোমায় ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতাম; মনে হইত, তোমায় ধরিতে পারিলে না জানি কত সুখের উদয় হইবে। তখন তোমায় দেখিলে কত আনন্দ হইত, এখনও হয়; কিন্তু কখনও কি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তুমি কি? আমি নীরস বৈজ্ঞানিকশব্দে তোমার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহি না,—তাহাতে প্রাণে তৃপ্তি হয় না। যদি বল, "আমি অগ্নিদেব" তাহাতে আস্থা হয় না। যদি বল, "আমি স্বর্গীয় আলোককণা" তাহাতেও সম্যগ্‌রূপে তোমায় বুঝিতে পারি না। এই সকল উত্তরে কেমন করিয়া তৃপ্তি হইবে? অগ্নিদেব কি বস্তু, তাহা জানি না। স্বর্গীয় আলোকের উপলব্ধি করিতে পারি না। তবে এ নিরর্থক কথার অপব্যয় কেন? সোজা চ'খে দেখি, তুমি বড় সুন্দর। মৃত্তিকাময় ভগ্নগৃহে জীর্ণকন্থাশায়িত মুমূর্ষুর শীর্ণ মুখে, দারিদ্র্য-পীড়িত গৃহসজ্জার উপরে, তোমার আলোক পড়িয়াও সকলই সুন্দর দেখাইতেছিল। নগেন্দ্র মনে করিয়াছিল, কুন্দনন্দিনীর রূপালোকে এ সকল এত সুন্দর দেখাইতেছে, কিন্তু সেই রূপই যে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখায় আলোকিত হইয়াছিল। অর্দ্ধরাত্রিতে পৌরজনের সুষুপ্তি অবস্থায় নিভৃত প্রকোষ্ঠে রঘু ভূমিষ্ঠ হইলেন, ঘর রূপে আলোকিত হইল। সেখানে স্তিমিতপ্রদীপে তোমার শিখা ছিল বলিয়াই ত কবিবর্ণনা এত সুন্দর। সদ্যপ্রসূত সূর্য্যবংশোদ্ভবের ললামদেহ তোমার আলোকেই ত আলোকিত হইয়াছিল।

ধনীর ধনরত্নাদি-বিভূষিত সুরম্যহর্ম্ম্যে মণিময় দীপাধারে গন্ধ-তৈল-সংযোগে, ভক্তিপ্রাণ ভক্তের শক্তি-সম্মুখস্থিত রজতাধারে ঘৃতসংযোগে, অথবা দরিদ্রের দুঃখ-নিপীড়িত পর্ণকুটীরে মলিন মৃত্তিকাধারে কটুতৈল-সংযোগে, সকল স্থানেই আলোক সুন্দর। তুমি প্রখর হইলেও সুন্দর, উজ্জ্বল হইলেও সুন্দর, মলিন হইলেও সুন্দর। যে নিজে সুন্দর, সে সকল অবস্থাতেই নিকটস্থ যাবতীয় দ্রব্যকে সুন্দর করিয়া তুলে।

আমাদের প্রত্যেকের দেহের ভিতর—আমাদের বলি কেন—যাবতীয় সৃষ্ট জীবের ভিতর একটু একটু আলোকের কণা আছে। ইহাই আমাদের সৌন্দর্য্য। কেহ বলেন, বর্ণবিশেষের নাম সৌন্দর্য্য। যাহাতে সেই বর্ণ আছে, তাহা সুন্দর, আর যাহাতে সে বর্ণ নাই, তাহা সুন্দর নয়। কিন্তু একবার ফুলের প্রতি দেখ। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত,—ফুল নানা বর্ণের; কিন্তু প্রত্যেক ফুলই ত সুন্দর। তবে কেমন করিয়া বলিব—সৌন্দর্য্য বর্ণে? "এমনই শ্যামের চিকণ দেহা" "এ সুধা ছানিয়া কে বা ও সুধা গড়েছে" প্রভৃতি শুনিয়া কি মনে হয়—সৌন্দর্য্য বর্ণে? কেহ বলেন, আকার বিশেষের নাম সৌন্দর্য্য। তাহাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করি? ফুল নানা আকারের হইয়া থাকে, কিন্তু সকল ফুলই ত সুন্দর। তবে কি ফুলের সৌন্দর্য্য সৌরভে? অসম্ভব! অনেক ফুলের ত আদৌ সৌরভ নাই, কিন্তু তাহাও ত সুন্দর। Shakespeare একস্থানে বলিয়াছেন "The rose is fair, but fairer we deem it for that sweet odour which doth in it live." গোলাপের পক্ষে এ কথা বলা যাইলেও ফুল-সাধারণের পক্ষে এ কথা খাটে না। এখন বুঝা গেল,—সৌন্দর্য্য ভাবে। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যত কিছু আছে, সকলই ভাবের গুণে সুন্দর। সৌন্দর্য্য চক্ষুতে দেখা যায় না। সৌন্দর্য্য রূপে নাই,—সৌন্দর্য্য গুণে! সৌন্দর্য্য আকারে নাই, গঠনে নাই, বর্ণে নাই,—সৌন্দর্য্য ভাবে। আমাদের হৃদয়নিহিত আলোককণার প্রতিভা ভাবে বিকশিত হইয়া এত সুন্দর করিয়া তুলে। ইহার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সুকুমার শিশুর মুখে দেখিতে পাই। শিশু সেই আলোকে নিরানন্দময় সংসার-গৃহ সদাই আলোকিত করে। গিরিজায়াকে যখনই দেখি, তখনই সে সকলকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ইহা তাহার বালিকা-স্বভাব-সুলভ মধুরতার ভাব। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া আমাদের আর এক রকম সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয়; ইহার নাম পবিত্রতা। যখন শুনিলাম, "আবার বলি ওস্মান, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর" অমনি সৌন্দর্য্য বিদ্যুতের ন্যায় আমাদের শিরায় শিরায় খেলিয়া গেল। ইহার নাম নির্ভীকতা।

এই শেষোক্ত চরিত্রে আমরা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি বলিয়াই কি ভীরুতায় সৌন্দর্য্য নাই? তাহা হইলে কুন্দনন্দিনীকে এত ভাল লাগিত না। সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃকণা আছে বলিয়াই, এখনও মানবের প্রাণে

প্রাণে মিল হয়। তবে এত শত্রুতা কেন? এত জীবের প্রতি নিগ্রহ কেন? কারণ আলোককণার দোষ নহে;—দোষ আবরণের। অলোকের মলিন আবরণ দিলে ইহার বাহ্যিক বিকার ঘটে। হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ষড়রিপুর আবরণে আলোক সংকীর্ণ হইয়া যায়, নিষ্প্রভ দেখায়।

তুমি পরোপকারী। দীপশিখা! তুমি এ বিশাল বিশ্বে বায়ুবাত্যায় উৎপীড়িত ক্ষণভঙ্গুর ক্ষীণ জীবন ধারণ করিয়া কিসে বিশেষ উপকার সাধন করিতেছ, তাহা অনেকের পক্ষে হয় ত অজ্ঞাত। অনেকে সে উপকারের মর্ম্ম বুঝে না। তুমিও তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া নিজের কার্য্য সাধন করিতেছ, তাহাদের আদর অনাদরে তোমার দৃক্‌পাত নাই। এ সংসারে কয়জন লোক একটু প্রশংসার জন্য লালায়িত নয়? সংবাদ-পত্রে একটু সুখ্যাতি শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করে? নিশীথে চোর গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে দেখে ঘরে দীপ-শিখা। গৃহস্থের এমন উপকারী বন্ধু সজাগ থাকিতে কি তাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়? আবার তুমি বন্ধুর হস্তে থাকিয়াও শত্রুর পথ আলোকিত কর, এ স্বার্থপূর্ণ সংসারের কয়জন ইহা লক্ষ্য করে?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

কবিতা-কানন।

পূর্ব্বস্মৃতি।

ভুলে যাও ভালবাসা, প্রবল অসীম আশা,
হবেনা যাহাতে কভু সুফল উদয়।
মনোভাব হতে দাও মনেই বিলয়॥
কেন মিছে কর মন, অকারণে উচাটন,
যে জনে পাবে না তুমি জানিছ নিশ্চয়।
কেন বৃথা তার জন্য হৃদয়ে প্রলয়॥

শৈশবে শৈশব ভাব, সে ভাবে এবে অভাব,
তাই বুঝে কর তুমি একথা প্রত্যয়।
দুদিনের তরে কভু না হয় প্রণয়॥
লভিতে প্রণয় রত্ন, পেতে হয় বহু যত্ন,
না হয় প্রণয় কভু কথায় কথায়।
হৃদে যার জন্মে প্রেম সেই ক্লেশ পায়॥
কতদিন দুইজনে, বসিয়া সে একাসনে,
হৃদয়ের দ্বার খুলি কহিয়াছি কথা।
ভাবিনাই কভু মনে প্রণয় অযথা॥
পোড়া স্মৃতি জাগাইল, তাই পুনঃ মনে হ'ল,
অতীতের মর্ম্মভেদী কথা দুইচার।
দিওনা দিওনা ক্লেশ, দিওনা ঝঙ্কার॥

বিফল।

নিভেছে শ্মশান, আছে স্মৃতি শুধু,
"ধূ ধূ" করা পোড়া অন্তরে;
অন্তঃপ্রবাহিনী, ফল্গু নদী সম,
বালুকা-পূরিত প্রান্তরে।
চ'লে গেছে আশা, ভাঙ্গা বুকে সুধু,
প্রবেশি গভীর যাতনা;
ফুরায়েছে শেষ প্রীতি আলিঙ্গন,
হৃদয়ে র'য়েছে বেদনা।
বসন্ত গিয়েছে, আছে দুটী ফুল,
শুধু নিরজন কাননে;
ফুরায়েছে ফুল, মৃদু হাসি তবু,
ফুটিতেছে যেন আননে।

শৈশব গিয়েছে, আছে স্মৃতি তার,
এখনো এখনো হৃদয়ে;
বিষয় গিয়েছে, রহিয়াছে আ'জ,
ভগ্ন অট্টালিকা আলয়ে।
ডুবিয়াছে রবি, এখনো আলোক,
ফুটিতেছে যেন গগনে;
ফুরায়েছে গান, তবু প্রতিধ্বনি,
ঘুরিতেছে যেন বিজনে।
গিয়াছে প্রাণের প্রিয় সহচর,
মাঝে ঘিরিয়াছে মরণে!
ঝরে অশ্রুবারি, কেনরে তখনি,
কি ফল বিফল রোদনে॥

কবির কি ভুল ? *

প্রিয়-জন-সমাগমে
বসন্ত নিশায়,
অথবা জলদাগমে
ঘন বরষায়।
মিলন সুখ-শয়নে
হৃদয় শিহরে,
কোকিল যদি কাননে
বারেক কুহরে।
কোকিলের কুহুতান
অতীব মধুর ;
দূরে যায় লাজ মান
নবীন বধূর।
ব্যথিত মন্মথ-শরে
পরাণ আকুল।
কবির কল্পনা কিরে
আগা গোড়া ভুল ?
পুর্ণিমার নিশি শেষে
শরতের শশী,
নিদ্রিতা প্রেয়সী পাশে
দেখেছ কি বসি ?
আহা সে জোছনা রাশি
ধরা আলো করে !
কে বলে কলঙ্কী শশী
সুনীল অম্বরে ?
গোলাপের ডালে কাঁটা,
কলঙ্ক চাঁদের,
ছুঁইতে নিষেধ তথা
সৌন্দর্য্য-হীনের ;
কে না মুগ্ধ হয় হেরে
কলঙ্কী শশীরে ?
কবির কল্পনা কিরে
ভুল একবারে !
যুবতী গরব ভরে
গজেন্দ্র গমনে,
যায় যবে ধীরে ধীরে
প্রিয় দরশনে,
সে গজ-গমন হেরে
সবারি নয়ন,
অতৃপ্ত পিয়াসা-ভরে
ঝরেনা তখন !
কবির হৃদয়-জাত
এসব কল্পনা,
ভুল কিনা বুঝিনা ত
বিচার করনা।
এ জগতে উপমার
বিস্তৃত বাজারে,
কবিরা দোকানদার—
বেচিছে সবারে।
কবির উপমা বিনে
যত উপমেয়,
লোপ পাবে দিনে দিনে
নগণ্য সে হেয়।

শ্রীসরোজনাথ ঠাকুর।

---

* প্রয়াস, দ্বিতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯০০, কবির ভুলের উত্তর।

দধীচি।

চারিপাশে শিষ্যগণ বেদ পাঠে রত,
মহর্ষি দধীচি মধ্যে প্রশান্ত হৃদয়;
হেনকালে দেবরাজ সভয়, কম্পিত,
আশ্রমের দ্বারে আসি হইলা উদয়।
সম্ভাষি জিজ্ঞাসে মুনি স্বর্গের কুশল,
বর্ণিলা বাসব ধীরে বৃত্রের পীড়ন,
পরাভূত দেবগণ, উপায় কেবল—
"বজ্র অস্ত্র"—যাহে তাঁর অস্থি প্রয়োজন!
শিহরিলা শিষ্যগণ, কহিলা তাপস,—
"ধন্য আমি ধন্য মম এ তনু-ধারণ,
যাহার বর্জ্জনে হবে দেব-দুঃখ নাশ!
লহ অস্থি—এই দণ্ডে ত্যজিব জীবন।"
আত্মত্যাগ, ঋষি, তব মহান্—পবিত্র!
ভারতে চিত্রিত তব অদ্ভুত চরিত্র!!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নিরাশে।

কেন চেয়েছ সুশীলে! নিদাঘ সলিলে—
শুকায়ে সরসী-নীর।
ধু ধু করে রেণু, থামিয়াছে বেণু—
অধীরা হয়েছে থির।
(সেযে) আসিলে বরষা, তবুও হরষে,
মেলিবে না পোড়া আঁখি।

করিবে না আর, প্রমোদ ঝঙ্কার,
শুখান তরুতে পাখী।
(কত) নীরব আশায়, নীরব ভাষায়,
নীরব ধরার বুকে।
পেতেছিল তার, প্রীতি পারাবার,
চির-নীরবতা সুখে।

নীরবে শুনিতে, নীরবে স্মরিতে,
নীরবে জাগাতে প্রাণে।
শুনিবে নীরবে, প্রাণহরা রবে,
তাহারি নীরব তানে।
(সখি) পূত-কামনায়,কি প্রীতি আশায়,
সবল বাসনা সাথে;
প্রাণের হরষে, কি শুভ আশীষে,
ধরেছিনু তার মাথে।
কবির কল্পনা, চিত্ত-বিমোহিনী,
শতেক আশার ছবি।
প্রাণের লহরী, আবেশে শিহরি,
যেথা গিয়েছিল ডুবি।
যেথানে আমার, শতেক সাম্রাজ্য,
সহস্র প্রাণের খেলা।
যেথানে আমার, প্রণয়-উদ্যানে,
ফুটেছে চামেলি বেলা।
যেথানে আমার, সাধের কৈশোরে,
অস্ফুট প্রভাতি গীতি।
যেথানে আমার, প্রথম যৌবনে,
অদম্য প্রাণের প্রীতি।
যেথানে আমার সংসারের মোহে
বিধাতার অভিশাপ।
যেথানে আমার, বিশ্বের কুহকে,
দুর্ব্বলের পরিতাপ।

যেথানে আমার, অনন্ত বাৎসল্য,
ছড়াইয়া ছিল ছায়া।
মুছিয়াছে আজ, তার এক রেখা,
তারি সে মোহিনী মায়া।
ডাকেনাকো আর, কোকিল পাপিয়া,
পঞ্চমে ছাড়িয়া তান।
গাহেনা বীণায়, গাহেনা বীণায়,
পুরাণো সে প্রেমগান।
হতাশে আবেশে, শিথিল হ'য়েছে,
মলিন হৃদয়-ভার।
শুনিতে চেয়েছ, কি শুনিবে সখি!
সে যে নাই হেথা আর।
সবে কোলে দিলে, নিলে স্নেহে তুলে,
একবার ও মুখ চেয়ে।
নিরাশার স্রোতে, সেটুকুও আজ,
ফেলিয়াছি হারাইয়ে।
সৌন্দর্য্য-বিহীনা, "কবিতা-কুমারী",
পেয়েছিনু যারে কোলে।
না বলে না ক'য়ে, না চেয়ে আমারে,
সে গেছে কো'থায় চলে।
(তবে) বল প্রিয়সখি, আশাশূন্য রবে,
লইয়া ব্যথিত প্রাণ।
করিলেও তুমি, শত অনুরোধ,
কেমনে আসিবে গান?

সরসী।

বিবিধ।

কর্ত্তা। দেখ, তোমার নতুন ঝিকে তাড়াতে হ'বে।

গিন্নি। কেন?

কর্ত্তা। সে ঘোষেদের বাড়ী বলে'ছে যে, আমি ভারি বোকা আর স্ত্রৈণ।

গিন্নি। আ মর, বেটির কি আক্কেল! ঘরের কথা পরের কাছে ব'ল্‌তে যায় কেন?

* * *

স্ত্রী। (গভীর রাত্রিতে স্বামীর কাণে কাণে বলিল) "একবার উঠ দেখি, নীচে চোর এসেছে, দেখে এস।"

স্বামী। তুমিই যাও। কি জান, স্ত্রীলোকের গায়ে সে হাত তুল্‌তে সাহস ক'র্‌বে না।

প্রাণভরে আহার।—একজন কৃষক লণ্ডনে প্রথম পদার্পণ করিয়া পত্নীকে বলিল, দেখ, লণ্ডন কি চমৎকার জায়গা; ঐ দেখ ঐ হোটেলে লেখা র'য়েছে, "সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত একটাকায় আহার মিলিবে।" চল একটা টাকা খরচ ক'রে, ছঘন্টা প্রাণভ'রে খাইগে।

কাজির বিচার।—এক ব্যক্তির নিকট ৫ খানি ও অপর ব্যক্তির নিকট ৩ খানি পাঁউরুটি ছিল। উভয়ে খাইতে বসিতেছে, এমন সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া খাইতে চাহিল। তাহারা সম্মত হইলে তিনজনে সমান আহার করিল। যাইবার সময় তৃতীয় ব্যক্তি ৮ টা পয়সা দিয়া চলিয়া গেল। যাহার পাঁচখানি রুটি ছিল, সে পাঁচটি পয়সা লইয়া বাকি তিনটি পয়সা যাহার তিনখানি রুটি ছিল, তাহাকে দিতে চাহিল। সে সম্মত হইল না, অনেক বচসার পর উভয়ে কাজির নিকটে গেল। কাজি পাঁচখানি রুটির অধিকারীকে সাতটা পয়সা দিয়া বাকি একপয়সা মাত্র অপর ব্যক্তিকে দিল। এখন, কাজির এই বিচার ঠিক হইল কি না, বলুন দেখি?

উত্তর। ঠিক হইয়াছে, কেননা তিনজনে সমান খাইয়াছিল; অতএব এক একখানি রুটি তিনখণ্ডে ভাগ করিয়াছিল, ৫ × ৩ = ১৫ এবং ৩ × ৩ = ৯ এই সবশুদ্ধ ২৪ টুক্‌রা রুটি হইয়াছিল। প্রত্যেকে ৮ টুক্‌রা করিয়া খাইয়া ছিল। যাহার তিনখানি রুটি ছিল সে ৯ টুক্‌রার মধ্যে ৮ টুক্‌রা স্বয়ং খাইয়া ছিল, বাকি ১ টুক্‌রা মাত্র সে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়াছিল। কিন্তু যাহার সাতখানি রুটি ছিল, তাহাকে ১৫ টুক্‌রার মধ্যে ৭ টুক্‌রা তৃতীয় ব্যক্তিকে দিতে হইয়াছিল। অতএব সে-ই ৭ পয়সা, ও দ্বিতীয় ব্যক্তি ১ পয়সা পাইবার উপযুক্ত।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ]	বৈশাখ, ১৩০৮।	[৪র্থ সংখ্যা।

শিল্প-শিক্ষা।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি যে, পুরাতন শিল্পের উদ্ধার জন্য স্কুল করিবার কোন প্রয়োজন নাই; এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, যে কোন প্রকার শিল্প শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইবে, তথায় দুঃখী ও মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানেরাই শিক্ষা করিতে আসিবে। ইংরাজ-দিগের আগমনের পর সভ্যতা-বিস্তারের সহিত যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী ভদ্রলোকের সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। ঐ সমস্ত দ্রব্য-প্রস্তুত বিদ্যাও বিজ্ঞান সাপেক্ষ; সুতরাং সেইগুলি প্রস্তুত শিক্ষা করিতে ও তাহাদের ব্যবসায় করিতে ভদ্রলোকে অপমান বোধ করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত জন্য আমরা বিদেশে লোক পাঠাইবার কথা বলিয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সম্বন্ধে স্কুল, কলেজ স্থাপনের আদৌ আবশ্যক নাই, একথা

বলিনা ; অথবা তাহার সম্পূর্ণ বিপক্ষ বা বিরোধীও নহি। স্কুল সংস্থাপন করিতে হইলে কয়েকটী বিষয়-বিশেষ প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ইংলণ্ডে এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকর শিল্প-বিত্থালয় দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হইয়াছে কি না সন্দেহ। অনেক বড় বড় ইংরাজের ঐ সমুদয় বিত্থালয়ের প্রতি আস্থা নাই। এ দেশে যে কয়েকটী স্কুল সংস্থাপন হইয়াছে, তাহাদের ফলও তাদৃশ আশাপ্রদ নহে। আমাদের দেশের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন একটী বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য বৃথা অর্থ ও সময় নষ্ট করিবার এ উপযুক্ত সময় নহে। সেই জন্যই আমরা জাপান-বাসীদিগের প্রথানুযায়ী বিদেশে লোক পাঠাইবার কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি।

স্কুল স্থাপন করিতে হইলে আমাদিগের প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বঙ্গ দেশে, বম্বে ও মান্দ্রাজে শিল্প-শিক্ষা দিবার জন্য একই রকম বিত্থালয় স্থাপন করিলে চলিবে না। যে প্রদেশে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রস্তুত-উপযোগী-দ্রব্য (Raw materials) পাওয়া যায়, সেই প্রদেশে সেই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য বিত্থালয়-প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এমন কি, একই প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতির উপায় শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল করার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ সামান্য মূলধনে যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, এখন সেই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে স্কুল প্রতিষ্ঠা করাই উচিত। মধ্যবিত্ত লোকই ঐ সমুদয় বিত্থালয়ে শিক্ষা করিতে আসিবেন, তাঁহাদের মূলধনের বিশেষ অভাব। সুতরাং যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে অনেক মূলধনের প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে তাদৃশ কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি নিতান্তই এ দেশে শিল্প-বিত্থালয় স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কথা দুইটী স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ঐ প্রণালীদ্বয় অবলম্বন না করিলে দেশে অনর্থক নূতন নূতন শিল্পীদল প্রস্তুত করা হইবে মাত্র। আমরা সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ জাপানীদিগের প্রথানুযায়ী বিদেশে লোক পাঠাইয়া শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার কথা বলিয়াছি ও বলিতেছি।

বিদেশে লোক পাঠাইতে হইলেও একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যাঁহারা বিদেশে লোক পাঠাইবেন, তাঁহারা যে ব্যবসায় করিবার জন্য লোক পাঠাইবেন, সেই দ্রব্য প্রস্তুতির উপযোগী উপাদান (Raw materials) তাঁহাদের

প্রদেশে বা জেলায় আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান অগ্রে করিয়া, পশ্চাতে লোক পাঠাইবেন। তাহা না হইলে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে না। আজকাল আমাদের দেশের অনেকে জাপানে শিল্প শিখিবার জন্য লোক পাঠাইবার পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু সমস্ত দ্রব্য শিক্ষার জন্য জাপানে লোক পাঠাইতে স্বীকৃত নহি। যে দেশে যে ব্যবসার চরমোৎকর্ষ হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যবসায় শিক্ষার জন্য লোক পাঠান উচিত। জাপান নিজে এখন শিক্ষার্থী,—জাপান হইতে এখনও নূতন নূতন ব্যবসায় শিক্ষার জন্য য়ুরোপ বা আমেরিকায় প্রায়ই লোক প্রেরিত হইয়া থাকে; সুতরাং এরূপ স্থলে আমাদের জাপানে লোক না পাঠাইয়া য়ুরোপ বা আমেরিকায় লোক পাঠান সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রে বিশেষ উন্নতি করিয়াই য়ুরোপ ও আমেরিকা-বাসীগণ আমাদের অপেক্ষা শিল্প-সম্বন্ধে অশেষ উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমাদের দেশে দুই চারিটী দ্রব্য প্রস্তুত জন্য কার্য্যকর শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন না করিয়া, বরং দেশে যাহাতে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞান বিস্তৃতি-লাভ করে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা বিধেয়। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে প্রকৃত গভীর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে সমস্ত ভারতবাসীর সমবেত চেষ্টা করা উচিত। আর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া প্রত্যেক ছাত্র অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও ঐ বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন, তাহারও পন্থা করা উচিত। বিখ্যাত পার্শি-বণিক টাটা সাহেবের প্রস্তাবিত (Research Institute) বিদ্যালয় যাহাতে এ দেশে সংস্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে ভারতবাসীমাত্রেই প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত। টাটা সাহেব এই বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য স্বয়ং ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে দেশে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলের মহা উৎসাহ; কিন্তু যে দিন অধ্যাপক রামজে বলিলেন যে, ঐ প্রকার বিদ্যালয় স্থাপনে ঐ টাকা যথেষ্ট নহে, আরও অনেক টাকা হইলে তবে ঐ রূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারা যাইবে, সেই দিন হইতে দেশে যে আর সে উৎসাহ নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। এ দেশের জাতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমবেত হইয়া কি প্রয়োজনীয় বাকি টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম নহেন? যাহারা

দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, গণ্য মান্য, যাঁহারা দেশের অগ্রণী বলিয়া পরিচয় দেন, যাঁহারা দেশের যাবতীয় উন্নতিকর কার্য্যের প্রতিভূ স্বরূপ, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি বলিতে চান? তাঁহাদের কি এ সময় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত? কেবল মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণ সমীপে আন্দোলন আলোচনা করিলেই কি যথেষ্ট হইল? য়ুরোপীয় নূতন নূতন শিল্পের মূল ভিত্তি যে পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্র, তাহারই উন্নতি কল্পে ভারতের সুসন্তান টাটা সাহেব ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিতে উদ্যত! আর তোমরা তাহার সৎ-মহতী-ইচ্ছা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সকলে সমবেত হইয়া তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছ না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! সকলে গভর্ণমেণ্টের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে; গভর্ণমেণ্ট কি বলেন এবং সাহায্য করেন কি না, দেখিতেছে। কেন,—আমরা কি সামান্য সামান্য করিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি না? ইহা সংগ্রহ করা কি সম্পূর্ণ অসম্ভব? একজন অনায়াসে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে সমর্থ, আর দেশের সমুদয় লোকের সমবেত চেষ্টায় বাকি টাকা সংগৃহীত হইবে না! কি লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা, কলঙ্কের কথা! আমাদের বিশ্বাস, এখনও দেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এক একজন একাই বক্রী দান করিয়া ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর অশেষ কল্যাণ-বিধান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিতে পারেন; কিন্তু জানিনা, এরূপ সদনুষ্ঠানে তাঁহাদের মতিগতি হইবে কি না। যদি টাটা সাহেবের প্রস্তাবিত বিদ্যা-লয়-সংস্থাপন কোন প্রকারে স্থগিত হয়, তাহা হইলে ভারতের এবং ভারতবাসীবর্গের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এরূপ উন্নতিকর কার্য্যের প্রতিবন্ধক সমুপস্থিত হইলে ভারতবর্ষ আবার পঞ্চাশ কি একশত বৎসর উন্নতির পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে। তখন তুমি, "যে তিমিরে আবার সেই তিমিরে।"

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্জ্জনার মাঠে।

—— ০:+:০ ——

(গল্প।)

হুদে, মধো, গয়া সন্ধ্যাব একটু আগে কর্জ্জনাব খালের কাছে ওৎ পেতে থাক্‌বে! কাল-বৈশাখী, পশ্চিমে মাঝে মাঝে একটু ঝিকি মিকি বিদ্যুৎ দেখা দিচ্চে। মেঘ উঠ্‌লেও উঠ্‌তে পাবে। তিন খুড়ো-ভাই-পোয় ভাব্‌চে। গয়া খুড়ো,—হুদে ও মধো ভাইপো। তিন জনে ভাবিতেছে,—কর্জ্জনার খাল—হেতা হ'তে ক্রোশ দুই,—মাঠে তেমন আশ্রয় নাই। যদি ঝড় বৃষ্টি হয়, তা'হ'লেই বা কর্জ্জনার মাঠে গিয়ে কি লাভ? পথিকেরা ত মেঘ দেখে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোথাও না কোথাও আশ্রয় নেবে। কিন্তু বৈশাখ মাসটায় বে—থা নানা হ্যাঙ্গাম আছে, আর দুকুর বেলায় লোক না চ'লে প্রায়ই বিকালে চল্‌তে আবম্ভ করে। মেঘত তেমন উঠে নি। দুই এক জন কি কর্জ্জনা পেরিয়ে যাবে না? মধো বলিল, "চল্‌না হুদে দেখা যাক্‌।" গয়া বলিল,—'নারে বুঝিসনি, কাল বৈশিখীর মরশুম হ'চ্চে ভোরে। শেষ জোচ্ছনা আছে, লোক সেই সময়ে চল্‌বে। মেঘখানার গতিক ভাল নয়, কি জানি মাঠের মাঝখানে যদি শীল পড়ে, তা'হলে মারা যেতে হবে।" হুদে আর মধোর নেহাৎ মন যে, যায়, কিন্তু গয়া কিছুতেই রাজি নয়। ব'ল্লে—"ঐ দেখ্‌ হুদে, মেঘখানা চড়াই হ'ল!" সত্যই একখান কালো মেঘ উঠ্‌ছে, বুকে আতস-বাজীর মত বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, খুব গরম,—হাওয়া প্রায়ই চল্‌ছে না। গয়া এবার জোর করে বল্‌লে "নারে, আর যাওয়ায় কাজ নেই,—ভোর বেলায় দেখা যাবে।" কালোর তুফান তুলে মেঘখানা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে নিবিড় কালো মেঘ হু হু ক'রে উঠে আধখানা আকাশ ঘেরাও ক'র্‌লে। মেঘের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, যেন মেঘের গায়ে সরু তলওয়ারের চোট মার্‌ছে। কখনও সাপের চাবুকের মত লাল বিদ্যুৎ হিল্‌ বিল্‌ ক'রে বেঁকে চুরে উঠে যাচ্চে। কালো মেঘ, যেন মেঘের গাদা মুখে ল'য়ে ঠেলে আস্‌ছে। এমন সময় শুক্‌না পাতা জড়ান ধূলাব বড় বড় থাম

ঘুরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া শোঁ শোঁ ডাক্‌তে লাগ্‌ল। হৃদে মধো হু'জনে বল্‌তে লাগ্‌ল "খুড়ো! যা বলেছ, এখনকার কাজ নয়।" বল্‌তে বল্‌তে একটী লোক যেন সেই ধূলার স্তম্ভ ভেদ ক'রে হঠাৎ বাহির হ'ল। লোকটীর চাদর ধূলায় উড়াচ্চে, লোকটীকে চক্ষু চাহিতে দিচ্চে না। ধূলার চোটে হাওয়ার চোটে শশব্যস্ত হ'য়ে, আগন্তুক বল্‌তে লাগ্‌ল,—"বাবা, আজ রাত্‌টে একটু স্থান দাও; নইলে বাবা, আজ বামুনের-ছেলে মাঠে প'ড়ে মারা যাব।" গয়া জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"কে আপনি?" আগন্তুক বল্‌লে, "দাঁড়াও বাবা, বসি। উঃ! ধূলোয় ওলট-পালট খাইয়ে দেছে, টিকির ভেতর পাঁচ সের ধূলো সেঁদিয়েছে।" এই ব'লে একটা বিচিলির গাদার আড়ালে, ঝড়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাবার জন্য দাঁড়াল। ঝড় শোঁ শোঁ ক'রে ধূলা উড়িয়ে চল্‌চে, হু'চারটে খড়ের আঁটিও ওলট্ পাল্‌ট্ ক'রে ফেলে দিচ্চে। গয়া সর্দ্দার আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আপনি কে?" আগন্তুক হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল,--"আমি ব্রাহ্মণ,—কন্যাদায়গ্রস্ত। পাঁচ শিষ্য বাড়ী ঘুরে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে ল'য়ে এলেম। কোন রকমে পণের টাকাটা সংগ্রহ হ'য়েছে। কুলীনের ছেলে, কোন রকমে বাপ-পিতামহের কুল রক্ষা করা। আর আমাদের হ'তে তো বাপ-পিতামহের নাম ডুব্‌তে বসেছে। তবে পৈতৃক ভিটেতে মায়া ক'রে র'য়েছি, পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে ধানটা খড়টা নিয়ে কৃষাণ গরু খাইয়ে এক রকম ক'রে চল্‌তিছি। পোণের টাকাই না হয় যোগাড় হ'য়েছে, এক মড়াই ধান বেচ্‌তেই হবে।" গয়া সর্দ্দারের কথার উত্তর যত হোক না হোক, ব্রাহ্মণ আপনিই ব'কে যেতে লাগ্‌ল। এ দিকে হাওয়ার চোটে মেঘটা ছাক্‌রা ছাক্‌রা হ'য়ে গেল। পশ্চিমে মেঘের গোড়া ফাঁক হ'ল, হাওয়ায় মেঘ বস্‌তে দিলেনা,—বৃষ্টি হবার আর সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণ দেখে বল্‌লে,—"বোধ হয়, বৃষ্টি হ'বার আর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বাবা! সন্ধ্যার সময়টা আজ আর পথ চল্‌বো না। এই রোদে দশ ক্রোশ পথ চ'লে এসেছি। বিশেষ তোমাদেরও কর্জ্জনার খালটা বড় খারাপ শুন্‌তে পাই। যদি দাওয়ায় একটু স্থান দাও, রাতটা এখানে পড়ে থাকি, ভোরের বেলা তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে যাই।" গয়া সর্দ্দার কথা শুনিয়া গদ গদ হ'য়ে উঠ্‌ল। হৃদে মধো চোক ঠারাঠারি ক'রে ইসারা কর্‌তে লাগ্‌ল। গয়া সর্দ্দার বল্লে "আপনি ঠাকুর! থাক্‌বেন, তা আব কি।"

দাওয়ার উপর খড় বিছিয়ে দিল। ছোট ভাইপোকে ডেকে বল্‌লে, "হৃদে! ঠাকুরকে পা ধোবার জল এনে দে।" জিজ্ঞাসা কর্‌লে 'কেমন ঠাকুর! তুমি রসুই ক'র্‌বে তো? আমরা সদ্গোপ।' ব্রাহ্মণ কহিল, "হাঁ বাপু, তা'হ'লে বড় ভাল হয়। দুপুর বেলা ভিজিয়ে খেয়েছি, এ বেলা দুটী ভাতে ভাত হ'লেই সুবিধা হয়।" গয়া বল্‌লে "তা আপনি রসুইবাস করুন, আমরা সব জোগাড় ক'রে দিচ্চি। ওরে মধো! ঠাকুরকে তামাক খাওয়া।" মধো চকমকি ঠুকে খড়ের লুটী ধরিয়ে, আমপাড়া কলকেতে দা কাটা তামাক সাজিয়া দিল। ব্রাহ্মণ খড়ের আটির উপর ব'সে, দেওয়াল ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে হাতে তামাক টান্‌তে লাগ্‌লো, আর কাস্‌তে লাগ্‌লো।

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবর্ণ, যেমন ঢেঙ্গা তেম্‌নি পাত্‌লা। আলকাতরা-মাখান তলতা বাঁশের মত হাত। পা দুটী ছড়াইয়া দিয়েছে, যেন দুটী লাটী। নাকটা টিকোলো, চোক দুটী কোটরে। "তারা তারা" ব'লে হাই তুলতে বোধ হ'ল, যে, কচি ছেলের মাথার মত একটী গরাস বদনে অনায়াসে প্রবেশ কল্লে। ঠাকুর বল্‌লেন্ বটে, যে, দুপুর বেলা ভিজিয়ে খেয়েছেন; কিন্তু যেরূপ আঁতে কত্তালে পেট প'ড়েছে, তা'তে বোধ হয়, যে তিন বৎসরের মধ্যে উদরে কিছু প্রবেশ করে নাই। উদর নিশ্বাসেব সহিত একটু লড়িয়া লড়িয়া বলচে—আজ গয়া সর্দ্দারের সর্ব্বনাশ ক'রে যাব।

এদিকে মেঘ বেশ কেটে গেল। ব্রাহ্মণ বল্লে "পুষ্করিণীতে গিয়াই গাটা ধুয়ে আসি, ধূলোয় নেয়ে গিয়েছি।" ব্রাহ্মণ গা ধুইতে গেল। গয়া বল্লে, "হৃদে, তুই মাঠে একটা খানা খুড়ে আয়,—যে ফাড়িদারের হ্যাঙ্গাম। মাঠে ঘাটে লাস প'ড়ে থাক্‌লে, আমাদেরই ধরে চালান দেবে। মেঘখানা উঠে বড় যোগাড় হ'য়ে গেলরে। বামুন, খেয়ে দেয়ে ঘুমুলে, কাজ সাফাই ক'রে, রাতারাতি পুতে রেখে আস্‌বো। বামুনের সঙ্গে মাল আছে। একশো স'শো টাকা হবে। যে দিনে মা জোটায়, ঘরে বসেই জোটায়! বামুনের রসুইবাস করবার জোগাড় ক'রে দে। আর একটু মদ নে আয়, একটু আমোদ ক'রে খাই। এই সেদো ডোমের দুটো হেলে গরু আছে। তার বাকাল আমায় ব'লেছে, খুব মজপুত গরু। মধো, আজ বরাৎ খুলে গিয়েছে।"

এই সকল পরামর্শ হৃদের স্ত্রী ভূতী শুন্‌তে পে'ল। ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন পৌছে, তখন হৃদের স্ত্রী জল নিয়ে বাটীতে আস্‌তেছিল। ব্রাহ্মণের

চেহারা দেখে, তা'র বাপ হীরে ডোমকে মনে প'ড়ল। পাঠক! মনে করতে পারেন—গয়াতো সদ্গোপ পরিচয় দিল, তবে ডোমের সঙ্গে তাহার কুটুম্বিতা কিরূপ? গয়া জাতিতে ডোম; এ টুকু আর বোঝেন নাই, সদ্গোপ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। হৃদের স্ত্রী পরামর্শ শুনলে। ব্রাহ্মণের মূর্ত্তির সহিত তার বাপের মূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখে, তার মনে একটু দয়া হ'ল।

ব্রাহ্মণ গা হাত পা ধুয়ে ফিরে এলো। এদিকে মধো বড় বড় মাটী দিয়া উনান ক'রে দিল। মোটা মোটা লাল চাউল, এক মুটো কড়াইয়ের ডাল, একটু তেল, একটু নুন, একটা পাতে ক'রে সিদা দিয়াছে। ব্রাহ্মণের খুব ফূর্ত্তি। মোটা মোটা রাঙ্গা রাঙ্গা চাউল প্রায় সের খানিক দিয়েছে, ব্রাহ্মণের এক রকম রাতটা কেটে যাবে। ব্রাহ্মণের নাম কৃষ্ণকিশোর মুকুজ্যে, গ্রামে বগাম্বর ব'লে ডাক নাম। ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করলে, গৃহস্থের আর সৎকর্ম্মে বড় রুচি থাকে না। তবে মোটা মোটা বোগড়া চাল রাতটে কাটিবে! ব্রাহ্মণ ফূর্ত্তি ক'রে খড়ের আঁটি চেপে বসল। অতিথি-সেবায় গৃহস্থের ভক্তি দেখিয়া একটু ঘি, যদি ঘরের গাই-য়ের একটু দুদ থাকে, একটু ভিড়ে গুড়, এই সকলের তদ্বির করিবার ব্রাহ্মণ চেষ্টা পে'ল। ব্রাহ্মণ চীৎকার ক'রে বলতে লাগলো, "ওগো যদি ঘরের গাইয়ের দুদ থাকে, একটু দিয়ে যেও। একটু ছিটে ফোটা নইলে আহার হবে না! আধ ছটাক খানেক ভিড়ে গুড় দিও, শেষটা একটু মিষ্টিমুখ না ক'রলে জল খেতে পারবো না।" ব্রাহ্মণের যেমন আবদার, গয়া সর্দ্দারেরও সেইরূপ অতিথি-সেবায় রুচি। হৃদে মধো কাজে গিয়েছে। গয়া সর্দ্দার ভূতি বউকে ফরমাস ক'চ্চে, বলিল "দেখ ভূতি, ছটাক খানেক গোয়ের দুদ নিয়ে চুন গুলে খানিক জল ঢেলে দিগে যা। ব্যাটা দুদ খাবে, খানিক রাত্রে মায়ের দুদ বেরিয়ে প'ড়বে।" ব্রাহ্মণ চীৎকার ক'রে বল্লে—"ওহে একটু দুদ পাঠালে?" গয়া সর্দ্দার বল্লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই নিয়ে যাচ্চে।" "আর দ্যাখ তোর কড়ি খানিক নারকেল তেল সেদিন যে বাপের বাড়ী হ'তে এনেছিলি, একটু রেখে আসিস্।" ব্রাহ্মণ চীৎকার ক'রে বলচে, "ওহে কিছু গুড় পাঠিও।" গয়া চীৎকার ক'রে উত্তর দিল, "যে আজ্ঞে।" ভূতিকে বল্লে, "গোবরে একটু গুড় মাখিয়ে রেখে আসিস্। ব্যাটা এখনি গোবর নাদবে, তা জানে না, গুড় খাবে!"

হুদে মধো মদ নিয়ে এলো। মুড়ির চাট নিয়ে মদ খাওয়া সুরু করলে। এদিকে ভূতি-বউয়ের প্রাণ ধড়ফড় কচ্চে। এই বগাসুর ব্রাহ্মণকে দেখে ভূতির পিতার মূর্ত্তি মনে পড়ায় ভূতি অস্থির হ'য়েছে। অন্ধকার রাত্রিতে সামনে অন্ধকারাবৃত মাঠ,—যেন অন্ধকারের বন্যা এসে মাঠ আচ্ছাদন ক'রেছে। কেবল ব্রাহ্মণের উনানের আলো একটু ছড়িয়ে প'ড়ে, ভূতদানার ন্যায় দুই একটা ছায়া ফেলেছে। কাঁচা কাঠ, মাঝে মাঝে আলেয়ার আলো মত, উনানের আগুণ নিবে যাচ্চে। ব্রাহ্মণ চীৎকার ক'চ্চে, "কিহে, কাঁচা তাল-বাক্‌রা গুলো কেন দিয়েছ?"

ব্রাহ্মণের চীৎকার সর্দ্দারের কাণে গেল না। সর্দ্দারের একটু নেসা হ'য়েছে। নেসার ঝোঁকে ব্রাহ্মণের টাকায় জমী জমা গোরু হাল খরিদ করবে, এই সকল ভাব্‌ছে। হুদে মধোও ভাব্‌ছে, যে, মাঠের মাঝখানে খানাটা মস্ত খুঁড়েছে, সেই খানায় ব্রাহ্মণের সহিত খুড়োকে চাপা দিলে চল্‌বে। জমীজারাৎ হাল গোরু এ সব তো হবেই, খুড়োতো মাঠে মাটী চাপা থাকুক। এখন হুদে আগে মর্‌বে, কি মধো আগে মর্‌বে! ব্রাহ্মণ প্রায় দেড় শো টাকা শিষ্যির বাড়ী হতে আদায় ক'রেছে। মধো ভাব্‌ছে, হুদে মর্‌বার নয়, হুদে ভাবছে মধো মর্‌বার নয়। তিন খুড়ো ভাইপোয়ে মেজাজে আছে; এ দিকে ভূতি ব্রাহ্মণের কাছে উঁকি মারচে। উনানের ক্ষীণ আলোকে, ভূতিকে প্রথমে দেখে ব্রাহ্মণের পেত্নী ব'লেই অনুভব হ'ল। ভূতির কালো রঙের উপর অন্ধকারে সাদা দাঁত দেখ'লে, পেত্নীমা ব'লে অনেকেরই তটস্থ হ'বার সম্ভাবনা। তারপর যখন একটু লজ্জার সহিত ভূতি একটু নাকি সুরে বল্‌লে,—"বামুন, দেখছিস্‌ কি, গেলি!" তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাব্‌লে,—এ বাড়ীতে উপদেবতা আছে। ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত। উপদেবতা ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌লো "কোথায় অতিথ হ'য়েছিস জানিস? এরা ডাকাত। এখন ব'সে মদ খাচ্চে। যখন শুবি—এই তালপাতার চ্যাটাখানা তোকে শুতে দিয়েছে, এই নে। যখন শুবি, সেই শোওয়ায় একদম কাঁধে চ'ড়ে মাঠের গর্ত্তের ভিতর শুবি। বেশ মস্ত খানা,—বেশ হাত পা ছড়িয়ে ঘুমুতে পারবি। এরা কি সদ্গোপ? এরা ডোম। কর্জ্জনার মাঠে মানুষ মারতে যাচ্ছিল, মেঘ দেখে যায় নাই। ঘরে এসে তুই জুটেছিস।" ব্রাহ্মণ সভয়ে ব'লে উঠল, মা মা! তবে কি কর্ব্বো? "কি করবি তা আমি জানি না। এ গ্রামে প্রায় পোদ, ডোম,

চাঁড়ালেরই বাড়ী। পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি নিয়ে এসেছিস, যদি কিছু না থাক্‌তো, তবু কাপড়ের জন্য প্রাণ যেত। এ এম্‌নি দুরন্ত গ্রাম। কোথাও যদি পালাতে পারিস, দেখ। এখানে তোর ভালাই নাই।" ব্রাহ্মণ পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি ল'য়ে উঠলো। কিন্তু নিবিড় অন্ধকার,—উঠে যেতেই সাম্‌নে একটা গোবরের গাদা ছিল, তাতে প'ড়ে গেল। উঠে দু'পা গিয়া ঝড়ে খড়ের আটি প'ড়েছে, তাতে পা বাধিয়া প'ড়ে গেল! নিবিড় অন্ধকার—যেন ঘন অন্ধকারে আকাশ ঢাকছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু বিদ্যুৎ খেল্‌ছে না। এবার একটা কাঠের গুঁড়িতে টক্কর খেয়ে ব্রাহ্মণ প'ড়েছে। বড়ই ব্যথা পেয়েছে। ব্রাহ্মণ পালাবার সঙ্কল্প এক প্রকার ত্যাগ ক'র্‌ল। যা হবার হবে, নিশ্বাস ফেলে ব্রাহ্মণ সেই তালের গুঁড়ি ঠেস দিয়া হাঁপ ছাড়তে লাগলো।

এমন সময় অদূরে সঙ্গীত-ধ্বনি,—"মা আমায় ঘুবাবি কত, যেন চোকবাঁধা বলদের মত।" ব্রাহ্মণ দেখিল—হাতে একটা লণ্ঠন, গাইতে গাইতে একটা লোক আস্‌তেছে। গায়ক কৃষ্ণকিশোরের নিকটে এসে (বলিয়াছি, ব্রাহ্মণের নাম কৃষ্ণকিশোর) বললে,—"বড় যে আমিরি দেখছি! তালের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে এখানে ধুঁকচো কেন?" উত্তর প্রতীক্ষা না ক'রেই গান ধর্‌লে,—"শ্যামা মা উড়াচ্চ ঘুড়ী—"

কৃষ্ণকিশোর একজন লোক দেখে আশ্বস্ত হ'ল। চেষ্টা ক'রে গান থামিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত গায়ককে জানা'ল। এই ভীষণ বৃত্তান্ত শুনিয়া গায়ক ফূর্ত্তি ক'রে পুনরায় গান ধর্‌লে,—"লক্ষ ঘুঁড়ি একটা কাটে হেসে দাও মা হাত চাবড়ে।" গান শেষ হ'লে গায়ক কৃষ্ণকিশোরকে বল্‌লে, "বেড়ে সিদে পেয়েছিস তো, এখানে প'ড়ে র'য়েছিস কেন? চল, দুটী খেয়ে নেওয়া যাক্‌।"

কৃষ্ণকিশোর বুঝলে—নিশ্চয় এ পাগল। কিন্তু পাগল ছাড়বার নয়। কৃষ্ণকিশোরের হাত ধ'রে টেনে তুল্‌লে। কৃষ্ণকিশোর ভেবেছিল—অন্ধকারে পলান অসম্ভব। যাই হ'ক, একটা গাট্টা গোট্টা সঙ্গী হ'ল। ও যা বলে তাই করি, প্রাণ তো যাবেই। কৃষ্ণকিশোর যেতে যেতে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"আপনার নাম?" গায়ক উত্তর কর্‌লে,—"ব্যোম বাবা সদাশিব,—গাঁজা কোটো টিপ টিপ।—আমার নাম সদাশিব গাঙ্গুলী।—শিব শম্ভু সদাশিব।—তোর যমের ভয় নাই। ভয় কি? চলে আয়,—দুটী

রেঁধে সদাশিবের ভোগ দে।” কৃষ্ণকিশোর সদাশিবের দুর্দ্দান্ত সাহস দেখে কতকটা আশ্চর্য্য হ’ল, আবার ভয়ও পেতে লাগলো। ভাবলে —লোকটা গাঁজাখোর দেখছি ; গাঁজার ঝোঁকে কি বলচে, বুঝতে পার্‌ছি না।

গাঙ্গুলী গান ধ’রেছে, “দেমা আমায় তপিলদারী।” ব্রাহ্মণ সুকণ্ঠ বটে,—ভয়শূন্য হৃদয়! কৃষ্ণকিশোরকে টেনে নিয়ে দস্যুদিগের দাওয়ায় উপস্থিত হ’ল। বললে,—“নে ভাত চড়া।” কৃষ্ণকিশোর ভাবলে,—এম্‌নেও গিয়েছি, অম্‌নেও গিয়েছি,—দি, দুটী ভাত চড়িয়ে।

গাঙ্গুলী গাঁজা সেজে “ব্যোম কেদার” ব’লে দম চড়িয়ে কৃষ্ণকিশোরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—“কেমনরে প্রসাদ পাস ?” কৃষ্ণকিশোর বললে,—“না মহাশয়!” গাঙ্গুলী বল্‌লে—“তাইরে ব্যাটা, তৈয়ারী অন্ন ছেড়ে যাচ্ছিলি! যদি এক টান গাঁজা খেতিস,—লক্ষ্মী ছাড়তো—ভয় পেতিস না। যে ব্যাটা লক্ষ্মীমন্ত সেই ব্যাটারই ভয়। গাঁজাখোরের কিছু ভয় নাই, বাবা, গাঁজাখোর লক্ষ্মীছাড়া।” কৃষ্ণকিশোর ভাবলে,—সত্য, পোনের টাকা সঙ্গে রেখেই এই বিপদে প’ড়েছি। তালপাতার ঠোঙ্গায় নারকেল তেল ছিল, যা ঘি ব’লে রেখে গিয়েছে,—গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা কর্‌লে, “কিরে ?” ব্রাহ্মণ বলিল, “ঘি।” সদাশিব শুঁকিয়া বলিল “দূর ব্যাটা নার্‌কেল তেল। থাক্ ব্যাটা ডাকাতের বাচ্ছা, তোরে তেল মাখিয়ে আমি ছেড়ে দিচ্চি।” দুধ দেখিয়া গাঁজাখোরের ইচ্ছা হ’য়েছিল, একটু খাই—কৃষ্ণকিশোর থাক্ আর না থাক্, তাহার কিছু ক্ষতি নাই ; কিন্তু দুধ দেখে বুঝলে চুনগোলা! কৃষ্ণকিশোরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, “তোর আফিংএর ধাৎ বুঝি,—একটু দুধ চেয়েছিলি ? তা এই দুধ খেলেই ধাত বিগড়ে যেত। এ দুধ খেলে বাবার জন্মে আর দুধ খেতে হ’তো না।” গাঙ্গুলী দুধ ফেলে দিয়ে, গামছায় বাটীটা মুছে ফেলে, বল্লে “বাটীটে বেশরে, এটা নিয়ে যেতে হবে।”

কৃষ্ণকিশোর ভাবলে,—উন্মাদের কি আর হাত পা আছে ; কোথায় ডাকাতের হাতে প’ড়েছে, আর ভাবছে ডাকাতের বাটীটে নিয়ে যাবে! তবু একজন অপেক্ষা দু’জন ভাল, কৃষ্ণকিশোর এই ভরসাতে আছে।

অন্ন প্রস্তুত হ’ল। এক সের তণ্ডুলের অন্ন, কৃষ্ণকিশোরের একলাই থই পেত না, কিন্তু অর্দ্ধেক সদাশিবকে দিয়ে অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকও কৃষ্ণকিশোর খেতে পার্‌লে না। সদাশিব ব্রাহ্মণের অবয়ব দেখেই বুঝেছিল যে, ব্রাহ্মণ খাইয়ে কম নয়, তবে মৃত্যুভয়ে ব্রাহ্মণের ক্ষুধাও ম’রেছে।

সদাশিব বললে—"বামুন, আজ তোরে বাঁচিয়ে নে যাব, কিন্তু আজ বেঁচে গিয়ে দেখিস, খবরদার মরিস্‌নি? মরিস্ তো বিশ জুতো লাগাব। ব্যাটা মর্‌বার ভয়ে দু মুটো খেতিস, তাও ছেড়ে দিলি? আমায় যদি ফাঁসী দিতে নিয়ে যায়, তা'হলে আমি তখনও বলি, "বাবা আধসের রসগোল্লা খাইয়ে ফাঁসি দাও। কলকাতা গিয়ে ভোলা ময়রার রসগোল্লা খেয়েছিলেম, বড় চমৎকার তার হে! রসটুকু চেটে খেয়ে ভাবলেম—এই অমৃত!—খেয়ে অমর হলুম।" কৃষ্ণকিশোর বল্লে, "তখন ত অমর হ'য়েছিলে,—এখন যে ডাকাতের হাতে মরো।" সদাশিব গান ধর্‌লে,—"আমি দুর্গা ব'লে যদি মা মরি।" কৃষ্ণকিশোর সরোষে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"তুমি পাগল না কি?" সদাশিব বলিল,—"ভাত খা, ভাত খা" বলিয়া আবার গান ধরিল;—

"তোদের খ্যাপার হাটবাজার মা,—
তোদের খ্যাপার হাটবাজার।
কব গুণের কথা কার গো মা,—
কব গুণের কথা কার॥
কর্ত্তা যিনি, পাগল তিনি, খ্যাপার মূলাধার মা,—
ও মা—খ্যাপার মূলাধার।
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় নাচিস তার মা,—
মাথায় নাচিস তার॥

ভোজনের অগ্রে সদাশিব, এদিক ওদিক হ'তে দুই একখানা তাল বাকরা এনে উনানের ভিতর দিল। আহারান্তে সদাশিব জিজ্ঞাসা করিল "কই পান আনিস্ নি?" তখন কৃষ্ণকিশোরের গোবর-মাখা গুড় খেয়ে মুখ কেমন কেমন ক'চ্চে। ব্রাহ্মণ গুড়ের কথা সদাশিবকে বলে নাই। সদাশিব বল্‌লে,—"এই নে, এক কুচি সুপারি নে।" এক কুচি আপনি খেলে, এক কুচি কৃষ্ণকিশোরকে দিল। তারপর বল্‌লে—"নে বামুন, এই তালবাক্‌রা খানা উনুন হ'তে বার ক'রে বড় ঘরের চালে গুঁজে দে। আর এই ছোট খানা রান্নাঘরের চালে দিস। আমি গাঁজাটা সেজেই এই খড়ের আটি জ্বালিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ধরিয়ে দিচ্চি। ব্যাটারা অনেক ব্রহ্ম-হত্যা ক'রে চণ্ডীমণ্ডপ ক'রেছে। যাক্, ব্রহ্ম-অগ্নিতে নির্ব্বাণ পাক। যা—যা—কি, দেখচিস কি?" কৃষ্ণকিশোর জলন্ত তালবাক্‌রা নিয়ে বড় ঘরে

গুজে রেখে এলো,—রান্না ঘরেও ছোট একখানা বাক্‌রা গুঁজিয়াছে। এ দিকে গাঁজায় দম দিয়ে সদাশিব চণ্ডীমণ্ডপে এক নুড়া জ্বলন্ত খড় ফেলে দিল। একবারে দাউ দাউ ক'রে শুক্‌না চাল জ্ব'লে উঠ্‌লো, গ্রামে রৈ রৈ শব্দ প'ড়ে গেল। বৈশাখ মাসের জোর হাওয়া—সন্নিহিত গ্রামের লোকও ছুট্‌তে লাগলো। হো—হো শব্দ চতুর্দ্দিকে হ'চ্চে, আশপাশের ঘরও ধ'রেছে, খড়ের গাদায় আগুণ লেগেছে—আলোয় আলোয় কুরখুটি! তখন সদাশিব, কৃষ্ণকিশোরকে বল্‌লে,—"আয় বামুন, আলোয় আলোয় ঘরে যাই।"

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গৌরাঙ্গ সমাজ।

গত ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মদিন স্মরণার্থ গৌরাঙ্গ সমাজের অধিনায়কবর্গ যে উৎসবের আয়োজন ও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর এবং সাধারণের চিত্তাকর্ষক। দেশে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যতই আন্দোলন-আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। আজ কাল লোকের মন সদনুষ্ঠানে বিশেষরূপে লিপ্ত দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হয়, এবং প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে এই কলিকাতা-বাসী-দিগের মনের অবস্থা এবং কার্য্য কিরূপ ছিল, তাহা বর্ত্তমানের সহিত তুলনা করিলে পার্থক্য কত বেশী, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তখন অধিকাংশ লোকের মনে ধর্ম্মভাব অতিমলিন অবস্থায় ছিল। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি কাহার বড় একটা আস্থা ছিল না, বরং অনেকে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ ও দোষারোপ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মে শিক্ষনীয় বা পঠনীয় তাদৃশ কিছু নাই, ইহাই তখনকার অনেকের বদ্ধমূল ধারণা। পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ এবং দর্শন-শাস্ত্র পাঠ না করিলে আর জ্ঞান লাভের দ্বিতীয় সোপান নাই, ইহাই তখনকার অধিকাংশ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অভিমত। হিন্দু-ধর্ম্মে আছে কি, পড়িব কি? যাহা কিছু আছে, তাহার অধিকাংশই

অসম্বন্ধ প্রলাপ-বাক্য ব্যতীত অপর কিছুই নহে, ইহাই সে সময়ের অপর এক সম্প্রদায়ের ধ্রুব বিশ্বাস। তখন অনেক লোকের নৈতিক চরিত্রের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য ছিল না। না থাকিবারই কথা। কারণ ধর্ম্মে আস্থা না থাকিলে পাপে ভয় থাকে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইতেছিল, অর্থাৎ নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। ক্রমে কাল-স্রোতের সহিত লোকের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! যে সকল লোক বলিতেন, "মহাভারত, রামায়ণ অথবা অন্যান্য পুরাণ পড়িব কি, উহাতে আছে কি এবং শিখিবই বা কি, তাঁহারাই আবার যখন কর্ণেল-অলকট-প্রমুখ কয়েকজন বিজাতীয় মনীষা-সম্পন্ন লোকের মুখে শুনিলেন যে, হিন্দু-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম, হিন্দুদর্শন শ্রেষ্ঠ দর্শন এবং হিন্দুগণের দ্বারা জগতে যত উন্নতি হইয়াছে, এরূপ কোন দেশে কোন কালে কাহারও দ্বারা হইয়াছে কি না সন্দেহ, তখন বুঝিলেন যে, হিন্দু-ধর্ম্ম উপেক্ষার বিষয় নহে। যখন শুনিলেন, ইহাতে শিখিবার, চিন্তা করিবার এবং জ্ঞান লাভ করিবার প্রচুর সামগ্রী আছে, হিন্দু-ধর্ম্ম সমুদ্র-বিশেষ, তখন অমনি তাঁহাদের সুর ফিরিল। পূর্ব্বের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য দিকে ধাবিত হইল। যে মুখে হিন্দু-ধর্ম্মের শত শত নিন্দাবাদ শুনা গিয়াছে, আবার সেই মুখে হিন্দু-ধর্ম্মের কত রকমের কত প্রশংসা শুনা গেল। বিদেশীর মস্তিষ্কের কি অভাবনীয় প্রভাব! আমাদের ঘরের জিনিষ, ভাল মন্দ বিচারের শক্তি আমাদের নাই। পরে যতক্ষণে ভাল বলিবে, ততক্ষণে ভাল বলিব। বলিহারি শিক্ষার প্রভাব! বলিহারি চিন্তাশীলতার পরিচয়! সুন্দর শ্বেত-মস্তিষ্ক হইতে যাহা কিছু বাহির হইবে, স্রোতে ভাসমান জীব আমরা তাহা লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তৎপদানুসরণ করিতে থাকিব। ইহাই আমাদের শক্তির পারাকাষ্ঠা। আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি যেন চিরদিনের তরে কর্ম্মনাশার অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমরা যেন ক্রীড়াপুত্তলি। অপরে যেমন নাচায় আমরা তেমনি নাচি, অপরে যেমন বলায় আমরা তেমনি বলি। তবে মন্দের ভাল এই যে, পাশ্চাত্য-দেশের লোকের অনুকম্পায় এ দেশের অনেক লোক এখন প্রকৃত বিষয় কি, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, এবং তজ্জন্য নাস্তিকতার পথ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইলেও অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। এখন অনেক লোকে দেশীয় ব্যাপার লইয়া আন্দোলন-আলোচনা করিতে প্রয়াসী। তাই বলিতেছিলাম, সেদিন-

কার গৌরাঙ্গ-সমাজের অনুষ্ঠাতৃবর্গের উৎসাহ, উদ্যম এবং ধর্ম্মবিষয়ে স্পৃহা দেখিয়া আমাদের মনে আবার আশার সঞ্চার হয়। মনে হয়, আবার আমাদের দেশ একদিন উন্নতির শীর্ষস্থানে উঠিবে। আবার আধ্যাত্মিক জগতে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া পাপ, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, শোক, মোহ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। আবার লোক আনন্দে হাসিবে, সুখে নাচিবে, হর্ষে গাইবে। জানিনা, সে দিনের সূর্য্য গগনে কবে উদয় হইবে?—যে ভারতবাসীর আর্য্য-শোণিতে আর্য্য-বীর্য্যে জন্ম, সেই ভারতবাসীর যে এতদূর অভাবনীয় অধঃপতন হইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই; কিন্তু কালের আশ্চর্য্য প্রভাবে সেই স্বপ্নাতীত বিষয় সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তজ্জন্য বৃথা অনুশোচনার প্রয়োজন নাই, যাহাতে ভবিষ্যতে আর মনের গতি বিপরীত দিকে ধাবিত না হয়। তদ্বিষয়ে সকলের বদ্ধ-পরিকর হওয়া বিধেয়, এবং যাঁহার যতটুকু শক্তি, তিনি ততটুকু আধ্যাত্মিক জগতের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে, উন্নতি অনিবার্য্য।

দোল-পূর্ণিমা দিবসের দৃশ্য দেখিয়া প্রাণমন বিগলিত হইয়াছিল। এখনও হিন্দুর প্রাণে কণামাত্র ধর্ম্মভাব যে রহিয়াছে, সেদিনকার সেই বিরাট দৃশ্যে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী ধর্ম্মের জন্য সব করিতে পারে। ধর্ম্মের নিকট তাহার সকল পদার্থ তুচ্ছাদপিতুচ্ছ। এমন কি, ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহে। যে দেশের লোকের ধর্ম্মের সহিত যাবতীয় কার্য্যের সম্বন্ধ; শয়নে, ভোজনে, গমনে, পর্য্যটনে, স্বপ্নে, নিদ্রায়, কর্ম্মে, চিন্তায়, এমন কি হাড়ে মাসে ধর্ম্ম অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত, সে দেশের লোক কি ধর্ম্মশূন্য হইয়া কোন উন্নতিকর পথে অগ্রসর হইতে পারে? যদি ধর্ম্মশূন্য হইয়া কাহার উন্নতি করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সে উন্নতি কখন স্থায়িত্ব-লাভ করিবে না। তাহা ভিত্তিশূন্য বালুকা-স্তূপ-সদৃশ অচিরাৎ বিলয়-প্রাপ্ত হইবে।

দোল-পূর্ণিমার দিন বিডনপার্কে শত শত কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের অদ্ভুত মহা সম্মিলন হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন প্রকার নদী আসিয়া যেমন সাগরে সম্মিলিত হয়, এই সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় সমূহও সেইরূপ নদীর মত ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ-সাগরে মিলিত হইবার জন্য সকলে বিডনপার্কে সমবেত হইয়াছিল। উক্ত পার্কের

মধ্যস্থলে একটী গোলাকার বেদীর উপর শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। সকল সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় গানে মাতোয়ারা হইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার গানের মধ্যে সিমুলিয়া হরিসেবক-সমিতির গানটী আমাদের বড় মধুর মনোরম বোধ হইয়াছিল। গানটীর রচনা-পারিপাট্য সুন্দর, এবং সুর অত্যন্ত সুমিষ্ট; সুতরাং মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইয়াছিল। সাধারণের অবগতির জন্য গানটী নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গানটী এই;—

রূপক।

ভাসে নিবাশা উজানে রজনী,
হাসে সলিলে সরোজ সজনী;
হাসিছে ঘন পূরব গগন,
আনন্দে নিমগন হাসিতেছে তরণি।

একতালা।

শ্যাম নীলিম নীরদ কায়,
মধুর নূপুর বাজিছে পায়,
করযুগে ধরি, বাঁকা বংশীধারী,
(গোলাপ কুম্‌কুম্‌ আবীর পিচ্‌কারী)
রাধানামের মোহন বেণু সঘনে বাজায়।
(রাধা ফিরে ফিরে চায়)

দশকুশি।

তরণি-তনয়া কূলে, গোকুল গোপিনীকুলে,
আবীরে আকুল, বলে—
করে ধরি ক্ষম ক্ষম হে
ওহে নীলমণি!
আমরা যে কুলবালা, কি কর চিকণকালা!
ওহে রাধানাথ!

লোফা।

মবি মাধুরী যমুনায়,
উথলে বিপুল পুলক-উজান,
প্রেমে মাতুয়ারা, আপন হারা,
গোপীসনে আজি, হোলি খেলে শ্যামরায়।

—

ঠুংরি।

(হেথা) নদীয়াতে বিদূরিতে কলিতে দূষিত ভাব,
হবি জনমিল শতদল-অমল-নয়ন-তার,
শচী-নিচোল-অঞ্চলে, ঢল ঢল ঢলে,
কলি-বিলাস-আকুল, বিলোকি মনুজকুল,
করিছে মধুর হাসি অমিয় আসাব।

—

একতালা।

কেমনে তরিব হরি, বল হে আমায়,
বৃথা কাজে মোর দিন যে যায়;
পাঁচ ভূতে খুলে খায়, বল তার কি করি উপায়,
বড় সাধ যায়,
বিকাইতে পায় ওহে শ্যামরায়.—
পাতকী তরাতে হরি, এলে নদীয়ায়।

—

মেল্‌তা।

রেখ হে গৌরাঙ্গ দিয়ে চরণ দুখানি।

—

অনেকে বলিবেন, লোকে এখন যাহা কিছু করে, তাহা সম্পূর্ণ মনের সহিত নহে। আড়ম্বর-প্রিয় লোক আড়ম্বরের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু ধর্ম্ম আড়ম্বরের মধ্যে আদৌ নাই। লোকে ভাল বলিবে, দেখিতে শুনিতে ভাল হইবে, সুন্দর সাজ সজ্জা করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতে হইবে, ইহাই পনর আনা লোকের ইচ্ছা ও অভিমত। এরূপ করিলে ধর্ম্মের উন্নতির পরিবর্ত্তে ক্রমে অবনতি হওয়াই সম্ভবপর; কারণ লোকে ক্রমে

সাচ্চা ছাড়িয়া ঝুটার প্রয়াসী হইবে, সুতরাং ধর্ম্মের ভান করিয়া লোকে স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। স্বীকার করিলাম, এরূপ করিলে প্রকৃত ধর্ম্মের পথে কেহ সহজে উপনীত হইতে পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া যে কখনও উপনীত হইতে পারিবে না, তাহা বলিতে পারি না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন যে, "মন ধোপা-ঘরের কাপড়, যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ হইয়া যায়।" আমাদেরও তাই মনে হয় যে, সত্যেতে ভান করিয়া মনকে ফেলিয়া রাখিলে, হয় ত সত্যের ছোপ ধরিয়া যাইবে। মানুষ আপনা-আপনি যখন ঝুটাকে ঝুটা বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন আর তাহাতে সে তৃপ্ত হইবে না, তখন সে সাচ্চা পাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবে। তখন সে ভান ধর্ম্ম পরিহার করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়াস পাইবে। সেই জন্য বলিতেছিলাম, ধর্ম্মের ভান ভাল, অধর্ম্মের কিছুই ভাল নয়। এ সম্বন্ধে একটী গল্প মনে পড়িল।

কোন একজন অসৎপ্রকৃতির লোক কোন দেশের এক রাণীকে দেখিয়া তাঁহার রূপে বিমোহিত হয়। কিছুতে নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে না পারায়, সে সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে একটী বটবৃক্ষ-মূলে কিছুদিন অবস্থিতি করে, এবং নানা লোককে নানা প্রকার ঔষধ বিতরণ করে। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক দলে দলে আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। একদিন একজন স্ত্রীলোক রাজবাড়ীর অন্দরে যাইয়া কথায় কথায় রাণীর নিকট সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা গল্প করিল। রাণীর কোন সন্তানাদি হয় নাই; সুতরাং সন্ন্যাসীর নিকট ঔষধ লওয়া স্থির করিয়া রাজার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার অভিমতি হইল এবং তিনি জনৈক লোকদ্বারা সন্ন্যাসীকে নিজ বাড়ীতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাধু আসন ত্যাগ করিয়া কাহারও বাটী গমন করেন না। অবশেষে রাজাজ্ঞানুসারে রাজবাটী হইতে সন্ন্যাসীর আস্তানা পর্য্যন্ত কাপড় দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইল। তার পর রাণীকে যাইবার জন্য রাজা অনুমতি প্রদান করিলেন। রাণী যাইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী তখন ধ্যানে নিমগ্ন, নয়নদ্বয় নিমীলিত। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখে, সম্মুখে রাণী দণ্ডায়মানা। সন্ন্যাসী রাণীর আপাদ-মস্তক স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ভস্মস্তূপ গ্রহণ করিয়া রাণীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিল,

"ইহা একটী স্বর্ণ মাদুলিতে পুরিয়া গলায় ধারণ করিবেন। সন্তান হইলে সেই মাদুলি তাহার গলদেশে পরাইয়া দিবেন। সন্তান রূপবান্ হইবে এবং দীর্ঘ-জীবন লাভ করিবে।" রাণী হৃষ্টান্তঃকরণে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং রাজাকে বলিয়া সন্ন্যাসীর থাকিবার জন্য সুবন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প মনে মনে করিলেন। পরদিন রাজা সন্ন্যাসীর সন্ধান লইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সন্ন্যাসী কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, তাহার সন্ধান কেহ বলিতে পারে না। এই ঘটনার পাচ বৎসর পরে সন্ন্যাসী দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই রাজার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ন্যাসী প্রকৃত সাধক হইয়াছে, তখন আর ভণ্ডামি কিছুমাত্র নাই। রাজাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী নিজবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রাণীমাকে একবার দেখিব"। রাজার তখন একটী চারিবৎসরের সন্তান নিকটে ছিল, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিল। তারপর রাণীকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিল "মা! আমি অতি মন্দ। আমি একদিন মন্দ চক্ষে তোমাকে দেখিয়া ধর্ম্মের ভান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলাম। তাই আজ তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমিই আমার গুরু। প্রসন্নচিত্তে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল। রাণী "ক্ষমা করিলাম" বলিবামাত্র সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিল। তার পর আর কেহ সন্ন্যাসীর কোন সংবাদ পায় নাই। দশবৎসর পরে অপর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া গল্প করিল "সেই সন্ন্যাসী এখন সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন এবং কোন এক নির্জ্জন গুহায় অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাঁহারই শিষ্য।"

তাই বলিতেছিলাম—ধর্ম্মের ভানও ভাল, অধর্ম্মের কিছুই ভাল নয়।

পত্রগুচ্ছ।

১ নং—হৃদয় চুরি।

জীবনপুর,—৫ই বৈশাখ, ১২—।

সোদরপ্রতিম সুরেন্দ্র,

এই দশ বৎসর কাল কত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিলাম,—কোথাও কেহ আমার এক কড়া কানা-কড়িও সরাইতে পারে নাই। কিন্তু কি কুক্ষণেই যে এত দিন পরে দেশে ফিরিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখানে আসিয়া দুই দিন যাইতে না যাইতেই, একজন আমার 'অমূল্য-রতন' হৃদয়টি—চক্ষুদান দিয়াছে!

এক শান্ত-প্রকৃতি-সম্পন্না কিশোরী (বোধ হয় ত্রয়োদশী) সাঁতার কাটিতে গিয়া জলে ডুবিয়া মরিতেছিলেন,—উদ্ধার করিলাম। তা' তিনি এমনই কৃতজ্ঞ যে, প্রাণদাতার প্রাণটী চুরি করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

আমি এতদিন দেশে ছিলাম না, এখানকার অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি; সুতরাং তুমি যদি এখন এই সাধুবৃত্তিশালিনী রমণীটীর পরিচয় জানিতে চাও, ত' বলিতে পারিব না। এই ললনা-কুল-ভূষণটীকে উদ্ধারান্তে বক্ষে করিয়া যেখানে পৌছিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, সেটি একটী কুটীর; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেছি, এটি দীন-কুলোদ্ভবা। তা দীনের এত 'ভিরকুটী' কেন, বলিতে পার?

তুমি সর্ব্বদা দেশে আসিয়া থাক—গ্রামের পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের বাড়ী; বলিতে পার, এ রত্নটীকে আমার অঙ্কলক্ষ্মী করিতে পারা যায় কি না? আশা করিতে পারি কি? না আমায় দেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে?

আজ কাল আমার শারীরিক অবস্থা বড় মন্দ নহে;—কিন্তু মানসিক অবস্থা শোচনীয়! তুমি কেমন আছ?—আজ বিদায়! ইতি——

অভিন্ন-হৃদয়—

বসন্ত।

২ নং—কান্নাহাটী।

জীবনপুর,—১২ই বৈশাখ, ১২—।

প্রিয়তমেষু——

এতদিন পরে তোমার বন্ধু শরচ্চন্দ্রের হৃদয়রত্নটী বুঝি বেহাত হয়! জমিদারদের বড় বাবু, বসন্তকুমার, এতদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরতের সর্ব্বস্বটী একদিন জলে ডুবিয়া যাইতেছিল,—তিনি তাহাকে উদ্ধার করিয়াই দাবী করিয়া বসিয়াছেন। তা তাঁহার দাবীটা, বোধ হয়, নিতান্ত আইন-বহির্ভূত হয় নাই,—কিন্তু এদিকে তা'হ'লে তোমার শরৎচন্দ্র যে অস্ত যায়!—আমারও নিশীথ-কুসুমটী অস্ত যায়!

এদিকে শরতের পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণ,—"তিনটি হাজার চক্‌চকে রৌপ্যখণ্ড না পাইলে শরতের বিবাহ দিতে নারাজ।" (সরোজের মায়ের কাছে বলিয়াই তিন হাজার; কারণ মেয়েটী দেখিতে ভাল ও স্বগ্রামের।—নতুবা পাঁচ হাজার!)

সরোজের মা দুঃখিনী বিধবা,—অত টাকা কোথায় পাইবেন? কাজেই এ বিবাহে অন্তরায় অনেক। এদিকে বসন্তকুমার আমাদের সরোজের মায়ের কাছে আপন অভিপ্রায় এক প্রকার জানাইয়াছেন। আর তিনি প্রায় প্রত্যহই নানাবিধ ছলছুতা করিয়া তথায় যেরূপ আনাগোনা করিতেছেন, তাহাতে কি হয়, বলা যায় না। সরোজের মাতা কিন্তু কন্যার মুখ পানে চাহিয়া এখনও কিছু কথা দেন নাই। এদিকে শরতের অর্থলোলুপ পিতা মহাশয় যদি নিতান্তই রাজি না হন, তা'হ'লে তিনি কি এমন সুপাত্রটী হাতছাড়া ক'রবেন?—হয় ত সেরূপ ক্ষেত্রে শরতেরই কপাল ভাঙ্গিবে। তাহা হইলে কিন্তু বড়ই মুস্কিল হইবে।

প্রিয়তম,—তুমিই আমার বলবুদ্ধি! সরোজের কান্না ত আর দেখা যায় না, কি করিব বল? তোমার ত জমিদারদের বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ আছে, তাঁহাকে কোন রকমে নিরস্ত করিতে পার না কি?

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার কুশল-সংবাদ দিবে। দাসীর ও ছেলেদের প্রণাম জানিও। ইতি——

তোমারই সেই পোড়ারমুখি—

বিনো—

৩ নং—উপদেশ।

কলিকাতা, ১৭ই বৈশাখ, ১২—।

প্রাণের বিনোদিনি!

তোমার ১২ই তারিখের পত্রখানি পাইলাম। তোমরা সকলে ভাল আছ পাঠ করিয়া, যার পর আনন্দিত হইলাম। ঈশ্বরানুগ্রহে আমিও এখানে শারীরিক কুশলে আছি। মানসিক অবস্থা অনবগত নহ।

সরোজের সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছ--আমি বলি, শরতের সঙ্গে যখন বিবাহ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব,—তখন সরোজের বৃথা কাঁদিয়া কাটিয়া কি হইবে? হিন্দুর মেয়ে এক জনকে ত বিবাহ করিতেই হইবে। তা' বসন্তকুমারের মত রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্ লোক যখন তাঁহার পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়াছেন, তখন সে বিষয়ে অমত করা কোন মতেই উচিত হয় না। সরোজকে তুমি এই কথা গুলি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিও।

বসন্তকুমারের সরোজ-সম্বন্ধে লিখিত পত্রখানিও এই সঙ্গে পাঠাই, নিজে পাঠ করিয়া সরোজকে পাঠ করাইও। বসন্তের পত্রের আমি এখনও কোন প্রত্যুত্তর দিই নাই। তোমার পত্র না পাইলে তাঁহাকে চিঠি লিখিব না। সরোজের কি মত সত্বর জানাইবে।

অনেক লেখা বাহুল্য মাত্র। তোমরা সকলে আমার আশির্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমারই সুরেন্দ্র।

---

৪ নং—প্রেমোল্লাস।

জীবনপুর,—১৯শে বৈশাখ, ১২—।

বন্ধু হে!

আজকাল আমি এক চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছি; সেই বিদ্যা-বলে দিবানিশি এক সংজ্ঞা-হীনা বালিকার মূর্চ্ছিত-সৌন্দর্য্য আমার লোচন-সমক্ষে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারি! শুধু উহাই নহে,— আজ কাল আমি আবার সাধকও হইয়া পড়িয়াছি। আমি "সরোজিনী" মন্ত্রের উপাসক;—দিবা-বিভা-বরী সেই সরোজিনী নাম সাধনা করিতেছি। সুতরাং দেখিতে পাইতেছ,

আজ কাল আমি কত ব্যস্ত। তবুও দেখ, তোমাকে উপর্য্যুপরি দুইখানি পত্র লিখিলাম; তুমি কিন্তু আজিও আমার পত্রের উত্তর দিলে না। ভারি অন্যায়! আশা করি, এইবার পত্রপাঠে মদুদ্দেশে লেখনী ধারণ করিবে।

তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, এই সংজ্ঞাহীনা বালিকাটীই বা কে, আর সরোজিনীই বা কে? বন্ধু! "এ্যা-ও যে, অ-ও সেই," দুই এক মূর্ত্তি,—দ্বিমূর্ত্তি নহে,—মূর্ত্তি এক, তবে আমায় কার্য্য করায় দ্বিবিধ! আরও কতবিধ করাইবে কে জানে? অবশেষে পাগল না কর্‌লে বাঁচি!

আমার চিত্র-বিদ্যার আদর্শে, আমার সাধনার মূলমন্ত্র সরোজিনীতে, আর আমার পূর্ব্ব পত্রে কথিত সেই জল-নিমজ্জিত সুশীলা বালিকাটীতে কোন প্রভেদ নাই, তিনই এক—একেই তিন!

আজ কাল এই তিনের বাটী আমার অন্ততঃ দিনে দশবার যাওয়া চাই, নহিলে প্রাণ বাঁচে না। সরোজিনী দুঃখিনীর দুহিতা, পিতৃহীনা। মায়ে ঝিয়ে সূতা কাটিয়া, পৈতা তুলিয়া, যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই উভয়ের এক প্রকার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তুমি কি ইহাদের চেন?

আমি স্বয়ং ঘটক হইয়া বিবাহের কথা ফেলিয়াছি। আজও কোন পাকা জবাব পাই নাই। এখন আমার অদৃষ্ট।

বর্ত্তমানে আমার শরীর ও মন উভয়ই কথঞ্চিৎ সুস্থ;—তুমি কেমন আছ? ইতি——

অভিন্ন হৃদয়—বসন্ত।

পুনশ্চ—সরোজিনী-সম্বন্ধে তোমার আর কোন সন্ধান লইবার প্রয়োজন নাই।

ব—।

---

৫ নং—তিরস্কার।

জীবনপুর,—২২শে বৈশাখ, ১২—।

প্রিয়তমেষু——

তোমার ১৭ই তারিখের পত্রে সরোজিনী-সম্বন্ধে যাহা পরামর্শ পাইয়াছি, তাহাতে আর কোন সময়ে তোমার নিকট যে কোন পরামর্শ লইব, তাহার প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়াছে। লোককেও পরামর্শ দিব যে, তোমার ন্যায়

উকিলকে কখন কোন মোকদ্দমায় নিযুক্ত না করে। তোমাদের পুরুষ জাত এমনই হৃদয়হীন বটে। তোমরা যত শীঘ্র লোককে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পার, আমরা তত শীঘ্র পারি না। শীঘ্র পারাপারি কি—কখনই পারি না!

তুমিই না একদিন আমাকে বলিয়াছিলে যে, যে রমণী এক জনকে ভালবাসিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচারিণী? তা' আজ আবার এ কি পরামর্শ দিতেছ? সরোজিনীকে তুমি ব্যভিচারিণী হইতে বল না কি?

বসন্ত বাবুর পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। তা' দুঃখিনীর প্রতি তাঁহার এত অনুগ্রহ কেন? যাহা হউক, তাঁহাকে সবিশেষ জানাইয়া একবার ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিও। তিনি যদি হৃদয়বান্ লোক হয়েন, ত' নিরস্ত হইবেন। নচেৎ অভাগিনীর অদৃষ্ট-লিপি অখণ্ডনীয়।

আমরা সকলে ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? বলি, সকলেরই বাড়ী আসা হয়, তোমার কি হয় না? ওকালতি করিতেছ, আইন-জ্ঞান আছে,—তা' এমন বে-আইনী কাজ করা কেন? ছুটীতে বাড়ীতে না আসা কি আইন-বিরুদ্ধ কাজ নয়?

আর কি লিখিব? আমাদের সকলের প্রণাম জানিও। ইতি——

তোমারই—বিনোদিনী।

---

৬ নং—পরামর্শ।

কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ১২—।

প্রিয় বসন্ত!

তোমার দুইখানি পত্রই যথাকালে আমার হস্তগত হইয়াছে; এতদিন তোমার পত্র দুইখানির প্রত্যুত্তর না দিয়া অপরাধ করিয়াছি। আশা করি, নিজ সহৃদয়তাগুণে বন্ধুর এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবে।

দ্বিতীয় পত্রে তুমি সরোজিনীসম্বন্ধে (তাহাকে আমি বিলক্ষণ চিনি) আর কোন সন্ধান লইতে বারণ করিয়াছ বলিয়া, আমিও তৎসম্বন্ধে উদাসীন আছি। তবে তোমার দ্বিতীয় পত্রখানি পাইবার পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে যে কথাগুলি জানিতে পারিয়াছি, কর্ত্তব্যানুরোধে তোমাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম।

তুমি লিখিয়াছ, 'আমার সরোজিনী'—কিন্তু আমি বলি তোমার নহে, 'শরচ্চন্দ্রের সরোজিনী'! (শরচ্চন্দ্রকে বোধ হয় ভুলিয়া যাও নাই?) আর সরোজিনীরও শরচ্চন্দ্র বটে!

এতদিন কবে ওই "দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিয়া যাইত", কেবল শরচ্চন্দ্রের অর্থ-প্রিয় পিতা তিন হাজারী সিন্দুক খুলিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া হইতেছে না।

তোমার দ্বিতীয় পত্র হস্তগত হইবার পূর্ব্বে সরোজিনী সম্বন্ধে উল্লিখিত সমাচার পাইয়াছি। এখন তুমি হয়ত বুঝিতে পারিতেছ যে, সরোজিনীর মাতা কন্যাদায়ে পড়িয়া যদি, বা তোমাকে কন্যাদান করেন,—কন্যা কিন্তু তোমাকে হৃদয়দান করিবে না। তাহার সে ক্ষমতা নাই; তাহা থাকিলে সে তাহার জীবনদাতাকে এই সামান্য উপহার প্রদানে কখনই পরাঙ্মুখ হইত না। ইহাতে উভয়েরই জীবন চিরকাল মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে থাকিবে।

আমি জানি, তুমি, উপরোক্ত কথাগুলি শুনিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে—হয়ত, আবার দেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবে। কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ-অনুরোধ,—তাহা করিও না। তুমি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিও দেখি, সরোজিনীর প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তাহা প্রকৃত ভালবাসা না রূপজ মোহ। আমি ত বলি রূপজ মোহ। তুমি তাহার এ কয়দিনে এমন কি গুণ দেখিলে, যাহাতে তোমার চিত্ত তাহার প্রতি এতদূর সমাকৃষ্ট হইল? বোধ করি, কিছুই দেখ নাই। অতএব ভাই! বৃথা রূপ-মোহে মুগ্ধ হইয়া, একটা কিছু অকাণ্ড করিও না। ছি! ছি! লোকে বলিবে কি? চিত্ত সংযত কর।—চিত্ত সংযত করা মুখে বলা অপেক্ষা যে কাজে করা ঢের কঠিন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ভাই! স্মরণ রাখিও,—পুরুষের পুরুষত্ব কেবল ইহাতেই।

দুইদিন অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর, সব ভুলিয়া যাইবে। রূপজ প্রেম বালির রচনা,—দুই দিনেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আমি বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি—

অভিন্নহৃদয়—সুরেন্দ্র।

৭ নং—নরদেবতা।

জীবনপুর, ২৯শে বৈশাখ, ১২—।

স্বামিন্!

পূর্ব্বপত্রে তোমাদের পুরুষ-জাতিকে যে কতকগুলি গালি দিয়াছি, গত ২৭শে তারিখ রাত্রিতে এখানে এমন একটী ঘটনা ঘটিয়াছে যে, আমাকে বাধ্য হইয়া সেগুলি প্রত্যাহার করিতে হইতেছে; কি জানি, তোমরা উকিল মানুষ, পাছে কোনরূপে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত হই।

সেই দিন শরচ্চন্দ্রের সহিত সরোজিনীর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শরতের পিতার হাজারী সিন্দুক তিনটী অবশ্যই পূর্ণ হইয়াছে। তুমি হয়ত জেরা করিবে,—সরোজিনীর মাতা ত নিঃস্ব,—টাকা আসিল কোথা হইতে? যে বসন্তবাবুর প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছিলাম, তিনি শুধু সেই টাকা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এ বিবাহের সমুদয় উদ্যোগই তিনি করিয়া দিয়াছেন। এরূপ না হইলে এত শীঘ্র হয়ত বিবাহ হইত না। হঠাৎ কায হইয়া গেল বলিয়া, তোমাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইও না,—তোমার পুরস্কার অবশ্যই পাইবে। আমি জানি, এ ঘটনার ঘটক তুমি; সুতরাং, তোমার ন্যায্যপ্রাপ্য আমার নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় আদায় পাইবে।

এখন শরৎ ও সরোজ উভয়ে অবশ্যই খুব সুখী হইয়াছে। কিন্তু বসন্তকুমার! তিনি কি সুখী হইয়াছেন? তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া ত কিছুই বুঝা যায় না। তবে সুখী বলিয়া মনে হয় এই কারণে যে, এই ঘটনা-সংঘটন কালে তাঁহার অধর-প্রান্তে মুহূর্ত্তেকের জন্যও হাসি বিলুপ্ত হয় নাই। আর তিনিই ত এই বিবাহের উদ্যোক্তা!

এখন এস, তোমার দেব-প্রকৃতি বন্ধুকে আলিঙ্গন করিবে এস!—আর একবার শরৎ ও সরোজিনীর মিলনানন্দ দেখিবে এস! এখনও কি করিতে কলিকাতায় রহিয়াছ? ছুটীতেও কি তোমার কাজ ফুরায় না? খোকা কয়দিন তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই কান্না জুড়িয়া দিয়াছে, তাহাকে থামাইয়া রাখা দায় হইয়াছে। আর আমার কান্নার কথা কিছু লিখিব কি?

আমাদের সকলেরই কুশল জানিবে; তুমি কেমন আছ জানিতে বাসনা। আজ আর বিশেষ কিছু লিখিবার নাই; খালি জানিতে চাই, ষ্টেশনে কবে ঘোড়া ও লোক পাঠাইতে হইবে? দাসীর ও ছেলেদের প্রণাম গ্রহণ করিও। ইতি——

তোমারই চিরদাসী—বিনোদিনী।

---

৮ নং—প্রতিবাদ।

জীবনপুর,—২৯শে বৈশাখ, ১২—।

সুহৃদ্বরেষু!

ভাই সুরেন্দ্র, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সরোজিনীকে আমি প্রকৃতই ভালবাসি;—সে ভালবাসা প্রকৃত—রূপজমোহ নহে। তাহার ন্যায় রমণী-রত্নকে ভালবাসিতে গুণের আবশ্যক হয় না;—কারণ

"To see her is to love her,
And love her but for ever."

আজ দুই দিন হইল এখানে একটী বড় মজা হইয়া গিয়াছে। কি—বলিব কেন? আসিলেই জানিতে পারিবে। তোমার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধুর বন্ধুত্ব ও আলিঙ্গন চির-প্রার্থনীয়। ইতি——

অভিন্ন হৃদয়—

বসন্তকুমার।

শ্রীপীরাজকৃষ্ণ সোম।

দুই রকম।

"সকল ভুবন আসি দেখিল শুনিল।
বাহ্যান্তরে সম একজন না দেখিল॥
মনে এক করে মুখে বাক্যে বলে আন।
কলি মধ্যে লোপ পাইল লোক-ধর্ম্ম-জ্ঞান॥"

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

আমাদের সমাজের দুরবস্থার অনেক গুলি কারণের মধ্যে ধর্ম্মদ্বৈত একটী। আমাদের যে দুইটি ধর্ম্ম আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন না। কিন্তু যত দিন না সকলেই এই ধর্ম্মদ্বৈতের অস্তিত্ব এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, তত দিনই আমাদের এই দুরবস্থা বর্ত্তমান থাকিবে। অতএব একটু চক্ষুরুন্মীলন আবশ্যক। তাহা না হইলে উন্নতির পথেই কি, আর জীবন-রক্ষার পথেই কি,—কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। ধর্ম্মদ্বৈত থাকা যে অমানুষিক ও নীতিবিরুদ্ধ, তাহা নীতিশাস্ত্র অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে অনেক প্রতিবন্ধক ঘটে। সুতরাং ধর্ম্মদ্বৈত থাকিলে যে ব্যক্তি-মাত্রের ও সমাজমাত্রের উন্নতি সাধনে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, এই প্রকার একটা ভয় না দেখাইলে, বোধ হয় সমাজ নিজের হীনতাটুকু স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। তবে একটা কথা এই যে, এই ভয়টা জুজুর ভয়ের ন্যায় নিতান্ত অমূলকও নহে। যদিও কোন বীর বালক জুজুর ভয়ে ভীত না হইয়া বলে—"কোথায় জুজু, মারিব।" কিন্তু ব্যাঘ্রের সম্মুখে বীরবালককে কিছু ত্রস্ত ও সাবধান হইতে হয়। সুতরাং সমাজের বিপ্লব ও নিশ্চিত মৃত্যু যদি ধর্ম্মদ্বৈতের অস্তিত্বের ফল হয়, তাহা হইলে সকলেই সময়ে সাবধান হওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন।

মুখে এক কথা, পেটে এক কথা থাকিলেই ধর্ম্মদ্বৈত হইল। একটু বিশেষ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এক এক সময়ে আমরা এক এক ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করি, কিন্তু সময়ান্তরে তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কার্য্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। একটীর প্রধান নাম স্বার্থ,

অপরটী পরার্থ। স্বার্থ ও পরার্থ ভাবের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। নীতিজ্ঞেরা বলেন যে, এই প্রকৃতির ভাব মনুষ্যের মানবত্ব-প্রসূত। এই মানবত্বের পবিত্রতা রক্ষা করিলে স্বার্থ নষ্ট হইয়া কেবল পরার্থ ধর্ম্মই দাঁড়াইয়া যাইবে।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় সেই পরার্থই প্রবল ছিল। কিন্তু অবনতিক্রমে ও মনুষ্য জাতি মোহে পতিত হওয়াতে বর্ত্তমান দুরবস্থা নষ্ট হইয়া, পুনরায় পূর্ব্ব পবিত্রাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক খবর এখনও পাওয়া যায় না। ভূগর্ভে নিহিত মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মনুষ্যের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই; তৎসম্বন্ধে যিনি যাহা কিছু বলিবেন, নিশ্চয়ই অনুমান-সাহায্যে ও "গায়ের জোরে।" বোধ করি, হিন্দু-দর্শন ও হর্বার্ট স্পেন্‌সার উভয়েই এই দোষে দোষী। কিন্তু হর্বার্ট স্পেন্‌সরের মত যে, মনুষ্য জাতি স্বার্থ লইয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে; অতএব স্বার্থই তাহার ধর্ম্ম। কিন্তু উন্নতি-পথে অগ্রসর হইয়া মনুষ্য স্বার্থ ও পরার্থ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী হয় এবং অন্তিম অবস্থায় পুনরায় পরার্থরূপী একধর্ম্মিত্বে উপস্থিত হয়।

"Primitive humanity has but one. The humanity of the remote future will have but one. The two are opposed, and we who live midway in the course of civilization have to believe in both."

উক্ত দুই দলে মতভেদ যতটাই থাকুক, পরার্থ ধর্ম্মই যে সভ্যতার শেষ সীমা, তাহা উভয়েই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এবং উভয়েই বলিতেছেন যে, পরার্থ ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের আচরণ নিতান্ত নিন্দাজনক ও হানিকর। এই তথ্য যে জাতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই উন্নত, ও যে জাতি স্বীকার করিতে চাহেন না, সে জাতি নীচ শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য।

আমরা প্রকৃতই স্বার্থের বশীভূত, কিন্তু মুখে পরার্থ ধর্ম্মের আড়ম্বর করিতে ছাড়ি না। আমাদের স্বার্থে যতক্ষণ না মতে লাগিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা বেশ বলিতে পারি "পরার্থ-প্রয়োজনম্‌" ইত্যাদি। কিন্তু যখনই স্বার্থের কার্য্য একটু হানিজনক হইবার সম্ভাবনা, তখনই আমরা একটা সূতানোতা ধরিয়া সে ক্ষেত্রে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করি। পরার্থই

শ্রেয়ঃ ও অনুষ্ঠিতব্য—এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমরা বক্তৃতায় যতটা সম্মান প্রদর্শন করি, ক্রিয়া-কলাপে কিন্তু ততটা দেখাইতে আমরা বড়ই নারাজ। আমরা প্রায় সকলেই বলি—স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত; কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন সংসারক্ষেত্রে স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আত্ম-সংকারে তৎপব? আমরা বক্তৃতা-কালে বলিতে পারি, যে, আমরা বিশ্ববন্ধু, আমরা দীনবন্ধু, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে আসিয়া আমাদের গৃহের প্রাঙ্গনেই সেই বিশ্বের সীমানা শেষ হইয়া যায়,—বোধ হয়, প্রকৃত দীন হীন আমারই শিশুরা। ইহাদের জীবনে যাহা কিছু কষ্টকর, তাহারই বিপক্ষে আমরা খড়্গ ধারণ করি।

ধর্ম্মদ্বৈতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বঙ্কিম বাবুর ব্রাহ্মণ জমীদার। কিন্তু সে প্রাচীন জমীদার-শ্রেণী কি সমূলে নিঃশেষিত হইয়াছে? নিঃশেষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমূলে নহে। সেই মূল হইতে কালবশে অন্য বৃক্ষ উদ্ভূত হইয়াছে,—সেই বৃক্ষটী নূতন যুবক সম্প্রদায়—আমরা। আমরা প্রাতঃকালে মনোনিবেশ করিয়া গীতা পাঠ করিয়া দুই প্রহরের মধ্যে যথেষ্ট গর্হিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে লজ্জা বোধ করি না। তখন ধর্ম্মভাব, বন্ধুভাব, দেবভাব কোথায় লীন হইয়া, আমাদের পৈশাচিক ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, যে, একই মনুষ্য পরস্পর-বিরুদ্ধ নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু প্রকৃত বৃত্তান্তে অধিকতর আশ্চর্য্যের কারণ আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে স্বদেশ-হিতৈষী, বদান্য ও কৃতবিদ্য কোন রাজা বাহাদুর যুবকগণকে বলিতেন "অভাগা ব্যক্তিগণের সহিত ব্যবহার করিবে না, তাহাদের সংস্রবে আসিবে না, ও তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিবে না।" সম্প্রতি তিনি বর্ত্তমান নাই, তাঁহার নামোল্লেখেরও প্রয়োজন নাই; কিন্তু উক্ত পরামর্শটী যে স্বার্থধর্ম্মের কি জলন্ত দৃষ্টান্ত, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। আধুনিক সভ্যতার মধ্যেও এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা দেব-প্রতিমার সম্মুখে একধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সংসারক্ষেত্রে পদে পদে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় কার্য্য করেন। ইংরাজী প্রণালীর চিকিৎসক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্যক্তিগণ অনায়াসে এক সময়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়া দেন ও পরক্ষণেই বিরুদ্ধমতাবলম্বী ইংরাজী শাস্ত্রের ধূয়া ধরিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ অন্তর্দৃষ্টির অভাব। উভয়

শাস্ত্রের তুলনা করিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি নাই বলিয়া, উভয়ের পার্থক্যটুকু বোধ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, সকলেরই এমন ঘটনা স্মরণ হইবে, যাহাতে হাস্য-সংবরণ অসম্ভব। লেখকের জ্ঞানগোচরের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জাল, মিথ্যাসাক্ষ্য ইত্যাদি কার্য্য সমাপন করিয়া গঙ্গায় এক ডুব মারিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। সুরাপায়ীদিগের মধ্যে গঙ্গাভক্তি ও কালীভক্তি ইহার অন্যতর উদাহরণ।

দেবভাব ও অসুরভাব বিভিন্নাংশে মিলিয়াই মানুষ;—কখনও দেবভাব প্রবল, কখনও অসুরভাব প্রবল; কিন্তু সর্ব্বদাই উভয়ের সংমিশ্রণ আছে, কেবল প্রাবল্যের তারতম্য। এই প্রাবল্য অনুসারেই আমাদের ক্রিয়া-কলাপ; উভয়ের একটা সমন্বয় থাকিতে কখনও দেখা যায় না। মনুষ্য অস্থির-প্রকৃতি—সুতরাং দেবভাব ও অসুরভাবের সাম্যাবস্থা তাহার জীবনে নাই। অসুরভাব প্রথমে প্রবল থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে (অথবা ভগবানের দয়ায়—অথবা কোন অজ্ঞাত কারণে) অসুরভাব ক্ষীণতর হইয়া যায় এবং দেবভাবের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। প্রথম অবস্থায় অসুরভাব প্রবল, দেবভাব ক্ষীণ; তৎপরে ক্রমশঃ অসুরের পরাক্রম হ্রাস হইয়া, দেবতার জয় হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত-সম্বলিত গল্প পুরাণাদিতে বোধ হয়, বহুশত স্থানে নিহিত দেখা যায়। জাতীয় ও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি একই প্রণালীতে সাধিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত জীবনেও এই বৃত্তান্ত প্রায়ই নয়ন-গোচর হয়—একটু নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে সকলেই আপন আপন জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত সংকলন করিতে পারিবেন। মনুষ্য-জীবনে নিরপেক্ষ বিচার অতি বিরল—নিরপেক্ষ ভাবের আবেশ কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সময়-বিশেষে নিরপেক্ষতা উপহসিত হইয়া থাকে। এই নিরপেক্ষতা দেবভাব ও অসুরভাবের সাম্যাবস্থা। কিন্তু এই সাম্যাবস্থা বড়ই বিরল; সর্ব্বদাই যেন দেবাসুরে সংগ্রাম চলিতেছে ও দেবগণ পরাজিত হইতেছেন। কিন্তু অন্তিমে পরম কারুণিক পরমেশ্বর (কোনও অজ্ঞাত নিয়মে?) মধ্যবর্ত্তী হইয়া দেবগণকে জয় দান করেন। দেবগণ অসুরভয়ে সদাই শঙ্কিত। কোন্ সময়ে অসুরভাব আসিয়া দেবভাবকে পরাস্ত করিয়া মানবের হৃদয়টুকু অধিকার করিবে, তাহা গণিত সাহায্যে বলা এখনও আমাদের সাধ্যাতীত হইলেও, আমরা সদাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, এক সময়ে আমাদের দেবভাব জয়ী, অন্য সময়ে অসুরভাব জয়ী।

বিচারাসনে বসিয়া কাহাকেও বা নিরপরাধে কঠিন কারাদণ্ড, কাহাকেও বা গুরুতর অপরাধে অব্যাহতি দিয়া থাকি। এই প্রকার অসঙ্গত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে বিরল নহে; কিন্তু এতদ্রূপ অসঙ্গত ব্যবহার কি নিতান্ত অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক নহে? আপত্তি হইতে পারে, যে, এই রূপ অর্ব্বাচীনতা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং ইহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু যে জাতির জ্ঞান এ পর্য্যন্ত স্পর্দ্ধিত হয় নাই, যে জাতির ইতিহাসের শতাংশ-মাত্রও অতুলনীয়, সে জাতিতে নীচপ্রবৃত্তির আবেশ অত্যন্ত দুঃখের কারণ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

আমাদের জাতিমধ্যে যে আত্ম সংস্কারের উদাহরণ একবারেই নাই, একথা বলা যায় না; বরং ইহাই বোধ হয়, যে, যেমন স্বার্থ সন্ধানে মগ্ন, ঘোর সাংসারিক; তদ্রূপ বিপরীত কেন্দ্রে সংসার-ত্যাগী আত্ম-বিস্মৃত শুষ্ক-পর্ণ-ভোজী সন্ন্যাসীও অপরিচিত ব্যক্তি নহে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কেহই সামাজিক-অবস্থা-ব্যঞ্জক নহে। সাংসারিক ব্যক্তির মতে সম্ভবপর আত্মসংস্কার সকলেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতে যেন স্বকীয় উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত বা অন্য কোনও প্রকার ক্ষতি না ঘটে। সকল সাংসারিক ব্যক্তিরই এই উপদেশ; সকলেরই কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে, কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব। ঘোর সাংসারিক কেবল এই বলিয়াই নিরস্ত নহেন। পুত্র অনভিজ্ঞ ভাবে আত্ম-সংস্কার করিয়া পাছে সাংসারিক উন্নতির হানিজনক কর্ম্ম করেন, এই আশঙ্কায় প্রাজ্ঞপিতা নিরপেক্ষ আত্ম-সংস্কার হইতে পুত্রকে বিরত করিবার জন্য নানা যুক্তিতর্ক দেখাইয়া থাকেন। নিরপেক্ষ আত্মসংস্কারের অযৌক্তিকতা যুবকের নিকট প্রতিপাদন করিবার জন্য কতই যুক্তিতর্ক প্রযুক্ত হয়! তাঁহাদের মতে কোন বিষয়েরই বেশী কিছু নহে; সংসারে স্বার্থ ও পরার্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী পথ অনুসরণ করাই তাঁহাদের মতে বিধেয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থক যুক্তিরও অভাব নাই। যদি সকলেই আত্মসংস্কারে রত থাকেন ও স্বকীয় মঙ্গলের চেষ্টা করিয়া পরের উপকারে ব্রতী হয়েন, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, পরস্পরের উন্নতি-সাধন-চেষ্টায় সমাজে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে ও অবশেষে সকলেরই অসুবিধাজনক হইবে। বরং সমাজে আত্ম-সংস্কার অভ্যস্ত করিবার পক্ষে একটু স্বার্থের অস্তিত্ব থাকা সুবিধাজনক। আর এই স্বার্থজ্ঞানটুকু না থাকিলে পরার্থজ্ঞানের মর্য্যাদা থাকে না।

এই যুক্তি মনোরম হইলেও নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। এই যুক্তি-প্রয়োগে যে সামাজিক অবস্থার কল্পনা করা হইয়াছে, সেই অবস্থার প্রকৃত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা আবশ্যক।

যে সমাজে সকল ব্যক্তি অন্য সকলের মঙ্গলের চেষ্টায় ব্যাপৃত, সে সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা কি? আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যাহাকে মঙ্গল কহা যায়, তদবস্থাপন্ন হইলে কি তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলিয়া বোধ করিব। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি ইহার বিরুদ্ধে;—আত্ম-সংকার অভ্যাস করিতে অন্যান্য অনেক গুণের আবির্ভাব হয়। যাঁহারা মুখে পরার্থ-প্রয়োজনের আড়ম্বর না করিয়া, পরের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সুখসঞ্চয়ের জন্য জীবনপাত করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা প্রকৃতই অতুলনীয়। যাঁহারা মমতা-বিরহিত হইয়া আপন পুত্র-কলত্রাদি অন্যের অপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করেন না, তাঁহারা স্বভাবতঃই ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থান্বেষণে অপারগ। বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজের এক ব্যক্তির মঙ্গল অর্থাৎ আর এক ব্যক্তির অমঙ্গল; কিন্তু উন্নতমনা সমদর্শী ঋষির ভাব অন্যতর। তিনি সামাজিক ধন, মান ইত্যাদি মঙ্গলের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না; এবং না করার কারণও যথেষ্ট আছে। যখন সমাজের সকলে সংকারী হইয়া উঠিবে, তখন কেহই ধন, মানের জন্য লোলুপ হইবে না, কিন্তু সকলেই একত্র হইয়া অন্যান্য সমাজগুলির মঙ্গল সাধনে তৎপর হইবে। যখন সকল সমাজই এইরূপ উন্নতাবস্থায় নীত হইবে, তখন মনুষ্য-জাতি এক অভাবনীয় স্বর্গীয় অবস্থায় পরিণত হইবে—তখন সকলই মধুময় ও সুখকর। আমরা এতই নিকৃষ্টাবস্থায় বর্ত্তমান যে, সেই উন্নত ভাবটী আমাদের কল্পনাতীত। কিন্তু সেই অবস্থার দিকে মনুষ্য-জাতি ক্রমশঃই অজ্ঞাতসারে যে অগ্রসর হইতেছে, তাহা অজ্ঞাতবাদী (Agnostic) হর্বার্ট স্পেন্সারও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় পৌঁছিবার কি কোন আপাতসুখময় পথ প্রস্তুত আছে? তাহা নহে, প্রতি পদে আসন্ন মৃত্যু; এই মৃত্যুকে, মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়া, যাঁহারা বীরপদার্পণে সমাজক্ষেত্রে মৃত্যুকে নগণ্য করিয়া কর্ত্তব্য-পথে চলিয়া যান, তাঁহারাই প্রকৃত বীর। এই কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হই কেন?—জ্ঞান আছে, পরার্থই প্রয়োজন। কিন্তু সম্মুখেই ভয়—বিনা-আহারে সন্ততিবর্গের প্রাণবিনাশ! এই আতঙ্কে প্রকৃত বীর ভীত নহেন,—আবশ্যক মত সকলেরই মঙ্গল-সাধনে তৎপর। বিবেচ্য কথা একটী আছে,

—পরম কারুণিক পরমেশ্বরের বিধানে মৃত্যু বড় শীঘ্র আসিয়া পৌছে না। আত্মসংকারে আত্মঘাতী হওয়ার সুবিধা বড়ই বিরল। সংসারের প্রকৃত অবস্থা ও ক্রমবিকাশ পরীক্ষা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, যে, বর্ত্তমান সমাজে আমি যতই আত্মসংকারে প্রবৃত্ত হই না কেন, আমি পরকীয় অমঙ্গল চেষ্টা যতক্ষণ না করিতেছি, ততক্ষণ আমার বিনাশ নাই। কারণ আমার আত্মসংকারের উপর নির্ভর করিয়া সমাজের অন্য ব্যক্তিগণ যতই নিশ্চেষ্ট হউন, তাঁহাদের সকলেরই ভয় আছে যে, আমার অর্থ শীঘ্রই নিঃশেষ হইলে, তাঁহাদের ভবিষ্যতে দুর্দ্দশা সঙ্কিত হইবে; সুতরাং আবশ্যকমত অর্থসঞ্চয়ে সকলেই যত্নবান্। অতএব আত্মসংকারী ব্যক্তির কোনও ঘাতই লাগিল না। ইহাই বর্ত্তমান সমাজের প্রকৃত অবস্থা। যে ব্যক্তি আত্মসংকারে রত, সে তাহার সমস্ত ধন, মান, গৌরব দান করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যদি প্রকৃত স্বরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ধনদানে তাঁহার আনন্দ ব্যতিরেকে নিরানন্দের কোন কারণই নাই। তাঁহার ধনদানই আনন্দ। তাঁহার যাহা কিছু আছে, সব দান করিয়াই তিনি সুখী। দান করিলেই নিঃশেষ, কিন্তু অর্থ নিঃশেষিত হইলে তিনি পরের অমঙ্গলাশঙ্কায় অর্থোপার্জ্জনে রত হইবেন না। তিনি আতুর ব্যক্তিকে অর্থদান করিয়া, ভাণ্ডার নিঃশেষিত করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত যে, অর্থোপার্জ্জনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল নাই। অর্থ লইয়াই মনে দ্বেষ, হিংসা—কষ্ট, দুঃখ। সুতরাং মঙ্গল কোথায়? যদি তিনি প্রকৃতই প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্য তিনি বন্যফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ শীর্ণ দেহে, সমাজের বা সংসারের উন্নতি-চেষ্টায় ব্রতী থাকেন। সমাজে তাঁহাকে অসম্মান করিলে, তিনি কুণ্ঠিত হয়েন না; কিন্তু অনশনে শুষ্কপর্ণ-ভোজনে জীবন শেষ করিয়া থাকেন। তিনি কুণ্ঠিত হয়েন না, কখনই কুণ্ঠিত নহেন, ভীতও নহেন; আত্মসংকারে আনন্দ উপভোগ করেন। আত্মসংকার ভিন্ন অন্যতর উপায় নাই, উদ্বেগ নাই, অভাব নাই; সুতরাং, আনন্দ, চিরানন্দ, পূর্ণানন্দ। ইহাঁর মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু নামে ভয়ে আতঙ্কে আমরা যে চমৎকৃত হই, তাহা এই আনন্দপূর্ণ জীবের মনে প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার মৃত্যু-ভয় নাই, মৃত্যু নাই।

ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ। ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। কোথা হইতে একটী উন্নত ভাব আসিয়া, কোন সাধুর অন্তর হইতে গাহিয়া

উঠে, ও পল্লীস্থ জন মানবকে মাতাইয়া তুলে। প্রথম বার এতই সুমধুর, বুঝি সে স্বর থামিলে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র হইবে! কিন্তু শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইলে পর, তাহার আকর্ষণশক্তি কিছু কমিয়া যায়। সংসার-রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত মানব ক্ষণেকের তরে স্বর-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া পরক্ষণে স্বার্থ-প্রয়োজন-সাধনে উন্মত্ত হইয়া উঠে। ধর্ম্মশিক্ষার মাধুর্য্য সকলে স্বীকার করেন কি না, জানি না; কিন্তু নূতন স্বর পুরাতন হইয়া যেমন আর চিত্তাকর্ষক হয় না, তদ্রূপ অভিনব উন্নততর ধর্ম্মভাবও কালক্রমে মনুষ্যের অভ্যস্ত হইয়া চিত্তকে আর উত্তেজিত করে না। কিন্তু মধুর স্বর যেমন স্বরামোদী ব্যক্তির নিকট চিরনূতন থাকে, তদ্রূপ অভিনব উন্নত ধর্ম্ম-ভাব পবিত্রাত্মা ব্যক্তিকে প্রতিক্ষণে নূতন তেজ, নূতন জীবন দান করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এ প্রকৃতির মানবসংখ্যা অধিক নহে। সমাজের ব্যষ্টীভূত অধিকাংশ ব্যক্তিই সংসার-মোহে পীড়িত। দেখা যাইতেছে যে, মানব যত উন্নত হইতেছে, যতই পবিত্রতর হইতেছে, সংসার-মোহ ততই ক্ষীণ হইতেছে, আমরা আত্মসংস্কারে অধিকতর তৎপর হইতেছি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়—ভীতি-চমকিত হইতে হয়। অন্যান্য সমাজও আমাদের সহিত উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে—কিন্তু তাহাদের দর্শন-মাত্রেই জীয়ন্ত বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ—হায়! ইহার প্রতি রন্ধ্রদ্বারে, প্রতি শিরায়, প্রতি স্নায়ুতে কি ভীতিপ্রদর্শক শিথিলতারূপ পচ্যমান্ দুর্গন্ধ অনুভূত হইতেছে না? পাশ্চাত্য সভ্যতা আজি আমাদের অনেক প্রকারে লজ্জিত করিতে-ছেন, কটু বলিতেছেন, বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন—কিন্তু আমা-দেরই সামাজিক গৌরবে এককালে ধরা গর্ব্বিত ছিল। আমরা দরিদ্র,—বিদ্যা, বুদ্ধি, ব্যবসায় অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা আমাদের বুঝি নাই, কিন্তু ধর্ম্মোন্নতিতে, আত্মজয়ে, কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অচিরকাল মধ্যেই সকল সমাজের সমক্ষে উন্নত আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে আমাদের বুক বাঁধা উচিত। আমরা হীন—কিন্তু হীন অবস্থা হইতেই জীব উন্নততর অবস্থায় পরিণত হয়। ধর্ম্মে আস্থা আমা-দের পৈতৃক গুণ,—সে গুণটী আমাদের একবারে নাই এমন নহে, তবে বিজাতীয় সংঘর্ষে মৃতপ্রায়। সেই আকস্মিক আঘাত হইতে আমরা পুন-র্জ্জীবিত হইতেছি। আশা করি,—পুনরায় জীবনলাভ করিব। কিন্তু চেষ্টা

আবশ্যক—ইচ্ছা আবশ্যক। আমাদের স্বাভাবিক নিস্পন্দতা দূব করিতে না পারিলে অন্য সমাজের সঙ্ঘাতে অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সচেষ্ট হইবার কাল শীঘ্রই অতিবাহিত হইবে—প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন-সঙ্কট ঘনীভূত হইতেছে। সাহিত্যের উন্নতি, ইতিহাসের ও ঐতিহাসিক ঘটনাব অনুসন্ধানে সমাজ উন্নত হইবার সম্ভাবনা বটে; কিন্তু, যতক্ষণ না আত্মসৎকার আমাদের জাতীয় লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে—ততক্ষণ আমাদের সামাজিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে পরার্থ-প্রয়োজনে প্রীতি জন্মাইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে—নচেৎ বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে সংসার হইতে আমাদিগকে অপসৃত হইতে হইবে।

"উদর ভরণ লাগি কতেক আকার।
কিবা হৈব এ লোকের নাহিক উদ্ধার॥"

(চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

কবিতা-কানন।

উদাসিনী।

কি লগনে পেখনু, শ্যাম-সুঠাম সই,
পরাণ বিভল মোর ভেল;
পীরিতি-কনক-পাশে, কণ্ঠ বেঢ়ল মোর,
পাগল চিত জনু কেল।
হিয়াক বিকায়নু, শ্যাম চরণ তলে,
জীব যৌবন দিনু ডালি,

টুটল পরাণ যব, ফিরিনু রাখই সখি,
কদম্বমূলে বনমালী।
বঙ্ক সো বর ঠাম, পৈঠল চিতে মোর,
কৈছে রহব অব গেহে?
নিমিখে পরাণ মঝু, চোরায়ল চিত-চোর,
তেজই মোহে শূন দেহে!
শাঙর চন্দিম তাক, উজোর নয়ান জোর,
চান্দকি ভাতি করু ক্ষীণ,
পড়ল সো যব দিঠি, করল রাধাক চিত,
সো বর চরণযুগে লীন!
আজু রজনী হাম্, কৈছনে গোঙায়ব,
কানুক বিনু শূন গেহে,
কাহে সজনি ওলো, তেজই যমুনাতীর,
ফিরাইনু শূন বাসে মোহে!
শ্যাম ধনে যো ধনী, সো কি কভু বিলসই,
অযুত পূর্ণিম-চন্দ-হারা?
তহি লো বিনু কানক, সগর জগ আঁধার,
ঝুরয়ে নয়নে বারি-ধারা।
সো ধন হৃদি-রমণ, না ভেল ইহ জনমে,
ইথে লাগি দুখ নাহি মোর;
জনমান্তরে জনু, করয়ে রাধাক বিহি,
শ্যামক সো অতুল কোর।
কবি কহ ধৈরয, ধরসি লো সুন্দরি,
তুহার চরণে শ্যাম বারি,
অবহি পূরায়ব, সবহুঁ পিয়াসা তুয়া,
আনই মোহন মুরারি।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

নববর্ষ।

দিন যায় মাস যায়, যায় যত বর্ষ।
ক্রমে হয় তনু ক্ষীণ দূরে যায় হর্ষ॥
মনের পবিত্র ভাব কোথা চলি যায়।
অপবিত্র শুষ্ক ভাব আসিয়া দাঁড়ায়॥
বাল্যের সে কমনীয় ভাব সুমধুর।
যৌবনের নব ক্ষেত্রে নহে সুপ্রচুর॥
মনে হয় গত সুখ আনি যেয়ে ডেকে।
হৃদয় জুড়াক, পাই পরিত্রাণ শোকে॥
কত কথা কত গল্প কত বন্ধু সনে।
কহিতাম হিয়া খুলি আনন্দিত মনে॥
ভাবিতাম এইরূপে যাইবে জীবন।
এখন সে সব দেখি "নিশার স্বপন"॥
কত আশা কত ভাব হইত উদয়।
বুঝি বা ভবিষ্যচ্ছবি অতি মধুময়॥
এখন স্মরিয়া সেই অতীত বারতা।
মরমে পেতেছি হায় কত কষ্ট ব্যথা॥
তুলনায় দেখিলে অতীত বর্ত্তমান।
পাইবে অতীত শ্রেষ্ঠ উচ্চ সে আসন॥
নব ভাব পাব ব'লে লোক যত ধায়।
দুর্গম দুঃখের পথে ততই দাঁড়ায়॥
উদ্যম, ভরসা, চেষ্টা, হৃদয়ের বল।
ভাবিতাম কালে বুঝি হইবে প্রবল॥
ক্রমেই সে সব দেখি নিস্তেজ আকার।
ভবিষ্য জীবন মম ঘোর অন্ধকার॥
হাসিতাম প্রাণ খুলি কতই তখন।
নীরব মরম অশ্রু সম্বল এখন॥
দিন যায়, মাস যায়, যায় যত বর্ষ।
ক্রমে হয় তনু ক্ষীণ, দূরে যায় হর্ষ॥

একটী স্মৃতি।

অতীত আঁধারে, শিশু-স্মৃতি-দ্বারে,
সে মূর্ত্তিখানি!
আধ মনে ভাসে, কভু শূন্যে মেশে,
সে স্বপ্নবাণী!
খেলা আবদার শিশু-অত্যাচার,
মাঝে রাজে সেই মূরতি ছায়ার,
সোহাগ করুণা স্নেহ পারাবার,
ক্ষুদ্র আমি তা'তে, মধুর প্রভাতে,
ভাসিয়া যাই।
পুনঃ যেন সেই কুহেলিকা ঢাকা,
মমতার ছবি কালিমায় মাখা,
আননে বিষাদ আশা-ভস্ম রেখা,
রোগ-তপ্ত দেহ, অশান্ত সে গেহ,
দেখিতে পাই।
সে যে মধুমাস! মলয় সুবাস,
দি'ছিল আনি,
ব্যাধি যাতনায়, অহি শ্বাস তায়,
লইল মানি।
ভুলিয়া সংসার নবরাগে ভরা,
অপূর্ণ যৌবন আশার পশরা,
পুত্র মায়াডোর ধরা মনোহরা,
জরা-জীর্ণ পিতা, নবীনা দয়িতা,
বাসনা শত;—
ভাবিল জীবন তুষানল বাস,
চির মুক্তি তরে আকুল তিয়াষ,
"গঙ্গায় নে যাও"—শ্রবণে সে ভাষ,
এখনো ধ্বনিত— হানা ঘরে শীত-
বায়ুর মত।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

বিবিধ।

ক। এক বিষয়ে আমি বড় সৌভাগ্যবান্,—আমার স্ত্রীর মত মিতব্যয়ী জগতে আর নাই।

খ। বটে? তবে ত তুমি যথার্থই ভাগ্যবান্।

ক। তাতে আর সন্দেহ আছে? আমি যা রোজগার ক'রে আনি, আমার স্ত্রী তা থেকে আমায় এক পয়সা খরচ ক'রতে দেয় না, সমস্ত নিজের গহনা গড়িয়ে জমিয়ে রেখে দেয়।

চারি বৎসরের শিশু ভোলা তাহার মাকে বলিল "মা আমার একটী ছোট ভাই থাক্‌লে বেশ হ'ত।"

মাতা। কেন বল্ দিকি?

ভোলা। তা হ'লে বেশ আমি তাকে আমার ঠেলা-গাড়ীতে চড়াতেম।

মাতা। এই জন্যে? কেন তোমার ত অনেক পুতুল আছে, তাদের চড়ালেই ত হয়?

ভোলা। না মা, পুতুলে ভাল হয় না। যতবার গাড়ি উল্টে যায়, ততবার তাদের হাত পা ভেঙ্গে নষ্ট হ'য়ে যায়।

মাদক-নিবারিণী সভার সভ্য।—তারক বাবু একজন মাদক-নিবারিণী সভার প্রধান সভ্য। তিনি একদিন মদন বাবুর পুত্র রাখালকে মদ কিনিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে রাখাল! মদ কার জন্যে নিয়ে যাচ্চিস?"

রা। বাবার জন্যে।

তা। সে কি? তোর বাবা যে আমাদের সভায় নাম লিখিয়েছেন, আর প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর ক'রেছেন যে, আর কখনও মদ্যপান ক'র্‌বেন না।

রা। আজ্ঞে, সেই অবধি ত বাবা মদ্যপান ত্যাগ ক'রেছেন, কেবল রুটি মদে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খান।

বুদ্ধিমান্ বালক।—মাঠে এক পাল গরু চরিতেছে দেখিয়া বালক তাহার পিতাকে বলিল, "ঐ শাদা গরুগুলোর কাছ থেকে আমরা দুধ পাই, আর ঐ কাল্‌লা গরুগুলোর কাছ থেকে আমরা চা পাই,—না?"

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। [৫ম সংখ্যা।

ইন্দিরা।

(অনুশীলন।)

ইংরাজীতে যাহাকে Memoir বলে, ইন্দিরা সেই ধরণে লিখিত। ইহাকে একখানি Romantic Memoir বা অলৌকিক আত্মকাহিনী বলা যাইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে অলৌকিকতার লক্ষণগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছি, অতএব উহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দস্যু কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব অবহৃতা হইয়া ইন্দিরা যখন বলিল, "তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল!" তখন একজন প্রাচীন দস্যু সকরুণভাবে (?) বলিল "বাছা! অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব?" একজন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" তখন ঐ প্রাচীন দস্যু সেই যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়িতে এইখানে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও-সকল পাপ কি আমাদের সয়?" ইন্দিরা সুন্দরী ও যুবতী; ডাকাতেরা তাহার

সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছিল, এমন কি তাহার বহুমূল্য পরিধেয় বস্ত্রখানির পরিবর্ত্তে তাহাকে একখানি ছেঁড়া মুড়া কাপড় দিয়াছিল। ইন্দিরা বলিতেছে, "যে ছেঁড়া মুড়া কাপড়টুকু ডাকাইতেরা আমাকে পরাইয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন মতে কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে—আমার বুকে কাপড় নাই।" রমণী-সৌন্দর্য্যের জন্য ট্রয ধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে এরূপ অবস্থায় দুর্বৃত্ত ডাকাইতেরা সেই বৃদ্ধ সর্দ্দারের লাঠির ভয়ে নিরস্ত হইল, লাঠির আঘাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া দিল না, ইহা একটু অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়। ডাকাইতের এই Ethics বা নীতি-জ্ঞান অনেক সময়ে ভদ্র-সমাজেও বিরল।

যাহা হউক, ইন্দিরা একখানি সুখপাঠ্য আত্মকাহিনী বটে; তবে "বিষ-বৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইলের" মত ইহাতে প্রাণস্পর্শী ঘাত-প্রতিঘাত কিছুই নাই। সেক্ষপীয়রের Merchant of Venice কিম্বা A Midsummer night's dream হইতে ম্যাকবেথ, কিম্বা ওথেলোর যে প্রভেদ, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল হইতে ইন্দিরারও সেই প্রভেদ। ম্যাকবেথ, ওথেলো, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে সৎ ও অসতের সংগ্রাম—আত্মার অধঃপতন বা মুক্তি ("The ruin or the restoration of the soul") ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। এই কঠিন সংগ্রাম আমরা দূর হইতে উৎকণ্ঠার সহিত অবলোকন করি; এই সংগ্রামে যে বীর জয়ী হয়েন, আমরা তাঁহার প্রশংসা ও পূজা করি, এবং যে পরাজিত হয়, তাহারও প্রতি আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করি। সংসারে এই সৎ ও অসৎ প্রকৃতির সংগ্রামই —আত্মার এই অধঃপতন বা মুক্তিই—সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী। কিন্তু ইন্দিরাতে তাহা নাই; সেই জন্য বলিয়াছি, ইন্দিরা সুখপাঠ্য হইলেও প্রাণস্পর্শী নহে—মানবী-হৃদয়ে চিরস্থায়ী ধারণা বদ্ধমূল করিতে অক্ষম। ঐরূপ গভীর ও চিরস্থায়ী ধারণা বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর পাঠে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। ইন্দিরা, রজনী বা বঙ্কিমবাবুর অপর কোনও পুস্তকপাঠে হয় না।

ইন্দিরা ছোট ছিল, বড় হইয়াছে; ইহার জন্য গ্রন্থকার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—"ভগবানের ইচ্ছায় নিত্যই ছোট বড় হইতেছে। রাজার কায ত এই দেখি—ছোটকে বড় করিয়া, বড়কে ছোট করেন। সমাজও, দেখিতে পাই, বড়কে

ছোট, ছোটকে বড় করেন। * * * তবে কথাটা এই যে, বড় হইলে দর বাড়ে। রাজার কৃপায় যাঁহারা বড় হয়েন, তাঁহারা বড় হইলেই আপনার আপনার দর বাড়াইয়া বসেন। এমন কি পুলিসের জমাদার যিনি এক-টাকা ঘুষেই সন্তুষ্ট, দারোগা হইলেই তিনি দুই টাকা চাহিয়া বসেন, কেন না বড় হইয়া তাঁহার দর বাড়িয়াছে। * * * তবে ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট, ছোট থাকিলেই ভাল। ছোট লোক বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে? কিন্তু অনেক ছোট লোকেই তাহা স্বীকার করিবে না। ইন্দিরা কেন তাহা স্বীকার করিবে?" রহস্যনিপুণ বঙ্কিম-বাবু রসিকতা-ছলে যে কঠোর সত্যগুলি বলিয়াছেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ আছে কি?

ইন্দিরা বড় হইয়া আমাদের বিবেচনায় মন্দ নই করিয়াছে, মন্দ করে নাই। এমন দু-এক জন ছোট, বড় হইয়া ভাল হইয়া থাকে,—একবারেই যে হয় না, তাহা বলা যায় না; গ্রন্থকার স্বয়ংও বলেন নাই। আজ কাল তুলনায় সমালোচনা করা একটা বিষম রোগ দাড়াইয়াছে, সেই জন্য আজ কাল বঙ্গদেশে গ্যারিক, মিসেস ডন্‌স্, বায়রণ, স্কট প্রভৃতির অভাব নাই। এইরূপ সমালোচনা দেখিলে ফ্লুয়েলিনের কথা মনে পড়ে,—ম্যাসিডন ও মনমাথ এই উভয় স্থানেই নদী আছে এবং সেই নদীতে স্যামন্ মৎস্য আছে। যা'হ'ক এই রোগ এত সংক্রামক হইয়াছে, যে কোনও একটা বিলাতী নামের সহিত আলোচ্য ব্যক্তির তুলনা করিতে না পারিলে কিছুই হইল না। আমরাও ইতিপূর্ব্বে কুন্দনন্দিনীর সহিত ডেস্‌ডেমোনার ও রোহিণীর সহিত ক্লিওপেট্রার তুলনা করিয়াছিলাম। সে তুলনা সঙ্গত হইয়াছিল কি না, তাহা পাঠকেরাই বলিতে পারেন। কিন্তু ইন্দিরা-চরিত্র তুলনায় সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইন্দিরা বুদ্ধিমতী ও বিপদকালেও ধৈর্য্যশালিনী। ইন্দিরার আর একটী গুণ, সে বড় ঘরের মেয়ে হইলেও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আত্ম-নির্ভরতা হারায় নাই, বা শোকে একবারে বিহ্বলা হয় নাই। দুঃখের সময়েও সে সাত আট বৎসরের দুইটী ছোট মেয়ের গান অতি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিল। গানটী আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে, যে, উহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।——

অমলা—

ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

নির্ম্মলা—

ঘাট্‌টী জুড়ে, গাছটী বেড়ে,
ফুট্‌লো ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

অমলা—

বিনোদ বেশে, মুচ্‌কে হেসে,
খুল্‌ব হাসির কল।
কলসী ধ'রে, গরব ক'রে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

নির্ম্মলা—

গহনা গায়ে, আল্‌তা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
চিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

অমলা—

যত ছেলে, খেলা ফেলে,
ফির্‌চে দলে দল।
কতবুড়ি, জুজুবুড়ি,
ধর্‌চে কত জল।
আমরা, মুচ্‌কে হেসে, বিনোদবেশে,
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা, বাজিয়ে যাব মল,
সই, বাজিয়ে যাব মল॥

দুই জনে—

আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

গানটী অতি সুমিষ্ট, ইহার ছন্দোবন্ধ অতি সুললিত। কিন্তু একটি কথা আছে। এ গান সাত আট বৎসরের বালিকার নহে,—ষোড়শী যুবতীর। সাত আট বৎসরের বালিকারা ঐ গান বোধ হয়, রসিকা যুবতীদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ গান যে যুবতীর, তাহার প্রমাণ "ঢিমে চালে, তালে তালে, বাজিয়ে যাব মল" এবং "আমরা, মুচ্‌কে হেসে, বিনোদবেশে" ইত্যাদি! বিনোদবেশ, ঢিমে চাল ও মুচ্‌কে হাসি, তিনটীই যুবতীর একচেটে।

ইন্দিরা বড় ঘরের মেয়ে হইয়াও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পরের বাড়ী রাঁধিতে স্বীকৃতা হইল। এ স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "কেন, ইন্দিরা তা'র পিতার নাম ধাম বলিলেই ত পরের ঘরে দাসীবৃত্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। তবে বলিল না কেন?" ইহার উত্তর এই,—বলিলে গল্প মাটী হয়, রোমান্‌স্ মাটী হয়। অবশ্য রামী, বামী, শ্যামী হইলে আগে পিতা বা স্বামীর নাম ধাম বলিত, পুলিসে খবর দিত, কত কি করিত, এবং ঘরে ফিরিতে পারিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা ঘটে, তাহা লিখিলে নভেল নাটক কিছুই হয় না। আমরা ইন্দিরাকে প্রথমেই যে Romantic memoir আখ্যা প্রদান করিয়াছি, ইহাও তাহার একটী কারণ। অবশ্য ইন্দিরা পরে সুভাষিণীকে সমস্তই বলিয়াছিল এবং তাহাতে স্বামীর সন্ধানও হইয়াছিল। এই সুভাষিণী-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সুভাষিণী বিষবৃক্ষের কমলমণির কনিষ্ঠ সহোদরা বলিয়া বোধ হয়। কমলমণি-চরিত্র বঙ্কিম বাবুর এত ভাল লাগিয়াছিল (আমাদেরও লাগে) যে, উহার পুনরবতারণা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সেইজন্য সুভাষিণীর সৃষ্টি। সুভাষিণী কমলমণির কনিষ্ঠ সহোদরা, কেন না, কমলমণি-চরিত্র যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, সুভাষিণী-চরিত্র ততটা হয় নাই। তবে উভয়ের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট বুঝা যায়। কমলমণি যেরূপ রঙ্গ-রসিকতা-প্রিয়, সুভাষিণীও ঠিক্ সেইরূপ। উভয়েরই অন্তঃকরণ অতি কোমল, উভয়েই বুদ্ধিমতী, কিন্তু উভয়েরই এক একটী মন্ত্রী ছিল। কমলমণির মন্ত্রী শ্রীশচন্দ্র, সুভাষিণীর মন্ত্রী র-বাবু, কিনা রমণ বাবু। কমলমণির যেমন "সতু বাবু" ছিল, সুভাষিণীরও তেমনি একটী শিশু ছিল। কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে যেরূপ বশে রাখিতে পারিয়াছিল, সুভাষিণীও সেইরূপ পারিয়াছিল। উভয়েই স্বামীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কায করিত

না। তাই বলিতেছি, সুভাষিণী কমলমণির নামান্তর মাত্র অথবা কনিষ্ঠ সহোদরা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দিরা বুদ্ধিমতী, তাহার নিজেরও সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে একস্থলে বলিতেছে "আমি জানি যে, আমি বড় বুদ্ধি-মতী, জানিতাম না যে, সুভাষিণী আমায় এক হাটে বেচিতে পারে, আর একহাটে কিনিতে পারে।

"আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না" (ইহা খুব সত্য কথা)। "ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবু-টিকে দেখিয়া লইলাম।"

"দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ, তাঁহাকে দেখিয়াই রমণী-মনোহর বলিয়া বোধ হইল। আমি বিদ্যুচ্চমকিতের ন্যায় একটু অন্যমনস্ক হইলাম। * * * আমি একটু লজ্জিতা, একটু অসুখী হইলাম। আমি সধবা হইয়াও জন্ম-বিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামী-সন্দর্শন হইয়াছিল, সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণীনিক্ষেপে বুঝি তরঙ্গ উঠিল ভাবিয়া, বড় অপ্রফুল্ল হইলাম। মনে মনে নারীজন্মে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনের ভিতর মরিয়া গেলাম।"

মনে মনে ইন্দিরা আপনাকে শতধিক্কার দিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য পরপুরুষের প্রতি যে তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক হইলেও কখনই প্রশংসার্হ হইতে পারে না। ইন্দিরা তখন নিমন্ত্রিত বাবুটীকে নিজ স্বামী বলিয়া চিনিতে পারে নাই, সেইজন্য বলি-লাম, পরপুরুষের প্রতি তাহার অনুরাগ আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। তাহার স্বামীকেও আমরা প্রশংসা করিতে পারি না; তাহার কারণ, ইন্দিরার কথাতেই বলি, "তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া, মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি।"

সুভাষিণী ইন্দিরার স্বামীর জন্য একটু ওকালতি করিয়াছিল; ইন্দিরার পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া সে বলিয়াছিল "তোর মত বাদর গাছে নেই। ওর যে স্ত্রী নেই।" কথাটা সমাজের আইনে সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র-অনুমোদিত কখনই নহে। সুভাষিণীর নিকট ইন্দিরার "এক-জামিন্ পাসটা" বেশ মিষ্ট লাগে।

আমাদের দেশে বর বা নূতন জামাইয়েব সঙ্গে যেরূপ বঙ্গরসিকতা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা প্রভৃতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, "সেকালে যেমন ছিল" পরিচ্ছেদে তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন "এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে, বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে, কেন না ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি আসিয়া মিলিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে যাহারা জামাই দেখিতে পৌরস্ত্রীদিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাঁহাদের চোক্‌-কান ফুটাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি', করিয়া তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম।"

ইন্দিরার অপরাপর চরিত্রগুলি-সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছুই নাই। ইহাতে অনুশীলন-যোগ্য বিশেষ কিছুই নাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

অদল-বদল।

(প্রহসন।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুম্ভকারের ঘর।

অঘোর ও তাহার স্ত্রী।

বৌ। আজ রাত্তিরে ঘরে থেক'। ছি! অমন করে' বাইরে প'ড়ে থাকা কি ভাল দেখায়? আমি তোমার জন্যে হাপিত্যেশ করে' জেগে থাকি—ভেবে ভেবে রাত কেটে যায়। আজ আমার মাথা খাও, ঘরে থে'ক, তা'হ'লে বেশ নিশ্চিন্দি হ'য়ে সুখে ঘুমাবো।

অ। থাম্, থাম্; পাগ্‌লি কোথাকার। কাদাগুলো মেখে ঠিক্ করে' রেখেচিস্ ত? কাল যদি কাঠামোতে মাখাতে কম প'ড়ে, তা'হলে আচ্ছা করে' ঠেঙ্গিয়ে দিব।

বৌ। তা বই কি! আপনার বেলা বোঝ বেশ। রোজ, রোজ, ঘরের পয়সা খুইয়ে ভাঁটী থেকে ফিরে আস্‌বে—বেহদ্দ মাতাল হ'য়ে খেঁকি-কুকুরের মতন ঝেঁক্‌রে ঝেঁক্‌রে উঠ্‌বে, মার ধোর ক'র্‌বে—সেটা বুঝি খুব ভাল?

অ। তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা যে! আমার দাবানির দোষ দিচ্ছিস্? জানিস্, আমি এ বাড়ীর রাজা—আমি যা' বল্‌ব, তাই শুন্‌তে হবে। আর এমন করে' আমার নিন্দে করা তোর মস্ত অধর্ম্ম—রাজার সাম্‌নে রাজনিন্দে!

বৌ। কি কতক গুলো মাথা মুণ্ড বোক্‌চ! এমন সব কথাত কোথাও শুনিনি। আমি জোড়হাত করে' বল্‌চি, তোমার পায়ে ধরে' বল্‌চি, আজ আর ভাঁটিতে মদ খেতে যেওনা।

অ। আচ্ছা, আচ্ছা, আজকের জন্যে তোর কথাটা শুন্‌বো। দেখিস্, তাই ব'লে যেন তোর আস্পর্দ্ধা বেড়ে যায় না। আজকে আর ভাঁটিতে যাবনা কেন জানিস্? আজ বেজায় খ্যাঁট্ আছে,—ঐ রাজার বাড়ীর সরকার—ঐ যে ওর নাম কি—রামা, রামা—আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রেচে —আজ আমাকে বিলিতি মদ খাওয়াবে। রাজার বাড়ীর যে লম্বা দালান আছে, সেখানে আজ মদের গামলায় সাঁতার দিব—আর মদ খেয়ে রাজার মতন মাতাল হ'ব।

বৌ। সর্ব্বনাশ! তবে না শুন্‌তে পাই, রাণী বাইরের কোন লোককে দরজায় ঢুক্‌তে দেয় না। শুনিচি মাগী এমনি বজ্জাত যে, জনকতক অনাহারী অতিথি দুপুর বেলায় বাড়ীতে ঢুকেছিল ব'লে, তাদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। রাণীর কি এই কায?

অ। তা'র মরণ! সে আবার রাণী হ'ল কবে? মাগীটা বড ভাল ঘরের মেয়ে নয়—তবে শুনিচি খুব লেখা পড়া জানে—ইংবাজীতে পাশ—তাই দেখে আমাদের রাজা ভুলে গিয়ে তা'কে বিয়ে ক'রেছে।

বৌ। আমাদের রাজা বড় ভালমানুষ। এমন সোণার জমিদার আর হ'বে না।

অ। আর ভালমানুষ! পাগ্‌লি তুই বুঝিস্ কি? বড় মানুষদের চালই আলাদা। এখন সেই মাগীর হাতে প'ড়ে ভাল মানুষ রাজাও পাগল হ'য়ে উঠেছে। আজ রাণীকে সঙ্গে ক'রে কল্‌কাতায় গিয়েছেন—ঘোড়ার নাচ কি থিয়েটার দেখ্‌বেন বোধ হয়, আজ আর রাত্তিরে বাড়ী ফিরবেন না। রাজার বাড়ীতে আর ত কেহ নাই—তাই আমাদের আমোদটা আজ খুব জমকাবে, হরদম মজা চলবে—এমন দিন আর হ'বে না।

বৌ। তোমার সঙ্গে আমিও তবে যা'ব। আমি কখনও রাজার বাড়ী দেখিনি!

অ। তোর বড় বাড় বেড়েছে—তুই আমাদের সেই পাঁচ-ইয়ারের মাঝখানে যাবি, না? তোর একথা বল্‌তে একটু লজ্জাও কল্লে না? তোকে নিয়ে যা'ব কিরে? শেষকালে যে দশের মাঝখান থেকে তোকে নিয়ে আসাই দায় হ'বে।

বৌ। তা' আমাকে নিয়ে গেলে তোমার ইয়াররা আমাকে দেখে সুখী হবে. বৈ কি! আর তুমি ত ব'লেছিলে, একবার রাজার বাড়ী দেখাবে; তা' এই সুযোগে নিয়ে চলনা—আমি যে কখনও দেখিনি।

অ। ভারি আব্দার যে—দুষ্ট কোথাকার। যে তোর সোয়ামী—তোর মনিব, তা'র সঙ্গে সমান চাল, সমান উক্তি! যা' কাদা মেখে ঠিক্ কর্‌গে যা'—নইলে এখনি তো'র পাঁজরা ভেঙ্গে দিব। (ছড়া কাটিতে কাটিতে)—

সুন্দরী বৌ থাক্‌লে ঘরে,
শান্তি নাই তা'র তিলেক তরে,
নজর দেয় যে পোড়া লোকে,
রাখ্‌তে হয় তাই চোকে চোকে।
ঠেঙ্গান দিয়ে দিন দুপুরে,
ঘরের মধ্যে রাখ্‌বে পূরে।
খেতে দিবে আধপেটা ভাত,
কাছে থাক্‌বে সারাটী রাত।
বাইরে যেতে ক'র্‌বে মানা,
নহিলে বিপদ ষোল আনা।

বৌ। আমরা দুঃখিনী, কেনা দাসীর মতন রাত দিন খাট্‌ব; আর তোমরা পুরুষ হ'য়েছ, তোমাদের সাত খুন মাপ, যা'ইচ্ছে তাই ক'রে বেড়াবে—

অ। মাগীর আস্পদ্দা দেখ—এক্ষণি এই গরাণ-পেটা ক'র্‌ব—চ'লে যা' বল্‌চি।

বৌ। আচ্ছা ভাই চল্লুম।

(গমনোদ্যত)

অ। দাঁড়া দাঁড়া—এই নে ছ'টা পয়সা নে—মুদির ধার শুধিস্, আর তোর দোক্তা কিনিস্—খুসী হ'য়েছিস্ ত। যা', এখন কম্বল পেতে মজা ক'রে শুয়ে থাক্‌গে যা',—যেন কোথাও যাস্‌নি।

(ছড়া কাটিতে কাটিতে)

সুন্দরী বৌ থাক্‌লে ঘরে—ইত্যাদি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জমিদারের বাড়ী।

(রামা, চাঁপা, পদ্ম, ও অন্যান্য দাস দাসী প্রভৃতি।)

রা। আজ সেই অন্ধ ছোঁড়াটাকে আস্‌তে ব'লেছি। তা'র হাত বড় মিঠে —সে বেশ বেহালা বাজায়—আজ আর আমাদের রাক্ষসী গিন্নি বাড়ী নাই—আমি মনের সাধে বাক্স খুলে বিলিতি মদ বার ক'রে এনেছি —আজ সকলে মিলে রাজভোগ খাব। আজ বড় মজা।

চা। মদের কথা যেতে দে। আজকে আমাদের গিন্নি বাড়ী নেই, সেইটাই আমাদের পরম লাভ। এম্‌নি রণচণ্ডী যে, তা'র ঠেঙ্গানি না খেলে আমাদের দিন যায় না। মাগী যেন মেয়ে-মদ্দানী। সে থাক্‌লে এমন আমোদ আহ্লাদ করে কা'র সাধ্য?

(অন্ধ, অঘোর ও অন্যান্য প্রতিবেশীর প্রবেশ)

রা। এস এস, ভায়ারা সব এস—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। অঘোর দাদা এসেছ—বেশ ক'রেছ, আমি বড়ই সুখী হয়েছি। বলি, দাদা আছ কেমন?

অ। সত্যি বল্‌তে কি আমি বিলিতি মদ পেলে, আর কিছুই চাইনি। বল কি ভাই, পয়সা নাই, তাই ভাঁটাতে গিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। আজ ভাই তোর কল্যাণে বিলিতি মদ খেয়ে রাজার মতন মাতাল হ'ব। আর তখন এই গরিব প্রজার মেজাজটা দেখ্‌তে পাবি যে, রাজার চেয়েও দিল্‌দরিয়া। অধীন ব'লে তখন আর আমার জ্ঞানই থাক্‌বে না।

রা। আচ্ছা ভাই সকলে মিলে একবার এস—আমাদের ভরপুর মদের গাম্‌লাটাকে—আমাদের সাধের দেবী প্রতিমাকে উৎসব কর্‌তে কর্‌তে এখানে আসি। তারপর সেই প্রতিমার উপর উৎসবের গানের মুকুট পরিয়ে দিব।

(সকলের প্রস্থান)

(সকলের মদ্যপাত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও সকলের গীত।)

অনুরক্ত বড় ভক্ত আমরা তোমারি ;
কৃপা করি কৃপাকর ওগো সুরেশ্বরি !
ভাস্‌ব সবাই সুখের কোলে, সকল দুঃখ জ্বালা ভুলে,
ভক্ত ব'লে লওগো তুলে, আনন্দ বিতরি ;
পেয়ালা ভ'রে কর্‌ব পান, ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ,
গাহিব তোমার গুণ-গান, উঠ্‌বে আকাশ ছাড়ি'।
রেখ ক'রে চিরদাস, নূতন সুখে বার মাস,
জীবন যত পাবে হ্রাস, রাখ্‌বে তুমি ধরি' ;
থাকৃব সদাই তোমার ঝোঁকে, তোমার স্তুতি ছুট্‌বে মুখে,
রাঙ্গা চরণ সেবি সুখে, মরতে যেন পারি।

ব। এস আমরা পান করবার উদ্দেশে এইবার গান গাই :—

গীত।

চল্‌ চল্‌ চল্‌ লালে লাল কি তরল বারি ;
কানায় কানায় উপচে পড়ে ফেনার লহরী।
তুমি রাণী সুরেশ্বরী, তোমার রাজ্যে বস'ত করি,
আমরা যেন মাত্‌তে পারি, সারা বিভাবরী ;
সূয্যি সবে ব'স্‌লো পাটে, আমরাও সব দাঁড়িয়ে ঘাটে,
সাগরটাকে পানের চোটে, নিঃশেষে শেষ করি ;—
চন্দ্র যখন অস্ত যাবে, আমরা তখন ছাড়বো সবে,
নাচিতে গাহিতে থাক তবে, আমরা কা'কে ডরি ?

হুর্‌রো হো—

(রাজা ও রাণীর প্রবেশ।)

রাণী। এ কি ! কোথায় এলেম। আমরা নাই ব'লে একবারে আকাশ পাতাল তফাৎ যে ! এ যে দেখ্‌ছি একবারে নরককুণ্ড ! এ পিশাচের দল এল কোথা থেকে ? তোরা সব কেরে ?

রাজা। রাণি, এদের আর লজ্জা দিও না—চল আমরা ভিতরে যাই— ওরা একটু আমোদ করচে, আর আমার গরিব প্রজারাও এসে যোগ দিয়েচে। ওদিকে আর গিয়ে কায নাই—আমরা এসেছি দেখে ওরা আপনারাই লজ্জায় পালাবে। মিছে আর ওদের লজ্জা দিও না।

রাণী। তোমার কায তুমি দেখগে—আমার বাড়ী আমি শাসন ক'র্‌ব —তোমার হাত দেবার দরকার কি ? আমার লোকজনকে শাসাবার জন্যে তোমার হুকুম নিতে হবে নাকি ?

রাজা। ভুল হ'য়েছে—আমি মনে ক'রেছিলেম, আমারই বাড়ী আর লোকজনরাও আমার।

রাণী। তুমি তোমার গাড়ী, ঘোড়া, বাগানবাড়ী দেখগে, এদিকে আর তোমার দেখ্‌বার দরকার নাই। আমার অধীনের লোক আমি শাস্‌ব, রাজশাসন আর এখানে জানাতে হবে না।

রাজার গীত।

এই কি তোমার দয়ার বিচার হ'ল শেষকালে ;
কেন বিধি হেন নিধি আমার কপালে।
আমিই যেন নেশার ঝোঁকে, মত্ত হ'য়ে ভাবি সুখে,
বেঁধেছি যে তা'রে বুকে, শান্তি পাব ব'লে।
কিন্তু তুমি জেনে শুনে, জুটিয়ে দিলে কোন্ পুণ্যে,
এখন যে তা'র চোপার গুণে, মর্‌চি সদাই জ্ব'লে।

বিয়ের ফলটা দেখ্‌চি—কেবল ঝগড়া, গোলমাল, কথা-কাটাকাটি, মনের কথা চাপা,—এসব দেখ্‌চি বড় অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল।

রাণী। (রামা প্রভৃতির প্রতি) পাজি বেটারা কোথাকার—আমাদের সব জিনিস পত্র চুরি ক'রেছিস্, আর মজা ক'রে খাচ্চিস্! দাঁড়া,—আজ ভাল ক'রে শিখিয়ে দিচ্চি।

রা। না রাণী মা, আজ আমাদের পরবের দিন—তাই একটু আমোদ আহ্লাদ কচ্চি।

রাণী। গাধা কোথাকার—আজ তোর পরবের দিন? তাই তুই যা' মনে কর্‌বি, তাই করবি রে পাজী!—(প্রহার) নচ্ছার বেটীরা—তোরা এখানে কি কচ্চিস্? তোরা এদের সঙ্গে নাচ্‌তে এসেচিস্ নাকি? (চাঁপার কর্ণমর্দ্দন)

চাঁ। গেলুম রে, গেলুম রে, কাণ দুটো ছিঁড়ে গেল রে।

রাজা। থাম, রাণী, থাম—নিজের মান-মর্য্যাদা রেখে কায কর। তোমার আচরণ দেখে আমার লজ্জা হ'চ্চে।

রাণী। তুমি যাও যাও—তোমাকে আর শিখাতে হবে না। মুখ ঢেকে কে ওদিকে? (প্রহার)।

অ। আমি কিছুই জানি না রাণী মা, আমি শুধু মায়ের নাম গেয়ে থাকি। (পাশ কাটাইয়া পলায়নোদ্যত)

রাণী। এই তোকে গান গাওয়াচ্চি। (প্রহার)

অ। (পলাইতে পলাইতে) মাগীকে ভূতে পেয়েছে নাকি?

রাজা। (রাণীর প্রতি) তোমার ব্যবহার বড় মন্দ।

রাণী। তোমার ও কথা বলা ভাল দেখায় না, চুপ কর। যখন বিয়ে করেছিলে, তখন আমায় না বিয়ে ক'রে একটা জানোয়ার বিয়ে কর্ত্তে পারনি। মানুষে এসব দেখ্‌তে পারে না। কি দয়ার শরীর!

অ। (দূরে যাইয়া ছড়া কাটিতে কাটিতে)—

"সুন্দরী বৌ যা'র ঘরে,
শান্তি নাই তার তিলেক তরে" ইত্যাদি। (প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) ছড়াটা ঠিক্ বটে।

রাণী। পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার—

রাজা। তোমার লজ্জা কি একবারেই নাই?

রাণী। (অন্ধের প্রতি) ভারি বেহালা বাজাতে বসেচিস্ যে? দাঁড়া, তোর মাথা ভাঙ্গচি। (বেহালা কাড়িয়া লইয়া অন্ধের মস্তকে বেহালার আঘাত করাতে বেহালা চূর্ণ হইল)

অন্ধ। ওগো কে আছ গো, আমায় মেরে ফেল্লে গো।

রাজা। এই নাও তোমার জিনিসপত্রগুলো নাও—আর এই টাকা নাও, এতে তোমার দু'টো বেহালা হ'বে।

(অন্ধের প্রস্থান)

রাণী। তুমি যে একবারে দাতাকর্ণ হ'য়ে ব'স্‌লে। এমন ক'রে আমাদের টাকাগুলো বেয়ান্দাজ আর খরচ ক'র না বল্‌চি।

রাজা। ঘরে যাও, ঘরে যাও রাণি! ঠাণ্ডা হও গে।

রাণী। আমায় ঠাণ্ডা হ'তে বল্‌চ?

রাজা। বিয়ের যে এত জ্বালা তা' কে জান্‌ত? (দ্বারে আঘাত শব্দ) চাকররা সব গেল কোথা? সকলেই কি ভয়ে পালা'ল। ঐ যে হোথা একজন রয়েছে—ওরে কে আছিস্, দেখ না, কে এসেছে?

রাণী। ঐ যে হতভাগারা— ওখানে কেন?

(রামার পুনঃ প্রবেশ)

রামা। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে যে দৈবিজ্ঞি থাকেন, তিনি এসেছেন—আপনি তাঁ'কে চেনেন যে—সেই যে যাগযজ্ঞি ক'র্‌তে জানে, পাঁজি পুঁথি তৈয়ার করে—জিনিসপত্র হারালে বলে দেয়—ঐ উনি আস্‌চেন।

(দৈবজ্ঞের প্রবেশ)

দৈ। বড় অসময়ে আপনার কাছে এসে প'ড়েছি—

রাজা। (প্রণাম করিয়া) কি আদেশ বলুন ?

দৈ। আস্‌তে আস্‌তে আজ বড় রাত হ'য়ে গেল—আব এত অন্ধকার যে, চল্‌তে পাচ্চিনি—আপনি যদি একটু আশ্রয় দেন।

রাণী। বেরো বাড়ী থেকে—ভুতুড়ে কোথাকার !

দৈ। (স্বগত) আরে বাপ্‌রে, এ আবার কে এল ? এযে দেখ্‌চি, এক-বারে রণচণ্ডী-মূর্ত্তি। ঘোর পরিবর্ত্তন, ঘোর পরিবর্ত্তন ! দাঁড়াও, মাগীটাকে একবার ভূতের খেলা দেখাতে হ'চ্চে, তবে দোরস্ত হবে।

রাজা। ঠাকুর দেখ্‌তেই পাচ্চেন—আমি কেমন বিপদে প'ড়েছি—এখানে আর আমার হুকুম চলেনা। আপনি এখন ঐ গলির মধ্যে গিয়ে ঐ কুমোরের বাড়ীতে আপাততঃ থাকুন। এখনি আপনার কাছে লোক পাঠাব—ঠাকুরবাড়ীতে আপনার স্থান ঠিক্ ক'রে দেবে এখন।

দৈ। আশীর্ব্বাদ করি আপনার মঙ্গল হ'ক। কিন্তু রাণীটী আপনার বড় সুবিধের নয় দেখ্‌চি। উনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রেচেন, তা'র ফল আজ রাত্রিতেই জান্‌তে পার্‌বেন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কুম্ভকারের কুটীর।

(কুমোর-বৌ ও দৈবজ্ঞ।)

বৌ। ঠাকুর, মিষ্টি মুখ করুন। আজ আমাদের কি ভাগ্যি যে, আপনার পায়ের ধূলো প'ড়ল। (পদধূলি গ্রহণ)

দৈ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হ'ক। তুমি বড় ভালমানুষ দেখ্‌চি। আচ্ছা আমি তোমার ভাগ্যের কথা সব গুণে বল্‌চি।

বৌ। বলগো ঠাকুর বল—আমি কখন হাত দেখাইনি।

দৈ। কৈ তোমার হাত দেখি।

বৌ। সমস্ত দিন মাটী ঘেটে আমার হাত বড় ময়লা হ'য়েচে।

দৈ। তা' হ'ক, তোমার কপাল বড় ভাল দেখ্‌চি। লজ্জা ক'রনা মা —মুখ তোল।

বৌ। না ঠাকুর—তুমি হাত দেখ।

দৈ। দেখ্‌চি, তোমার খুব সুখ হবে।

বৌ। (স্বগত) দেখ্‌চি ঠাকুর খুব পণ্ডিত।

দৈ। কাল সকালে দেশের মধ্যে তুমি সবার চেয়ে সুখী হবে।

বৌ। কাল সকালে কি ক'রে হ'ব ঠাকুর?

দৈ। আর তুমি হতভাগা মাতাল সোয়ামী নিয়ে কষ্ট পাবেনা। মার-ধোর থেকেও বেঁচে যা'বে।

বৌ। (স্বগত) ইনি কি ক'রে জান্‌লেন? দেখ্‌চি ঠাকুর সর্ব্বজ্ঞ। (প্রকাশ্যে) সত্যি বটে, আমার সোয়ামী মাতাল আর আমাকে মারধোর করে; কিন্তু এ দিকে সে ভাল-মানুষ, আর কোন দোষ নাই—বেশ কায কর্ম্ম করে—কষ্টে স্রষ্টে দিন চ'লে যায়। তা' সে যা' খুসী করুক না কেন, আমার তা'তে কি? তোমার প্রসাদ আমাকে দিতে হ'বে, মিষ্টিমুখ কর ঠাকুর।

দৈ। তুমি বড় ভদ্র দেখ্‌চি। আমি তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌চি—কাল তোমার খুব ধন দৌলৎ হ'বে, গাড়ী পাল্কী হ'বে—তুমি একবারে রাণী হ'বে।

বৌ। ঠাকুর! তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রচ?

দৈ। আমি। যা' বল্‌চি তা' নিশ্চয়ই ঘট্‌বে। না হ'লে যেন আমার সব বিদ্যাই মিথ্যে। তুমি নিশ্চিন্ত থেক। আর যা' কিছু তোমার ঘট্‌বে তাই সহ্য করবে—না হ'লে বড় মন্দ হবে।

বৌ। তা' ঠাকুর আমি সব সহ্য কর্‌তে পার'ব। হা ভগবান! এ পোড়া কপালে কি এত সুখ হবে?

(অঘোরের প্রবেশ)

অ। মাগীটা গেল কোথায়? অ—বৌ, বৌ!—কি আপদ, কচ্চিস্ কি ওখানে?

বৌ। ওগো আমাদের বাড়ীতে একজন দৈবিজ্ঞি এসেছে, সাক্ষাৎ দেবতা—আর আমার কপালের কথা সব ব'লে দিলে।

অ। তোর ভাগ্যে যা' আছে, সব ব'লে ফেলেচে! বলিস্ কি, দেখিস্, তোর দু'টো সোয়ামী বলেনি ত?

দৈ। তোমার স্ত্রী খুব সতী-লক্ষ্মী, আর তুমিও খুব সুখী হবে।

অ। বের'হ' ভুতুড়ে, পাজি, জোচ্চোর, বদমাইস—সুন্দরী বৌ দেখে আমার ঘরে ঢুকেছ?

বৌ। চুপ করনা গা! ওকি কথা? আমরা বড় মানুষ হব, আমাদের গাড়ী ঘোড়া হবে—

অ। গাড়ী ঘোড়া হবে—গরুর গাড়ি হবে—কুটের গাড়ী হ'বে রে পাগলী—কুটের গাড়ী হ'বে। রাত্তিরেও তোর ঘুম নাই, কোথেকে এক দৈবিজ্ঞি জুটিয়েছিস্। যা' বিছানায় যা'। (প্রহার)

বৌ। ওগো আমায় মাপ কর গো—এই বুঝি আমার সুখের কপাল—ঠিক ব'লেছ গো, ঠিক ব'লেছ, ও তবে নিশ্চয়ই ভুতুড়ে।

(প্রস্থান)

দৈ। ছিঃ তোমার এমন ক'রে শুধু শুধু মারা ভাল হয়নি। তুমি বড় মন্দ।

অ। বেরো ব্যাটা, বাড়ী থেকে বেরো।

দৈ। আচ্ছা বাবা যাচ্ছি।

অ। বেরো বেটা। (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসময় লাহা।

কেন্দ্রীয় ঊষা।

(AURORA BOREALIS.)

শীতপ্রধান উত্তর-দেশের দারুণ শীতযুক্ত প্রাতঃকাল। বেলা অনেক হইয়াছে, তথাপি চতুর্দ্দিক এরূপ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন যে, কোলের মানুষ দেখা যাইতেছে না। যে দিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই শ্বেতবর্ণ

তুষার। তুষার—তুষার—তুষার-ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভূমি তুষারাচ্ছন্ন, পর্ব্বত তুষার-মণ্ডিত। সমুদ্রের উপরি-ভাগ জমিয়া গিয়া এত কঠিন হইয়াছে যে, উহার উপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা যায়। স্থানে স্থানে বরফ পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়াছে। কোথাও বা বরফের নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল তুষারক্ষেত্র, পর্ব্বত ও প্রবাহ ইত্যাদি দেখিয়া বোধ হয়, তুষার যেন এই প্রদেশে নিজ-রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। এই শীত-প্রধান উত্তর-দেশের লোকেরাও বরফের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে বাস করে।

গ্রীষ্মকালে উহারা যদৃচ্ছালব্ধ জলচর পক্ষী, সীল প্রভৃতি শিকার করিয়া উহা দ্বারা জীবন ধারণ করে। কিন্তু শীতকালে আহার্য্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়। গ্রীষ্মকালে বরফ অল্প গলিয়া গেলে নৌকাদ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা সম্ভব হয়, এবং তিমি মৎস্য প্রভৃতি শিকার করিবারও সুবিধা হয়। শীতকালে জল জমিয়া যাওয়ায় সে সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়। অধিকন্তু শীতকালে সূর্য্যদেব উদিত হন না। শীতকালের প্রারম্ভে একদিন একবার দেখা দিয়া তিনি কিছুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। সূর্য্যোদয় হইতে পুনরায় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ছয় মাস। এই ছয়মাস-ব্যাপী রাত্রিকালে কয়েকটী তারকা অতিশয় ক্ষীণ আলোক প্রদান করে মাত্র।

এই অন্ধকারময়ী দীর্ঘরজনীতে জীবগণ সমস্তই পঞ্চত্ব পাইত সন্দেহ নাই; কিন্তু করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা জীবজীবন রক্ষার্থ এক অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি দুঃখের মধ্যে সুখ—নৈরাশ্যে আশা—বিরহে মিলন—রোগে আরোগ্য—অভাবে পূরণের সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনিই দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী রজনীর মধ্যে আলোকেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার লীলা বুঝা ভার!

দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী রজনী আরম্ভ হইলে, তারকাগণ নিজের আলোক-দ্বারা জগৎকে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, আঁধার জীবগণকে অভিভূত করিলে, গগনের ভালে কিরীটসদৃশ একটী আলোক দৃষ্ট হয়। প্রথমে উহা কিছু চঞ্চল থাকে—পরে সুস্থিরচপলার ন্যায় উজ্জ্বল আলোক প্রদান করে। ঐ আলোক ধনুর আকার ধারণ করিয়া উচ্চে যতই উঠিতে থাকে, ততই উজ্জ্বল দেখায়। ক্রমে উহা হইতে আলোকরশ্মি সমস্ত নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। রশ্মিসমূহ যে কেবল ঐ ধনুর আকৃতি

আলোক হইতেই নির্গত হয়, এমন নহে। কখন কখনও চতুর্দ্দিক হইতে ঐরূপ রশ্মি বহির্গত হইয়া অন্ধকার গগনকে আলোকরাশিদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। ক্রমশঃ রশ্মিসমুদায় একত্রিত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে, এবং যতদূর উজ্জ্বল হইবার, ততদূর উজ্জ্বল দেখায়। সময়ে সময়ে উহা আবার কত সুন্দরবর্ণে রঞ্জিত হয়। এই মণ্ডলার্দ্ধের নিম্নদেশ গোলাপী আভায়, মধ্যস্থল হরিদ্বর্ণে ও শীর্ষস্থান পীতবর্ণে শোভা পায়। আবার কখন উহাব পরিবর্ত্তন ঘটে। গোলাপী গাঢ়রক্তবর্ণে, গাঢ় হরিদ্বর্ণ লঘু-হরিতে পরিণত হয়।

এইরূপে উষারাণী নানাবর্ণের দুকূল পরিধান করিয়া গগনে দেখা দেন এবং জীবগণকে যেন "মা ভৈঃ মা ভৈঃ" শব্দে আশ্বস্ত করেন। অন্ধকাব করাল দংষ্ট্রা বাহির কবিয়া সাগর-বক্ষ হইতে যেন জগৎকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হয়। আর অভ্রভেদী, অচল, অটল তুষারের পর্ব্বত-শ্রেণী যেন তপঃ-সাগরে মগ্ন কোন যোগীবরের ন্যায় বিরাজমান থাকেন। প্রকৃতি-দেবীর এইরূপ নানা-মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যেন কোনও স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছি। যেন বাস্তবিক এই প্রকার ব্যাপারের কখনও কোথাও কোনরূপ অস্তিত্ব নাই।

কেন্দ্রীয় উষা বায়ু-সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক ব্যাপার। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সহিতও উহার নিকট সম্বন্ধ আছে। আর উহা উত্তর মেরুতেই সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। উষার আগমে চৌম্বক সূচি কর্ত্তৃক দিগ্‌নির্দ্দেশের বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাড়িত-বার্ত্তাবহ-তার-সমূহ স্বকার্য্য উত্তমরূপে সাধন করে না —কখন কখনও উহারা বৈদ্যুতিক যন্ত্র হইতে পৃথকও হইয়া যায়—এবং বৈদ্যুতিক ঘন্টা সকল আপনা হইতেই বাজিতে আরম্ভ হয়। এই সমস্ত দেখিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, বায়ুর উর্দ্ধতন স্তরে তাড়িত-প্রবাহের বিকাশ এবং চলাচলই কেন্দ্রীয় উষার প্রকৃত কারণ। একজন ফরাসি-দেশীয় পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আকাশস্থ এবং ভূগর্ভ-নিহিত এই উভয় প্রকার বিদ্যুতের কোনও প্রকার সংযোগ হইলেই উক্ত নৈসর্গিক ব্যাপাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তিনি যন্ত্র-সাহায্যে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াও দেখাইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় উষা ভূমি হইতে কত উচ্চে যে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রকৃষ্ট-রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। লেমষ্টর্ম (Professor Lemstorm) নামক

জনৈক বিজ্ঞানবিৎ উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে ঐ ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। একদা তিনি ফিন্‌লাণ্ড প্রদেশের একটী উচ্চ পর্ব্বতে প্রায় ৩০০০ ফুট উঠিয়া বৈদ্যুতিক ক্রিয়াদ্বারা কেন্দ্রীয় ঊষার অনুরূপ ব্যাপার সম্পাদনেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

কণ্ঠহার।

(বিদেশী গল্প)

নিয়তির ভ্রমবশতঃই যেন সুন্দরী মনোমোহিনী বালিকাটীকে কেরাণীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহার না ছিল সম্পত্তি, না ছিল অবস্থোন্নতির আশা; এমন কোন উপায়ও ছিল না যে, তাহাকে কোন ধনবান যশস্বী পুরুষ জানিয়া বুঝিয়া ভালবাসিয়া বিবাহ করিতে পারে। সুতরাং শিক্ষা-বিভাগের একটী সামান্য কর্ম্মচারীর সহিত তাহার বিবাহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

সে সামান্য সাদাসিদে পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত—ভাল পোষাক পাইত না বলিয়া। কিন্তু সে তাহার জন্য এমন অসুখ বোধ করিত, যেন নিজের উচ্চপদ হইতে তাহার অবনতি ঘটিয়াছে! কারণ, নারীর নিকট জাতি বা পদভেদ নাই; বংশ ও আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা ও মোহিনী-শক্তিই কার্য্যকরী। প্রকৃতি-সুলভ-পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং নমনীয় বুদ্ধিমত্তাই নারীর আভিজাত্য; এই সকল গুণই সাধারণ-রমণী-জনকেও শ্রেষ্ঠতমা অঙ্গনাদিগের সমকক্ষ করিয়া তুলে।

নিখিল-সুখকর এবং সকল প্রকার বিলাস-দ্রব্যজাত উপভোগ করিবার জন্যই আপনার জন্ম অনুভব করিয়া, সে অবিরাম যন্ত্রণা পাইত। বাসভূমির দৈন্যে, গৃহভিত্তিগুলির জঘন্যতায়, জীর্ণ চেয়ার গুলি দেখিয়া, পর্দ্দার কদর্য্যতায় তাহার কষ্ট হইত। যে সকল দ্রব্য তদবস্থাপন্ন অপর কোন স্ত্রীলোকের খেয়ালেও আসিত না, সেই সবই তাহার অসহ্য যন্ত্রণা

ও ক্রোধের কারণ। যে কৃষাণ-তরুণী তাহার সামান্য গৃহ-কর্ম্ম করিত, তাহাকে দেখিয়া তাহার নৈরাশ্যময় অনুশোচনা হইত—রাত্রিতে তাহার সম্বন্ধে উদ্ভট স্বপ্ন দেখিত।

প্রাচ্য-কারুকার্য্যময় বিচিত্র বস্ত্রে বিমণ্ডিত, সুদীর্ঘ তাম্রময় শামাদানে আলোকিত, নির্জ্জন, প্রশস্ত দালান, বড় বড় আর্ম্ চেয়ারে শয়নাভ্যাস, এবং চুল্লীনির্গত বায়ুর মিষ্ট উত্তাপে নিদ্রালস আজানুচুম্বী-পাজামা-পরিহিত পদাতিক ভৃত্যযুগল;—এই সকল চিন্তা তাহার মন অধিকার করিত। প্রাচীন রেশমে সুশোভিত সুবিস্তৃত অভ্যর্থনা-কক্ষ সকল; অদম্য কৌতূহলোদ্দীপক নেত্র-সুখকর চিত্রাদি গৃহসজ্জা; অন্তরঙ্গ বন্ধুজনের সহিত, এবং যে সকল যশোধন পুরুষবৃন্দ সকল-নারীরই ঈর্ষ্যাস্থল—যাহাদের অর্চ্চনা নারীমাত্রেই কামনা করে,—তাহাদেরই সহিত প্রদোষে আলাপ করিবার জন্য মনোরম গন্ধামোদিত নিভৃত প্রকোষ্ঠ;—এই সকলের কল্পনায় সে নিমগ্ন থাকিত।

যখন সে তিন দিনের ব্যবহার-মলিন আস্তরণে আচ্ছাদিত গোল টেবিলে স্বামীর সম্মুখে ভোজনার্থ উপবেশন করিত; এবং ভর্ত্তা সূপপাত্রের আবরণটী খুলিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিত, "আহা, কি স্বাদু ব্যঞ্জন! আমি ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু জানি না।"—সে ভাবিত,—কত রসনা-তৃপ্তিকর ভোজ্য, সমুজ্জ্বল রৌপ্য-তৈজস এবং প্রাচীর-শোভমান ঝালর—যাহাতে পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মূর্ত্তি এবং পরি-অধিষ্ঠিত উদ্যানের মাঝে উড্ডীয়মান বিচিত্র বিহঙ্গের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।—কত না বিস্ময়কর বহুমূল্য রেকাবে সুস্বাদু খাদ্য, এবং লাল মাছ বা একটু পাখীর ডানা আস্বাদন করিতে করিতে সুমিষ্ট মৃদুহাস্য-সহকারে শ্রুত কত না নির্ভীক রমণী-সেবার কাহিনী তাহার মনে উদয় হইত।

তাহার পোষাক ছিল না, অলঙ্কার ছিল না, কিছুই ছিল না। এবং সে এই সকল ছাড়া আর কিছুই ভালবাসিত না—সেই সব উপভোগ করিবার জন্যই সে আপনাকে সৃষ্ট অনুভব করিত। আনন্দদান করিতে, ঈর্ষাভাজন হইতে, পুরুষচিত্তে রূপমোহ জন্মাইতে, এবং সকলের বাঞ্ছনীয় হইতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইত।

তাহার একটী বন্ধু ছিল—অতীত দিনের একজন ধনবতী সহপাঠিকা। তাহার সহিত দেখা করিয়া গৃহে ফিরিবার সময়, সে এমন হীনতা অনুভব করিত যে, পুনরায় তাহার সহিত মিশিতে আর তাহার বাসনা থাকিত না।

একদিন সায়াহ্নে তাহার ভর্ত্তা গর্ব্বান্বিতভাবে গৃহে ফিরিয়া একখানি বড় খাম হাতে করিয়া বলিল,

"এই দেখ, তোমার একটি জিনিস।"

স্ত্রী ব্যগ্রভাবে খামখানি ছিন্ন করিয়া দেখিল, একখানি মুদ্রিত কার্ড। তাহাতে এই কথাটী লিখিত ;—

"১৮ই জানুয়ারী, সোমবার সন্ধ্যায় শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার পত্নী—তাঁহাদের প্রাসাদে লোয়াজেল দম্পতির উপস্থিতি প্রার্থনা করিতেছেন।"

স্বামীর আশানুরূপ যুবতী আনন্দিত না হইয়া, নিমন্ত্রণ-পত্রখানি টেবিলের উপর অবজ্ঞার সহিত ফেলিয়া বলিল,—

"ইহা লইয়া আমাকে কি করিতে হইবে ?"

"কিন্তু প্রিয়ে! আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি সন্তুষ্ট হইবে। তুমি কখন কোথাও যাও না, এখন এমন একটী সুযোগ। ইহার যোগাড় করিতে আমার বিষম কষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকেই যাইতে চায়। খুব বাছা বাছা লোকের নিমন্ত্রণ ; এক জনও কেরাণী আমন্ত্রিত হয় নাই। বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেই সেখানে যাইবেন।"

বিরক্ত হইয়া সে স্বামীর প্রতি চাহিল, এবং অধীরভাবে বলিল,—

"আমার অঙ্গটায় কি সাজ লইতে বল ?"

স্বামী একথা ভাবে নাই ; অস্ফুটস্বরে বলিল,—

"কেন, যে পোষাক পরিয়া তুমি থিয়েটারে যাও ; সেটী ত, আমার মনে হয়,—বেশ।"

স্ত্রীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে থামিল। দুটি বড় বড় অশ্রুবিন্দু আঁখি-কোণ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া অধরপুট স্পর্শ করিল। সে তোৎলার মত জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি হইয়াছে ? কি হইয়াছে ?"

তরুণী প্রবল চেষ্টায় আপনার দুঃখাবেগ দমন করিল ; এবং সিক্ত কপোল মুছিতে মুছিতে শান্তকণ্ঠে বলিল,—

"কিছুই না ; কেবলমাত্র আমার পোষাক নাই। এবং সেই জন্যই এ উৎসবে যাইতে পারিব না। যা'র স্ত্রীর আমার অপেক্ষা ভাল পোষাক পরিচ্ছদ আছে, তোমার এমন কোন সহকর্ম্মীকে টিকিটখানি দাও গে।"

সে ত হতাশ হইয়া পড়িল। বলিল,—

"এস, দেখা যাউক মথিল্‌ডি! একটী বেশ মনোমত অথচ সাদাসিদে, অন্য সময়েও ব্যবহার করিতে পারিবে, এমন একটী পোষাক কিনিতে কত পড়িবে?"

কিশোরী কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল—কত টাকা হইলে একটী হয়; অথচ মিতব্যয়ী কেরাণীটী প্রার্থিত অর্থের কথা শুনিয়া একবারে অস্বীকার না করেন, কিম্বা ভয়ে চীৎকার করিয়া না উঠেন! অবশেষে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—

"ঠিক জানি না; তবে, আমার বিশ্বাস, চারি শত ফ্র্যাঙ্ক পাইলেই আমি করিয়া লইব।"

স্বামী একটু বিবর্ণ হইয়া গেল; কারণ, সে ঠিক ঐ টাকাটাই একটী বন্দুক কিনিবার জন্য জমা করিতেছিল। ইচ্ছা ছিল,—আগামী নিদাঘে সে বন্ধুদের সহিত মিলিয়া এক রবিবারে 'নান্‌টেয়ারে' লার্ক পাখী শিকার করিতে যাইবে।

কিন্তু সে বলিল,—

"বেশ। আমি তোমাকে চার শত ফ্র্যাঙ্কই দিব। একটী সুন্দর পোষাকের চেষ্টা দেখ।"

*　*　*　*　*

উৎসবের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল; আর, মাডাম লোয়াজেল বিষণ্ণ, অসুখী, উদ্বিগ্ন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার পোষাক ত প্রস্তুত!

একদিন সন্ধ্যার সময় তাহার স্বামী বলিল,—

"ব্যাপার কি? এস, এই তিন দিন ধরিয়া তুমি এমন অদ্ভুত ভাবে রহিয়াছ?"

স্ত্রী উত্তর দিল,—

"একখানিও গহনা নাই, একটী মাত্রও পাথর নাই, কিছুই পরিবার নাই—আমার ভাবি কষ্ট হইতেছে। আমায় বড়ই দারিদ্র্য-পীড়িত দেখাইবে। সেখানে না যাওয়া বরং ভাল।"

"তুমি ফুল পরিতে পার। এখন বেশ রীতি-অনুযায়ীই হইবে। দশ ফ্র্যাঙ্কে তুমি দু তিনটি খুব চমৎকার গোলাপ পাইবে।"

তাহার মন উঠিল না।

"না ; ধনবতী মহিলাদের কাছে গরীবের মত থাকার চেয়ে অবমাননা আর নাই।"

কিন্তু, তাহার স্বামী সোল্লাসে বলিল,—

"তুমি কি মূর্খ! যাও, তোমার ফরেষ্টিয়ের কাছ থেকে খানকতক গহনা চাহিয়া আন। তার সঙ্গে তোমার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে, অনায়াসে তুমি চাহিতে পার।"

সে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"সত্যই ত! আমি একবারও ভাবি নাই।"

পর দিন সে সখীর কাছে যাইয়া আপনার বিপদের কথা বলিল।

মাডাম ফরেষ্টিয়ে একটী কাচের আলমারির নিকট যাইয়া, একটী বড় গহনার বাক্স লইল, এবং তাহা খুলিয়া লোযাজেলকে বলিল,—

"পছন্দ করিয়া লও, ভাই।"

প্রথমে সে কতকগুলি বলয় দেখিল, তারপর একছড়া মুক্তার হার, পরে স্বর্ণ ও বহুমূল্য পাথরের একটী চমৎকার ক্রস। দর্পণের সম্মুখে সে গুলি পরিয়া দেখিতে লাগিল। সে গুলি ছাড়িতে বা ফিরাইয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—

"আর কিছু নাই?"

"হ্যাঁ; আছে বৈ কি; দেখ না। তোমার কি রকম পছন্দ হবে, তা ত জানি না।"

হঠাৎ একটী কাল সাটীনের বাক্সে সে একছড়া চমৎকার হীরার মালা দেখিতে পাইল। অদম্য আকাঙ্ক্ষায় তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। সেটী তুলিবার সময় তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। আপনার কণ্ঠবিসর্পী পরিচ্ছদের উপর সে উহা বাঁধিয়া দিল, এবং নিজেকে দেখিয়া হর্ষাতিশয্যে মগ্ন হইয়া গেল।

তারপর, ইতস্ততঃ করিয়া উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—

"এই-টী—শুধু এই-টী—আমায় ধার দিতে পার?"

"পারি বই কি ; নিশ্চয়ই পারি।"

সে তাড়াতাড়ি সখীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, প্রীতি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে চুম্বন করিল ; তারপর, সেই রত্নমালা লইয়া ছুটিয়া পলাইল।

* * * * *

উৎসবের দিন আসিল। মাডাম লোয়াজেল যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিল। সে সকলের অপেক্ষা সুন্দরী, রমণীয়া, করুণাময়ী, হাস্যফুল্লা, এবং হর্ষোন্মত্তা। সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, নাম জিজ্ঞাসা করিল, এবং পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মন্ত্রী-সমিতির সকলেই তাহার সহিত নাচিতে চাহিল। স্বয়ং মন্ত্রীর লক্ষ্য তাহারই উপর।

সে দীপ্ত অনুরাগে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিল। নিজরূপের জয়োচ্ছ্বাসে,—আপনার সাফল্য-গর্ব্বে—এই স্তুতিবাদ, এই প্রশংসা, এই সব প্রবুদ্ধ বাসনা, এবং নারী-হৃদয়ের পক্ষে এমন মিষ্ট পূর্ণবিজয়জ্ঞান—এই সকলের মিলন-জাত এক প্রকার সুখের মোহে,—নিখিল ভুলিয়া সে প্রমোদরসে প্রমত্ত হইয়া নাচিতে লাগিল।

প্রত্যূষে চারি ঘটিকার সময় তাহার নৃত্য সমাপন হইল। নিশীথ হইতে তাহার স্বামী অপর তিনটি ভদ্রলোকের সহিত একটা ছোট নিভৃত কক্ষে ঘুমাইতেছিল—তাহাদের পত্নীরাও ততক্ষণ বেশ সুখে যাপন করিতেছিল।

লোয়াজেল পত্নীর স্কন্ধের উপর গৃহ হইতে আনীত শাল ফেলিয়া দিল—গৃহস্থের সামান্য উত্তরীয়। নাচের সাজের উপর পড়িয়া উহার বৈষম্য ফুটিয়া উঠিল। যুবতী তাহা বুঝিতে পারিয়া অন্যান্য মহিলাগণের লক্ষ্য পরিহার করিতে চেষ্টা করিল,—তাহারা যে মূল্যবান পশমী বস্ত্রে আপনাপন অঙ্গ আচ্ছাদিত করিতেছিল।

কিন্তু স্বামী তাহাকে ধরিয়া বলিল,—

"একটু অপেক্ষা কর। বাহিরে তোমার ঠাণ্ডা লাগিবে। আমি একখানি গাড়ী ডাকিতেছি।"

কিন্তু সে স্বামীর কথা শুনিল না; দ্রুতপদে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। পথে আসিয়া তাহারা একখানিও গাড়ী দেখিতে পাইল না! উচ্চৈঃস্বরে শকটচালকদের ডাকিতে লাগিল।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারা হতাশভাবে "সীন" নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশেষে ঘাটের নিকট একখানি পুরাতন নৈশ শকট দেখা গেল—সে সকল গাড়ী রজনীর পূর্ব্বে প্যারীর চতুর্দ্দিকে দেখা যায় না; যেন তাহারা দিবালোকে তাহাদের দৈন্য দেখাইতে লজ্জিত। গাড়ী গৃহদ্বারে আসিলে, তাহারা সবিষাদে অবতরণ করিল। কিশোরীর ত

সমস্তই শেষ হইয়াছে। আর, পুরুষটীর কথা? সে ত ভাবিল, পরদিন দশটার সময় তাহাকে আবার কর্ম্মস্থানে হাজির দিতে হইবে।

স্কন্ধ হইতে উত্তরীয় সরাইয়া সে আর একবার আপনার সম্পূর্ণরূপ-প্রভা দেখিয়া লইবার জন্য দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইল! কিন্তু অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। কণ্ঠে ত হারগাছি নাই।

তাহার স্বামী পোষাক খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইল?"

"আমি—আমি—আমি ফরেষ্টিয়ের মালা হারিয়ে ফেলেছি।"

"কি!—কেমন করে?—অসম্ভব।" স্বামী হতবুদ্ধির মত এই কথা বলিল।

তাহারা পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে, ক্লোকের খাঁজে খাঁজে, পকেট গুলিতে—সমস্ত যায়গায় খুঁজিল। কোথাও পাইল না।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ঠিক জান, নাচের পর তোমার গলায় উহা ছিল?"

"প্রাসাদের দালানে আমি স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছিলাম।"

"কিন্তু, যদি তুমি পথে হারাইতে, আমরা পতনের শব্দ পাইতাম। নিশ্চয়ই গাড়ীতে হারাইয়াছ।"

"সম্ভবতঃ। তুমি নম্বরটা লিখিয়া লইয়াছিলে?"

"না। আর তুমি? তুমিও কি দেখ নাই?"

"না।"

যেন বজ্রাহত হইয়া তাহারা পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। অবশেষে লোয়াজেল কাপড় পরিল। বলিল, "আমি যে পথ দিয়া আসিয়াছি, পদব্রজে সেই পথ ধরিয়া পুনর্ব্বার যাইব। দেখি পাই কি না।"

স্বামী চলিয়া গেল, রমণী সেই নাচের সাজেই একখানি চেয়ারে বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। শয়নে যাইবার সামর্থ্য ছিল না—বিস্ময়হত, শক্তিহীন, উদাস মনে বসিয়া রহিল।

স্বামী প্রায় ৭টার সময় ফিরিল—কিছুই পায় নাই।

সে পুলিসে গেল, পুরস্কার ঘোষণা করিতে সংবাদপত্র-কার্য্যালয়ে গেল, গাড়ী-ওলাদের আড্ডায় ঘুরিল—বস্তুতঃ যেখানেই সামান্য মাত্র সন্দেহ হইল, সেই খানেই গেল। কোথাও পাইল না।

এই ভয়ঙ্কর বিপদ্‌পাতে যুবতী আশঙ্কায় উন্মত্তের মত সমস্ত দিন যাপন করিল।

লোয়াজেল রাত্রিতে ক্লিষ্ট পাণ্ডুমুখে ফিরিয়া আসিল—কোন সন্ধান পায় নাই। স্ত্রীকে বলিল, "তোমার বন্ধুকে লেখা উচিত যে, তুমি তাহার কণ্ঠ-হারের "আঁকড়াটী" ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ; তাই উহা সারাইতে দিয়াছি।" ইতিমধ্যে যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারা যায়।

স্বামীর উপদেশ-মত পত্র লেখা হইল।

* * * * *

এক সপ্তাহের শেষে তাহাদের সকল আশা ফুরাইল। কয়দিনে লোয়াজেলের পাঁচ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। সে স্ত্রীকে বলিল,—

"গহনাখানি প্রত্যর্পণ করিবার উপায় আমাদের দেখিতে হইবে।"

বাক্সটীতে যে জহুরীর নাম ছিল, তাহারা পরদিন তাহার কাছে গেল। সে খাতাপত্র দেখিয়া বলিল,—

"ভদ্রে! আমি মালা বিক্রয় করি নাই। কেবল মাত্র বাক্সটী প্রস্তুত করিয়াছিলাম।"

তার পর, স্মৃতির সাহায্যে তদনুরূপ একছড়া কণ্ঠহার কিনিবার জন্য, তাহারা কত না জহুরীর দোকানে ঘুরিল! বিরক্তি ও মনস্তাপে উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

একটী দোকানে ঠিক সেই রকমই একছড়া হীরার মালা দেখিতে পাওয়া গেল। তার দাম চল্লিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক। ছত্রিশ হাজারে পাইতে পারে।

তাহারা দোকানদারকে তিন দিনের জন্য সে গাছি বিক্রয় না করিতে অনুরোধ করিল। স্থির হইল, তাহারা যদি ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে হারান মালা খুঁজিয়া পায়, তাহা হইলে দোকানদার আপনার মালাগাছি তাহাদের নিকট হইতে ৩৪,০০০ ফ্র্যাঙ্কে কিনিয়া লইবে।

পিতা যে ১৮,০০০ ফ্র্যাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছিলেন, লোয়াজেলের তাহাই ছিল। বাকী ধার করিতে হইবে।

এক জনের নিকট হাজার ফ্র্যাঙ্ক, অপরের কাছে পাঁচ শত, এখানে পাঁচ লুই, সেখানে তিন লুই, এমনি করিয়া সে ধার করিতে লাগিল। সে কত নোট লিখিয়া দিল, সুদখোরদের সহিত—সমস্ত কুসীদ জাতির সহিত—কারবার খুলিল। আপনার অবশিষ্ট জীবন কাল সে বন্ধক দিল।

পরিশোধ করিতে পারিবে কি না, তাহা না জানিয়াই স্বাক্ষর করিতে লাগিল। ভাবী কষ্টরাশি, অন্ধকারময় দৈন্য, এবং অচিরভোগ্য শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক যন্ত্রণার চিন্তায় ভীত হইয়া, সে বণিকের টেবিলের উপর ছত্রিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক রাখিয়া নূতন হার গাছি আনিতে গেল।

যখন মাডাম লোয়াজেল কণ্ঠহার ছড়া ফিরাইয়া দিল, ফরেষ্টিয়ে একটু অসন্তোষের সহিত বলিল, "ইহা তোমার আরও পূর্ব্বে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল, যদি আমার প্রয়োজন হইত ?"

সে কিন্তু বাক্সটা খুলিল না—এবং ইহাই লোয়াজেল ভয় করিয়াছিল। ফরেষ্টিয়ে যদি বদল জানিতে পারিত, তাহা হইলে কি মনে করিত,—কি-ই বা বলিত ? তাহাকে চোর মনে করিত না কি ?

লোয়াজেল এখন নিঃস্ব জনের জীবন বুঝিল। কিন্তু নির্ভীক হৃদয়ে আপনার কষ্টভার বহন করিতে লাগিল। এ ভয়ঙ্কর দেনা পরিশোধ করিতেই হইবে—শোধ করিবেই। তাহারা ভৃত্য ছাড়াইল, বাসা পরিত্যাগ করিয়া উপরের একটা ছোট ঘরে বাস করিতে লাগিল।

গুরুভার গৃহকার্য্য এবং রন্ধনশালার ঘৃণ্য তত্ত্বাবধান কাহাকে বলে, হতভাগিনী তাহা বুঝিল। তৈলাক্ত বাটী ও থালাগুলি সে আপনার "অরুণ নখ" দিয়া পরিষ্কার করিত। ময়লা কাপড়, জামা প্রভৃতি স্বহস্তে ধৌত করিয়া শুকাইতে দিত। সে প্রত্যহ প্রাতঃকালে অপরিষ্কৃত জল রাজপথে নামাইয়া আনিত, এবং দম লইবার জন্য প্রত্যেক সোপানে থামিয়া থামিয়া উপরে জল তুলিত। সামান্য স্ত্রীলোকের মত পরিচ্ছদ পরিয়া, ঝুড়ি হাতে করিয়া, সে ফলওয়ালা, মুদী ও মাংসবিক্রেতার নিকট দর-কশাকশি করিয়া অপমানিত হইয়া আপনার অতি কষ্টের ধন বাঁচাইতে চেষ্টা করিত।

প্রত্যেক মাসেই তাহাদের কতক হুণ্ডির টাকা শোধ করিতে হইত, কতকগুলি পুনরায় লিখিয়া দিতে হইত, আরও সময় লইতে হইত।

তাহার স্বামী সায়াহ্নে কোন ব্যবসাদারের হিসাবপত্রের পরিষ্কার নকল করিত, এবং অধিক রাত্রিতে পাতা-পিছু পাচ "সু"র হিসাবে গ্রন্থকারদিগের পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দিত।

তাহাদের জীবনের দশ বৎসর এইরূপে কাটিল।

দশ বৎসরের অবসানে তাহারা মোটা সুদ এবং রাশীকৃত সুদের সুদ সমেত সমস্ত—সমস্ত ঋণ—পরিশোধ করিল।

মাডাম লোয়াজেলকে এখন বৃদ্ধা দেখাইত। সে এখন দীনের গৃহিণী—বলিষ্ঠ, দৃঢ়, এবং কঠোর। রুক্ষ চুলে, অশোভন পরিচ্ছদে, কঠিন হস্তে জলের বড় বড় বাল্‌তি লইয়া সে ঘরের মেজে ধুইতে ধুইতে উচ্চস্বরে কথা কহিত। কিন্তু, সময়ে সময়ে, যখন তাহার স্বামী আফিসে থাকিত, সে জানালার নিকট বসিয়া সেই বহু পূর্ব্বকার হর্ষোৎফুল্ল যামিনীর কথা, সেই নৃত্যোৎসবের কথা ভাবিত—সে দিন তাহাকে কত না সুন্দরী দেখাইয়াছিল, সে দিন সে কত না অর্চ্চনা পাইয়াছিল!

সে যদি কণ্ঠহার না হারাইত? তাহা হইলে কি হইত? কে জানে? জীবন কি বিস্ময়কর, কি পরিবর্ত্তনশীল? মরিতে বাঁচিতে কত টুকু জিনিষের প্রয়োজন?

* * * * *

একদিন রবিবার, সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য সে পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে একজন মহিলাকে হঠাৎ দেখিতে পাইল—সে একটী শিশুর হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিল। সে ফরেষ্টিয়ে—এখনও যৌবনোৎফুল্ল, এখনও সুন্দরী, এখনও মনোমোহিনী।

মাডাম ফরেষ্টিয়ের হৃদয় বিচলিত হইল। সে তাহার সহিত কথা কহিবে কি? হাঁ,—নিশ্চয়ই এখন ত ঋণমুক্ত হইয়াছে—তাহাকে সমস্ত বলিবে। কেন না বলিবে?

সে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

"ভাল ত সখী?"

রমণী প্রৌঢ়ার দ্বারা এমন ভাবে সম্বোধিত হইয়া বিস্মিত হইল। তাহাকে মূলে না চিনিতে পারিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল,—

"কিন্তু—মাডাম!—আমি জানি না—আপনি নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছেন।"

"না; আমি—মথিল্‌ডি লোয়াজেল।"

তাহার সখী চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ও—আমার মথিল্‌ডি! তোমার কি পরিবর্ত্তন!"

"হাঁ—তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ অবধি আমার বড় কষ্টের দিন গিয়াছে। বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন—আর, সে তোমারই জন্য।"

"আমার জন্য? কেমন করিয়া?"

"তোমার কি মনে আছে, তুমি আমাকে মন্ত্রীবাড়ীর নাচের দিন তোমার হীরার মালা ধার দিয়াছিলে?"

"হ্যাঁ—তার পর?"

"তারপর? আমি সে ছড়া হারাইয়াছিলাম।"

"তুমি কি বলিতেছ? আমাকে ত ফিরাইয়া দিয়াছিলে।"

"আমি তোমাকে ঠিক সেই রকম আর একছড়া দিয়াছিলাম। তার জন্য দশ বৎসর ধরিয়া দেনা শোধ করিয়াছি। তুমি বুঝিতে পার, আমাদের পক্ষে (যাহাদের কিছুই ছিল না) উহা কত কষ্টসাধ্য। যাহা হউক, এখন সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। আমি বড় সন্তুষ্ট।"

"তুমি কি বলিতেছ, আমার হারের বদলে, আর একছড়া হীরার মালা কিনিয়া দিয়াছ?"

"হ্যাঁ। তা' হ'লে তুমি লক্ষ্য কর নি। দুগাছি এমন সমান!" এই বলিয়া সে গর্ব্বিত অথচ সরল আনন্দে মৃদুহাস্য করিল।

ফরেষ্টিয়ে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাহার দুটি হাত ধরিয়া বলিল,—

"হায়, আমার মথিল্‌ডি! আমার হার যে ঝুটো! বড় বেশী যদি হয়, তার দাম পাঁচ শ ফ্র্যাঙ্ক!" *

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

ফুলের মুক্তি।

(দ্বিতীয় অংশ।)

ফুলের সৌরভ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, সেইজন্য ফুলের এত আদর। কিন্তু যে ফুল লইয়া জগৎ, যে ফুলের বিকাশে সৃষ্টি ও অবকাশে প্রলয়, সেই ফুল কি সুন্দরী নহে? তাহার নাম আত্মা, কিন্তু সে নাম শ্রবণে আমাদের ত প্রীতি নাই; তাহার অন্তরে কি মধুরিমা, কি লালিত্য, কি

---

* গীদে মোপাসাঁর ফরাসী গল্পের ইংরাজী হইতে অনুবাদ।

অঙ্গসৌষ্টব আছে, তাহা ত আমরা জানি না! ঐ বেলফুলটীর কথা সব জানি,—উহার প্রেমের কথা জানি, উহার যৌবনের প্রায় সব কথাটাই জানি; বেলফুল আমার ভালবাসা! তাই ত ইহারই নাম ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে—কার নাম বলিতে কার নাম বলিয়া ফেলি। বলিব আত্মার কথা, কিন্তু বলিলাম ফুল। যাহাই হউক, যা বলিতেছিলাম, তাহাই এক্ষণে বলি। এই যে আমাদের আত্মাটী, যাহাকে চলিত ভাষায় আমরা মন বলি, সেটী যে চিরকাল একভাবে থাকে, তাহা নহে।

সকল জীবজন্তুর অঙ্গগুলি যেরূপ অতি কোমল অবস্থা হইতে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আত্মারও সেই প্রকার একটী তরুণ অবস্থা ও একটী পরিণত অবস্থা আছে। শিশু স্বভাবতঃই চপল, কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তি ধীর, শান্ত; এই পরিণতি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। সেই নিয়মগুলি সূত্র-বদ্ধ করা দুরূহ হইলেও, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, লতাপল্লব, জীবজন্তু প্রভৃতি যেমন এক একটী স্থির প্রণালীতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় ও উন্নতি লাভ করে, আত্মাও একটী স্বতন্ত্র স্বাভাবিক প্রণালীতে উন্নতি লাভ করে। আত্মার উন্নতি একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ঘটিয়া থাকে, এবং সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। এই প্রণালীর দৃষ্টান্ত কয়েকটী উদাহরণ ও মানববুদ্ধির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে একটী সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে। আমাদের বুদ্ধি আছে,—আমরা বুদ্ধিমান্, এই অহংকারে আমরা সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে যাই; কিন্তু জীব সোপানের নিম্নপদবীতে কি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? বানর, কুক্কুর, বিড়াল ইত্যাদি পশুপক্ষী প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপে বুদ্ধিবৃত্তির লক্ষণ দেখা যায়। মানববুদ্ধি ও পশুবুদ্ধির মধ্যে স্থূল-সাদৃশ্য থাকায় উভয়েই বুদ্ধি-পদবাচ্য বটে, কিন্তু সূক্ষ্মাংশে উভয়েরই মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

পশুবুদ্ধি হইতে মানববুদ্ধির আবির্ভাব। কি প্রণালী অনুসারে পশুবুদ্ধি বিবর্ত্তিত হইয়া মানববুদ্ধিতে পরিণত হয়, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বোধ করি, আমরা অদ্যাপিও অক্ষম। যাহাই হউক, চেষ্টা করিয়া দেখা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

বুদ্ধি অর্থে বিচারশক্তি। বুদ্ধি অর্থাৎ বিচারশক্তির উৎপত্তি কোথায় বা কি প্রকারে হইল? আমরা দেখিতে পাই, জীবজাতি-মাত্রেরই একটু না একটু বুদ্ধির লক্ষণ আছে; কিন্তু নানাজাতীয় প্রাণীর জাতি বুদ্ধি তুলনা

করিলেই বুঝিতে পারি যে, শারীরিক গঠন অর্থাৎ স্নায়ু-সন্নিবেশের সহিত আত্মার বিকাশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে।

সকল প্রাণীর ক্রিয়া-কলাপেই কতকগুলা স্নায়বিক আবেগ লক্ষিত হয় এবং সেই আবেগগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা-স্রোতে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের উপাদান হইয়া পড়ে।

মানসিক বৃত্তিগুলি বারম্বার অভ্যস্ত হওয়ায় স্নায়বিক আবেগে পর্য্যবসিত হয়। যে সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পূর্ব্বে বুদ্ধি অর্থাৎ বিচারশক্তি ও চেষ্টার আবশ্যক হইত, এক্ষণে সে গুলি এতই অভ্যস্ত হইয়াছে যে, স্নায়ুগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সেই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে। অভিনব জ্ঞান অভ্যস্ত হইবার কালে প্রাকৃতিক তেজঃপুঞ্জের প্রভাব ও স্বভাব উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই পরিবর্ত্তনের সাহায্যেই একটী অভিনব জ্ঞান অভ্যস্ত হওয়ার পর, দ্বিতীয় জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে। সৃষ্টির প্রতি অংশই পরিবর্ত্তনশীল, ও সকল অংশই এরূপ সম্বন্ধ যে, এক অংশে আঘাত লাগিলে, অন্য সকল অংশই কম্পিত হইবে ও সর্ব্বাংশ হইতেই সেই আঘাতের প্রতিঘাত হইবে। এই আঘাতে ও প্রতিঘাতে প্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তিত হয়, বিবর্ত্তন সম্ভব হয়।

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায়, মানবজাতিরও কতকগুলা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা স্বধর্ম্ম আছে। এই স্বধর্ম্মগুলি পূর্ব্বজীবনে অর্জ্জিত।

বাস্তবিক সকল জাতিই এই প্রকারে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে।

মানবজাতি যে সকল প্রবৃত্তি বা স্বধর্ম্ম লইয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য। তন্মধ্যে প্রধান ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এই শব্দটীর মধ্যে অনেকগুলি কথা অন্তর্নিহিত আছে। প্রথম ক্ষুধা ও কামবৃত্তি,—দেহরক্ষা, বংশরক্ষা—এই বৃত্তিদ্বয় অতি সামান্য উদ্ভিদ অবস্থা হইতে লব্ধ। উভয়ই আবশ্যক,—একটী শরীর-রক্ষার জন্য, অপরটী সমাজরক্ষার জন্য। উভয়টী শরীরবৃত্তির মধ্যে গণ্য, কিন্তু ঐ বৃত্তিদ্বয়ের উপযুক্ত ব্যবহারই মানবকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। "প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু গরীয়সী।" এই বৃত্তিদ্বয়ের অনুরূপ আর একটী শারীরিক বৃত্তি আছে,—গতি ও বিরাম,—ক্ষণিক চাঞ্চল্য ও ক্ষণিক স্থৈর্য্য। মানব কখনও চলিতেছে, ফিরিতেছে, কখনও স্থিরভাবে বসিয়া আছে। এই বৃত্তি কয়টী মানবদেহের বা

মানব-শরীরের স্নায়বিক সন্নিবেশের গুণ। ইহাতে মনুষ্যত্বের লক্ষণ নাই; কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ব্বাবস্থার অর্থাৎ পশুভাবের পরিচয় আছে।

মানব সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সমাজ মাত্রেই একের ক্রিয়াকলাপে অপরের সুখ বা দুঃখ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। মানবের যে অবস্থায় উক্ত গুণত্রয় ভিন্ন অন্যতর ধর্ম্ম না থাকে, তদবস্থ কতিপয় মানব একত্রীভূত হইলেই, প্রবৃত্তির আবেগে পরস্পরের সঙ্ঘাত হইবে। এই সঙ্ঘাতের ফলে সকলেই বিজয়ী বা বিজিত হইতে থাকিবে। বিজিত হইলে বিজয়ী ব্যক্তির প্রতি যে ভাবের উদয় হইতে থাকে, তাহারই নাম ঘৃণা, রোষ, বা ভীতি। উভয়ে সমকক্ষ হইলে বিপক্ষের প্রতি যে ভাব হয়, তাহার নাম রোষ। বিপক্ষ প্রবল হইলে ভীতি, ও দুর্ব্বল হইলে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। আত্মরক্ষা, বা সমাজরক্ষা বা শারীরিকগতি ইত্যাদিতে প্রত্যাহত হইলেই রোষ, ভীতি বা ঘৃণার সঞ্চার হয়। মানব আদিম অবস্থায় স্নায়বিক প্রবৃত্তির তাড়নায় যে প্রণালীতে কার্য্য করে, তাহাতে কেবল তাহার স্বার্থই অভিলষিত বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তৎকালে "অভিলাষ" দেখা দেয় নাই, কেবল সুখ ও দুঃখের অতি সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তৎপরে প্রত্যাহত হইয়া রোষ, ভীতি ও ঘৃণার উদ্রেকের সহিত সুখ ও দুঃখের জ্ঞান আরও পরিস্ফুট হয়। বিবর্ত্তন-সোপান বাস্তবিক এতই জটিল, যে, ঠিক কোন্ অবস্থায় কোনও একটা বিশেষ জ্ঞান অভ্যস্ত হইয়া স্নায়বিক প্রবৃত্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। বাস্তবিক কাম, ক্রোধ ইত্যাদি যে সকল স্নায়বিক প্রবৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুলি যে বহুকাল অভ্যাসে লব্ধ, তাহা বিশ্বাস করিতে বহুতর ঘটনা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কুক্কুরের সম্মুখে একটী বিড়াল হঠাৎ উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠদেশ সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, গাত্র রোমাঞ্চ হয়। মানবশিশুকে আদর করিবার ছলে, আমরা প্রায়ই লুফিয়া থাকি; কিন্তু একবার অনভ্যস্ত দূর পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেই শিশু চীৎকার করিয়া উঠে। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে, এই ভীতি তাহার স্নায়বিক প্রবৃত্তি। কিন্তু ঐ স্নায়বিক প্রবৃত্তিও বহুকালে লব্ধ। কতকগুলি সামান্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার স্নায়বিক ভীতি অভ্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় তাহার সম্পর্কে কদাপি আসে নাই, সেই গুলি অভ্যস্ত হইবার প্রণালী অনুসন্ধান

করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, স্নায়বিক প্রবৃত্তি মাত্রেই অভ্যাস-বশতঃ লব্ধ। মানবের সম্মুখে অজ্ঞাতকুলশীল কোন জন্তু উপস্থিত হইলে হর্ষ বা ভীতি উৎপাদনের কোন কারণ থাকে না, কিন্তু সেই জন্তুর দ্বারা আহত হইলে তাহার প্রতি ঘৃণা বা ভীতি ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এই ঘটনা হইতে আমরা অনুমান করি যে, বারম্বার এই প্রকারে আহত হওয়ায় ভীতি প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া ক্রমশঃ স্নায়ুগুলি সেই সকল ঘটনা দ্বারা সংগঠিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই প্রকারে বহুতর বিষয় অভ্যস্ত হইলে, অনভ্যস্ত বিষয়েও অভ্যস্তবিষয়-সদৃশ গুণ দৃষ্ট হইলেই, স্নায়ু চকিত হইয়া আত্মার সকাশে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং আত্মা দেহরক্ষার উপযোগী কার্য্য করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ বহুদর্শিতার ফলে দূরদর্শিতা জন্মায়। বহুদর্শিতার উপযোগী স্নায়ু-সন্নিবেশ হইলে অভিনব বিষয়ের সংসর্গ মাত্রে স্নায়ুগুলি তাহার ধর্ম্মসম্বন্ধে ও তাহার সহিত ব্যবহারসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়া দেয়। যত প্রকার অবস্থাব ফল স্নায়ুগুলি ভোগ করিয়াছে, তদনুরূপ নূতন কোনও ঘটনা বা বিষয়ের সংসর্গ মাত্রেই পূর্ব্ব স্মৃতি অনুসারে আত্মাকে তাড়না করে ও আত্মা সেই তাড়নায় চালিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং বলা যায়, বহুদর্শিতা হইতে দূরদর্শিতা জন্মায়। অতীত ফলস্মৃতি হইতে ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী স্থির করা যায়। সকল প্রাণী অপেক্ষা মানবজাতি বহুদর্শী; সুতরাং, মানবজাতি সর্ব্বাপেক্ষা দূরদর্শী। দূরদর্শিতা অভ্যাস করিতে কখনও জয়, কখনও পরাজয়, কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ ভোগ হয় ও সেই ফলগুলি স্নায়ুতে নিহিত থাকিয়া যায়, এবং পুনরায় দূরদর্শিতার ব্যবহার আবশ্যক হইলে, পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে স্নায়ু চকিত হইয়া উঠে। উক্ত প্রকারে দূরদর্শিতাও স্নায়বিক প্রবৃত্তি মধ্যে গণ্য হইয়া যায়।

উক্তরূপ দূরদর্শিতার ফলে, সমাজরক্ষাপ্রবৃত্তি জাগরূক থাকিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; এবং নির্দ্দেশের প্রথম ফল,—স্নেহ—পুত্রস্নেহ, পিতৃস্নেহ, মিত্রতা, দাম্পত্য-প্রণয় ইত্যাদি। এই ধর্ম্মগুলি, মানবজীবনেই অর্জ্জিত বটে, কিন্তু সভ্যসমাজে এ গুলি স্নায়বিক প্রবৃত্তির মধ্যে গণ্য। সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অভ্যস্ত হইলে, সেই কার্য্যেই মানবের আহ্লাদ জন্মায় ও সেই আহ্লাদের নাম পুত্রস্নেহ। স্বজাতিরক্ষণে সহকারী ব্যক্তি-গণের প্রতি যে স্নেহ, তাহার নাম বন্ধুত্ব, এবং আত্মরক্ষণে ইচ্ছুক অথচ অক্ষম

ব্যক্তির প্রতি যে স্নেহ, তাহার নাম মমতা। বন্ধুত্বের বিবর্তনে দাম্পত্য-প্রণয়ের উদ্ভব এবং মমতা হইতে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণের আবির্ভাব হয়। পিতা মাতা আপন আপন গুণধর্ম্মানুসারে আত্মরক্ষার সহায় বলিয়া তাঁহাদের প্রতি যে স্নেহ জন্মে, তাহার নাম পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহ। পশুজীবনে পিতৃস্নেহের একান্ত অভাব-সত্ত্বেও কতকগুলি ঘটনা হইতে আমাদের পক্ষ সমর্থন হইতেছে। বিড়ালশিশু ভীত হইলেই মাতার ক্রোড়শায়ী হইয়া পরিত্রাণ লাভ করে। এই প্রকার অভ্যাসে মাতৃস্নেহ বা পিতৃস্নেহের উদ্ভব হয়। অবশেষে প্রকৃতপক্ষে আশ্রয়ের আবশ্যক না হইলেও ঐ ধর্ম্মটী স্নায়বিক প্রবৃত্তিরূপে মানবচিত্তে প্রতিভাত হইতে থাকে। সুতরাং পুত্রস্নেহ, পিতৃ-স্নেহ, প্রণয় ও মিত্রতা, এবং মমতা, এ সকল ধর্ম্ম মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থার স্বভাবসিদ্ধগুণ। মানবজাতির অতি সরল আদিম অবস্থায় পুত্র-স্নেহ দেখা যায় না। পশুজাতির মধ্যে যে পুত্রস্নেহ দেখা যায়, তাহা আমাদের স্নেহের সহিত সমপ্রকৃতির নহে। পুত্রস্নেহ অর্থে ঠিক যে ভাবটী আমাদের মনে উদয় হয়, পশুপক্ষীর স্নেহে সে সকল ভাব নাই, এবং যদিও আমাদের ও পশুপক্ষীর স্নেহ-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ দেখিতে প্রায় এক রকম বটে, কিন্তু উভয়ই সারাংশে পৃথক্। সেই জন্যই আমরা বলি, পশুপক্ষীর মধ্যে পুত্রস্নেহ বা পিতৃস্নেহ নাই।

এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কয়টী ধর্ম্ম মানব-চরিত্রে দেখা যায়, যে গুলির আভাস পশু-চরিত্রে আদৌ নাই। যথা—বিস্ময়, প্রীতি ও ভক্তি। মানব-জাতি যখন পূতিময় পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নব সৌরভময় জীবন আরম্ভ করে, তখনই পূর্ব্বসুকৃতিবশে লব্ধ মানসিক তেজবলে সকল ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। এই প্রবৃত্তির আদিম অবস্থা বিস্ময়। বর্ত্ত-মান কালে পৃথিবীতে মানবজাতির সভ্যাসভ্য বহুতর শাখা বিদ্যমান আছে। আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে এ ধর্ম্মটী বিদ্যমান কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা যে সভ্য মানবজাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রীতি বা সৌন্দর্য্যবোধ এবং ভক্তি মানবজাতির বিশেষ ধর্ম্ম। এগুলি অন্য কোনও জীবে লক্ষিত হয় না। বিস্ময় হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্রীতি হইতে আনন্দ এবং উভয়ের একত্র সমাবেশ ও ঘাত প্রতিঘাত হইলেই মানবচিত্ত মার্জ্জিত হইতে থাকে। ভক্তি সেই মার্জ্জনী, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম যে প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়াছে, ভক্তিও সেই প্রণালীতে লব্ধ।

অসভ্য মানব-চিত্তে ভক্তির অঙ্কুশমাত্র আছে; কিন্তু সেই ভক্তির স্বভাবও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয় এবং বর্ব্বর-চরিত্রের ভক্তি ও সভ্য-চরিত্রের ভক্তির মধ্যে এতই প্রভেদ যে, দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রবৃত্তি ভক্তি; এই ভক্তির চরমসীমা কি, বা কোথায়, তাহা আমরা জানি না,—অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

আমরা দ্বাদশটী ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি। বিবর্ত্তন-সোপান ব্যবচ্ছেদ করিলে এই গুলি সর্ব্বপ্রথমেই নয়নগোচর হয়। এগুলির নিখুঁৎ পারম্পর্য্য স্থির করা অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকৃতির মূর্ত্তি এতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যে, কোন্ ঘটনাটী কি কারণে অর্থাৎ কোন্ ঘটনার সহযোগে ঘটিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা নিতান্তই দুরূহ হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, জ্ঞানবিস্তার-সাহায্যে আশা করা যায় যে, এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বহুকাল আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে না। আমরা যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি, তাহা ঘটনা বৃত্তান্তের দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে, এই সিদ্ধান্তটী সত্য, এবং যদি সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বোধ করি, হিন্দু উপনিষদ্ শাস্ত্রের মুক্তি যথার্থ বৈজ্ঞানিক সত্য। মানবের উন্নতি প্রকৃতির নিয়মবশে ঘটিতেছে,—মানবের ইচ্ছা বা চেষ্টার বশীভূত নহে। যেমন বাগানের ফুলটী প্রাকৃতিক নিয়মবশে ফুটিয়া উঠিয়া সৌরভে প্রাণ মাতাইয়া তুলে, তদ্রূপ আত্মাও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিয়া ভক্তিগুণসংযুক্ত হইয়া জগৎকে প্রেমে মাতাইয়া তুলে, ও স্বয়ং বিভোর হইয়া পড়ে। ভক্তিতে চিরস্থায়ী প্রেম আছে, আনন্দ আছে। নিম্নপদস্থ জীবের আনন্দ অতি বিরল এবং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু জীব যতই উচ্চতর পদপ্রাপ্ত হয়, তাহার আনন্দের সীমাবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং স্থিরতর ও অধিকতর স্থায়ী হয়। সেই জন্যই বোধ হয়, পরমানন্দলাভকে মুক্তি বলে। *

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেক গুরুতর বিষয় অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, এবং স্থানাভাবে আবশ্যক প্রমাণ ও যুক্তি সন্নিবেশ করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির মানস রহিল। লেখক।

কবিতা-কানন।

হৃদয়ের কথা।

মরণের উপকূলে এসেছি এবার,
বক্ষেতে বাঁধিয়ে বল করিয়াছি পণ,
দেখাব হৃদয় চিরে লুকাইত ধন,
রয়েছে সাজান যাহা অন্তরে আমার।
আজীবন যে কাহিনী রেখেছি মানসে,
সেই তৃষিতের গান, মরমের ব্যথা,
শুনাব সকলে আজি হৃদয়ের কথা;
তাই বুঝি ক্ষীণপ্রাণ নাচিছে হরষে।

যে বাঁধনে বাঁধা ছিল জীবন আমার,
ছিঁড়ে গেল ক্রমে সেই সোনার বাঁধন।
তীব্র মদিরার নেশা ছুটিল এবার,
পুনরায় ফিরে এল পুরা'ন চেতন।
কাটিল এখন সেই স্বপনের ঘোর,
বাস্তবের দেশে পুনঃ আনিল এখন।

শ্রীহরিহর শেঠ।

রবীন্দ্রনাথ।

বাসন্তী শশাঙ্ক যেন কৌমুদী বিস্তারি,
ভুলাইয়া ভাবুকের বিশাল হৃদয়,
সুনীল-গগন কোলে আপনা পাসরি,
জুড়াইয়া জগজন মানস-নিলয়,
যৌবন-মধ্যাহ্ন ধীরে উপনীত এবে;
সুবিমল সমুজ্জ্বল কিবা ও প্রতিভা,
মরি মরি পাপময় এই মর ভবে,
ওই পূর্ণ দীপ্তিময়ী পারিজাত-বিভা।
ভ্রমে বিধি পারিজাত ফুলে এজগতে,
দে'ছে পাঠাইয়া, তাই এহেন সুন্দর,
তোমার বয়ান বুঝি, সৌরভ মরতে
অতুলন, অনুপম, অক্ষয়, অমর?

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুন্দর কি ?

১

শরতের পূর্ণশশী,
নির্ম্মল অম্বরে বসি,
হাসি হাসি বিলায় কিরণ মনোহর,
বটে তাই পরম সুন্দর।

২

মধুর বসন্তকালে,
বিকচ কুসুম-জালে,
মাতায়ে জগতজনে সুমধুর বাসে,
সুন্দরতা বটে পরকাশে।

৩

মৃদু মন্দ প্রবহনে,
মলয়ের সমীরণে,
সুখের পরশে আহা শরীর জুড়ায়,
সুন্দরতা রহে বটে তায়।

৪

প্রকৃতির নবশোভা,
স্বভাবতঃ মনোলোভা,
ভাবুকের করে সদা নয়ন-তর্পণ,
বটে তাই সুন্দর দর্শন।

৫

ইন্দুমুখী সুহাসিনী,
বরণ কাঞ্চন জিনি,
অপরূপ রূপবতী রমণী মূরতি,
সুন্দরতাময় বটে অতি।

৬

এইরূপ নানাকার,
নয়নের শোভাধার,
সুন্দর পদার্থ কত আছে ধরাতলে,
সুন্দর বলিয়া লোকে বলে।

৭

কিন্তু মোর মনে লয়,
সংসারে লক্ষিত হয়,
অপূর্ব্ব সামগ্রী এক অতি মনোহর,
এ সবার হ'তেও সুন্দর।

৮

বিনা স্বার্থে বিনা-আশা,
অকৃত্রিম ভালবাসা,
আপনারি যেন ভাবি মনের মতন,
অতীব সুন্দর সেই ধন।

৯

যে জন যতন কোরে,
আপন ভাবিয়ে মোরে,
যথার্থ প্রণয়ে তোষে আমার অন্তর,
দেখি তায় পরম সুন্দর।

১০

দেখিলে তাহার মুখ,
কি যেন উপজে সুখ,(ভুলে যাই সবদুঃখ)
ইচ্ছা হয় দেখি তারে নিকটে সদাই,
নিরখি সম্প্রীতি কত পাই।

১১

রূপ, গুণ, কথা, আর,
দর্শন চলন তার,
যে কিছু তাহার দেখি সকলি সুন্দর,
দেখি সুখে ভাসি নিরন্তর।

শ্রীগৌরকিশোর কর।

উদাস পরাণ লয়ে স্রোতে ভেসে যাই।

১

কোন্ কার্য্য সাধিবার তরে এ জীবন।
কিবা কাজ করিয়াছি,বাকী কি এখন।
জানিনা কিছুই আমি,কে বুঝাবে হায়।
অকূল পাথারে ভাসি নাহিক উপায়॥

২

সংসার কিরূপ তাহা কভু বুঝি নাই।
কেমনে কাটাব কাল ভাবি সদা তাই॥
প্রাণের নিভৃতে আছে কত গুপ্ত কথা।
কাহাকে বলিব হায় কে বুঝিবে ব্যথা॥

৩

উদাস পরাণ লয়ে স্রোতে ভেসে যাই।
যেই খানে রই তথা দুখগীতি গাই॥
দুঃখ শুনে দুঃখ করে এমন আমার।
কেহ নাই কেহ নাই সংসার মাঝার॥

৪

শ্মশান শ্মশান মোর বড় আদরের।
কভু না ভুলিতে পারি গুণ তাহাদের॥
যখনি উত্তপ্ত প্রাণ লয়ে যাই তথা।
বিমল আনন্দ পাই যায় সব ব্যথা॥

৫

শ্মশানেতে যত লোক পুড়ে হয় ছাই।
তা দেখে আমি যে কত উপদেশ পাই॥
অহঙ্কার অভিমান দম্ভ আদি যত।
শ্মশানের কাছে এসে সব পরাহত॥

৬

উচ্চ আশা, লালসা পিপাসা আদি যত।
আশার অসংখ্য নাম বলিব তা' কত॥
সকলের গর্ব্ব খর্ব্ব যাইলে শ্মশান।
নিবাত-নিষ্কম্পবৎ জুড়ায় পরাণ॥

৭

বড় ভালবাসি আমি শ্মশান তোমায়।
তোমা ছাড়া হতে মোর নহে অভিপ্রায়।
বসিলে তোমার কাছে অতীতের ভাব।
আসিয়া মানসে সব হয় আবির্ভাব॥

৮

ভাবিতে ভাবিতে শেষে আত্মহারা হই।
যে আমি ছিলাম,যেন সে আমি বা নই॥
কোথায় গিয়াছি যেন নূতন প্রদেশ।
নাহি দুঃখ শোক তাপ সুখ সে অশেষ॥

৯

বিমল বিশুদ্ধ সুখ বিরাজে তথায়।
যাইলে সেথায় প্রাণ ফিরিতে না চায়॥
মনে হয় চিরদিন থাকি এই স্থানে।
ফিরিতে না হয় যেন সংসার বিপিনে॥

১০

উদাস পরাণ লয়ে স্রোতে ভেসে যাই।
ভাসিতে ভাসিতে যেয়ে সাগরে সুধাই॥
বলনা সাগর তুমি কাহার আদেশে।
অসীম হে জলরাশি! ফের হেসে হেসে॥

১১

জানিনা বুঝিনা কিবা উদ্দেশ্য তোমার।
করিতেছ বল কার মহিমা প্রচার॥
জীবনের উদ্দেশ্য যদি হে থাকে তব।
কহ তা' শুনিয়া তব উপদেশ লব॥

১২

মম জীবনের দেখি কোন লক্ষ্য নাই।
(তাই)উদাসপরাণ লয়ে স্রোতে ভেসে যাই॥
যদি কেহ কূল দেয়, কূল তবে পাই।
অকূলে আকুল আমি,ভাবি হে সদাই॥

বাঁশীর সুরে।

আর বাজায়ো না বাঁশী।
নিবেছে তারকা, ডুবেছে চন্দ্রমা,
অতীত সুখের নিশি।
ওই ডাকিছে কোকিল,গাহিছে পাপিয়া,
স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরে;
অস্ফুট কলিকা, মেলিছে নয়ান,
নবীন পুলক ভরে।

ওই, মদির বাঁশীর, মদির ঝঙ্কার,
বহিবে শূন্যেতে ফিরে;
আমি, বাঁশীর সুরে, পরাণ বাঁধিয়া,
কেমনে থাকিব ঘরে?

শ্রীলালবিহারী দত্ত।

বিবিধ।

পুরাতন সংবাদ। একদিন এক ব্যক্তি ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে কোনও এক সংবাদপত্র কার্য্যালয়ে আসিয়া সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিল "এইটে না—সংবাদপত্রের আপিস্ ?"

স। হ্যাঁ।

আগন্তুক। এই কাগজেই না আমাকে চোর বলা হ'য়েছিল ?

স। কই না ?

আ। আমাকে পাজি বলে নি কি ?

স। নিশ্চয়ই না।

আ। তবে, বোধ হয়, অন্য কোন কাগজে হবে, এ কাগজে নয়।

স। তা'হ'তে পারে, এ কাগজে পুরাতন কথা প্রকাশিত হয় না।

* * *

খরিদ্দার।—ব্যাটার কি বুদ্ধি ? গোয়ালা আর কত ভাল হ'বে ? গরু ও গোয়ালা একই—প্রভেদ মধ্যে যা কেবল গরু খাঁটী দুধ দেয়, গোয়ালা জলো দেয়।

গোয়ালা।—আজ্ঞে হাঁ, আর একটু প্রভেদ আছে ; গোয়ালা ধারে দুধ দেয়, গরু ধারে দেয় না—আগে খেতে পাবে, তবে দুধ দেবে।

* * *

পুস্তক বিক্রেতার প্রতি। "ধনী হইবার সহজ উপায়" ব'লে কোনও বই তোমার দোকানে আছে কি ?

দোকানদার। আজ্ঞে আছে, দিচ্ছি। একখানা পিনাল কোডও সেই সঙ্গে নিয়ে রাখুন, দরকার হ'তে পারে।

* * *

একটী জাহাজে ৩০ জন আরোহী ছিল ; তাহার মধ্যে ১৫ জন শ্বেত এবং ১৫ জন কৃষ্ণকায়। জাহাজের কাপ্তেন দেখিলেন যে, এত অধিক আরোহী লইয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইতে পারিবেন না. তাই পনরজন লোককে জলে ফেলিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। এই সংবাদে আরোহীকুল অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। কাপ্তেন সকলকে সারি সারি দাঁড় করাইলেন এবং বলিলেন, আমি পর পর গণিয়া প্রত্যেক দশম ব্যক্তিকে জলে ফেলিয়া দিব। এই নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনে শ্বেতকৃষ্ণ সকলেই সন্তুষ্ট হইল। এখন বলুন দেখি, কাপ্তেন সেই ত্রিশ-জন লোককে কেমন করিয়া সাজাইয়া লইবেন, যাহাতে সমস্ত শ্বেতকায় ব্যক্তি রক্ষা পায় ?

উত্তর।—সাজাইবার প্রণালী—০ ০ * ০ ০ ০ * * * * * ০ ০ * * ০ ০ ০ ০ * ০ * * * ০ * * * ০ ০ *। শ্রী অঃ।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩০৮। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রাচীন কলিকাতা।

(১)

ভারতের রাজধানী ও প্রধান নগরী যে কলিকাতা আজ ধনে, ঐশ্বর্য্যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, জনসংখ্যায় ও অট্টালিকাদির আধিক্য ও সৌন্দর্য্যাদিতে পৃথিবীর অপরাপর প্রধান রাজ্যের রাজধানী-সমূহের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে, পূর্ব্বে সেই কলিকাতার কিরূপ অবস্থা ছিল এবং কিরূপ ঘটনাচক্রে ইহা ইংরাজদের রাজধানী হইয়া বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার যথাসম্ভব ঐতিহাসিক বিবরণ সমূহ সংগ্রহ করিবার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এই মহানগরীর নাম "কলিকাতা" কেন হইল, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকেরই অনুমান ৺কালীমাতার পীঠস্থান কালীঘাট হইতে এ সহরের "কলিকাতা" নামকরণ হইয়াছে এবং এই অনুমান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট জব চার্ণক প্রথম এই মহানগরীর সূত্রপাত করেন। কোম্পানীর কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা হুগলী হইতে এই স্থানে

আসিতে হইত। বাঙ্গালার মধ্যে হুগলী নগরী তখন কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। সম্রাট আরঙ্গজেব তখন প্রবল-প্রতাপে ভারত শাসন করিতেছিলেন এবং বাঙ্গালার এ অঞ্চলের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য হুগলীতে সম্রাটের একজন কর্ম্মচারী (ফৌজদার বা গভর্ণর) নিয়োজিত ছিল। এই ফৌজদারের সহিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ইংরাজকর্ম্মচারীদিগের প্রায়ই বিবাদ ঘটিত ও তৎসূত্রে কোম্পানীর এই সকল কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদিগের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতির সহিত বিলক্ষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। এজন্য বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর হইতে হুগলীর এজেন্টের প্রতি এই আদেশ হয়, যেন তিনি এই স্থানের পরিবর্ত্তে অপর কোন নিরাপদ স্থানে তাঁহাদিগের কার্য্যস্থল (কুঠী) স্থানান্তরিত করেন। এই সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কার্য্যস্থল তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ শাসনাধীন, আয়ত্বাধীন ও উত্তমরূপ গড়বন্দি করা ছিল। এখানেও যাহাতে তাঁহারা উক্তরূপ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হন, তজ্জন্য ডিরেক্টরেরা এজেণ্ট জব চার্ণককে বাঙ্গালার সুবাদারের (গবর্ণর) নিকট, ও তথায় বিফল মনোরথ হইলে দিল্লীশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত, আবেদন করিতে বিশেষরূপে আদেশ করেন।

এদিকে এই সময় বণিক-ইংরাজদিগের অত্যাচার, আবদারও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই স্থলে আমরা সংক্ষেপে একটি উষ্ট্রের গল্প বলিব। গল্পটী পুরাতন হইলেও সময়োপযোগী বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। এক উষ্ট্র একদিন ঝড় বৃষ্টিতে দারুণ কষ্ট পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল; কোথাও মাথা রাখিবার স্থান না পাইয়া অবশেষে বেচারী কাঁপিতে কাঁপিতে এক কুটীরের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল, ও কুটীর-স্বামীকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সেই কুটীরের আট্চালার নিম্নে মস্তকটী রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিল। কুটীরস্বামী উট্ বেচারীকে এই প্রকার কষ্ট পাইতে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, উষ্ট্র মহাশয় একটু ভরসা পাইয়া যাহাতে তাঁহার বৃহদাকার দেহের অপরাংশ বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পায়, তজ্জন্য পুনরায় কুটীর-স্বামীর দয়াপ্রার্থী হইলেন। তিনিও দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া এবার তাহাকে সেই কুটীরের দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইতে অনুমতি দান করিলেন। এইবার উষ্ট্র মহাশয় বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া যেমন একটু আরাম বোধ

করিল, সেই সঙ্গে একটু সাহস—একটু আবদারও বাড়িল। তখনও বাহিরে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। উষ্ট্র মহাশয় দেখিলেন, কুটীরাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ স্থানলাভ করিতে পারিলে বড় ভাল হয়,—আর শীতে কষ্ট পাইতে হয় না। সুতরাং পুনরায় সেই সদয়-হৃদয় কুটীরস্বামীকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া কুটীর মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থান-লাভের জন্য দয়াপ্রার্থী হইলেন। এবারও তাঁহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কুটীরস্বামীর অপরাপর পরিজনের সহিত উষ্ট্র মহাশয়ের বিপুল দেহের স্থান উত্তমরূপ সঙ্কুলান না হওয়ায় সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। এদিকে কুটীরস্বামীকে নিরীহ দয়ার্দ্রচিত্ত লোক দেখিয়া উষ্ট্র মহাত্মার তখন সাহস ও আবদার বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং এবার জোরের সহিত সুর ধরিয়া কুটীরস্বামীকে বলিলেন, "বাপু, আমাকে এই ঘরটী ছাড়িয়া দিয়া তোমায় অন্যত্র স্থান দেখিতে হইতেছে, নতুবা আমার এখানে আরামে থাকিবার সুবিধা হইতেছে না।" কুটীর-স্বামী সেই ঝড়বৃষ্টি-ক্লিষ্ট উষ্ট্রের এই ভাব দেখিয়া অবাক্!

ইংরাজ-কোম্পানীরও এখন সেই ভাব। অনেক যত্ন, চেষ্টা, উপরোধ, অনুরোধের পর যদি বাণিজ্য করিবার অনুমতি মিলিল, তখন কারখানার নিমিত্ত স্থানের আবশ্যক, যদি বা তাহাও মিলিল, তখন বিবিধ প্রকারের নানা আবদার বাড়িতে লাগিল, এবং তাহারও অনেক পূর্ণ হইতে লাগিল দেখিয়া তখন বিলক্ষণ সাহস বাড়িয়া গেল, আর যায় কোথা! তখন আবদেরে পোষ্যপুত্রের ন্যায় সুর ধরিলেন, আমাদিগকে বিনামূল্যে এতটা ভূমি দান কর, কেল্লা বানাইতে দাও, বিনা-মাশুলে বাণিজ্য করিতে দাও, আরও কত কি অধিকার দাও, তাহার সংখ্যা নাই। ইংরাজদিগের এই সকল আবদার ও জুলুমের কথা বাঙ্গালার নবাব সম্রাটের কর্ণগোচর করিলে পর ইংরাজদিগের সকল আশা ভরসা তখনকার মত নির্মূল হইল।

কিন্তু ইংরাজ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; যখন জেদ্ ধরিয়াছেন, তখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আর ইংরাজের এই গুণ—এই Perseverance ও এই অবিচলিত জেদ্ আছে বলিয়াই, আজ ইংরাজ জগতের মধ্যে এত শ্রেষ্ঠতালাভে সমর্থ হইয়াছে। ইংরাজের অগণিত দোষ-রাশির মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহা এই অধম বাঙ্গালী জাতির নিতান্ত অনুকরণীয়। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের সেদিকে লক্ষ্য নাই।

হুগলীতে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের এই অবস্থার কথা কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরাজের পররাজ্য-গ্রাসেচ্ছা চিরকাল সমভাবে প্রবল; বিশেষতঃ এই সময়। তখন ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি অপরাপর ইউরোপীয় জাতিরা ভারতে বাণিজ্য-কার্য্যে উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিয়া ইংরাজ হিংসায় ফাটিয়া যাইতেছে; সুতরাং এতাদৃশ সময় এরূপ একটা ছুতা হাতে পাইয়া কি আর তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অবিলম্বে রাজা জেম্‌সের আদেশক্রমে মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রবল প্রতাপে আপনাদিগের বাণিজ্য-বিস্তার জন্য (রাজ্যলাভ নয়?) ইংলণ্ড হইতে দশখানি যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইল; এই সকল জাহাজে বার হইতে সত্তরটী পর্য্যন্ত কামান ও সেই সঙ্গে ছয় দল পদাতিক সৈন্য ছিল। কাপ্তেন নিকলসন্ নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর হস্তে এই সমস্ত যুদ্ধ জাহাজের ভার থাকে, এবং বাঙ্গালায় পঁহুছিলে পর এই সকলের ভার প্রধানবার এজেন্টের প্রতি সমর্পণের আদেশ থাকে। অধিকন্তু এই সকল জাহাজে অপরাপর সেনা-নায়কের (Officer) অভাবে এজেন্টের সহকারী কর্ম্মচারীদিগের প্রতি কাপ্তেন, কর্ণেল প্রভৃতি সৈনিকপুরুষদিগের পদ গ্রহণ করিয়া সমর-কার্য্য-পরিচালন-ভার গ্রহণের আদেশ প্রদত্ত ছিল। মোগল সম্রাটের সৈন্যদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পক্ষে ডিরেক্টরদিগের ইহা অতি চমৎকার সুব্যবস্থা। আর এই সকল কর্ম্মচারী কিরূপ সাহসী ও যুদ্ধকার্য্যে কিরূপ দক্ষ ছিলেন, আমরা পরে তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিব।

এতদ্ভিন্ন কোর্ট অব ডিরেক্টর হইতে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া তথায় দুই শত কামান সংযুক্ত কেল্লা নির্ম্মাণ ও কুঠী স্থাপনের এবং বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকা আক্রমণের স্বতন্ত্র আদেশ প্রদত্ত হয়। নিকলসন্ কয়েক খানি জাহাজ লইয়া হুগলীতে পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই (১৬৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে) সুসভ্য ইংরাজের সুসভ্য প্রথানুযায়ী হুগলী সহরকে কামানের গোলার সাহায্যে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করেন, ও অল্প সময় মধ্যে পাঁচ শত গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। হুগলীর ফৌজদার এই প্রকার হঠাৎ আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া আপাততঃ সন্ধি-স্থাপনের জন্য উদ্যত হইলেন। এই সময় হইতে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ-

দিগের বাঙ্গালায় ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। এই আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সম্রাট আরঙ্গজেবের আদেশক্রমে বাঙ্গালার গবর্ণর ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ মিটাইবার জন্য হুগলীর ফৌজদারকে আদেশ করেন। বোধ হয়, আরঙ্গজেব এই সময় নানাপ্রকারে বিব্রত হইয়া পড়ায় আর শত্রু বৃদ্ধি না করিয়া উদ্ধত বিদেশীয়দিগের প্রতি সদয় ভাব দেখাইলেন। এ দিকে কোম্পানির কর্ম্মচারীগণ হুগলীতে অবস্থান করা আর নিরাপদজনক নয় বিবেচনা করিয়া তথা হইতে কুঠী স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামে কুঠী স্থানান্তরিত করার পরিবর্ত্তে সুতানুটিতে নূতন আস্তানা বসাইলেন। এই সময় বরাহনগরে ওলন্দাজদিগেরও এক আড্ডা ছিল। ১৬৮৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই অভিনব আস্তানার নিশান গাড়া হয়। শুভদিনে, মাহেন্দ্রক্ষণে, একাদশ বৃহস্পতি মাথায় লইয়া বিদেশীয় ধূর্ত্তবণিককুল এই নূতন আড্ডা সংস্থাপন করেন। এই সময় হইতে বণিক ইংরাজ অসম সাহসে যখন যাহা মনে করিয়াছেন, তখন তাহা করিয়া আসিতেছেন। আর মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংশেরও এই সময় হইতে সূত্রপাত হয়। ইহার পর আরও সত্তর বৎসর মোগল সাম্রাজ্য এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল বটে, কিন্তু তখন অধঃপতনের দশায়। তাহার পর ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। একটি কথা যথাস্থানে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি। কোম্পানির ডিরেক্টরেরা কাপ্তেন নিকল্‌সনের প্রতি আর একটি হাস্যাস্পদ আদেশ করেন যে, তিনি যেন মোগলরাজের নিকট হইতে ৬৬ লক্ষ মুদ্রা কোম্পানির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, সহজে না হয়, কামানের ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আদায় করিবেন। বোধ হয়, এইজন্য কাপ্তেন সাহেব বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়াই তাড়াতাড়ি হুগলি সহরটা কামানের গোলায় উড়াইতে আরম্ভ করেন। আবদার বড় কম নয়। কিন্তু এখানকার কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট বুদ্ধির কাজ করিয়া এই টাকা আদায় জন্য কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। সম্রাট্ আরঙ্গজেবের আমলে এই প্রকার অসঙ্গত প্রস্তাব না করা যথার্থই বুদ্ধিমানের মত কাজ হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরেরা এজন্য চটিয়া লাল হন, এবং অনেক ইংরাজ এজন্য আজ পর্য্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

১৬৯০ অব্দের ২৭শে এপ্রেল তারিখে বাঙ্গালার সুবাদার নবাব ইব্রাহীম খাঁ সম্রাটের আদেশ-ক্রমে ইংরাজদিগকে সুতানুটিতে কুঠী সংস্থাপনে

অনুমতি দান করেন। এই আদেশানুযায়ী জব চার্ণক ১৬৯০ অব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা রাজধানীর পত্তন করেন এবং একশত সৈন্য লইয়া সুতানুটিতে রীতিমত বসবাস আরম্ভ করেন। ইহার পর তথায় কুঠী প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ১৬৯২ অব্দে জব চার্ণকের মৃত্যু হয়। ইহাঁরই যত্নে কলিকাতার ন্যায় নগণ্য গ্রামকে বন জঙ্গল হইতে ইংরাজের রাজধানী পদবীতে পরিণত করিবার সূত্রপাত হয়। চার্ণকের মৃত্যুর পর আয়ার সাহেব কলিকাতায় এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। সে সময় কলিকাতায় কোন উপযুক্ত লোক না থাকায় ইহাঁকে ঢাকার কুঠী হইতে আনান হয় ও সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া এক শতের স্থানে কুড়িজন মাত্র রাখা হয়।

১৬৯৪ অব্দে ডিরেক্টরদিগের অনুমতিক্রমে সুতানুটিকে কোম্পানির বঙ্গের প্রধান এজেণ্টের কার্য্যস্থল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, এবং যাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী অপর দুইটী গ্রাম—গোবিন্দপুর ও কলিকাতা হস্তগত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে আদেশ প্রদত্ত হয়। এই বৎসর এখানকার কুঠীতে ইংরাজের দুই সহস্র মুদ্রা কর আদায় হইয়াছিল, এবং ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রজাসংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৬৯৬ অব্দে কোম্পানির ডিরেক্টর-দিগের মনোবাঞ্ছা কতক পূর্ণ হইল। এই বৎসর বর্দ্ধমান অঞ্চলে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় ফরাসি, ওলন্দাজ এবং ইংরাজ-বণিকেরা আত্মরক্ষার্থ নবাবের নিকট হইতে দুর্গ নিম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন; এই অনুমতি অনুযায়ী ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় ফোর্ট গষ্টেভাস্, ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম এবং ফরাসীরা চন্দননগরে কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু চতুর ইংরাজেরা ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে গোপনে গোপনে কাজ হাসিল করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইহারা এই তিন খানি গ্রামে স্থায়ীভাবে কুঠী স্থাপন জন্য ইজারা গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

এই শুভ সম্বাদ বিলাতে কোম্পানির কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া কলিকাতাকে প্রেসিডেন্সি * পদবীতে সম্মানিত

* "The term 'Presidency as applied to Surat (afterwards to Bombay), to Madras and to Calcutta, originally meant that the chief of each of these factories respectively was supreme also over the subordinate factories in that part of India."——Lethbrige's History of India.

ও আঘাত করিবার আদেশ দান করেন, এবং এই সঙ্গে ইহার প্রেসিডেণ্টের বেতন বৃদ্ধি করিয়া মাসিক দুই শত মুদ্রা ধার্য্য করা হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত মাসিক এক শত মুদ্রা দানের ব্যবস্থা করেন। সম্ভবত, এই ব্যবস্থা হইতে এ দেশের লাট বেলাটদিগের বেতনের উপর যে অতিরিক্ত মুদ্রা (allowance) প্রদত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাহার আরম্ভ।

ইহা ব্যতীত, এই সময় কোম্পানির কার্য্য সৌকর্য্যার্থ এবং প্রেসিডেণ্টের কার্য্যে সহায়তার জন্য চারিজন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। ইহাদিগের একজন হিসাবরক্ষক (accountant), দ্বিতীয়—গুদাম ঘরের কর্ত্তা (ware-house-keeper), তৃতীয়—জাহাজের বক্সী (marine-purser) এবং চতুর্থ —রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা (receiver of revenues)। যাহা হউক, ইহাদিগের বেতনের হার কিরূপ ছিল, তাহার উল্লেখ না থাকায় আমরাও কিছু বলিতে পারিলাম না।

ইহাই এদেশে ইংরাজ-রাজের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান বা আরম্ভ। এই বৎসর ইহাদিগের সাবেক দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপন হয়। ইহা তখন গোবিন্দপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থান তৎকালে চৌরঙ্গীর ইন্দ্রালয়-সদৃশ সুশোভিত অট্টালিকাদির পরিবর্ত্তে হিংস্র জন্তুদিগের আবাস ভূমি—নিবিড় বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, ও সেই অরণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে দুই চারি খানি সামান্য কুঁড়ে ঘর ও একটি বাজার মাত্র দৃষ্ট হইত। ইহাই গোবিন্দপুরের তখনকার সম্পত্তি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

কল্পনা বনাম সত্য।

(গল্প।)

১

অনিলের প্রতি ব্রজদুর্ল্লভ।

আজ তোমার মাসিমার অ্যাটর্ণির নিকট যাইয়া তাঁহার উইল দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহার শ্বশুর-বংশেরও আর কেহই জীবিত নাই। তিনি অর্দ্ধেক বিষয় সম্পত্তি তোমাকে এবং অপরার্দ্ধ তাঁহার স্বামীর এক দূর

সম্পর্কীয় ভাগিনেয় বা তদীয় উত্তরাধিকারিগণকে দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর-সেবার দেবোত্তর জমিরও বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র আছে। তাঁহার স্বামীর পৈতৃক বাটী তোমাদের দুই জনের মধ্যে একজন লইয়া বসবাস কর, এই তাঁহার ইচ্ছা। যে ঐ বাটী লইবে, তাহাকে অপর পক্ষকে দশ হাজার টাকা দিতে হইবে। অবশ্য পল্লীগ্রামের সেই ভগ্নস্তূপ দশহাজার টাকা দিয়া ক্রয় করিবার তোমার কোনও আবশ্যক দেখি না। কিন্তু তোমায় একবার সেই বাটী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করা উচিত।

তোমার অংশে যে সম্পত্তি পড়িয়াছে, তাহাতে তুমি স্বাধীনভাবে ধনীর মত কলিকাতাতে বাস করিতে পারিবে। এখন আর ত অর্থের আপত্তি করিতে পারিবে না। এইবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও, আর পদ্য লিখিয়া ও নভেল পড়িয়া জীবনটাকে নিরামিষ কাটাইও না। অবশ্য এ কথাটা তোমাকে অ্যাটর্ণি-ভাবে বলিতেছি না,—আমাদের উভয়ের আশৈশব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়াই বলিতেছি।

তোমার উত্তর পাইলে আমি অপর পক্ষের অ্যাটর্ণির সহিত তোমার বিষয়-বিভাগ-সম্বন্ধে শেষ-নিষ্পত্তি করিব।

২

ব্রজদুর্ল্লভের প্রতি অনিল।

তোমাদের কথামত আমি সে বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। সে বাটীও পরিত্যক্ত এবং পল্লীও জনশূন্য বলিলেই হয়। তুমি বলিয়াছিলে, ডায়মণ্ড হারবারের নিকটেই, কিন্তু ঠিক তাহা নহে; ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ হইবে। গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, অবশ্য আমি পদব্রজেই গিয়াছিলাম। পাকা রাস্তা ছাড়িয়া গ্রাম্যপথে মাঠের উপর দিয়া অনেক দূর যাইতে হয়। যখন—পুলে পহুছিলাম, তখন অপরাহ্ণ।

বাড়িটীর বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। সেটী একটী অতীত ঐশ্বর্য্যশ্রীর সমাধি-মন্দির। নহবৎখানা, কাছারি বাটী, অতিথিশালা, সুবৃহৎ দালান ও বহির্বাটী এবং অন্দরমহল সকলই আছে—কিন্তু ভগ্নাবশিষ্ট। তাহাদের বিশালত্ব, তাহাদের গঠন-নৈপুণ্য এবং স্থানে স্থানে স্থপতি-কারুকার্য্য অবর্ণনীয়। এবং এক বিজন নীরবতা, সেই বংশের কত কি পুরাতন ইতিহাস বক্ষে ধরিয়া সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে।

আমার প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে সে যেন কি এক অব্যক্ত ভাষায় আর্ত্তনাদ করিল। আমি সেই অট্টালিকা-স্তূপে কখন বা পথহারা, কখন বা আত্ম-হারা হইয়া গিয়াছিলাম।

সেই বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঠাকুর-বাটীতে পঁহুছিলে পুরোহিত ঠাকুর আমার পথ-প্রদর্শক হইলেন। ঠাকুর-বাড়ীও পুরাতন, কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ নহে, কালের পদচিহ্ন এখানে মৃদুতর বলিয়া বোধ হইল। দেবালয় গুলির মধ্যে রাধাকান্ত এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির-দ্বয়ই প্রধান,—উহাদের সুউচ্চ চূড়া-যুগল গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত তরুরাজির শিখর ভেদ করিয়া বহুদূর হইতে দেখা যাইতেছিল, এক্ষণে নিকটে আসিয়া সেগুলিকে আগ্রহের সহিত দেখিলাম। দেখিবার জিনিস বটে! লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির-অভ্যন্তরে তলদেশ হইতে শিখর পর্যান্ত চক্রাকারে সোপান-শ্রেণী উঠিয়াছে —সর্ব্বোচ্চ-তলে দেব-দেবীর শয়নঘর। সেরূপ নির্ম্মাণ-কৌশল বাঙ্গালার আর কোনও দেব-মন্দিরে দেখি নাই। রাধাকান্ত-দেবের মন্দির উচ্চতর। মন্দিরদ্বয়ের পশ্চাতে আম্রকানন, পশ্চিমে ফুলবাগান,—এখন জঙ্গলময়—কচিৎ দুই একটী শেফালিকা, কামিনী, করবীর ও চম্পক বৃক্ষসমূহ উহার পূর্ব্ব অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। পূর্ব্বে প্রকাণ্ড সরোবর রক্তপদ্মে ভরিয়া রহিয়াছে। ভোগশালা, শিবালয়, তুলসীমঞ্চ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে এবং সেই পূজারি ব্রাহ্মণঠাকুরের মুখে এই কীর্ত্তিস্থাপনকারীগণের নানা-কাহিনী শুনিতে শুনিতে শত সহস্র স্মৃতি ও বাসনা আমার মনে উদিত হইয়া আমাকে যেন বিকল ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিল। আমি ব্রাহ্মণঠাকুরকে মন্দির-দ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া একটু নির্জ্জনে বসিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। মনে হইল, যদি এই শান্তি-সুষমার লীলাভূমি নিভৃত পল্লীতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার এ জগতে বুঝি কামনার বস্তু আর কিছু থাকে না। সংসারের জনতা-কোলাহল, পাপতাপ, আশা-উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা-অবসাদ, কিছুই আমাকে এখানে স্পর্শ করিবে না। আমি পুস্তক ও স্মৃতি লইয়া এখানে কল্পনা-রাজ্যে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব। উপন্যাস ও পদ্য তোমার নিকট উপহাস ও অবজ্ঞার জিনিস, কিন্তু আমার নিকট সে গুলি পরম আদরের ও উপকারের বস্তু! বাস্তবিক অবিমিশ্র সুখ ও তৃপ্তি কে কবে পাইয়াছে? কিন্তু কল্পনা সেই সুখ, সেই তৃপ্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করে। সেই জন্য কল্পনাকে আমি সত্য হইতে বড়

বলিয়া আরাধনা করি। এখানে বাস করিলে আমি অসুন্দর সত্যকে বিস্মৃত হইয়া চিরসুন্দর কল্পনাকে জীবনের সাথী করিতে পারিব। তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিতে বলিয়াছ,—সেরূপ বিপদ্‌-গ্রস্ত হইবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। কল্পনাকেই আমি পত্নীরূপে বরণ করিয়াছি এবং এই বাটীকেই আমি উভয়ের মিলন-নিকেতন করিব। অতএব আমার ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ এই বাটী প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির উপর নির্ভর করিতেছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে কবিতে আমি উপবেশন ও বিরাম লাভার্থে অদূরবর্ত্তী সরোবর-তটদেশে দোলমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। তখন সূর্য্যদেব বিদায়োন্মুখ,—রক্তিম মেঘমালায় পশ্চিমাকাশ বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে, এবং ভগ্ন অট্টালিকা-গাত্রে ও মন্দির-চূড়ায় সেই রক্তাভা প্রতি-ফলিত হইয়া কি এক স্বপ্ন-লোকের ছায়া বিস্তার করিতেছিল। আমি দোলমঞ্চের পশ্চাৎভাগ বেষ্টন করিয়া সরোবর-তীরে যাইয়া দেখি, সোপানো-পরি একটী রমণী উপবিষ্টা। রমণী প্রীতিপ্রফুল্ল-নেত্রে, অলসভঙ্গীতে সেই লোহিত-নীরদ-জাল-প্রতিবিম্বিত দীর্ঘিকা-জলে রক্তপদ্মের সহিত সায়াহ্ন-সমীরের খেলা দেখিতেছিল। আমি সেই শোভাময় সন্ধিক্ষণে, অপ্রত্যাশিত স্থানে, সেই নীরব নিশ্চল অনুপম লাবণ্যময়ী রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া, প্রথমে স্বপ্ন কি সত্য, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। কিন্তু বিমনা-বশতঃ সোপানে আমার পদস্খলন হওয়াতে, সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। রমণী সেই শব্দে চকিত এবং আমাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার শান্তির ব্যাঘাতে আমি দুঃখিত—'অন্যত্র যাইতেছি' এইরূপ আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। রমণী সলজ্জ-মধুর স্বরে বলিলেন 'আপনি দেখুন, আমরা সকাল থেকে সমস্ত দেখেছি' এবং একবারমাত্র আমার দিকে সরল-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া উত্তরের অবসর না দিয়া সোপান হইতে উত্থিত হইয়া ত্বরিত চরণে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। আমি বিমূঢ়ের ন্যায়, অপলক-নয়নে রমণীর দিকে চাহিয়াছিলাম, এবং পর ক্ষণেই আত্মবিস্মৃতি-বশতঃ দারুণ লজ্জা অনুভব করিতাম, কিন্তু নিকটদৃষ্টিতে দেখি —রমণী বালিকা মাত্র। পুরোহিতের নিকট অবগত হইলাম যে, ঐ বালিকা ও উহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণ আমার ন্যায়, —পুলে নব আগন্তুক দেব-দেবী দর্শনে আসিয়াছিল। যাহা হউক, এই অপরিচিতা বালিকার কথা বোধ হয় অবান্তর আলোচনা।

আমি ঐ বাটী প্রাপ্ত হইবার জন্য কত উৎসুক, তাহা বুঝিতে পারিতেছ। যাহাতে উহা আমারই হয়, সে বিষয় সত্বর চেষ্টা করিবে।

৩

অনিলের প্রতি ব্রজদুর্ল্লভ।

আমি ত বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। তুমিও বাড়ীখানি চাও, আর তোমার অংশীদারও বাড়ীখানি চায়। তোমার সে বাড়ীর বর্ণনা পড়িয়া, একবার মনে করিয়াছিলাম, সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দিই, বিজ্ঞাপনের কায করিবে। শুনিয়াছি, বিলাতে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিবার দর্শনী লওয়া হয়, এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হয়। কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম, এ দেশের লোকদের সে সব মতিগতি নাই, ছাপান কেবল পণ্ডশ্রম হইবে। অনুসন্ধানে জানিলাম, বাটীটির ইটগুলির অধিকাংশই সে কালের—ছয় ইঞ্চি,—বিক্রয়ের সম্ভাবনা নাই;—আর সে অঞ্চলে পাকা বাড়ী করিবার লোকও এখন কেহ নাই—সুতরাং ক্রেতার অভাব। তবে —পুলের নিকটবর্ত্তী গ্রামের মিউনিসিপালিটীকে রাস্তার খোয়া ও সুরকি প্রস্তুতের জন্য বাড়িটী ক্রয় করিয়া দিলে বড় জোর পাঁচ ছয় শত টাকা দর হইতে পারে; আর কড়ি-বরগা ও জানালা-দরজাগুলা উৎপাটন করিয়া কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে হাজার খানেক টাকা উঠিতে পারে। অতএব বাড়িটী ক্রয় করিলে অন্ততঃ সাড়ে আট সহস্র টাকার লোকসান অনিবার্য্য। তোমারই যেন মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু অপর পক্ষেরও মস্তিষ্কের যে তুল্যাবস্থা, এইটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, উকীলে উকীলে ইহার কিছু মীমাংসা হইবার আর উপায় দেখি না—বিশেষতঃ যখন তোমাদের মত মক্কেলের অভূতপূর্ব্ব সংযোগ। তোমার যদি ভাঙ্গা বাড়ীতে পেচক ও শৃগাল এবং চামচিকা ও ঝিঁঝিঁ পোকার সহিত একত্র নির্ব্বিবাদে জ্যোৎস্না পান করিবার নেহাৎ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বয়ং —নং নেবুতলা ষ্ট্রীটে গিয়া অংশীদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আর যদি সুপরামর্শ চাহ, তাহা হইলে দশটি হাজার টাকা হস্তগত করিয়া, সেই ভাঙ্গা বাড়িটী তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুরুষানুক্রমে ভোগ—দখল করিতে পত্র পাঠ অনুমতি দিও।

পুনশ্চ—তুমি প্রত্যহ স্নান কর ত? তাহা হইলে স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে

বেশ করিয়া মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখিও। দুই এক শিশি না কিনিয়া, এক ডজন একত্র কিনিও; শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাইবে। আর অন্ততঃ ডজন খানেক তোমার দরকারও লাগিবে।

৪

ব্রজদুর্ল্লভের প্রতি অনিল।

আমি এইমাত্র অপর পক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হয় নাই, তিনি স্ত্রীলোক। সেন মহাশয়ের যে ভাগিনেয় কয়েক মাস পূর্ব্বে গতায়ু হইয়াছেন—ইনি তাঁহার একমাত্র কন্যা। শুনিলাম, বাটীখানি প্রাপ্ত হইবার জন্য ইনি আমার ন্যায় নিরতিশয় ব্যগ্র এবং এ বিষয়ে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের কোনও সম্ভাবনা নাই। পুরুষকে বুঝান যায়, কিন্তু স্ত্রীলোককে বুঝান কঠিন। আমি সেই বাটীর একটা পরুষ মানুষের নিকট উক্ত সমাচার অবগত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে স্ত্রীলোকটী, বোধ হয়, আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া দরজার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটী পরিচারিকাকে মধ্যস্থ রাখিয়া তিনি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আমাকে সংবাদ দিবেন, এইরূপ অভিরুচি জানাইলেন। ঠিকানা লিখিয়া দিয়া আসিয়াছি,—প্রতিপক্ষের অভিমত প্রাপ্তিমাত্র তোমাকে সংবাদ দিব। স্মরণ থাকে যেন, আমি দ্বিগুণ বা ততোধিক মূল্য দিতেও প্রস্তুত আছি।

৫

অনিলের প্রতি ইন্দুবালা।

আপনি সে দিন আমাদের বাটীতে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনার প্রস্তাবে আমি অভিমত প্রকাশ করিতে পারি নাই। সে জন্য আমি আপনার নিকট লজ্জিত আছি। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, সেই পুরাতন অট্টালিকা যাহাতে রক্ষিত হয়, যে প্রাচীন বংশের বিষয় সম্পত্তি ভাগ্যচক্রে আমাদের হস্তে আসিয়াছে, সেই বংশের কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতি যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করা আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ এক জনের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আপনার এ বিষয়ে অভিরুচি জানিতাম না। সেই জন্য অনিশ্চিতে

নির্ভর করিয়া আমিই সেই কর্ত্তব্যপালন করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলাম। আমার শৈশবও—পুলেই অতিবাহিত হয় বলিয়া, ঐ পল্লীর উপর, ও স্থানীয় দেবালয়গুলির উপর আমার বিশেষ মমতা আছে। কিন্তু আপনাকেও যখন ঐ বাটী রক্ষার জন্য আমার ন্যায় তুল্যরূপ অনুরাগী দেখিতেছি, তখন আমি হৃষ্টচিত্তে আপনাকে ঐ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি পুরুষমানুষ—সুতরাং আমার অপেক্ষা আপনিই যে এই কর্ত্তব্যসাধন কার্য্যে অধিকতর উপযোগী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অন্ততঃ ঐ ভার যে অপাত্রে ন্যস্ত হইবে না, আমার এইরূপ ভরসা আছে।

আমি আপনার অপরিচিতা নহি।—পুলে রাধাকান্তের দোলমঞ্চের সোপানে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

৬

ইন্দুবালার প্রতি অনিল।

আপনি আমাকে বাটীখানি গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণে অসমর্থ। আমি এখন ভাবিয়া দেখিতেছি যে, আপনারই ঐ বাটীখানি গ্রহণ করা উচিত। আমি নিজের প্রীতি-লাভার্থ উহা প্রাপ্ত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য মহত্তর—কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও বিষয়-স্থাপয়িতৃগণের স্মৃতিরক্ষা। যদি আমি আপনার ন্যায় সহৃদয়া স্ত্রীলোকের ইপ্সিতবস্তু-লাভের পথে অন্তরায় হই, তাহা হইলে আমি নিজের সমক্ষেই ঘৃণ্য হইব। অতএব আপনার সদয় প্রস্তাবেই আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত বোধ করিয়াছি ও চির-বাধিত রহিলাম। এক্ষণে আপনি ঐ বাটী গ্রহণ করিলেই আমি পরম সুখী হইব, জানিবেন।

৭

অনিলের প্রতি ব্রজদুর্ল্লভ।

এ আবার কি খেয়াল! বাটী তুমিও পাইবে না এবং তোমার অংশীদারও লইবেন না। তবে কেন আমাকে দাও না, আমি এই বেলা—গ্রামের মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত ইষ্টক বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করি। তোমার পত্রে আমি যখনই শুনিলাম যে, অপরপক্ষ স্ত্রীলোক, তখনই আমার মনে

একটা বিষম ধাঁধাঁ লাগিয়াছিল;—স্ত্রীলোক দশ হাজার নগদ টাকার লোভ ছাড়িয়া একটা পাড়াগাঁয়ের ভাঙ্গাবাড়ী লইতে চায়! অবশ্য আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, স্ত্রীলোকটী স্থবিরা ও বিধবা; সেইজন্য ঐ ধাঁধাঁ। এখন শুনিতেছি, ঐ রমণী-মহাশয়া তরুণী ও অনূঢ়া; সুতরাং আমার ধাঁধাঁর উত্তর মিলিয়াছে। এই রমণী-কবি-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের দিনে তাঁহার ভাঙ্গাবাড়ী-প্রাপ্তির পূর্ব্ববাসনা এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বভাব-সঙ্গত বলিয়াই বোধ হইতেছে। শুনিতেছি, তাঁহার পরলোক-গত পিতা তাঁহাকে পদ্য, উপন্যাস প্রভৃতিতে সুশিক্ষিতা হইবার পথ সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে কন্যার একটী মনোমত যোগ্য পাত্র ত্রিভুবনে খুঁজিয়া সংগ্রহ করিয়া যাইতে পারেন নাই!

বলিতেছিলাম কি—কল্পনা-আহারে ত এতটা জীবন কাটাইলে, একবার বাস্তবের আস্বাদটা লইলে হয় না কি? অর্থাৎ যদি পাকাপাকি রকমে রেজিষ্টারী করিয়া রবীন্দ্র বাবুর চিরকুমার-সভায় নামটা না লিখাইয়া থাক, তাহা হইলে এই মেয়েটীকে বিবাহ করিলে হয় না? দশ হাজার টাকাটাও ঘরে থাকে, আর বাড়ীটাও হাতে আসে,—উপরন্তু সমস্ত সম্পত্তিটা! কি বল?

৮

অনিলের প্রতি ব্রজদুর্ল্লভ।

আমি এই বিবাহ-সম্বন্ধের উপকার গুলা সোজা কথায় বলিয়াছি বলিয়া, তোমার কবিতা-ঝঙ্কৃত কর্ণে বড় কড়া ও বেসুরা লাগিয়াছে। আমার উপর রোষবর্ষণ না ক'রে, তুমি নিজেই কেন ঐ প্রস্তাবটায় সুরলয় লাগাইয়া মিঠা করিয়া লও না। মেয়েটীর জাত্যংশেও কোন দোষ নাই, নভেল-নাটকাদি পড়া-শুনারও অভাব নাই, এবং রূপ দেখে ত তুমি ভাঙ্গাবাড়ীতে—এঁ হেঁ—মূর্চ্ছাগত হইবার উপক্রম হইয়াছিলে। তুমি লিখিয়াছ যে, তুমি পাত্রীর অনুপযুক্ত।—উপযুক্তা পাত্রীর হস্তে পড়িলে তিনি নিজেই সকল অভাব পূরণ করিয়া লইবেন। অতএব সে বিষয়ে চিন্তাক্লিষ্ট হইবার তোমার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। পরন্তু আমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা এবং পদ্যশূন্যতা ব্যতীত, এই বিবাহ প্রস্তাবে যে তোমার অপর কোনও আপত্তি আছে, তাহা তোমার পত্রে আবিষ্কার করিতে

পারি নাই। সুতরাং 'শুভস্য শীঘ্রং' এই চিরন্তন ও সমীচীন নিয়মানুসারে আমি বিবাহের কথাবার্ত্তা, এমন কি দিন স্থির পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছি। কন্যাপক্ষেও ত কোনরূপ ওজর-আপত্তি শুনিলাম না। ব্যাপারখানা কি—স্বয়ম্বরা না কি!

যাহা হউক, আমার ফি-টা কিন্তু ডবল চাই,—১ম অ্যাটর্নির ফি, বিষয়টা বিভাগ না করিবার দরুণ; ২য় ঘটকালী বিদায়—ন্যূনকল্পে পাঁচ পারসেণ্ট। একবার মনে করিতেছি, শেষোক্ত টাকাটা ছেড়ে দিয়ে স্বার্থত্যাগের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইয়া দিই। এইরূপ মানসের একটা নিগূঢ় কারণও আছে। অ্যাটর্নিদেরও একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, বিবেক নামে পদার্থটা ব্যবহার-জীবীদেরও অন্তরে আছে,—সেইটে এক একবার অম্লশূলের মত আমার হৃদয়-পঞ্জরে আঘাত ক'রে যেন আমাকে বলিতেছে—কাযটা ভাল করিতেছ না—পাত্র ও পাত্রী দুজনেই এক রোগাক্রান্ত,—ভাঙ্গা ছাদের উপর প্রাচীন কীর্ত্তিতে তন্ময় হ'য়ে অমানিশার নক্ষত্র-শোভা দেখিতে যাইয়া একটা বিপদ না ঘটায়!

৯

ব্রজদুর্ল্লভের প্রতি অনিল।

আজ প্রায় দেড়বৎসর হইল—তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। এবার তোমাকে —পুলে খোকার অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে সপরিবারে আসিতেই হইবে। ভাঙ্গাছাদের ভয় নাই—গৃহিণী সমস্ত বাটী পূর্ব্বাবস্থাপন্ন করিয়া উহার প্রাচীনত্ব অদৃশ্য করিবার চেষ্টায় বিশেষ মনোযোগিনী আছেন। আর —পুলের বিজন-নীরবতা উপভোগ করিবার সৌভাগ্যও তোমার আদৌ ঘটিবে না।—গৃহিণী নারদের নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

কন্দর্পের ধরাবাস।

কন্দর্প আসিল যবে প্রথম ধরায়,
মাধবী ফুলের শেয দিল বিছাইয়া ;
রতিপতি ভাবে, "ফিরে যাব অমরায়
মাধবী আমারে যদি যায়গো ছাড়িয়া।"

মাধবী চলিয়া গেল ; দেখিল মদন
এসেছে নূতন বধূ মরত নিবাসে ;
মাতিল মকরকেতু বিলাসে তখন
নিদাঘ-নিকুঞ্জ মাঝে সঘন নিঃশ্বাসে।

বরষা নামিল ধীরে এলাইয়া কেশ,
হানিয়া অনঙ্গ-হৃদে অপাঙ্গের শর ;
কেতকী কদম্ব যূথী ফুটিল অশেষ,
প্রদ্যুম্ন ভাবিল মনে, "এই মোর ঘর।"

পরে আসি' লীলাময়ী শরৎ-সুন্দরী
পঞ্চশরে বরি' নিল আপন প্রণয়ী,
সুধাংশু-সোহাগ-স্নিগ্ধা শোভনা শর্ব্বরী
জীবন-দায়িনী তা'ও, নিত্য সুখময়ী।

সুচির নিশায় কত প্রমোদ-লহরী,
তপ্ত সুকোমল শয্যা, নিবিড় বেষ্টন,
অফুরাণ সুশীতল শীতের শর্ব্বরী ;—
মদন দেখিল তা'ও মন-বিমোহন।

ঋতু পরে গেল ঋতু ;—কেবলি উৎসব !
ফুলে চন্দ্রে আলিঙ্গনে ভুলিয়া মদন,
হাতে লয়ে সমুচ্ছল যৌবন-আসব,
বলে, "আর ধরা ছাড়ি' যেতে নাহি মন !"

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

কৃষ্ণকুমারী।

অতীত-গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ রাজস্থানের পবিত্র ইতিহাস আলোচনা করিলে যে সকল লোমহর্ষণ বিস্ময়কর ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে রাণা ভীমসিংহের দুহিতা মিবার-লক্ষ্মী কৃষ্ণকুমারীর শোচনীয় মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভারতপূজ্য পবিত্র শিশোদীয় বংশে এরূপ অভিনয় আর কখনও অভিনীত হয় নাই। ভারতের ইতিহাসের এই দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালিত হইবার কোন উপায় নাই।

অলোকসামান্যা জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী গ্রিসীয় রমণী হেলেনার সৌন্দর্য্য যেমন ট্রোজন যুদ্ধের অবতারণা করিয়া গ্রীসকে মহা অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল, সেইরূপ দেবোপমা ভারতললনা কৃষ্ণকুমারীর অতুলনীয় রূপ-রাশি রাজস্থানের নৃপগণের হৃদয় মধ্যে নৈরাশ্যোৎপন্ন অশান্তি-বহ্নি প্রজ্ব-লিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে অনেক রাজ্য চিরদিনের জন্য শ্রীহীন হইয়াছিল। এবং পরিশেষে মিবারের শান্তি স্থাপনের জন্য কৃষ্ণাকে আত্ম-সংহার করিতে হইয়াছিল। যে সকল মহাত্মা স্বদেশহিতৈষিতায়, আত্মত্যাগ ইত্যাদি সদ্গুণাবলীর দ্বারা, পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণ-কুমারী তাহাদিগের মধ্যে উচ্চাসন পাইবার উপযুক্তা। ষোড়শ বর্ষীয়া ভারত-ললনার অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের এরূপ তুলনা আর নাই। ভারতের ইতিহাসে স্বদেশের জন্য এরূপ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

অদৃষ্ট-চক্রের কঠোর সংঘর্ষণে মহারাণা ভীমসিংহের সৌভাগ্যরবি যখন অস্তমিত হইতেছিল, যখন তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষগণের প্রণষ্ট-গৌরব-গরি-মার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া দারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছিলেন; তখন সেই অবলম্বনশূন্য অবস্থায় তিনি তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপিণী একমাত্র কন্যা কৃষ্ণ-কুমারীর মুখ চাহিয়াই কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছিলেন; তখন কৃষ্ণাই তাঁহার সকল সুখ। কিন্তু হায়! বিধাতার বাসনা অন্যরূপ! বৃদ্ধের সেই নয়নের মণি প্রাণপুত্তলি স্নেহের তনয়াই শেষে তাঁহার সকল অসুখের কারণ হইল, এবং তাঁহাকে লইয়াই তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন।

প্রথমে কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়-সম্বন্ধ জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহের সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং সেই শুভ সম্বন্ধকে দৃঢ়তর করিবার কারণ উভয় পক্ষ হইতে উপঢৌকনাদি বিনিময়ও হইয়াছিল। কিন্তু মারবার-নৃপতি মানসিংহ কৃষ্ণার অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। এই বাসনা পূর্ণ করিবার অভিলাষে তিনি জয়পুরপতির ইচ্ছা বিফল করিবার জন্য একবারে সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাণার নিকটেও মানসিংহ আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, এবং যদ্যপি তিনি তাঁহার বাসনা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে রাজ্য মধ্যে মহা অনিষ্ট সাধন করিবেন, এই ভয়ও দেখাইলেন। ভীমসিংহ অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িলেন, কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মানসিংহ অম্বর-রাজের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র এক তুমুল বিগ্রহ উপস্থিত করিলেন। এদিকে ক্রূর-চরিত্র মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ প্রতিদ্বন্দ্বিগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আরও ভীষণতর করিয়া তুলিল। উহাদিগের মধ্যে যাহার সহিত যাহার শত্রুতা ছিল, সেও সময় পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কোন সময় সিন্ধিয়া জগৎসিংহের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু জগৎসিংহ তাহার প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। এক্ষণে সিন্ধিয়া সেই ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি অবিলম্বে মিবার হইতে জয়পুরের সৈন্যগণকে বিদায় প্রদান করেন। কিন্তু রাণা সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। ইহাতে সিন্ধিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, এবং সেই রোষের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার আট সহস্র সৈন্যকে মিবারের বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। রাণা তাঁহার গতিরোধ করিবার আশায় জগৎসিংহের সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আরাবল্লীর প্রবেশপথে দণ্ডায়মান হইলেন। তথায় ক্ষণকালের জন্য উভয় দলের যুদ্ধ হইল এবং দুর্ভাগ্য-বশে ভীমসিংহই তাহাতে পরাজিত হইয়া অবশেষে সৈন্যগণের সহিত আপন নগরে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। সিন্ধিয়ার সৈন্যদল বিজয়গর্ব্বে মহোল্লাসে রাণার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া রাজধানীর অনতি-দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাণা ভীমসিংহ এই উপস্থিত বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন সহজ উপায় না দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তাঁহার সর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে,

জয়পুর-রাজের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ না দেওয়াই কর্ত্তব্য। নিরুপায় হইয়া রাণা সিন্ধিয়ার ইচ্ছামত জয়পুরের সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন এবং তাহার অর্থলিপ্সা পরিতৃপ্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

মানবের অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন তাহারা যাহাতে হস্তক্ষেপ করে তাহারই ফল অশুভকর হয়; কোন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাহারা যে পথ অবলম্বন করে, অদৃষ্ট তাহাতে নূতন বিপত্তি আনয়ন করে। রাণা উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশায় সিন্ধিয়ার ইচ্ছা-অনুযায়ী জয়পুরপতির সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন। কিন্তু হায়! তাহাতে হইল কি? আর একটী নূতন অগ্নি প্রচণ্ড বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল মাত্র, আর সেই কালবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে স্বর্গীয় সুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর পবিত্র শোণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগৎসিংহ যে আশালতা এতদিন ধরিয়া হৃদয় মধ্যে বর্দ্ধিত করিতেছিলেন, এক্ষণে ভীমসিংহ তাহা স্বহস্তে উন্মূলিত করিলেন। রাণার ঈদৃশ আচরণ ও ভুবনমোহিনী কৃষ্ণকুমারী লাভের হত-আশা যুগপৎ জগৎসিংহের অন্তরে উদিত হইয়া মনোমধ্যে এক বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রবল রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে মনুষ্য মাত্রেরই আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। জয়পুররাজ অসহনীয় ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষণ প্রতিশোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি মিবারের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিবার জন্য রণোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এরূপ সুবিশাল সৈন্যদল ইতিপূর্ব্বে জগৎসিংহের রাজ্যমধ্যে কখনও সজ্জিত হয় নাই। মারবারপতি মানসিংহ তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর এইরূপ ভয়ানক রণসজ্জার কথা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শীঘ্রই তিনি তাহার সৈন্য সামন্তগণের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ সেই সময়ে তাঁহার নিকট একটী অভাবনীয় প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজসিংহাসন লইয়া রাজ্যমধ্যে ভীষণ অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। তাহাতে বহু অর্থব্যয় ও বহু শোণিত-পাত দ্বারা রাজ্যের বিস্তর অনিষ্টসাধন হইয়াছিল। শেষে ক্রূর-চরিত্র মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুপরিমাণে রাজ্যের আন্তরিক বলের হ্রাস করিয়াছিল।

যাহা হউক, মানসিংহ এই বৃহৎ বাধা প্রাপ্ত হইলেও জগৎসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ সংখ্যক

সেনা লইয়া যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইলেন। পুরবৎস নামক স্থানে উভয় পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। যদিও উভয় দলেই যথেষ্ট বিক্রমের সহিত কিয়ৎ-কাল সংগ্রাম চলিল, কিন্তু অল্পকাল পরেই যুদ্ধের ভীষণতা কমিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশে মানসিংহের সর্দ্দারগণের অনেকেই তাঁহার সহিত বিপক্ষতাচরণ পূর্ব্বক বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিল। আশা-ভরসাশূন্য মানসিংহ ভগ্ন-হৃদয়ে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য কণ্ঠচ্ছেদোদ্দেশে অসি উত্তোলন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কতিপয় সর্দ্দার আসিয়া হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইল, এবং শীঘ্র রাজধানীতে লইয়া গেল। শত্রুগণ নিরস্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক রাজধানীর তোরণদ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু মান-সিংহের সামন্তবর্গকে পরাস্ত করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। তৎপরে তাহারা যোধপুর অবরোধ করিল। যোধপুরবাসীগণ ছয় মাস কাল মহাপরাক্রমের সহিত জয়পুর-সেনাগণের উদ্যম বিফল করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিল। কিন্তু শীঘ্র তাহারা বলহীন হইয়া শত্রুগণের অধীন হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের যাবতীয় ধন-রত্ন তাহাদের কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল।

যে একতা-হীনতার জন্য ভারতবাসীর চরিত্র আজিও জগতের চক্ষুতে কলঙ্কিত, তাহা পূর্ব্বকালে এইরূপই বিদ্যমান ছিল! যে জগৎসিংহের সৈন্য-গণ পূর্ণ উৎসাহের সহিত রণোদ্যমে মাতিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকভাব সমুদিত হইয়া অল্প সময় মধ্যে একবারে সকল দিক্ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। তখন রাঠোর-বীরগণ উপযুক্ত অবসর পাইয়া সেই সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া বধ করিতে লাগিল। জগৎসিংহ প্রাণভয়ে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পুরবৎস ও যোধপুরের রত্নরাশির কিছুই জয়পুরে আসিল না, পথিমধ্যে রাঠোরগণ তাহা বলপূর্ব্বক হস্তগত করিয়া লইল।

জগৎসিংহ যে উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনেক যত্নে সুবিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া মিবার আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, আজি তাঁহার সে আশা সমূলে বিনষ্ট হইল! তাঁহার সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। যদিও তিনি অতি কষ্টে স্বনগরে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ শীঘ্রই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িলেন। নানা কারণে দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহাকে অধীর করিয়া ফেলিল। বেতনের প্রতীক্ষায় সৈন্যগণ বহু দিন ধরিয়া জয়পুরে থাকিয়া কেহ কেহ কালের করাল গ্রাসে পতিত

হইল; অবশিষ্ট সেনা দেশ ত্যাগ করিয়া গেল। জয়পুরের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় লইল। হায়, সোণার জয়পুর শ্মশানে পরিণত হইল! কুক্ষণেই জগৎসিংহ কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিয়াছিলেন, আর কুক্ষণেই তিনি মানসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ করিয়াছিলেন!

এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, বিধাতার লীলা কি বুঝিব? যে মানসিংহ দারুণ দুরদৃষ্ট বশতঃ আপনার সর্দ্দারগণ হইতেই পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অধঃপাতের নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি আবার সমস্ত বাধা, বিঘ্ন ও বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব ধীরে ধীরে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। আমীর খাঁ নামক একজন দুরাচার পাঠানের সাহায্যে তিনি এত দ্রুত পুনরুন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই আমীর খাঁ তৎকালে একজন দুর্বৃত্ত, নিষ্ঠুর, পাষণ্ড ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাকে সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও সে অনেকের ভয়ের পাত্র ছিল। রাণা ভীমসিংহ তাহার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন।

জয়পুরপতির পরাজয়ের সহিত যদিও চতুর্দ্দিকের যুদ্ধবিগ্রহ-জনিত গোল-যোগের অনেক পরিমাণে উপশম হইল বটে, কিন্তু সেই সুন্দরী কৃষ্ণার আশা কেহ একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শোণিত-পিপাসু আমীর খাঁ উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় চন্দা বংশের প্রধান সর্দ্দার অজিৎসিংহ তাহার সহিত যোগ দিলেন। প্রবল আকাঙ্ক্ষা যখন মানবহৃদয় উদ্বেলিত করে, তখন মনুষ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে পারে না। অজিৎ সাধারণতঃ ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি পাষণ্ড আমীর খাঁকে কি কারণে সাদরে গ্রহণ করিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কৃষ্ণকুমারীকে অঙ্ক-লক্ষ্মী করিবার বাসনা যে তাঁহার হৃদয়ে উদিত না হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, এক দিবস কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে আমীর খাঁ অজিৎকে বলিয়াছিল যে, যদি কৃষ্ণা মানসিংহকে পতিত্বে বরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি আত্মপ্রাণ সংহার করিয়া রাজস্থানের শান্তি পুনঃ স্থাপন করুন; নচেৎ অন্য উপায় অবলম্বন করিলেই রাণা বিপদে পড়িবেন। নিষ্ঠুর পাঠানের এই কথা রাণার কর্ণগোচর হইতে বাকি রহিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি আমীর খাঁকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। এক্ষণে

এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই পাঠানের কথা না শুনিলে নিশ্চয় উদয়পুর একবারে ছারেখারে যাইবে।

ক্রমান্বয়ে বহু-চিন্তাদ্বারা বৃদ্ধ রাণার মনের তেজ অনেক হ্রাস হইয়াছিল। মারবার ও অম্বরের তুমুল সংগ্রামের নিবৃত্তি হইলে, তিনি কিঞ্চিৎ স্থির হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু আমীর খাঁর এই নিষ্ঠুর মন্তব্য শ্রবণ করিয়া বড়ই কাতর হইলেন। অস্থির অন্তরে অনেক চিন্তায়ও কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। স্নেহের পুত্তলি প্রাণের দুহিতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। আমীর খাঁর নিষ্ঠুর অনুশাসন আর কৃষ্ণার কোমল আনন রাণার মনোমধ্যে একত্র উদিত হইতে লাগিল। তিনি এক প্রকার পৈশাচিক যাতনার অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। সেই মানসিক বিকারবশে তাঁহার প্রকৃতি কঠোরতা ধারণ করিতে লাগিল, পুনরায় অপত্যস্নেহ ক্রমশঃ হৃদয় হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। তখন তিনি কৃষ্ণার আত্মোৎসর্গ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন।

স্বর্গচ্যুতা বিকচ-নলিনী কৃষ্ণা যখন তাঁহার সম্বন্ধে পিতার এই সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি আনন্দিতা হইলেন। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে মিবারভূমি রক্ষা হইবে, এই শুনিয়া সরলা বালার মনে এক ভরসার সঞ্চার হইল। তিনি রোরুদ্যমানা জননীকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। অনিত্য জগৎ হইতে নিত্যধামে যাইতেছি, তাহাতে শোকের কোন কারণ নাই, এইরূপ কত কথা বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু মাতার মন কি তাহাতে শান্ত মানে?

ক্রমে কৃষ্ণকুমারীর জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই হৃদয়-বিদারক কার্য্যের জন্য প্রজাগণের দুঃখের দিকে রাণা চাহিলেন না। তিনি পাষাণ হৃদয়ে কন্যাকে আত্মবলির জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু এই নৃশংস ব্যাপার সাধন করিতে কেহই স্বীকার করিলেন না। মহারাজ দৌলতসিংহ নামে রাণার এক আত্মীয় শেষে এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন, তিনি শ্রবণমাত্রেই অতিশয় ঘৃণা সহকারে রাণাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তখন যৌয়ান দাস নামক এক ব্যক্তিকে এই নিষ্ঠুর অভিনয়ের ভার দেওয়া হইল। তিনি ভীমসিংহের

পিতার এক বেশ্যার গর্ভজাত সন্তান। বোধ হয়, বেশ্যা-গর্ভজাত বলিয়াই তাঁহার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত। তিনি এই আজ্ঞায় সম্মত হইয়া ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক সহাস্যবদনে হৃদয়-স্তম্ভনকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যখন সেই স্বর্গীয়া বালার সরল বদনকমল তাঁহার নয়নগোচর হইল, তখন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। শাণিত ছুরিকা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, তিনি আর সেস্থানে থাকিতে না পারিয়া শীঘ্র গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণকুমারীর আজি শেষদিন! কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কঠিন ছুরিকা কৃষ্ণার কুসুম-কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ করে, এমন লোক উদয়পুরে নাই! কিন্তু তাহাতে কি হয়, বিধাতা আজ তাঁহার জীবনের শেষদিন লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সামান্য প্রাণ লইতে শেষে তীব্র হলাহলের আশ্রয় লইতে হইল। তখন কোন রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী রমণী সেই গরল প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণকুমারীর করে পানার্থ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণা নির্ভীক অন্তরে অকম্পিত হস্তে সেই গরল-পাত্র গ্রহণ করিলেন। কি অদ্ভুত আত্মত্যাগ! একটী দীর্ঘনিশ্বাসও তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত হইল না। তিনি এই অখিলের পতিকে স্মরণ পূর্ব্বক পিতার দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া প্রফুল্লবদনে কালকূট সেবন করিলেন। তখন তাঁহার মাতা দারুণ মর্ম্ম-ভেদী ক্রন্দনে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণা তখনও তাঁহার বসনাঞ্চল দিয়া মাতার অশ্রুমোচনে রত! যে গরল-আঘ্রাণে অনিষ্টের সম্ভব, তাহা আজ কৃষ্ণকুমারীর প্রাণ বিনাশ করিতে পারিল না। শীঘ্র আর একপাত্র বিষ প্রস্তুত হইল, তাহাও অম্লান বদনে কৃষ্ণা পান করিলেন। এবারও তাঁহার নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল না, বা বিম্বাধরে কোন প্রকার ক্লেশের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। সকলেই অত্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং এই পৈশাচিক কার্য্যে ভীত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মনুষ্য-নামের অযোগ্য শোণিত-পিপাসু পাষণ্ডদ্বয়—আমীর খাঁ ও অজিতের মনে কোন ভয় হইল না। তাহাদের আদেশে কুসুমরস-সহযোগে এক প্রকার অতি তীব্র কালকূট এইবার প্রস্তুত হইল। সরলা কৃষ্ণা এইবার বুঝিল যে, তাঁহার ইহজগৎ হইতে চির-বিদায়ের কাল নিকট হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার অধরে যেন এক নূতন ভাব প্রকাশ পাইল, অন্তিমে আর একবার ঈষৎহাসির রেখা

দেখা দিল। কুমারী শেষবার এই প্রাণঘাতী কালকূট সেবন করিল। এইবার নারকীদ্বয়ের বাসনা সিদ্ধ হইল,—কৃষ্ণকুমারী মিবার-রক্ষার নিমিত্ত চিরদিনের জন্য নশ্বর পাপ সংসার ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন! রাজপুত-জাতির সুখ-রবিও আজি হইতে অস্তমিত হইতে লাগিল! বীরবর বাপ্পার পবিত্র বংশে পাপস্রোত প্রবেশ করিল! আর মিবারের ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইল!

কৃষ্ণকুমারী যৌবনের প্রাক্কালে ষোড়শবর্ষ বয়ক্রমে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। হায়, সেই বিমল কুসুম ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়া গেল, সে কুসুমের শোভা অবলোকন করিবার সৌভাগ্য কাহারও হইল না! দেবললনার অমূল্য জীবন আপন কার্য্য সাধন করিয়া অকালে কাল-সাগরে অনন্ত কালের জন্য নিমজ্জিত হইল!

অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর ন্যায় রমণী জগতে বিরল। একাধারে এত গুণ সম্বলিত মানবী আর কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই কারণেই তিনি রাজস্থানের কমলিনী (Flower of Rajasthan) নামে কীর্ত্তিত। মহামতি টড (James Tod) কৃষ্ণকুমারীকে উক্ত নামের উপযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এক প্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, কৃষ্ণার ন্যায় অপরূপ সৌন্দর্য্য ও অনুপম গুণরাশি সম্পন্না রমণী পাশ্চাত্য দেশ-সমূহেও অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। আজ কতদিন সেই রমণী-কুলভূষণ সতী স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কখনও লুপ্ত হইবে না।

শ্রীহরিহর শেঠ।

ম্যাক্‌বেথ।

(অনুশীলন।)

অমর কবি সেক্ষপীয়ারের অমর প্রতিভা তিন শত বৎসরাধিক কাল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সমস্ত সভ্য জগতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির আলোচনা ও আদর হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে সেক্ষপীয়ার অপেক্ষা সত্যপীর অধিক পরিচিত। বাঙ্গালা ভাষায় সত্যপীরের পুঁথি আছে, কিন্তু সেক্ষপীয়ারের অনুবাদ নাই; তাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক-কারের নাম জনকতক ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটই পরিচিত। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। অনেকে হয় ত বলিবেন "অনুবাদে আবার উপকার কি?" কিন্তু আমাদের বিবেচনায় জগতের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি অনুবাদ করিলে যে কোন সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইতে পারে। ইংরাজী সাহিত্য অমূল্যরত্নের খনি, সেই খনি হইতে রত্ন-আহরণ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপমান নাই, অবনতি নাই, উন্নতি স্থির-নিশ্চয়। অনুবাদে কতক পরিমাণে সৌন্দর্য্য-হানি হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেককে যদি গ্রীক শিখিয়া "সফক্লিস্", "ইস্কুলাস্" "ইউরিপাইডিস্" পড়িতে হয়, জর্ম্মাণ শিখিয়া, "গেটে" "শিলার" পড়িতে হয়, ফরাসী শিখিয়া "মলিয়ার" "রাসিন" "রেসিন্" পড়িতে হয়, স্প্যানীষ শিখিয়া Don Quixote পড়িতে হয়, নরউইজিয়ান শিখিয়া হেন্‌রিক্ ইব্‌সেনের Samfundet Stolter প্রভৃতি পড়িতে হয়, তাহা হইলে সত্যযুগের পরমায়ুতেও কুলাইয়া উঠে কিনা সন্দেহ! ইংরাজী সাহিত্য মধুচক্র বিশেষ; সমস্ত জগতের সাহিত্য-মধু আহৃত হইয়া ঐ মধুচক্র অতি বিশাল ও রসাল হইয়াছে। এইরূপ অনুবাদে ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব-হানি হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালা সাহিত্যেরই বা গৌরব-হানি হইবে কেন?

গিরিশ বাবু ম্যাক্‌বেথ অনুবাদ করিয়া উত্তম করিয়াছেন এবং ঐ অনুবাদও অতি উত্তম হইয়াছে। বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে ম্যাক্‌বেথের আদর হইয়াছিল কিনা জানি না, না হইবারই কথা। ইহার কারণ দুইটি; প্রথম—সাধারণ লোকের

পক্ষে চিরপরিচিত পৌরাণিক বা এতদ্দেশীয় সামাজিক ঘটনা ও চরিত্রগুলির পরিবর্ত্তে হঠাৎ একটা বিলাতী জিনিষ হজম করা নিতান্ত কঠিন। ম্যাক্‌বেথ যখন মেলিন্‌স্‌ ফুডের ন্যায় ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত হইবে, তখন রঙ্গালয়েও উহার অভিনয় সাফল্য-লাভ করিবে। এখন ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ হইয়া সাধারণের পক্ষে উহার অধ্যয়ন ও আলোচনা সহজ-সাধ্য হইয়াছে। সেই জন্য আমরাও বাঙ্গালা ভাষায় ম্যাক্‌বেথের অনুশীলন করিতে সাহসী হইয়াছি, নতুবা উহা ধৃষ্টতা হইত মাত্র।

দ্বিতীয় কারণ—ম্যাক্‌বেথ বিয়োগান্ত নাটক, ইহাতে ভাল মন্দ উভয় প্রকার লোকেরই মৃত্যু আছে,—একদিকে ডান্‌ক্যান্‌ ও ব্যাঙ্কোর নিষ্ঠুর হত্যা, অপর দিকে ম্যাক্‌বেথ ও তদীয় পত্নীর শোচনীয় পরিণাম। বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে অত কি সয়? বিয়োগান্ত নাটক হিন্দুর কাব্যশাস্ত্রে একবারে নিষিদ্ধ, সেই জন্য আমরা এখনও উহাতে তত অভ্যস্ত হই নাই। অন্ততঃ পক্ষে সর্ব্বশেষে একটা বিষ্ণুলোকের বা পরীস্থানের দৃশ্য থাকা চাই, সেখানে সকলের পুনর্ম্মিলন হওয়া আবশ্যক, তা না হইলে সব মাটি! "সরলা" "নীলদর্পণের" পরও "রাজাবাহাদুর" চাই, নইলে অশ্রুসিক্ত নয়নে কি গৃহে ফেরা যায়!

ম্যাক্‌বেথের প্রধান চরিত্রগুলির অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে গিরিশ বাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। গিরিশ বাবুর প্রতিভা আছে, ম্যাক্‌বেথ অনুবাদে সে প্রতিভার আরও বিকাশ হইয়াছে। বাস্তবিক অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে, ভাব অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, অথচ ভাষাও ওজস্বিনী হইয়াছে। নিম্নে দুই একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল:—

"What beast was't then
That made you break this enterprise to me?
And when you durst do it, then you were a man;
And, to be more than what you were, you would
Be so much more the man. Nor time nor place
Did then adhere, and yet you would make both:
They have made themselves. and that their fitness now
Does unmake you. I have given suck, and know
How tender, 'tis to love the babe that milks me!
I would, while it was smiling in my face;

Have plucked my nipple from his boneless gums
And dash'd the brains out, had I so sworn as you
Have done to this."

"কোন্ পশু তবে আমার নিকটে,
করেছিল উত্থাপন এ কঠিন পণ?
মানব নামের যোগ্য আছিলে তখন,
সাহস বাধিলে যবে এই উচ্চব্রতে।
উচ্চতর পদ যদি করহ গ্রহণ,
মনুষ্যত্ব পুরুষার্থ অধিক তাহায়;
সময় সুযোগ স্থান আছিল অভাব,
করেছিলে পণ সুযোগ খুঁজিয়া ল'বে,
সে সুযোগ এবে উপস্থিত;
সুযোগ হেরিয়ে তুমি পুরুষার্থ-হারা!
স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন,
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে,—
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে,
দন্তহীন মুখ হতে স্তনাগ্র ছিনায়ে,
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার—
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি করি তোমার সমান।"

"Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more · it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury.
Signifying nothing."

"কল্য——কল্য——কল্য
চলে ধীর পদে দিন্ দিন,

হয় লয় নির্ণীত সময়ে
প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে;
গত কল্য একত্র হইয়া,
ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে,
মিলাইতে শ্মশান ধূলায়।
নিভে যা, নিভে যা ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ!
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন;
ক্ষুদ্র অভিনেতা, নিজ অভিনয় সময়ে যেমন,
মদগর্ব্বে চলে রঙ্গস্থলে,
হস্তপদ সঞ্চালিয়ে গর্জ্জন করিয়ে;
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ.
বাতুলের গল্প এ জীবন,—
অর্থহীন মাত্র—বহু বাক্য আড়ম্বর!"

আমরা স্থানাভাবে অধিক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। উহার আবশ্যকও নাই; কারণ আমরা গিরিশ বাবুর ম্যাক্‌বেথের সমালোচনা করিতে বসি নাই, উহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি মাত্র। চরিত্রগুলির অনুশীলন কালে আমরা ইংরাজী উদ্ধৃত না করিয়া এই অনুবাদ হইতেই উদ্ধৃত করিব। গিরিশ বাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা মাদার গিগলের "রক্তের রসিকতা" (humour of the blood) কিম্বা "এক ব্যক্তি কৃপণ ও তাহার স্বর্ণসম্পত্তির কথা" এরূপ অদ্ভুত অনুবাদের মত নহে; অনেক সময়ে প্রতি কথার বা ছত্রের অবিকল অনুবাদ দৃষ্ট হইবে না, অথচ তিনি ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, তিনি সেক্ষপীয়ারের ভাল ভাল নাটকগুলি বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করেন। সেক্ষপীয়ারের "ওথেলো" বিয়োগান্ত নাটক হইলেও বোধ হয় রঙ্গমঞ্চে জমিতে পারে; যদি না পারে তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? রঙ্গমঞ্চের জন্য যদি অনুবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে "Merchant of Venice." "Measure for Measure." "Twelfth Night." "Tempest." "Cymbeline." প্রভৃতি অনুবাদ করিলে বোধ হয় চলিতে পারে। এক্ষণে আমরা ম্যাক্‌বেথ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

ম্যাকবেথের প্রথমেই আমরা তিন জন ডাকিনীকে দেখিতে পাই। উহারা কা'রা? মানবহৃদয়রূপ অন্তর্জ্জগতে পাপ ও পুণ্য প্রবৃত্তির অস্তিত্ব বোধ হয় কেহ অস্বীকার করেন না। ঐ ডাকিনীগণ যদি সেই পাপ প্রবৃত্তির সজীব প্রতিমূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে শুধু ম্যাক্‌বেথের হৃদয়েই তাহারা বিরাজ করিত, তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিত না; ম্যাক্‌বেথই শুধু তাহাদিগকে দেখিতে পাইত, ব্যাঙ্কো পাইত না। কিন্তু ব্যাঙ্কোই সর্ব্ব প্রথমে তাহাদের দেখিতে পাইয়াছিল। অতএব ডাকিনীগণ অন্তর্জ্জগতের জীব নয়, বহির্জ্জগতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ভূতের অস্তিত্ব অনেকে উড়াইয়া দিবেন সন্দেহ নাই; আমরাও উহার অস্তিত্বে আপাততঃ তাদৃশ বিশ্বাস করি না। কিন্তু ভৌতিক বা অলৌকিক ব্যাপার যে একেবারে অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না। সেক্ষপীয়ারই বলিয়া গিয়াছেন—

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক জিনিষ থাকিতে পারে, যাহা আমাদের দর্শন—বিজ্ঞান—কল্পনায়ও আসিতে পারে না। সকলেই জানেন, কোনও স্থানে পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনারাশি জমিলে, সেই স্থানের বায়ু দূষিত হইয়া যায় এবং প্লেগ প্রভৃতি নানা রোগের "ব্যাসিলি" বা জীবাণু জন্মায়। শত সহস্র বৎসরের পাপ ও পুণ্যের সঞ্চিত প্রভাব কোথায় যাইবে? সেই সঞ্চিত পুণ্যের প্রভাবে স্থান-বিশেষের বায়ু আজও নির্ম্মল রহিয়াছে; আমরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে কখন কখন সেই নির্ম্মল পবিত্র পবন-হিল্লোলের দ্বারা বাহিত হইয়া সুখময় পবিত্রতাময় স্বার্থশূন্য জীবন লাভ করি। আবার শত সহস্র বৎসরের সঞ্চিত পঙ্কিল পাপরাশি আজিকার বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই বিষাক্ত বায়ুতে নারকীয় "ব্যাসিলি" বা জীবাণু বা ভৌতিক পদার্থের জন্ম সম্ভব কি না কে বলিতে পারে? সংসারে এই বিষাক্ত বায়ু হইতে আমরা সকলে সকল সময়ে অব্যাহতি পাই না। উহার প্রভাব বড় ভয়ানক। ম্যাক্‌বেথের অধঃপতনে সেক্ষপীয়ার সেই প্রভাব অতি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, এবং বহির্জ্জগতেও পাপপ্রভাবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ঊনবিংশ শতাব্দীতেও গেটে (Goethe) তাঁহার ফাউষ্টে (Faust) এই

পাপ ও পুণ্য প্রভাবের পৃথক্ অস্তিত্ব বুঝাইয়াছেন। অতএব ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীগণকে বহির্জ্জগতের জীব জ্ঞান করিলে অসঙ্গত হইবে না।

কিন্তু এই বহির্জ্জগতের পাপমূর্ত্তির সহিত অন্তর্জ্জগতের পাপপ্রবৃত্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই জন্য দেখিতে পাই, ম্যাক্‌বেথের প্রথম উক্তি, প্রথম দৃশ্যে ডাকিনীগণের শেষ উক্তির রূপান্তর মাত্র। ডাকিনীগণ বলিয়াছিল,—

"Fair is foul and foul is fair,
Hover through the fog and filthy air."

ম্যাক্‌বেথ বলিতেছে, "So foul and fair a day I have not seen." গিরিশ বাবু ইহার অনুবাদে একটু বাড়াইয়া লিখিয়াছেন, যথা—

"এই ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিল অবনী—
তখনি অমনি দিনমণি প্রকাশিল হেমকর,
দুর্দ্দিন সুদিন হেন হেরিনি কখন।"

(ইহার প্রথম দুই ছত্র কোথা হইতে পাইলেন জানি না। Clarendon Press সংস্করণে নাই; উপরোক্ত ইংরাজী চরণে ডাকিনীগণের ও ম্যাক্‌বেথের উক্তিতে যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, অবশ্য অনুবাদে তাহা নষ্ট হইয়াছে; সেইজন্য আমরা মূল উদ্ধৃত করিলাম।) ইহাতে সেক্ষপীয়ার বোধ হয় এই দেখাইতে চান যে, ডাকিনীগণকে দেখিবার পূর্ব্বেই তাহাদের সহিত ম্যাক্‌বেথের আত্মার মিলন হইয়াছিল। আত্মার মুক্তি বা অধঃপতন অর্থাৎ সংসারে পাপ ও পুণ্যের সংগ্রামই সেক্ষপীয়ারের বিয়োগান্ত নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ম্যাক্‌বেথে আত্মার অধঃপতন অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের সংগ্রামে পরাজয় অতি বিশদ্‌ভাবে দেখান হইয়াছে। অনেকের ধারণা, ম্যাক্‌বেথ প্রথমে অতি মহৎ ও নির্ম্মল-চরিত্র ছিলেন; কিন্তু পত্নীর প্ররোচনায় পাপে প্রবৃত্ত হন। পত্নীর প্ররোচনায় পাপে মগ্ন হন বটে, কিন্তু ম্যাক্‌বেথ একবারে নির্ম্মল-চরিত্র বা পাপপ্রবৃত্তি-হীন ছিলেন না। তাঁহার অদম্য উচ্চ আশা ছিল, পাপ পুণ্য কোনও প্রবৃত্তিই বিশেষ প্রবল ছিল না। ম্যাক্‌বেথ-চরিত্র লেডি ম্যাক্‌বেথ ঠিক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারই কথায় ঐ চরিত্রের পরিচয় দিব;—

"উচ্চপদ ইচ্ছা তব, উচ্চ আশ নহ ত বিহীন;
কিন্তু বিনা-পাপে সাধিবারে চাহ প্রয়োজন।

যে পদ বাসনা তব হৃদয়ে প্রবল,
ধর্ম্মপথে অর্জ্জন করিতে তাহা সাধ।
প্রতারণা কর ঘৃণা, কিন্তু পরস্ব লালসা তব।
যেই উচ্চাসন লাভ প্রয়াস তোমার,
চাহ যদি সে আসন,
অবশ্য দুষ্করকার্য্য হইবে সাধিতে;
ভয়চিতে, যে কার্য্য করিতে—
সেই কার্য্য হ'ক সমাধান ইচ্ছা তব।"

ইহাতে কি ম্যাক্‌বেথের চরিত্র অতি মহৎ ছিল বলিয়া বোধ হয়? ইহা কি "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের নীতি নহে? ম্যাক্‌বেথের হৃদয় কোমল ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা আদৌ ছিল না। তাঁহার বাহুবল ছিল, বীরত্ব ছিল; কিন্তু পুরুষত্ব ছিল না। রণক্ষেত্রে তিনি "রণদেব-বরপুত্র সম" ছিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় জীবন-সংগ্রামে প্রবল-লোভের দ্বারা পরাজিত হইলেন। এই সৎ ও অসতের সংগ্রামে ম্যাক্‌বেথের আত্মার অধঃপতন হইল। এই অধঃপতনের মূল লোভ।

নির্ম্মল-আত্মা ব্যাঙ্কো ডাকিনীগণের কথা শুনিয়া ম্যাক্‌বেথের ন্যায় আত্মহারা হন নাই, জাগ্রত অবস্থায় সে বিষয়ে মনে আন্দোলন করেন নাই। ম্যাক্‌বেথের রাজ্যলাভের পর ব্যাঙ্কো ডাকিনীগণের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"সকলি পেয়েছ এবে, রাজ্য আদি সমুদয়,—
যেই মত কহিল বিকটা-ত্রয়।
ভাবি মনে সে কারণে খেলেছ বিষম খেলা।
কিন্তু সেই ডাকিনী-বচনে,
তব বংশে সিংহাসন নহে স্থায়ী।
আমি মূল, ক্ষিতিধর-শ্রেণীর জনক,
তব ভাগ্যে সত্য যদি ভবিষ্যৎ বাণী—
উজ্জ্বল প্রভায়, হ'বে নাকি তাহে মম প্রারব্ধ নির্ণয়,
আশে উত্তেজিত নাহি হ'ব কি কারণ?
কিন্তু স্থির হও অন্তর আমার,
আন্দোলন অধিক নাহিক প্রয়োজন।"

ম্যাক্‌বেথ সম্বন্ধে ডাকিনীগণের কথা সত্য হইল দেখিয়া, স্বভাবতঃ নিজ সম্বন্ধে তাহাদের ভবিষ্যৎ বাণী মুহূর্ত্তের জন্য ব্যাঙ্কোর মনে উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি তখনই বলিয়াছিলেন,—

"স্থির হ'ও অন্তর আমার
আন্দোলন অধিক নাহিক প্রয়োজন।"

এমন কি পাছে নিদ্রিত অবস্থায় ঐ পাপচিন্তা ব্যাঙ্কোর পবিত্র হৃদয় অধিকার করে, সেই ভয়ে তিনি বলিতেছেন "যে সকল দুশ্চিন্তা, স্বপ্নে উত্তেজিত হয়, কৃপাময়ী মহাশক্তি আমার অন্তর হ'তে দূর করুন।" (এই স্থানটি গিরিশ বাবু গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন)। ঘোর অমাবস্যা নিশিতেও শত শত উজ্জ্বল তারকা দৃষ্ট হয়, পাপ-তাপভরা সংসারেও শান্তি, প্রীতি ও সুখের আধার আছে বলিয়াই আজিও সংসার শ্মশানে পরিণত হয় নাই! পবিত্র-আত্মা ব্যাঙ্কো আত্ম-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং নিহত হইলেও তাঁহার নিহন্তাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা একটী সমস্যার ন্যায় বোধ হইতে পারে, কিন্তু এ সমস্যার গভীর তাৎপর্য্য আছে। আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

ম্যাক্‌বেথ স্বহস্তে ডানক্যানকে হত্যা করিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কোকে নিজ-হস্তে নিহত করেন নাই। তবে ডানক্যানের প্রেতাত্মা না দেখিয়া ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা কেন দেখিয়াছিলেন, এবং ঐ প্রেতাত্মা দেখিয়া "রণ-দেব-বরপুত্র সম," "সমরদেবীর প্রিয় সামন্ত-প্রধান" ম্যাক্‌বেথ কেন বিচলিত, বিকম্পিত হইয়াছিলেন? আর লেডি ম্যাক্‌বেথ স্বহস্তে ডান্‌ক্যানকে হত্যা না করিলেও স্বপ্নাবস্থায় কেন বলিয়াছিলেন "এখনও শোণিতের গন্ধ র'য়েছে। সমস্ত আরব্য সুগন্ধিতে আমার এই ক্ষুদ্র হস্ত দুর্গন্ধহীন হ'বে না? ওঃ হোহো!" ("এই ক্ষুদ্র" This little এই দুইটী কথা গিরিশ বাবু ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভাবের গভীরতা একটু নষ্ট হইয়াছে—ক্ষুদ্র হস্ত হইলেও পাপের গুরুত্ব এত অধিক, যে সমস্ত আরব্য সুগন্ধিতে সেই কলুষিত ক্ষুদ্র হস্ত নির্ম্মল দুর্গন্ধহীন হইবে না)। এই দুইটী প্রশ্ন অনেকেরই মনে আদৌ উদয় হয় না। সেই জন্য ইহার কারণ-নির্দ্দেশও কেহ করেন নাই। ম্যাক্‌বেথ-অনুশীলন ফলে আমরা ইহার উত্তরে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলে বোধ হয় ধৃষ্টতা হইবে না। যে ম্যাক্‌বেথ ডান্‌ক্যানকে হত্যা

করিবার পূর্ব্বে মানস-চক্ষুতে বিভীষিকাময় শোণিতাঙ্কিত তরবারি-ছবি হেরিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, হত্যার পর নিহত রাজার প্রেতাত্মা দর্শনই তাঁহার পক্ষে অধিকতর সম্ভব। কিন্তু তাহা না দেখিয়া ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা দেখিয়াছিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, যদিও ডান্‌ক্যানকে ম্যাক্‌বেথ স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, লেডি ম্যাক্‌বেথের প্ররোচনাতেই ঐ পাপ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, নতুবা হয় ত করিতেন না। সেই জন্য লেডি ম্যাক্‌বেথকেই ঐ পাপের ফল ভুগিতে হইয়াছিল, কারণ তিনিই প্রকৃত পক্ষে ডান্‌ক্যানের হত্যাকারিণী।

নীতিশাস্ত্র-বিশারদ মার্টিনো বলেন, কোনও কার্য্যে সৎ কি অসৎ বিচার করিতে হইলে তাহার পরিণাম ধরিয়া বিচার করিলে চলিবে না, উদ্দেশ্য ধরিয়া বিচার করিতে হইবে। পাপ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইলেও সেই পাপ কার্য্যের ভাগী হইতে হয়। বাইবেলেও আছে ("Whoever looks upon a woman with an eye of lust commits adultery.") (পাপ চক্ষে কোনও রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ব্যভিচার করা হইল)। ডান্‌ক্যানের হত্যা ম্যাক্‌বেথের উদ্দেশ্য ছিল না, ঐ পাপ কার্য্য লেডি ম্যাক্‌বেথের প্ররোচনাতেই হইয়াছিল; অতএব লেডি ম্যাক্‌বেথকেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর ব্যাঙ্কোকে ম্যাক্‌বেথ নিজ হস্তে হত্যা না করিলেও, তিনিই লেডি ম্যাক্‌বেথের অজ্ঞাতসারে গুপ্তহন্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন—তাঁহার নিজ উদ্দেশ্য অপরের দ্বারা সম্পাদন করাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে নিস্তার কই? উদ্দেশ্য যখন ছিল, তখন তিনিই ব্যাঙ্কোর প্রকৃত হত্যাকারী। অতএব ডান্‌ক্যানের প্রেতাত্মা না দেখিয়া ম্যাক্‌বেথকে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা দেখিতে হইয়াছিল। মহাকবি সেক্ষপীয়রের কি আশ্চর্য্য কৌশল ও গভীর জ্ঞান!

প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে আমরা অধিক কথা বলিব না, লেডি ম্যাক্‌বেথ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধের সমাপন করিব। অনেকের ধারণা আছে, লেডি ম্যাক্‌বেথ সাক্ষাৎ রাক্ষসী, তাঁহার হৃদয়ে কোমলতার লেশ মাত্র নাই। কিন্তু সে ধারণা ভ্রমাত্মক। লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে রমণী-সুলভ কোমলতা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বামীর সুখের জন্য জোর জবরদস্তি করিয়া সেই কোমলতা দূর করিয়াছিলেন;—

আয়্ আয়্ আয়্ রে নরক-বাসি পিশাচ-নিচয় !
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয়্ ত্বরা করি,
হর নারী-কোমলতা হৃদি হ'তে মম,
আপাদ মস্তক কর কঠিনতা-ময়,
কর ঘন শোণিত প্রবাহ,
রুদ্ধ রাখ হৃদয়ের দ্বার,
মানব-স্বভাব-জাত অনুতাপ যেন নাহি পশে,
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ, দ্বন্দ্ব নাহি উঠে মনে,
যদবধি কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
এস হত্যা-উত্তেজনা-কারি !
ভ্রম যা'রা অদৃশ্য শরীরে,
মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজনা হেতু,
এস এস নারীর হৃদয়ে,
পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে।"

কিন্তু এতেও লেডি ম্যাক্‌বেথের রমণী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা যায় নাই, নরকবাসী পিশাচ-নিচয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও তিনি স্বাভাবিক কোমলতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে নরকবারি মদিরার সাহায্য লইতে হইয়াছিল,—

"যে মদিরা উন্মত্ত ক'রেছে সবে—
করিয়াছে সাহস প্রদান মোরে,
জ্ঞান-জ্যোতি নির্ব্বাণ সবার যে প্রভাবে--
উদ্দীপিত ক'রেছে আমায়।"

তবুও কি সে কোমলতা একবারে গিয়াছিল? না, যায় নাই। তিনি বলিতেছেন "আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান, আমি সাধিতাম কায।"—

ডান্‌ক্যানের সহিত নিজ পিতার সাদৃশ্য দেখিয়া লেডি ম্যাকবেথ ডান্‌ক্যানকে হত্যা করিতে পারেন নাই। সেই জন্য বলিতেছি, লেডি ম্যাক্‌বেথ রাক্ষসী নহেন। তবে যে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন,
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে,—
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে,

দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে,
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার—
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি করি তোমার সমান।”

যে লোক ম্যাক্‌বেথকে উত্তেজিত করিবার জন্য পিতার মুখের সহিত সামান্য সাদৃশ্য মাত্র দেখিয়া একজন পরকে হত্যা করিতে পারে নাই, সে নিজ শিশুকে উক্তরূপে হত্যা করিতে পারিবে, ইহা একবারে অসম্ভব। ম্যাক্‌বেথ চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অনিশ্চয়তা ও মানসিক বলের অভাব। ম্যাক্‌বেথের যে দুইটী গুণের অভাব ছিল, লেডি ম্যাক্‌বেথের তাহা অতিরিক্ত পরিমাণে ছিল। যে কার্য্য করিতে হইবে, লেডি ম্যাক্‌বেথ তাহা একবারে স্থির করিয়া ফেলিতেন, এবং সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন। তিনি জানিতেন যে, ম্যাক্‌বেথ যেরূপ উচ্চাভিলাষী, তাহাতে ডাকিনীগণের কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে। তিনি আরও জানিতেন, ম্যাক্‌বেথ প্রতারণা ঘৃণা করেন বটে, কিন্তু পরস্বে তাহার লালসা আছে। যে কার্য্য করিতে ভয়, সেই কার্য্য আপনা-আপনি সম্পন্ন হউক, ম্যাকবেথের যে এরূপ ইচ্ছা ছিল, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু কোনও কার্য্য আপনা-আপনি সমাহিত হয় না। তাই তিনি ম্যাক্‌বেথের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনের ভার স্বয়ং লইয়াছিলেন। দুর্ব্বলচিত্ত স্বামীর উপর দৃঢ়তা ও স্থির-বুদ্ধিশালিনী পত্নীর প্রাধান্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। ম্যাক্‌বেথের উপর লেডি ম্যাক্‌বেথের আধিপত্য সেই জন্য। কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথ যে পাপ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অনুমোদন না করিলেও অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, তিনি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। পতির সুখের জন্য পতিপ্রাণা সাধ্বী সব করিতে পারেন। পতির সুখের জন্যই লেডি ম্যাকবেথ ঘোর পাপকার্য্য করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার নিজের রাজ-রাণী হইবার বাসনা একবারও দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য পতিকে পাপে প্রবৃত্ত করা সাধ্বী স্ত্রীর উচিত নহে, কেন না, পতি অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। কিন্তু অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে এমন কার্য্য করিতে হয়, যাহাতে তাহার নিজের আদৌ অভিরুচি নাই। কোন পতিব্রতা স্ত্রীর পতি যদি মদ্যপায়ী হয়, এবং অনেক নিষেধ, অনুনয় বিনয়েও যদি পতি সেই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহা হইলে তিনি কি পতিকে ত্যাগ করেন, না পতিকে মদ্যপান করিতে অনুমতি দেন? পতি-

ঘাতিনী কৈকেয়ী অপেক্ষা কি লেডি ম্যাক্‌বেথের অপরাধ গুরুতর? কৈকেয়ী নিজ পুত্রের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, লেডি ম্যাক্‌বেথ নিজ পতির জন্য রাজ্য-অধিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিজ পতি-পুত্রের জন্য অনেকে সুবিধা পাইলে অনেক কুকার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হন না, সেটা দোষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মসুখের জন্য যাহারা ঐ সমস্ত কুকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের দোষ আরও গুরুতর। স্বর্ণলতার প্রমদা অপেক্ষা লেডি ম্যাক্‌বেথ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। প্রমদা নিজ পতি শশীভূষণের বিপদের সময় স্বকীয় স্বার্থপর প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল। লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয় যে একবারে কোমলতা-হীন হয় নাই, তাহার আর এক প্রমাণ—নিদ্রিত অবস্থায় (যখন তাহার মনের উপর আধিপত্য ঘটিত না) অনুতাপ। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার মনের উপর যথেষ্ট আধিপত্য ছিল, সেই জন্য পাপ কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে মনকে অবসর দিতেন না। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় সে আধিপত্য ছিল না, তখন পাপের ভীষণ উৎকট চিন্তা হৃদয়কে দলিত করিত। আর সেই জন্য লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয় ভগ্ন হয় ও অগ্রে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই স্বপ্ন ব্যাপারের অর্থ এই যে, মানব যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও শক্তিশালী হউক না কেন, এমন একটা শক্তি আছে, যাহার নিকটে তাহাকে হার মানিতে হয়। আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। লেডি ম্যাক্‌বেথ বাহিরে দৃঢ়তার ভান করিতেন মাত্র, কিন্তু ডান্‌ক্যানের হত্যা তাঁহার কোমল হৃদয়ে এত লাগিয়াছিল, যে তাঁহার হৃদয় অবশেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ব্যাঙ্কোর হত্যার কথা তিনি কিছুই জানিতেন না, সে হত্যা তাঁহার অভিপ্রেতও ছিল না, উহার জন্য শুধু ম্যাক্‌বেথই দায়ী। লেডি ম্যাক্‌বেথের আর এক গুণ ছিল,—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—বিপদের সময় তাঁহার অসাধারণ উপস্থিত-বুদ্ধি যোগাইত। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে যাহা সংকল্প করেন নাই, এমন একটা নূতন বিভীষিকাময় কাণ্ড দেখিলে আত্মহারা হইতেন। সেই জন্য ম্যাক্‌বেথের যখন প্রহরীদ্বয়কে হত্যা করিলেন, লেডি ম্যাক্‌বেথ মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, সে মূর্চ্ছা প্রকৃত, ছলনা নহে। প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, অতএব এই খানেই সমাপন করিলাম।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

কবিতা-কানন।

বাঁশরী স্বর।

নিশি দ্বিপ্রহরে, তটিনী উপরে,
কোথায় বাঁশরী বাজায় রে ;
সুমধুর তানে, ঢালি সুধা প্রাণে,
অবলা বালায় মজায় রে !
আহা কিবা মরি ! মধুর লহরী,
উঠিছে, মিশিছে মলয়ানিলে ;
মৃদুল পবন, উল্লাসে মগন,
হ'য়ে, কত রঙ্গ করে সলিলে।
আপনি তটিনী, সত নিশীথিনী,
সুধা করে ল'য়ে হৃদয়োপরে ;
তারকা-বেষ্টিত, কিবা সুশোভিত,
নাচে রঙ্গে নানা হরষ ভরে !
প্রেমিক সুজন, বুঝি কোন জন,
অথবা বিরহী আকুল প্রাণ ;
এহেন সুস্বরে, মন চুরি করে,
বাঁশরী সুতানে ধরিয়ে গান !
সাধ হয় প্রাণে, মিশি প্রাণে প্রাণে,
দাসী হ'য়ে থাকি জনম ভোর ;
হৃদয়-আসনে, বসায়ে সে ধনে,
শুনি এই ধ্বনি হ'য়ে বিভোর।

শ্রীঅনাথবন্ধু দে।

কেন ?

বিমল শশাঙ্ক মুখে কেন ফুটে সুধাহাসি
পূর্ণিমা নিশায় ?
কেন ঘন নীলাকাশে ফুটে গো তারকা মালা
কিরণ প্রভায় ?
ইন্দুলেখা বুকে ধরি কেন আপনার মনে
ছুটে প্রবাহিনী ?
প্রতিধ্বনি কেন জাগে নৈশ-নীরবতামাঝে
শৈল-নিবাসিনী ?
কেন ফুল দুলে দুলে শশিকর মাথে গায়
প্রমোদে ভাসিয়া ?
রহিয়া রহিয়া কেন দূর হ'তে ক্ষীণ ধ্বনি
তুলে গো পাপিয়া ?
কুসুমিত উপবনে আধ ফোটা ফুল কেন
পরশে সমীর ?

চকোর সুধার আশে কেন চাঁদ পানে চাহে
হইয়া অধীর?
প্রেমময় বিশ্বমাঝে প্রেমের বাঁধনে সবে
প্রফুল্লিত রয়,
এমন সময় তবে বিধবার তপ্ত প্রাণ
কেন বিষময়?
তোমার জগৎ প্রভু সবে তব আজ্ঞাবাহী
তুমিই প্রধান,—
আপনার কর্ম্মফল তবুও ভুঞ্জিবে জীব
এ কোন্ বিধান?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রমণী-প্রণয়।

রমণী হৃদয় হায় প্রেমের আলয়।
কঠিন নিয়তি-বাণ,
ফোটে যদি অবিশ্রাম,
অমোঘ ঔষধি হেরি রমণী আশ্রয়।
দুর্ব্বার সংসার-রুহ বাজিলে তোমায়,
অশান্তির ঘনঘটা,
ঘেরিলে তোমার জটা,
একান্ত আশ্রয় হেরি রমণী-হৃদয়।
নিরাশার পারাবারে ভাসিবে যখন,
শতেক ব্যাপার পরে,
কূল যদি নাহি মিলে,
রমণী-হৃদয় তরি আশ্রয় তখন।
জীবন-মরুতে যদি হও উপনীত,
দুঃসহ তৃষ্ণার জ্বালা,
করে যদি ঝালাপালা,
অমৃত-বল্লরী সম রমণী-পীরিত।
অমানিশা অন্ধকারে পর যদি হায়,
শতেক চেষ্টার পরে,
পথ যদি নাহি মিলে,
শেষের মস্তক মণি—রমণী-প্রণয়।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সিংহ।

বিবিধ।

আপদের শান্তি।—এই দারুণ গ্রীষ্মে আম্র-কাঁঠালের গন্ধে অনেক মাছির আমদানী হয় এবং লোককে সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে মক্ষিকাকুল বিনষ্ট করা যাইতে পারে। একটী গেলাসের অর্দ্ধেক যে কোন মদ্যে পূর্ণ কর। একখানি সাদা কার্ডের মধ্য-স্থলে একটী মক্ষিকা প্রবিষ্ট হইতে পারে এরূপ একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া কাগজখানির একপৃষ্ঠায় একটু মধু লেপন কর এবং এই মধুম্রক্ষিত পৃষ্ঠা ভিতরদিকে রাখিয়া উক্ত মদ্যপূর্ণ গেলাসে চাপা দাও। এখন এই গেলাসটী যেখানে মাছির আধিক্য সেইখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হও। মৃত মাছি ছাঁকিয়া লইয়া এই মদ্য দুই তিন বার চালাইতে পার।

অদ্ভুত জমা খরচ।—পঁয়তাল্লিশ হইতে ৪৫ বাদ দিলে কিরূপে ৪৫ বাকী থাকে? পাঠক মহাশয় অসম্ভব মনে করিতেছেন? তবে আমি না হয় দেখাইয়া দিই;—৯৮৭৬৫৪৩২১ = ৪৫

১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৪৫

৮৬৪১৯৭৫৩২ = ৪৫

পাথর ভাঙ্গার কায়দা।—সে দিন রাস্তার মধ্যে একটী মুটের মাথা হইতে একখানি একমণ ভারী মারবেল পাথর পড়িয়া চারিখণ্ডে ভাঙ্গিয়া যায়। একজন দোকানদার সেই ভাঙ্গা পাথরগুলি কুড়াইয়া ওজন করিয়া দেখিল যে, এই চারি খণ্ডেরই দ্বারা সে এক হইতে চল্লিশ সের পর্য্যন্ত জিনিস ওজন করিয়া বেচিতে পারিবে। এখন ইহাদের প্রত্যেকের ওজন কত, আন্দাজ করুন দেখি। যদি মনে করেন, মাথা খারাপ হইয়া যাইবে, তবে না হয় আমিই বলিয়া দিই;—উত্তর;—১, ৩, ৯, ২৭ সের।

ভট্টাচার্য্য।—বাবা রামপদ এই একপোয়া ইস্পাত ও তিন পোয়া লৌহ লইয়া কামারবাড়ী একখানি কাটারি গড়িতে দাও। কিন্তু দেখ', সাবধান, কামার যেন ইস্পাত চুরি না করে।

কয়েকদিন পরে রামপদ কাটারি প্রস্তুত করাইয়া পিতাকে দেখাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কামার বেটা ত ইস্পাত চুরি করে নাই? উহাদের ইস্পাত চুরিই রোগ।"

রামপদ উত্তর করিল—"সে কি বাবা, আমাকে ফাঁকি দেবে? এই দেখ কাটারি, আর এই দেখ এক পোয়া ইস্পাত। ইস, আমি যেন ইস্পাত তাকে দিয়েছি!!"

সমালোচনা।

মধুর মিলন।—শ্রীরসময় লাহা ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ প্রণীত। ইহা একখানি মিলনান্ত নাটক। রচনা সুমিষ্ট; চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকারদ্বয় বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অবকাশ লহরী।—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক প্রণীত। ইহা একখানি কবিতাপুস্তক। লেখক নবীন হইলেও লিখিবার ক্ষমতা আছে; চর্চ্চা রাখিলে ভবিষ্যতে তিনি একজন সুকবি হইতে পারিবেন, আমাদের এরূপ আশা আছে।

Handbook of Indian Agriculture.—শিবপুর গভর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের কৃষিশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম, এ; এম, আর, এ, সি, প্রণীত। ইহা একখানি ইংরাজীতে কৃষি-বিষয়ক পুস্তক। পুস্তক খানিতে ভূমি-নির্ব্বাচন, সার-দেওন, বীজবপন, কোন্ জমীতে কিরূপ সার দিলে অধিকপরিমাণে ফসল হইতে পারে, গাছের পোকা নষ্ট করিবার উপায়, প্রধান প্রধান শস্যের কোন্ সময় কিরূপে আবাদ করিতে হয়, ইত্যাদি কৃষিসম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে জানিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। স্থানাভাবে আমরা পুস্তকখানির বিস্তারিত সমালোচনা না করিতে পারায় বিশেষ দুঃখিত হইলাম। প্রত্যেক জমীদার ও পল্লীগ্রামস্থ ইংরাজী-অভিজ্ঞ গৃহস্থকে আমরা এই পুস্তক ক্রয় করিতে অনুরোধ করি। এরূপ একখানি পুস্তক নিকটে থাকিলে মূল্যের সহস্রগুণ ফল পাইবার সম্ভাবনা।

মহাজনবন্ধু।—মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এদেশে সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রাদি অনেক আছে, কিন্তু ব্যবসায়ীগণের কোনরূপ পত্র ছিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া সেই অভাব দূর করিয়াছেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে দেশের লোকে যাহাতে উন্নতি করিতে পারে, এই পত্রের তাহাই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য মহৎ; আমরা পত্রিকা খানির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩০৮। [৭ম সংখ্যা।

প্রাচীন কলিকাতা।

(২)

বর্ত্তমান গড়ের মাঠ, গভর্ণমেণ্ট হাউস ও পোষ্ট আফিস প্রভৃতি সাবেক গোবিন্দপুরের এলাকাভুক্ত; আর চিৎপুর রোডের উত্তরাংশ, হাটখোলা প্রভৃতি পল্লী স্থতানুটি নামে অভিহিত হইত, ও প্রায় এক শতাব্দীকাল এই হাটখোলার ঘাট স্থতানুটির ঘাট বলিয়া পরিচিত ছিল। এই ঘাটটী তখনকার গভর্ণর জব চার্ণকের বড় প্রিয় ছিল। তিনি হুগলি হইতে আগমন কালে এই ঘাটের সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম-সুখ-সম্ভোগ করিতেন। উপরি উক্ত গোবিন্দপুর ও স্থতানুটির মধ্যবর্ত্তী স্থানের কলিকাতা নামকরণ ছিল।

"The position of the original village of Calcutta, is distinctly marked by the following circumstances;—in the map of 1794 two portions of the town to the east of Tank Square are marked Dehee Calcutta. The great Bazar

now known as Barra Bazar, was entered on the record before 1756 as being in Dehee Calcutta, and the ground on which St. John's Cathedral stands, and which was presented by Munshi (afterwards Raja) Naba Kissen, is also stated in the deed of gift as being in Dehee Calcutta."

কলিকাতার প্রথমাবস্থায় এখানে তন্তুবায়ের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার শেঠ ও বসাক পরিবারস্থ যে কয়েক ঘর সমৃদ্ধিশালী [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য-সূত্রে ধনশালী হইয়া উঠেন। ইঁহারা এবং সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়স্থ রায়, মল্লিক পরিবারের কয়েক ঘর এই সূত্রে কলিকাতায় প্রথম উপনিবেশন স্থাপন করেন; ইঁহারা অনেকে সপ্তগ্রাম হইতে এখানে আগমন করেন। এই উভয় জাতিই কলিকাতার আদিম অধিবাসী।

১৭৫৬ অব্দে লালবাজার, চীনাবাজার প্রভৃতি ইংরাজ পল্লীগুলিকে কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া উহার পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। তখন চৌরঙ্গীর নাম গন্ধ ছিল না। ইংরাজ দোকানদারেরা তখন রাধাবাজার, চীনাবাজার, মুরগীহাটা ও আর্ম্মানি-গির্জ্জার নিকট আপনাদিগের দোকান পত্র করিত এবং বাঙ্গালীরা ধর্ম্মতলা, চৌরঙ্গী, লালবাজার অঞ্চলে (অর্থাৎ তখনকার গোবিন্দপুরে) বন জঙ্গল মধ্যে কুটীর-বাসী ছিলেন। বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মাণের সময় বাঙ্গালীরা এতদঞ্চল ত্যাগ করেন, এবং ইংরাজেরা ঐ অঞ্চল দখল করিয়া চৌরঙ্গী প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। লালদীঘি কলিকাতার একটী প্রাচীন পুষ্করিণী, লালচাঁদ বসাকের নাম হইতে ইহার "লালদীঘি" নামকরণ হইয়াছে। দেড়-শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইহার জলের গভীরতা ষাট ফুট বলিয়া উল্লিখিত আছে। আর তখনকার লালবাজার, এখনকার চৌরঙ্গীর সম্মান উপভোগ করিত; কোম্পানীর বড় বড় কর্ম্মচারীরা তৎকালে লালবাজারবাসী ছিলেন। পরে যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, তখন রাইটারস্ বিল্ডিং (পূর্ব্বে সিবিলিয়ানদিগকে রাইটার বা কেরাণী বলা হইত) অপেক্ষা এই স্থান আরও জমকাইয়া উঠে; নূতন সিবিলিয়ানেরা এই গৃহের এক অংশে বসবাস করিতেন, অপর অংশে কলেজ স্থাপিত ছিল। এই কলেজে ইঁহারা এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। তবে সে সময় শিক্ষা কার্য্যটাও বড় চমৎকার গোছের ছিল!

বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্বে কলিকাতায় এত ঘাটের আধিক্য ছিল না। দক্ষিণ অংশে তখন রাজচন্দ্র দাসের ঘাট (যাহাকে অনেকে মাড়েদের ঘাট বলিয়া থাকেন), চাঁদপাল ঘাট, কালভিন ঘাট ও পুলিস ঘাট, এই কয়েকটি প্রাচীন বলিয়া গণনীয়। প্রিন্সেপ ঘাট এবং কয়লা ঘাট, এই সকলের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। হলওয়েল সাহেব কৃত প্রাচীন কলিকাতার মানচিত্রে (১৭৫২ অব্দ) এই দুই ঘাটের নামোল্লেখ নাই। পরে চার্লস যোসেফ কৃত ১৮৪১ অব্দের মানচিত্রে প্রিন্সেপ ঘাটের নাম প্রথম দৃষ্ট হয়; সুতরাং ইহা অভিনবের মধ্যে গণ্য। জেমস্ প্রিন্সেপ (বোধ হয় হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজ প্রিন্সেপের ইনি পিতামহ হইবেন।) সাহেবের স্মরণার্থ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া এই ঘাট নির্ম্মিত হয়। কিন্তু বিস্তর অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইলেও ইহা দুইবার ব্যতীত কখন কোন সাধারণ কার্য্যোদ্দেশে ব্যবহৃত হয় নাই। সেই দুই বারের মধ্যে একবার, লর্ড এলেনবরো এ দেশের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ড প্রত্যাগমন কালে চাঁদপাল ঘাটের পরিবর্ত্তে এই ঘাটে জাহাজারোহণ করেন; আর প্রিন্স অব ওয়েল্স যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন এই ঘাটে তিনি অবতরণ করেন। সেই দিন এই ঘাটে যেরূপ লোক-সমাগম হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহা কখন বিস্মৃত হইব না।

চাঁদপালের ঘাট কলিকাতার মধ্যে অতি প্রাচীন। ইহা কোন্ ব্যক্তি দ্বারা ও কত দিন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ঠিক বৃত্তান্ত কেহ অবগত নহেন। তবে যে ১৭৫৬ সালের পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না, হলওয়েলের ম্যাপে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জনরব যে, পূর্ব্বে এইস্থানে চন্দ্রপাল নামে এক ব্যক্তির মুদীর দোকান ছিল এবং তাহারই নামানুসারে ইহা চাঁদপালের ঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছে। যাহা হউক, এই ঘাটের সহিত এ দেশের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত। ভারতের শাসনকর্ত্তা, প্রধান সেনাপতি, লর্ড বিশপ ও কৌন্সিলের মেম্বর প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষেরা ইংলণ্ড হইতে আগমন করিয়া কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ কালে দুর্গ হইতে তাঁহাদের পদানুযায়ী কামানধ্বনি শুনিতে শুনিতে এই ঘাটে অবতরণ ও প্রত্যাগমন কালে এই ঘাটে জাহাজারোহণ করিয়া এ দেশের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতেন। এখন বোম্বাই পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রেল নির্ম্মিত হওয়ায়, ইহার সে পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে। আর এক কারণে এই ঘাট এ দেশের

ইতিহাস-পাঠকের বিশেষরূপ সুপরিচিত। ১৭৭৪ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ জুনিয়স পত্রের (Letters of Junius) সুপ্রসিদ্ধ রচয়িতা ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের সভাসদ ফ্রান্সিস সাহেব অপর তিন জন সদস্যের সহিত যৎকালে এই ঘাটে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, তখন ইহাঁদের প্রত্যেকের সম্মানার্থ দুর্গ হইতে সতরটি করিয়া তোপধ্বনি হয়। ফ্রান্সিসের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সম্মানার্থ উনিশ বার তোপধ্বনি হইবে। একে বঙ্গোপসাগর হইতে আগমন কালে ক্রমাগত পাঁচ দিন ঝড় বৃষ্টিতে কষ্ট পাওয়ায় তাঁহার মেজাজ খারাপ ছিল, তাহার উপর এই প্রকারে ভগ্ন-মনোরথ হওয়ায়, তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে; এবং ক্ষোভে, রোষে এই জন্য তিনি হেষ্টিংসের উপর প্রতিহিংসা লইতে ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, যে ছয় বৎসর কাল ফ্রান্সিস এ দেশে ছিলেন, সেই কয় বৎসর কাল হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা কিরূপ বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত, এবং খিদিরপুরের পুলের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে ইহাঁরা কিরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধে (Duel) উভয়ে উভয়ের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং শেষ এই ফ্রান্সিসের যত্ন-চেষ্টা-ফলে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার হলে সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল-ব্যাপী ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় বাগ্মীপ্রবর এড্‌মণ্ড বর্ক ও সেরিডনের বাক্যবাণে হেষ্টিংসকে কিরূপ লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, অপদস্থ ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। যদ্যপি হেষ্টিংস পূর্ব্বাহ্নে জানিতেন, যে, সামান্য দুইটি তোপের জন্য এতদূর অনর্থপাত ঘটিবে, ও তাঁহাকে এতদূর বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা হইলে তিনি আর দুইটি অতিরিক্ত তোপের আদেশ দানে কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না। যাহা হউক, কিরূপ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা হইতে কীদৃশ গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, এই ঘটনা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদিগের বক্তব্য হইতে আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে পুনরায় আরম্ভ করা যাউক। আর একজন ইংরাজ বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে (সুপ্রীম কোর্টের প্রথম ও প্রধান জজ) এই ঘাটে জাহাজ হইতে অবতরণ কালে এদেশীয় লোকদিগের নগ্নপদ ও স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট একমাত্র বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে দুঃখ প্রকাশ ও আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ ভাষায় এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে :—"See brother, the wretched victims

of tyranny. The Crown Court was not surely established before it was needed. I trust it will not have been in operation six months before we shall see these poor creatures comfortably clothed in shoes and stockings." কথাগুলি বেশ আশাপ্রদ ও মিষ্ট! এ দেশীয়দিগের দুঃখে অনেক ইংরাজকেই প্রথম প্রথম এইরূপ অনেক দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে শুনা যায়। আর এরূপ মিষ্ট কথা শুনিলে মনোমধ্যে একটু আশা ভরসা হয় বটে; তবে আমাদের অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এ পর্য্যন্ত কাজে কেহ কিছু যে করিলেন না, এই যা দুঃখ।

চাঁদপাল ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে কালভিন ঘাট। পূর্ব্বে এই ঘাট দেশীয় নৌকাদি নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। তখন এই ঘাট হইতে একটি খাল, সাবেক দুর্গের পার্শ্ব ও বর্ত্তমান বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসের নিম্ন দিয়া বরাবর বাদা পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। এখন সেই খালের আর কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এই খালেই উক্ত নৌকাদি রক্ষিত হইত।

ইহার উত্তরে পুলিস ঘাট। নবাব সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে এই ঘাটের উপর ইংরাজদিগের কুঠির প্রেসিডেণ্টের আবাস-গৃহ স্থাপিত এবং ইহার সংলগ্ন ভূখণ্ডে লালদীঘি পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক উদ্যান ছিল। এই উদ্যান পার্ক নামে অভিহিত হইত ও তৎকালে এখানকার অধিবাসীরা সেই উদ্যানে বায়ু-সেবনার্থ গমন করিতেন। এক্ষণে আর সেই সকলের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রাচীন ম্যাপে তাহার পরিচয় মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উদ্যানের সন্নিকটে এবং রাইটার্স বিল্ডিংএর পশ্চিম পার্শ্বে যে গির্জ্জা স্থাপিত ছিল, সেই গির্জ্জায় সাহেবরা উপাসনা করিতে গমন করিতেন। কোম্পানীর প্রেসিডেণ্টও এই গির্জ্জায় উপাসনার্থ গমন করিতেন। কিন্তু গাড়ী ঘোড়ার অভাবে পদব্রজে তাঁহাকে অপরাপরের সহিত গমনাগমন করিতে হইত। কোম্পানীর বাঙ্গালার প্রধান রাজপুরুষ প্রেসিডেণ্টের যে ইহাতে সম্মানের লাঘব হইত, তাহার সন্দেহ নাই। এইজন্য ১৭২৫ অব্দে প্রেসিডেণ্ট ডিন্ সাহেব গাড়ী ঘোড়া ক্রয়ের ব্যয় স্বরূপ এগার শত টাকা বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের নিকট চাহিয়া পাঠান। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে অতি কঠোর ভাষায় উত্তর দেন; তাঁহারা লিখিয়া পাঠান যে, প্রেসিডেণ্ট গাড়ী ঘোড়া রাখিতে ইচ্ছা করিলে, নিজ ব্যয়ে তাহা ক্রয় করিতে

পারেন; ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে তাহার জন্য এক কপর্দ্দকও কোম্পানীর তহবিল হইতে দিতে পারিবেন না। তখনকার প্রেসিডেন্ট বা গভর্ণরেরা কিরূপ শ্রেণীর লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদের কিরূপ মান-সম্ভ্রম ছিল, ইহা হইতে বুঝিয়া লউন। ১৭৫৭ সালেও কলিকাতায় দুই খানি ব্যতীত সাহেব-দিগের গাড়ী দৃষ্ট হইত না। ইহার একখানি ক্লাইবের, অপর খানি ওয়াট সাহেবের। বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও বড়-একটা কেহ গাড়ী ঘোড়ার ধার ধারিতেন না। বড় লোকেরা পাল্‌কিতে করিয়া যাতায়াত করিতেন। তখন গাড়ী চড়িবারও বড় সুবিধা ছিল না; সহরের প্রায় সকল স্থানই বন, জঙ্গল ও পুকুরে আবৃত ছিল;—বড় রাস্তার মধ্যে কেবল মাত্র চিৎপুর রোড, সুতরাং গাড়ী চলেই বা কোথায়! সে সময় বড় বড় গোলপাতার ছাতার খুব চলন ছিল; এখনকার মত সৌখিন ছাতা পাওয়া যাইত না। উড়িয়ারা ঐ সকল ছাতার মালিক ছিল, ভদ্রলোকদিগের মাথার উপর ধরিয়া তাঁহাদিগের গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিত ও সাধারণতঃ চারি পয়সা করিয়া ভাড়া পাইত। এখনও লালবাজারের নিকট "ছাতাওয়ালা লেন" সেই সাবেক ছাতির ব্যবসার সাক্ষ্য দিতেছে।

১৭৫৬ অব্দে বঙ্গেশ্বর সিরাজোদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণে বণিক্ কোম্পানীর যেমন কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, তেমনি বিস্তর লাভও হইয়াছিল। কলিকাতা আক্রমণে অধিবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া নবাব সকল শ্রেণীর লোককেই সেই ক্ষতিপূরণ জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। সেই টাকায় বণিক ইংরাজদের ত কথাই নাই, অনেক বাঙ্গালীও নূতন গৃহের মুখ দেখেন এবং অনেকের জরাজীর্ণ ও ভগ্ন কুটীর ইংরাজ-বর্ণিত নৃশংস নররাক্ষস সিরাজের আক্রমণ-ফলে নূতন আকার ধারণ করিল এবং সেই সঙ্গে কলিকাতার শ্রী অনেকটা ফিরিয়া গেল।

এই সময় বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট-হাউস যে ভূখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান, সেই ভূখণ্ডের উপর নবাব প্রদত্ত উক্ত অর্থে প্রেসিডেণ্টের নব আবাস নির্ম্মিত হয় এবং সাবেক গভর্ণমেণ্ট হাউসকে ব্যাঙ্কশালে (Bank-shall) পরিণত করা হয়। ইহার সম্মুখস্থ ঘাটে পাইলটদিগের জাহাজ মেরামতের জন্য ১৭৯০ অব্দে একটী ডক স্থাপিত হয়। ১৮০৮ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় জাহাজাদি মেরামত হয়, এবং পরে উহা বুজাইয়া ফেলা হয়। তখনকার এদেশবাসী ইংরাজেরা আমাদিগের ন্যায় হুঁকা

কলিকায় তামাক সেবনের বড় ভক্ত ছিলেন। এই নব লাট-গৃহে তখনকার প্রেসিডেণ্টেরা মে ও জুন মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরাহ্নে বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, জলযোগান্তে হুঁকা কলিকায় তামাক সেবনের সুখানুভব করিতেন। তখন টানাপাখার সৃষ্টি হয় নাই; বোধ হয়, সাহেবেরা পাখার সেই অভাব হুঁকায় মিটাইতেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লী বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট-হাউস নির্ম্মাণ করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর বারাকপুর প্রিয়তম স্থান ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বারাকপুরে গভর্ণমেণ্ট-হাউস নির্ম্মিত করিয়া, যত সরকারী আফিস তথায় উঠাইয়া লইয়া রাজধানী স্থাপন করেন; তখনকার অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষদিগেরও এই মত ছিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি গভর্ণমেণ্ট-হাউসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া কার্য্যারম্ভ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। ৩৪ লক্ষ মুদ্রা ইহার ব্যয় ধার্য্য হয়; কিন্তু বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের আদেশে উহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না। কড়ি, বরগা, কপাট, জানালা প্রভৃতি যাহা ক্রীত হইয়াছিল, সব নিলামে বিক্রয় করা হইল। আর যাহা কিছু নির্ম্মিত হইয়াছিল, লর্ড হেষ্টিংসের শাসন কালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আদেশ-ক্রমে তাহা ধ্বংশ করা হয়। লর্ড হেষ্টিংস কিন্তু বর্ত্তমান পার্কের যথেষ্ট শ্রী সম্পাদন করেন। ১৭৭২ অব্দে বারাকপুরে প্রথম সেনা-নিবাস (Cantonment)-এর সূত্রপাত হয় এবং চাণকের পরিবর্ত্তে বারাকপুর নামান্তরিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

উড্ডীয়মান মৎস্য।

কেনারাম বাবু একটী গোলগাল ছোটখাট মনুষ্য। তাঁহার উদরদেশ নিটোল গোল, এবং মুখখানি চল্‌চলে ও চক্‌চকে। তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকের ধারণা হইত যে, কেনারাম বাবুর শিরায় শিরায় রক্তের

পরিবর্ত্তে তৈল প্রবহমান। ছোট তাহার নাসিকাটি—যেন কাঁচাবেলের কিল খাইয়া বোঁচা হইয়া গিয়াছে,—আর খাটো তাঁহার পদদ্বয়—যথার্থই তাদৃশ দেহ বহনের উপযুক্ত এবং স্রষ্টার সামঞ্জস্য-জ্ঞানের পরিচায়ক! আর তাঁহার চক্ষু অন্যান্য অবয়বের অনুরূপ। অর্থাৎ তাঁহার নাসিকা চীনবাসীদের সহিত তুলনা করিলে চক্ষুদ্বয়ও চৈনিক, তাঁহার দেহ হস্তীর ন্যায় বলিলে চক্ষুও করিচক্ষুর সাদৃশ্য বলিতে হইবে। তাঁহার রং মিস্‌-মিসে নয়, ফিটফিটেও নয়। চক্ষুর উপমায় চীনবাসী ও করিবর উভয়কেই বজায় রাখিয়াছি, কিন্তু রঙ্গে ইহাদের কাহারও সাদৃশ্য নহে। অর্থাৎ তিনি বঙ্গদেশে গৌরবর্ণ রঙ্গে চলিতে পারেন—যে রঙ থাকিলে লোকের অপর অঙ্গের দোষ ঢাকিয়া যায়। এইত কেনারাম বাবুর বাহ্য অবয়ব। এখন তাঁহার আভ্যন্তরিক গুণ বর্ণনা আবশ্যক। কেনারাম বাবু সুরুচিপূর্ণ পুরুষ। সঙ্গীত-শাস্ত্রে বা চিত্রবিদ্যায় তাঁহার রুচি নাই, কিন্তু আছে কেবল সন্দেশ-রসগোল্লায়—পোলাও-কোর্ম্মায়। প্রকৃতি এবং লক্ষ্মীর সমান অনুগ্রহ কেনারাম বাবুর উপর হয় নাই। প্রকৃতি তাঁহাকে যেরূপ সুরুচিসম্পন্ন করিয়াছেন, লক্ষ্মীর তত্তদূর অনুকূল দৃষ্টি না থাকায়, রুচি-অনুসারে উদরপূর্ত্তি হয় না। এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই নূতন নূতন খাদ্যের জন্য বন্ধুবর্গের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইত। আমরা এরূপ বলিতে পারি না যে, তিনি প্রত্যহই নিমন্ত্রিত হইতেন, তবে তাহার বাড়ীতে কখনও খাদ্যের আয়োজন হইত না। তাঁহার গল্প বলিবার, হাসাইবার, অযাচিত সুখ্যাতি বর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা লোকরঞ্জন করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, তাঁহার বন্ধুবর্গের বাড়ী আহার জুটিয়া যাইত। এজন্য তাঁহার পরিচিতের সংখ্যা যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি হয়, সেদিকে কেনারাম বাবুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

এত যত্ন এবং অধ্যবসায় সত্ত্বেও তাঁহার ভোজনে প্রায়ই ত্রুটি হইত। এমন কি, মাঝে মাঝে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুদের বাড়ী আহারে বসিয়া আশানুরূপ দ্রব্যাদি সর্ব্বদা পাইতেন না। কোথাও কালিয়া-কাবাবের আশায় পাত পাতিয়া, শেষে লুচি-তরকারি দ্বারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে হইত। মনুষ্য-শরীরে ধৈর্য্যের ত একটা সীমা আছে। এ অবস্থায় পড়িলে কেনারাম বাবুর বন্ধুর উদ্দেশে বৈদিক সংস্কৃত বাহির হইত।

কিছুদিন এ বিষয়ে গভীর গবেষণার পর কেনারাম বাবু এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ইহাতে তাঁহার আহার্য্য পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিতে

পারিতেন, কাযেই যেখানে সেখানে হঠাৎ উপস্থিত থাক্‌লে তাঁহাকে নৈরাশ হইতে হইত না। অতঃপর কেনারাম বাবুর কার্য্যপ্রণালী এইরূপে নির্ব্বাহ হইত। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া, বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। স্থানীয় সকল বড় বড় লোকের ঝি, চাকর, তাঁহার মুখচেনা থাকায়, তিনি অনায়াসে ও অপরের অলক্ষিতে জানিতে পারিতেন, কাহার বাড়ী বড় রুই মাছটা গেল, কোন্ চাকরে অতিরিক্ত মাংস কিনিতেছে, কোন্ ঝির সহিত ঝোড়া-খানেক মিষ্টান্ন চলিয়াছে ইত্যাদি। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কোনও নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে ভোজনের ব্যবস্থা করিতে কেনারাম বাবুকে বেশী কষ্ট পাইতে হইত না।

একদা কেনারাম বাবু এইরূপ বাজার-পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি ছোট ডালা করিয়া একজন কতকগুলি তপ্সে মাছ বিক্রয় করিতেছে। মৎস্যগুলির সুবৃহৎ আয়তন ও বালসূর্য্য-কিরণ-সদৃশ বরণ-ছটা দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এরূপ সুস্বাদু মৎস্য বাজারে সর্ব্বদা আসে না বলিয়া, অনেকে দু'চারটি লইবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছিল; কিন্তু বিক্রেতার ধনুর্ভঙ্গপণের তুল্য দর শুনিয়াই সকলে নৈরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কেনারাম বাবু প্রথমাবধিই এই লবণ সমুদ্রের অমৃতভাণ্ড স্বরূপ ডালা খানির প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোনও সুনিপুণ ডিটেক্‌টিভ পুলিস কর্ম্মচারী ভাবী আসামীর প্রতি যেরূপ নজর রাখেন, সেইরূপ কেনারাম বাবুর সেই দৃষ্টি ভাবী ক্রেতার উপর। ক্ষুধার্ত্ত বালক মিষ্টান্নের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেরূপ সলালস দৃষ্টিক্ষেপ করে, সেই পাঁচকুড়ি তাজা পূর্ণগর্ভ শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মৎস্যরত্নপূর্ণ ডালার প্রতি কেনারাম বাবুর সেইরূপ দৃষ্টি। ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মাংসের প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেমন সে সত্যই মাংস খাইতেছে মনে করিয়া, জিহ্বা হইতে লালা ক্ষরণ হয়, সেইরূপ কেনারাম বাবুর মনে মনে এই অখণ্ডিত মৎস্যগুলিকে কাল্পনিক কটাহে ভর্জ্জিত করিয়া দন্ত দ্বারা ইহাদের মুণ্ড মর্দ্দনের সুখানুভব করিতে করিতে মুখে রসসঞ্চয় হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ দেখিলেন, রাজা বলাইদেবের সরকার উক্ত ডালাশুদ্ধ মৎস্য কিনিয়া লইয়া গেল। এতক্ষণের সন্দেহ এবং আশঙ্কার পর কেনারাম বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন। রাজা বলাইদেবের ভবনে কেনারামের গতি অবারিত। রাজা বাহাদুর কেনারামের গল্প শুনিতে সর্ব্বদাই উৎসুক এবং তজ্জন্য সেখানে মাসের মধ্যে দশদিন কেনারামের সেবা বাঁধা। তপ্সে মাছ বাজার আঁধার

করিয়া গেলে, কেনারামের আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন হইল না। তিনি মৎস্যের বিরহে আকুল হইয়া তদুদ্দেশে রাজভবনের দিকে চলিলেন।

রাজা বলাইদেব সে সময়ে চা খাইতেছিলেন। কেনারাম বাবু বরাবর রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা সহাস্য বদনে কেনারামকে বসিতে বলিলেন। কেনারাম আসীন হইলে, রাজা বাহাদুর বলিলেন, "আজ ক'দিন তোমাকে না দেখে মন খুলে হাসি হয় নি। আজ জনকতক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একত্র আহার কর্‌ব মনে কর্‌ছি। তুমি না থাক্‌লে আমাদের স্ফূর্ত্তি হবে না।" কেনারাম বাবু দেখিলেন যে, মেঘ না চাইতে চাইতে জল। মনে মনে অন্ততঃ এককুড়ি তপ্সে মাছের পরকালের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক, এ ত আমার সুখের কথা।" তার পর একথা সে কথার পর চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক খানি পত্র আসিল। পত্রখানি রাজা বলাইদেবের বন্ধু লিখিয়াছেন। কিশোরী বাবু সন্ধ্যার পর রাজাবাহাদুরকে স্বভবনে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। রাজাবাহাদুর বন্ধুর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া পত্রোত্তর লিখিলেন, এবং নিকটে একজন পরিচারককে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "যদি পুকুরের বড় মাছ ধরা হইয়া থাকে, তবে তাহার একটা পত্র-বাহকের হস্তে কিশোরী বাবুর বাড়ী পাঠাইয়া দাও। পরিচারক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পুকুরের বড় মাছ সমস্ত কুটিয়া ফেলা হইয়াছে। তবে সবে মাত্র সরকার মহাশয় বাজার হইতে এক ডালা তপ্সে মাছ আনিয়াছেন, তাহা এখনও কোটা হয় নাই।" রাজাবাহাদুর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, মৎস্যগুলি সডিম্ব; এবং লোককে দিবার উপযুক্ত বড় বড়। তখন সেইগুলি সমস্ত কিশোরী বাবুর বাড়ী পাঠাইবার আদেশ হইল। চাকর পত্র লইয়া প্রস্থান করিল। তপ্সে মাছ বিলাইবার হুকুম শুনিয়াই, কেনারামের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্থির-বিশ্বাস ছিল যে, যদি মাছগুলি রাজাবাহাদুর একবার স্বচক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি প্রাণ ধরিয়া সেগুলি বিলাইয়া দিতে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু এতাবৎ কেনারাম সে সম্বন্ধে কিছু বলে নাই; আর এখন বলিলে কোনও ফল হইবে না। কারণ মৎস্যের ডালা লইয়া লোক চলিয়া গিয়াছে। এখন উপায়? কেনারাম নিজ অদৃষ্টকে এবং রাজার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর, রাজা বলাইদেবের দৃষ্টি কেনারামের উপর

পড়িল। তিনি তাহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনারাম! কোন অসুখ হ'ল নাকি? হঠাৎ এ রকম মুখ শুকিয়ে গেল যে?"

কেনারাম মৎস্যের বিরহে রাজবাড়ী শূন্যময় হেরিতেছিলেন, রাজার কথায় হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, শরীরটা যেন কেমন কেমন কর্‌ছে।" এই বলিয়া তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

রাজা। তাই ত হে, হঠাৎ এ আবার কি? কোথায় দুপুরবেলা আমোদ ক'রে খাওয়া দাওয়া যাবে, তা' না হ'য়ে তোমার অসুখ হ'ল। বোধ করি, দুপুরবেলা খেতে আস্‌তে পারবে না?

কেনা। আজ্ঞে, বোধ হয় না। তবে দেখি একটু শুয়ে থেকে যদি শরীরটা খোলসা হ'য়ে যায়, তবে না হয় কিশোরী বাবুর বাড়ীই যাব এখন। তাঁর বাড়ী আরও নিকট হ'বে।

রাজা বলাইদেবের কেনারাম-চরিত্রে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। কেনারামের এই অতর্কিত উত্তরে তাঁহার মনে একটু সন্দেহের ছায়া আসিল, তিনি ধীরে ধীরে অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সে যুক্তি মন্দ নয় কেনারাম, কিশোরী বাবুর বাড়ীই আহার ক'র। তপ্সে মাছ তোমার রোগের উপযুক্ত পথ্য। যাবার সময় না হয় কিশোরী বাবুকে আমার নাম ক'রে ব'লে যেও যে, মাছগুলি ওবেলা পর্য্যন্ত থাক্‌বে না।"

অতঃপর কেনারাম ত্বরায় রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কিশোরীবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে চলিলেন। এখানে আসিয়া রাজার বন্ধু এবং পূর্ব্বের পরিচিত বলিয়া কেনারাম যথেষ্ট খাতির পাইলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ একথা সেকথার পরও কিশোরীবাবু আহারের কথা পাড়িতেছেন না দেখিয়া, কেনারামের কিছু ভাবনা হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করিলেন, "আজকে দুপুর বেলাটা আমার কোনও কাজ নেই, দিন্‌টা কেমন ক'রে কাট্‌বে, তা' ভেবে পাচ্ছিনা।" এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট হইল। অম্‌নি কিশোরীবাবু বলিলেন, "আপনার ন্যায় আমুদে লোক মেলা ভার। যদি কিছু মনে না করেন, তবে না হয় এখানেই আজ আহারাদি করুন। হঠাৎ ভদ্রলোককে একথা বল্‌তে সাহস হয় না, তবে আপনি নাকি রাজা বলাইদেবের বন্ধু, আর আপনার যেরূপ মন শাদা, এতে বোধ হয় আপনার কিছু আপত্তি হ'বে না।"

কেনা। আপত্তি আবার কি। এ ত সুখের বিষয়, তবে—রাজবাটীতে এবেলা আমার নিমন্ত্রণ ছিল।

কিশোরী। এ গরিবের কুটীরে রাজবাটীর তুলনায় আপনার কিছুই হবে না। আর একটু আগে জান্‌লেও বরং তপ্সে মাছ গুল রেখে দিতুম। এই মাত্র আমার স্ত্রী সেগুলি সমুদয় তার গুরু মহেশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। তবে রাত্রির যোগাড় মন্দ হবে না, আমার কয়েকজন বন্ধুকে রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ ক'রেছি।

এবার বড় মুস্কিল। বরং কিশোরী বাবুর সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় আছে, কিন্তু গুরু মহেশ ভট্টাচার্য্য একবারে অপরিচিত। দেশে এত লোক থাকিতে কিনা এই ভট্টাচার্য্যের বাড়ী অমন তপ্সে মাছ গুলি হাজির হইয়াছে? কেনারাম দুই জায়গায় বিফল-মনোরথ হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল রহিল—আজ যেমন করিয়া হউক্, এই মৎস্য আহার করিয়া রসনার জড়তা ভঙ্গ করিতে হইবে। ইহাতে কাল মাথা যায়, সেও স্বীকার! কেনারামের বীর-হৃদয় এই প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ! দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য মধ্যপাণ্ডব এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

কিশোরী বাবুর নিরামিষ নিমন্ত্রণের দায় হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া দ্রুত-পদবিক্ষেপে ভট্টাচার্য্য-পল্লীতে আসিতে কেনারাম বাবুর বেশী বিলম্ব হইল না।

মহেশ ভট্টাচার্য্যের দ্বারদেশে পৌছিয়া, তাঁহার আর ডাকিতে সাহস হইতেছে না। তখনই সেই ডালাপূর্ণ তপ্সে মাছ স্মরণপথে উদিত হওয়াতে আবার সাহস দ্বিগুণ হইল। মস্তিষ্কে বুদ্ধি টলমল করিতে লাগিল। কেনারাম সবেগে দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং আস্তে ব্যস্তে আসিয়া দরজা খুলিয়া আগন্তুকের ললামদেহের প্রতি কিয়ৎক্ষণ অনিমিষে চাহিয়া রহিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক্। পরে কেনারাম অসীম ধীশক্তির বলে ইহাকেই গুরু বলিয়া চিনিলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! রাজা বলাইদেবের আদেশমত আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। রাজা বাহাদুরের কোনও পুর-মহিলা সম্প্রতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে, আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

এইরূপ কৌশল-পূর্ণ বাক্যে মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেনারামকে সাদরে আহ্বান করিয়া বসাইলেন। ভট্টাচার্য্যের মনে কেবল রাজবাটীর

ভূরিভোজন ও ভোজনান্তে দক্ষিণার কথার উদয় হইতেছে। তখন কেনারাম বাবু দ্বিতীয় চাল চালিলেন "দেখুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আজ প্রাতঃকাল হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিমন্ত্রণ করিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অস্থির হইয়াছি। এদেহে অধিক পরিশ্রম সহ্য হয় না। আহার ত আজ সেই বেলা তিনটার কমে হচ্ছে না; একটু জল যদি অনুগ্রহ ক'রে আনিয়ে দে'ন, তবে দারুণ তৃষ্ণার শান্তি হয়।"

মহেশ। সে কি কথা! জল এখনি আনিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু আমার এখানে তোমার প্রসাদ পেতে হবে। রাজবাটী থেকে এসেছ। তাঁর সাবেক সরকার নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসে বেলা বেশী হ'লে এখানে প্রসাদ পেত। মহারাজের ব্রাহ্মণসজ্জনের প্রতি কত ভক্তি!

কেনা। আজ্ঞে, সেটা মাপ্ কর্‌বেন। কিশোরী বাবুর ওখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি না গেলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন।

মহেশ। কিশোরী যে আমার শিষ্য। ওহো, সে যে আজ কতকগুলা তপ্সেমাছ পাঠিয়েছিল বটে। আমিও ভাব্‌লুম, বুঝি বাড়ীতে কোনও কার্য্য আছে।

কেনারাম। (স্বগত) তপ্সেমাছ! তপ্সেমাছ!! এতক্ষণে তোমায় পাইলাম। আজ তোমার জন্যে কত ঘুরিয়াছি, কতবার নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিয়াছি। (প্রকাশ্যে) কিশোরী বাবু আমার পরম বন্ধু। তথাপি উপস্থিত ব্রাহ্মণের প্রসাদ ত্যাগ করা মহাপাপ।

মহেশ। আমাদের সাত্ত্বিক আহার, আপনার তাহাতে পরিতৃপ্তি হ'বে কিনা বল্‌তে পারি না।

কেনারাম বাবু দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ ক্রমে তপ্সেমাছের কথা হইলে অনেক দূরে আসিয়া প'ড়েছেন। তাই বলিলেন "আজকাল যেরূপ ব্যায়রাম হ'চ্ছে, তাতে নিরামিষ ভোজনই উচিত। একান্ত পক্ষে সামুদ্রিক মৎস্য বরং ভাল, কিন্তু পুকুরের মাছ সজীব ব্যাসিলি।"

মহেশ। আমরা নিরামিষই খাই। কিশোরীর স্ত্রী যে মাছ পাঠিয়েছিল, তা' আমাদের আর এক শিষ্যের বাড়ী দিলুম।

কেনা। তা'র নাম?

মহেশ। কালী দে।

কেনা। ঐ যাঁর কাপড়ের দোকান আছে?

মহেশ। আপনায় দেখ্‌ছি যে, ছোট বড় সকল লোকের সহিত আলাপ?

কেনারাম কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, রাজা বলাইদেবের একজন সরকার 'মহেশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দিকে আসিতেছে। কেনারাম ইহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন; পাছে কোনও বেফাঁস কথা বলিয়া রাজবাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজনের সংবাদ অলীক প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। তিনি সংক্ষেপে "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়াই রাস্তায় পড়িলেন এবং "আসি তবে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কি দুর্দ্দৈব! বেলা যে প্রায় দ্বিপ্রহর হইতে চলিল, আর কতক্ষণ তিনি পলায়নপর তপ্সে মাছের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন? কেনারামের বীরহৃদয় এতক্ষণে ক্ষুধার দুর্দ্দমনীয় তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে কত কঠিন ভোজন ব্যাপারে কত সহজে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা মনে হইতে লাগিল, এবং তিনি নিজ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। আবার সেই সকালের ডালাপূর্ণ সরস মৎস্যগুলি তাঁহার মনে পড়িয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে জাগাইয়া দিল। আর একবার তিনি মৎস্য-চমূর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনবার তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কিন্তু কে বলিল যে, চতুর্থবারে তিনি জয়ী হইবেন না? ওয়াসিংটন্, গ্যারিবল্ডী, লিওনিডাস্, নেপোলিয়ন, প্রতাপ-সিংহ প্রভৃতির কথা স্বতঃই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। ইহারা কেহ কি তিনবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন? তবে তিনি কি বলিয়া ভগ্নমনোরথ হইবেন। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" একথা কাপুরুষের, কেনারামের নহে। তাঁহার মনটা এখন "সাধিলেই সিদ্ধি।"

কেনারাম বাবু ক্রমে অস্থির-পদবিক্ষেপে কালী দের বাড়ীর সম্মুখীন হইলেন। রাস্তার ধারের জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, দে মহাশয়কে চাকর তেল মাখাইতেছে। চারি চক্ষুর মিলন হইতেই, দে মহাশয় তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া চাকরকে কি বলিয়া দিলেন। অমনি কেনারামবাবু একলম্ফে রাস্তার মোড়ে, তারপর সটান গলির ভিতর দিয়া ছুট্।

অনেকে তর্ক করেন যে, মোটা লোকে ভাল ছুটিতে পারে না; কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, মোটা লোক বৈজ্ঞানিক মতে জলে সহজে ভাসিয়া থাকে এবং বিশেষ সন্তরণ-পটু হয়। ঠিক সেই যুক্তিবলেই

তাহারা বায়ুস্তর ভেদ করিয়া সহজে এবং সবেগে গমন করিতে সক্ষম। কিন্তু স্থূলকায় ব্যক্তিগণ সহজে দৌড়াইতে চাহেন না, কাযেই লোকের অন্ধ-বিশ্বাস দূর হয় না। এখনও কেনারাম বাবু দৌড়াইতেছেন; তাঁহার মনে হইতেছে—বুঝি কালী দের বেহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। বহুদিন হইল, কেনারাম বাবু কালী দের দোকান হইতে ধার করিয়া অনেকগুলি টাকার কাপড় লইয়া আসেন। সেই অবধি উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। কালী বাবু তাঁহাকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কেনারাম বাবুও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে কেনারাম বাবুর এইরূপ পলাইয়া বেড়াইতে বিবক্তিবোধ হইতে লাগিল। তিনি মনে করিয়া-ছিলেন, কোন সুযোগে কালী দের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অনুনয় বিনয় করিয়া একটা মিট্‌মাট করিয়া ফেলিবেন। আজ মহেশ ভট্টাচার্য্যের নিকট কালী দের নাম শুনিয়া সেই গুপ্ত শুভসংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে মনস্থ কবিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে যাহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরে, তাহারও মত্‌লব আঁটিয়া-ছিলেন। কিন্তু হায়, কালী দের দৃষ্টিমাত্রেই (মহাজনের দৃষ্টিতে কোন্ বীর-হৃদয় না বিচলিত হয়?) কেনারামের সকল সংকল্প, সকল মতলব প্লাবনের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় অথবা সুরধুনীর স্রোতে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ছুটিয়া পলায়ন ভিন্ন কেনারামেব পরিত্রাণের আর কোনও বুদ্ধি যোগাইল না।

কেনারাম বাবু খানিকটা ছুটিয়াই হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মনে হইতেছে, এই বুঝি ধবা পড়িলাম। এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি পথিপার্শ্বে এক গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিলেন এবং ভীমের ন্যায় দরজা চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঘটনাক্রমে কেনারাম বাবুব পরিচিত এক ভদ্রলোক এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া এতদবস্থায় কেনারাম বাবুকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কেনারাম বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় একটা মহিষে তাড়া করিয়া আসাতে, তাঁহাকে ছুটিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছে।

ভদ্রলোক এই কথা শুনিয়া, কেনারাম বাবুর আহারের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। যথা সময়ে আহার করিতে বসিয়া, কেনারাম বাবু দেখিলেন, তাঁহাব পাতে এক রাশি তপ্সে মাছ। চক্ষু মুদিত করিয়া দশ পনরটা খাইয়াও কেনারাম বাবুব বিশ্বাস হইতেছে না যে, ইহা স্বপ্ন বা সত্য।

গৃহস্বামীর নিকট পরে প্রকাশ পাইল যে, একজন চাকরাণী সম্ভবতঃ বাড়ী ভুল করিয়া একশত বড় বড় তপ্‌সে মাছ দিয়া গিয়াছে, এবং সে সময় বাড়ীতে শুদ্ধ রাঁধুনী ব্রাহ্মণ থাকায়, সেও বিনা-ওজর-আপত্তিতে সেগুলি রন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আহারাদির পর পান চিবাইতে চিবাইতে কেনারাম বাবু গৃহস্বামীকে বলিলেন, "কালীপ্রসন্ন বাবু! আজ আপনি মহিষের শৃঙ্গ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আপনার উপাধিটা কি ভাল মনে হচ্চে না।

কালী। "দে"।

শ্রীঅঃ—

আমি।

বৈশাখী পূর্ণিমা। প্রকৃতির রূপ-খানি আজ বড়ই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। মাঝের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, চারিদিক ধৌত করিয়া যেন প্রকৃতিকে নববেশ পরিধান করাইয়াছে। ছোট বড় গাছ-পালা গুলি জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া আর্দ্রবসনা সদ্যস্নাতা কুমারীদের মত এক অভিনব সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একখানি শাদা মেঘ, আকাশের গায়ে পথ হারাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এমন নিস্তব্ধ নিশীথে আমি আমার একটি গৃহে, জরা-ভার-গ্রস্ত টেবিলের সম্মুখে একখানি জীর্ণ এবং অসংখ্য ছারপোকা-পরিবেষ্টিত পৈতৃক চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া কত কি ভাবিতেছি। মানব-প্রাণের কাতরতা, মনুষ্য-হৃদয়ের স্বার্থপরতা, প্রাচীনের গাম্ভীর্য্য, যৌবনের চাঞ্চল্য, বালিকা-হৃদয়ের সরলতা, যুবতীর রূপ-মাধুরী, হৃদয়ের নৈরাশ্য, শিশুদের মৃদুহাস্য, —কত কি ভাবিলাম। শৈশবের সুখ-স্মৃতি, বালিকার প্রেম, সুখের আবেশ, বিষাদের দীর্ঘশ্বাস, জীবনের পরিণাম ইত্যাদি মাথামুণ্ড কত কি ভাবিলাম। চিন্তা-সমুদ্রে একটীর পর একটী, এরূপ কত তরঙ্গ যে হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল—কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। হঠাৎ

ছারপোকা-বৃন্দের দৌরাত্ম্যে চমক্ ভাঙ্গিল। দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, দেহখানি ঘর্ম্মে ভাসিয়া যাইতেছে। নিদারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ অসহ্য হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া মুক্ত-বাতায়ন-তলে আশ্রয় লইলাম। জ্যোৎস্না-ধৌত মেঘমুক্ত নীলিমার পানে চাহিয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল "আমি" কে? "আমি" কি? "আমি" র মূল্য কত? জগতে সকলেই আমিত্ব-সম্পন্ন। সকলেই "হাম বড়"। তবে কেমন করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করি, "আমি" র মূল্য কত?

রাজ-সিংহাসনে বসিয়া রাজা ভাবিতেছেন, আমিই আমি। আমি সকলের জীবন-রক্ষক, শান্তি-রক্ষক। আমিই সকলের হর্ত্তাকর্ত্তা, জীবন-রক্ষার বিধাতা,—অতএব সংসারে আমিই একমাত্র আমি। মন্ত্রণা-গৃহে মন্ত্রী মহাশয় ভাবিতেছেন, আমারই বুদ্ধিবলে এই বিপুল রাজ্য নিরাপদে চলিতেছে; অতএব সংসারে আমিই একমাত্র আমি। দুর্গে বসিয়া দীর্ঘ-শ্মশ্রুরাশি নাড়িতে নাড়িতে সেনাপতি মহাশয় ভাবিতেছেন, আমারই ভীম পরাক্রমে এই বহুল বিস্তৃত রাজ্য-খণ্ড অখণ্ড-প্রতাপে শাসিত হইতেছে; অতএব আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আমি। দুর্গে বসিয়া আবার সামান্য সৈন্যও ভাবিতেছে, আমারই সাহায্য লইয়া সেনাপতির আস্ফালন, নৃপতির সিংহাসন; অতএব আমিই এ বিশ্বে একমাত্র আমি।

এদিকে ধনী বৃহৎ শকটারোহণে, রাজপথ কাঁপাইয়া, পথিকের কর্ণ বধির পূর্ব্বক গমনের সময় যথাসাধ্য আপনার বক্ষ স্ফীত করিয়া ভাবিতেছেন, আমার মত অর্থ কার? আমার দর্শন-লাভে কত লোকে বঞ্চিত, আমার সহিত পরিচিত হইবার জন্য কত ভদ্রসন্তান লালায়িত; অতএব আমি এ জগতে একমাত্র আমি। আফিসওয়ালা বাবু দুই বৎসর হইতে বেতনের কিছু কিছু, সংসার খরচ বাদ, উদ্বৃত্ত রাখিয়া আসিতেছিলেন; অদ্য তাহা দ্বারা "তারাহার" গড়াইয়া আনিয়া প্রিয়তমার গলদেশ শোভিত করিলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রাণাধিকার রক্তিম অধরে সস্নেহে গুটি দুই চুম্বন করিয়া ভাবিলেন,—আমার মত প্রণয়িনীর চিত্তরঞ্জন করিতে এমন আর কে পারে? আমার মত এমত সুরসিক কয়জন আছে? অতএব আমিই এ বিশ্বে একমাত্র আমি। সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়, নেত্র বিস্ফারণ পূর্ব্বক ভাবিতে-ছেন, আমি মসী-যুদ্ধ করিয়া, রাজার অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা করিতেছি, দেশের উন্নতি করিতেছি, চারিদিকে সভা-সমিতি বসাইতেছি,

আমার মত এমত স্বদেশ-হিতৈষী কে?—আমিই এ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আমি। গ্রন্থকার ভাবিতেছেন, আমি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে জ্ঞানালোকে লইয়া যাইতেছি, তাহাদের চরিত্র-গঠনের জন্য প্রাণপণ করিতেছি, অতএব আমিই ত্রিজগতে একমাত্র আমি। এদিকে পুস্তক হস্তে লইয়া, বিদ্যালয়ের ছাত্র ভাবিতেছে, আমি ইংরাজী জানি, সংস্কৃত জানি, লাটিনও শিখিতেছি; সেক্সপীয়ার বুঝি, কার্লাইলের রচনার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, স্কটের উপন্যাস পড়িতে ভালবাসি, সংস্কৃতের প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখাই, বাঙ্গালা-ভাষাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া ঘৃণা করি, ইংরাজী ভালরূপ বুঝি আর না বুঝি, ইংরাজীতে বিশেষ সুশিক্ষিত বলিয়া সাধারণের নিকট গর্ব্ব প্রদর্শন করি;—অতএব আমিই এই নিখিল-সংসারে একমাত্র আমি। আবার এদিকে কৃষক হাল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতে যাইতে ভাবিতেছে, আমি সকলের অন্নদাতা, আমি না থাকিলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও আহার জুটিত না,—অতএব আমিই একমাত্র আমি।

এইত ব্যাপার! সকলেরই—রাজা হইতে কৃষকের—আমিত্বে সমান দাবী। হায় "আমি"! কেমন করিয়া তবে আমি তোমার মূল্য নির্ণয় করি। সকলেই আমি, আমি, করিয়া ব্যস্ত অথচ এ পর্য্যন্ত আমিত্বের মূল্য স্থির হইল না। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় ঢং করিয়া ঘড়িতে একটা বাজিল—বুঝিলাম রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। শয়ন করিবার মানসে গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া পালঙ্কের নিকট আসিলাম। অস্পষ্ট দীপালোকে প্রিয়তমার সুপ্ত মুখখানি কি সুন্দর দেখাইতেছিল! মুগ্ধ চিত্তে দাঁড়াইয়া ক্ষণিক তাহাই দেখিলাম। আমার আমিত্ব-তত্ব নির্ণয় করা আর হইল না। শয়ন করিতে যাইতেছি, প্রদীপটা নিবিয়া গেল। আমারও সেই সঙ্গে মনে হইল, "আমি" কে ঠিক হইবার আগে, মানবের জীবন-প্রদীপটাও বুঝি এইরূপে নিভিয়া যায়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

মানসী।

অতি দূরে কে আমায় ডাকিল রে?
সুধা-স্বরা কার্ বীণা বাজিল রে?
কার্ মধু হাসি
সমীরণে ভাসি'
আসিল রে?
হৃদি মাঝে কে আমায় ডাকিল রে।

ঝলসিত পরকিতি রবিকরে,
তপ্তবায়ে তরুচয় মরমরে,
যত ফুল রাণী
মর্ম্মে ব্যথা হানি'
ঝরিছে রে!
আকুলিত কে আমায় ডাকিল রে!

মধুমাসে মুকুলিত সহকারে,—
থাকি' থাকি' পিককুল ডাকিছে রে;
কার্ বাণী শুনে
শত ভাব মনে
জাগিল রে!
সুধামুখে কে আমায় ডাকিল রে!

কার্ কেশপাশ নবনীত করে,
পড়িছে এলায়ে ফুলবপু'পরে,
কার্ মধুমুখ
জাগি' সব দুখ
হরিল রে?
মনপুরে কে আমায় ডাকিল রে!

ছল ছল কার আঁখি মাগিছে রে,
স্নেহপ্রীতি দান হায় নীরবে রে?
গাহিছে কে গান
মৃদু মধু তান
বসন্তেরে!
হৃদি মাঝে কে আমায় ডাকিল রে!

স্বপনে কি পেনু ফিরে হারান' তারে!
জাগরণে হেরি কারে হৃদয়-দ্বারে?
আজনম ধরি যারে
খুঁজিয়াছি বারে বারে,
সেই কি আসিয়া আজি
মরমের মাঝে
সরম-অরুণাধরে ডাকিল মোরে?

ধরণীতে পাব কি গো পরশে তারে?
স্বপন-গোধূলি-ছায়ে হৃদয়ে যারে,
দেখিনু মধুরতম
মুগ্ধনববধূ সম
অধরে হাসিটি চাপি'
নয়নে রহস্য!
পরশে পাবনা কি গো প্রাণের তারে?

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

অদল-বদল।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্মশান।

(দৈবজ্ঞ।)

দৈ। চলে আয় রে তাল বেতাল ;
ঘোর আঁধারে নিশুতি কাল।
পশু-পক্ষী সব ঘুমিয়ে আছে ;
এই বেলা আয় আমার কাছে।
সময় যে নাই, আয়রে চ'লে ;
শ্মশান মাঝে মড়ার পালে।
আমার কাযে হেলা ফেলা ;
কল্লে দিব বিষম জ্বালা।

(নেপথ্যে)

প্রভু তোমার শুনতে কথা,
এই যে আমরা দাঁড়িয়ে হেথা।
একবার হুকুম দিলে মুখে,
অসাধ্য কায সাধ্‌ব সুখে।

দৈ। ভাল তবে শোন—আমার আদেশ পালন করতে দেরী ক'র না। কারণ আজ রাত্তির শেষ হ'বার আগেই আমার উদ্দেশ্য সাধন করা চাই। অঘোরকুমোরের স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে ঐ জমিদারের স্ত্রী রাণীর আত্মার বদল ক'রে দিতে হবে। ওরা দুজনে যখন অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমুবে, সেই সময়ে ওদের অজান্তে পরস্পরের আত্মা এমন ক'রে বদ্‌লে দিতে হবে, যাতে কুমোরের স্ত্রীর ভাব রাণীর মত হ'বে, আর রাণীর ভাব কুমোরের স্ত্রীর মত হ'বে।

(নেপথ্যে) আমরা আপনার এ সমস্ত আদেশ যত্নের সহিত পালন

ক'র্ব। মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ, আর ঝড়ের সাহায্যে এখনই আমরা আপনার কায সাধন করতে চল্লেম। ।

(দৈবজ্ঞের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কুম্ভকারের গৃহ।

(এক পার্শ্বে শয্যা ও অপর পার্শ্বে প্রতিমার কাঠামোয়
অঘোর খড়বন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত।)

অ। উঃ রাত্তিরে কি ঝড়—ঠিক যেন ভূতের উপদ্রব! আমার জীবনে কখন এমন ডাক শুনিনি। আমার মনে হ'ল, যেন আমাদের ঘরের চাল খানা উড়ে গেল আর কি! কিন্তু এখন চারিদিক পরিষ্কার—শুক্‌তারা উঠেছে—ভোর হ'য়ে এল। তাই আমিও উঠে এই কার্য্যে লেগেছি। লোকে বলে, শীতকালে ঝড় হয় না—এখনকার সব আশ্চয্যি।

গীত।

দেব-প্রতিমা গ'ড়ে তুলি আমরা যতনে,
আমাদের কায সবার সেরা বিদিত ভুবনে।
কুমোরেতে হাঁড়ি গড়ে, তাই ত লোকের রান্না চড়ে,
সবার প্রাণ আছে ধড়ে, মোদের কাযের গুণে।

(রাণীর আত্মাপ্রাপ্তা অঘোরের স্ত্রী শয্যা হইতে)

রাণী। কেরে এখানে গান গাইচে। না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। আমার ঘুম ভাঙ্গাতে এত সাহস কার? জানিস্, আমি তোর পিটের চামড়া তুল্'ব!

অ। আমরণ! মাগী ঘুমন্ত বক্‌চে না কি? এখনও আজ উঠ্'ল না। (প্রকাশ্যে) অরে বৌ, ম'রে ঘুমুচ্চিস্ না কি? বেলা হল যে, ওঠ্ শীগ্‌গীর।

রাণী। গাধার মতন চেঁচাচ্চে কে? আমার চাকররা সব গেল কোথা? ওরে কে আছিস্—এ বদ্‌মাইস্‌টাকে বার ক'রে দেত।

অ। এ আবার কি! বড় বুদ্ধি দেখ্‌চি যে! ভূতুড়েটা কিছু খাইয়ে গেল না কি? মনে করেছিনু, মাগীকে একটা নাকচাবি গড়িয়ে দিব—

রাণী। কি আশ্চয্যি, এখনও কেউ এল না—কেউ এলে এ পাজীটাকে ধ'রে শাগে মুখ রগ্‌ড়ে দিতে বলি।

অ। পাগলি এখনো দেখ্‌চি ঘুমুচ্চে।—ভূতুড়ে ব'লেছে—তার গাড়ী হবে—তাই স্বপ্নে বুঝি সেই সব দেখ্‌চে।

গীত।

হতেম যদি আমি রাজা, কর্ত্তেম তোমায় রাণী,
আদর ক'রে গড়িয়ে দিতেম কাণের চৌদানী।
অমনি তুমি মানের ভরে, চলে যেতে বাপের ঘরে,
বিরহেতে থাকতেম জ'রে, খেয়ে লাল পানি।

রাণী। এ কি! রাজা তুমি কেন আমাকে অপমানিত হ'তে দিচ্চ। স্বামী হ'য়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে না কে?

অ। আমরণ! সোয়ামী—রাজা—আমার আবার রাজ্য হ'ল কবে? এ মাগী যে আমার জাত, ব্যবসা, নাম, সব উল্‌টে দিলে!

রাণী। তাই ত! রাজা এখানে নাই—হা ভগবান্, আমি কোথায়? উঁ হুঁ হুঁ, কিসের দুর্গন্ধ—বিছানায় চট পাতা যে—ছেঁড়া কাল' মশারি—ছেঁড়া কাঁথা, আমি কি জেগে আছি? না স্বপ্ন? ও পাজীটা ওখানে কে ব'সে? আমি কোথায়? কে আমাকে এখানে এনেছে? তুই কেরে বোকা?

অ। কি আশ্চয্যি! আমি ত কখন এর কাছ থেকে এমন সব মধুর কথা শুনিনি। দেখ্‌চিস্ এই হাতে দড়ী রয়েছে। দাঁড়া, তোকে দেখাচ্চি—তা' হলেই আমাকে চিন্‌তে পারবি।

রাণী। কি আশ্চর্য্য! তুই আমার স্বামী নাকি? দেখ্ তোকে আমি ফাঁসি দোব। আমি রাণী—কেউ আমাকে কিছু খাইয়ে এই বদ্ খৎ জায়গায় এনেছে। তুই জানিস্ ত বল্, কে আমাকে এখানে আন্‌লে?

অ। এ মাগী বলে কি? নিশ্চয় ঘুমের ঘোর।—তোকে কি ভূতে পেয়েচে, না এখনও ঘোর কাটে নি?

রাণী। আমি কোথায়? রাজা আমাকে কোথায় এনেছে? আমার দাস,

দাসী সব গেল কোথায়? পদী—পদী—চাঁপা—চাঁপা—কৈ কেউ যে সাড়া দেয় না।

অ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, এ মাগী আবার দাসী খুঁজ্‌চে। ভূতুড়ে দেখ্‌চি একে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

রাণী। ও লোকটা ভূতুড়ের কথা কি বলে? আমাকে কি তবে ভূতে পেয়েছে—কি আপদ—আমি করি কি?

(নেপথ্যে রাখালদিগের বাঁশীর শব্দ।)

অ। শোন্—রাখালরা সব মাঠে গরু নিয়ে যাচ্চে। আর বিছানায় প'ড়ে থাক্‌তে হ'বে না—ওঠ্—কায কর্ কায কর্—কাদাগুলো ভাল করে মেখে দে। নইলে এই দড়ি দেখ্‌ছিস্—তোর পিঠের চাম্‌ড়া তুল্‌বো। আমি তোর দু'ঘণ্টা ভোরে উঠে কায কচ্চি—আর তুই এখনও বেহুস প'ড়ে আছিস্?

রাণী। কিরে মূর্খ বদ্‌মাইস্—আমাকে চিনিস্ নি?

অ। তোকে চিনিনি—তোকে বেশ চিনি—এই তোকে এইবার চেনাচ্চি আমি কে?

রাণী। আমি রাজার স্ত্রী রাণী, আমি এখানে এলুম কি ক'রে?

অ। রাজার স্ত্রী—রাণী—বাঃ বাঃ—ওরে তুই এখনও তত মন্দ ন'স্। সে মাগীটা বড় বদ্—যা'কে তা'কে ঠেঙ্গায়—আর লোকের শাপ মুন্যি কুড়োয়। কাল্‌কে আমি তা'র চাক্ষুষ ফল পেয়েছি—তাকে আর এ জন্মে ভুল্‌চিনি বাবা।

রাণী। নাঃ আমি আর এখানে টেঁক্‌তে পাচ্চিনি—পাজি নচ্ছার, দাঁড়া, তোকে ভাল সহবৎ শেখাচ্চি। (রাণী রাগিয়া বিছানা বালিশ প্রভৃতি ছুঁড়িয়া অঘোরকে মারিলেন)

অ। (অবাক্ হইয়া) এ কি রকম হ'ল। আমি কখনও একে এমন করতে দেখিনি—এক দিনও আমাকে একটা মন্দ কথা বলে নি। দাঁড়া, আমি তোর ধাত ঠিক ক'রে দিচ্চি। ওষুধ ভিন্ন তুই শোধ্‌রাবিনি। (দড়ির দ্বারা প্রহার ও রাণীর পলায়ন)

রাণী। আমি তোর টুঁটি এখনই ছিঁড়ে ফেল্‌চি—তোর চোক উপ্‌ড়ে দিচ্চি—কে আছিস্ রে! আমায় মেরে ফেল্লে গো মেরে ফেল্লে—দেখ্ এজন্যে রাজা তোকে ফাঁসি দেবে—খুন্ খুন্।

অ। থাম্, পাগ্লামি রাখ্—কাদাগুলো বেশ চট্‌কে চট্‌কে মাখ্। তুই ত কখনও এমন করিস্ নি? যা'—কায কর্—কি, কর্‌বিনি? তবে দেখ্—(প্রহার।)

রাণী। থাম, থাম, যা' বল্‌বে, তাই করব।

অ। আমি বলেছিনু তোকে ধাতে আন্‌ব—যা' কাদা মাখ্‌গে।

রাণী। (কাদার তালের দিকে যাইতে যাইতে স্বগত) কি করি—আমি ত কাদা মাখ্‌তে জানি নি।

অ। বেলা হ'ল দোকান ঘরে বসিগে। (পাশের দোকান ঘরে যাইয়া)

গীত।

বলিহারি বিধির বিধি বুঝ্‌তে কেবা পারে?
মাগীগুলোয় গড়্‌লে কেন এতই ভাল করে।
এমনি বিধির মজার খেলা, সদয় যত তাদের বেলা,
দাড়ি গোঁপের দেয়নি জ্বালা, চাঁদ বদনের' পরে।
যতই তারা হ'কনা কালো, তাইত তাদের লাগে ভালো,
তারাই এসে জ্বালে আলো, মোদের আঁধার ঘরে।

মাগীটার দেখ্‌চি আজ মাথা খারাপ হ'য়েছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুই দ... মাখ্‌তেও ভুলে গেলি।

রাণী। দৌড়তে ভুলিনি—এই দৌড়লাম—আঃ তোর হাত থেকে বাঁচ্‌লেম। (প্রস্থান।)

অ। তাই ত! দৌড়ল কেন? আমাকেও পিছনে পিছনে যেতে হ'ল দেখ্‌চি। (প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জমিদারের শয়ন কক্ষ।

(শয্যা'পরি রাণীর মূর্ত্তিধারিণী অঘোরের বৌ।)

বৌ। আজ রাত্তিরে কি সুখেরই স্বপন দেখেছি—আমার মনে হ'ল আমি স্বর্গে—ফুলের বিছানায় শুয়ে র'য়েছি—আর মনের মতন সোয়ামী—যেন

দেবতা আমার পাশে শুয়ে র'য়েছে। আঃ—আমি এখন কোথায়? এ সমস্ত দুর্গন্ধ কোত্থেকে এল? বসন্তের কোন ফুল-বাগানে এমন গন্ধ কখনও থাকে না। আমি কোন বিছানায় আছি না কি? এ যে মখমল-পাতা বিছানা। এ কি! আমার গায়ে এত হীরা-মুক্তার, সোণার গহনা এল কোথা থেকে? আমি যে রেশমী কাপড় প'রে র'য়েছি! হা ভগবান্, আমি স্বপ্ন দেখ্ছি নাকি? যদি যথার্থ স্বপ্নই হয়, আমি জাগ্‌তে আর চাইনি। নিশ্চয়ই রাত্রিরে ম'রে গিয়েছি, আর স্বর্গে এসেছি—এই সেই স্বর্গ।

(চাঁপার প্রবেশ।)

চাঁ। (স্বগত) আমাদের রাণীকে ঘুম থেকে উঠানও যা'—আর জল্‌জ্যান্ত বিপদ ডেকে আনাও তা'। আর সে বিপদ থেকে রাত-দুপুর না হ'লে নিস্তার পাবার যো নাই। প্রথম কথাই হ'বে—হতভাগী, লক্ষীছাড়ী—আরও কত কি। (প্রকাশ্যে) রাণী মা—রাণী মা—

বৌ। (স্বগত) একি রকম হ'ল? হা, ভগবান্, ইনি কে? (প্রকাশ্যে) কি ব'ল্‌চ গা তুমি?

চাঁ। (স্বগত) আজ কার মুখ দেখে উঠিচি—আজ আমার কপালটা ভাল। (প্রকাশ্যে) আজ কি কাপড় প'রবেন?

বৌ। (স্বগত) মানে কি? রাণী—কি কাপড় প'র্‌বেন?—আমি কি তবে জেগে আছি?

চাঁ। আপনি কি এখন কোন কথা কইবেন?

বৌ। হাঁ বাছা, ব'ল্‌চি, আমি কাল যা' প'রেছি, তাই প'র্‌ব।

চাঁ। (স্বগত) আমার উপর দয়া! কৈ বাছা ব'ল্‌তে ত কখন শুনিনি? কি আশ্চয্যি!

(পদ্মর প্রবেশ।)

প। (চাঁপার প্রতি) রাণী উঠেছেন কি? দু' এক ঘা খেয়েচিস্‌ না কি?

চাঁ। (জনান্তিকে) আমার আজ খুব আহ্লাদ হ'য়েছে—আজ মেজাজ বড় সদয়। যাও, কাছে গিয়ে কথা ক'য়ে দেখগে না কেন। আমি এত ভাল মানুষ হ'তে ওঁকে একদিনও দেখিনি।

প। (জনান্তিকে) হাঁ—এখন আমার পালা বটে—মেরে ধরে দাঁত উপ্‌ড়ায় বা আমার। (নিকটে যাইয়া) রাণী মা—

বৌ। (স্বগত) এ আবার কি চায়? (প্রকাশ্যে) তুমি কি ব'ল্‌ছ বাছা?

প। আজ কি কি কায কর্ব্ব।

বৌ। কাজ ব'ল্‌ছ বাছা—তা' এখন আর কি কায ক'র্ব্বে—এখন তোমাদের ছুটী।

প। (স্বগত) আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখ্‌চি! ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন—কি সুখের দিনই আজ! (প্রকাশ্যে) আপনার গরম জল এসেছে।

বৌ। (স্বগত) এ আবার কি? আমি ত জানিনি, এর কি দরকার? (প্রকাশ্যে) রেখে দাও।

প। তবে কি এখন মুখ ধোবেন না? জল যে আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

বৌ। তা' হ'ক।

(রাঁধুনী বামুনের প্রবেশ।)

রাঁ। (স্বগত) খাবার কথা জান্‌তে যাচ্চি—অদৃষ্টে আজ কি আছে যে, বল্‌তে পারিনি। হয় ত কত গাল মন্দ দিয়ে ব'স্‌বে।

প। (জনান্তিকে) আজ আমাদের রাণীকে নতুন মেজাজ দেখে আশ্চয্যি হ'য়ে যাবে।

রাঁ। (জনান্তিকে) তোরা পাগল হ'য়েচিস্ না কি?

চাঁ। রাণী মা, আজ কি রান্না হ'বে, বামুন ঠাকুর জান্‌তে এসেছে।

বৌ। (স্বগত) রাধুনী বামুন ত দেখচি বেশ ভালমানুষ। (প্রকাশ্যে) এ আর আমাকে কি জিজ্ঞেস ক'র্‌তে এসেছ? যা' ভাল হয়, রাঁধগে—এই বেগুন পোড়া, শাক চচ্চড়ি, কুলের অম্বল—

রাঁ। (স্বগত) আজ এ কি কথা? আমার মাথা ঘুর্‌চে—"বামুন ঠাকুর" উঃ, কি মিষ্টি কথা! আজ একবারও অন্ততঃ বদ্‌মাইস্ কি হতভাগা ব'ল্লে না। এদিকে খাবার যেমন উল্টে গিয়েচে—মেজাজটাও দেখ্‌চি তেমনি বদ্‌লে গিয়েচে। (প্রকাশ্যে) এ সব ব্যঞ্জন কি আপনার শরীরে সহ্য হ'বে? যদি অসুখ করে—আমি বলি কালিয়া, কোপ্তা, পায়েস, আর আর ভাল ভাল জিনিস তৈয়ার করিগে।

বৌ। (স্বগত) এ সবের নাম ত কখন শুনিনি। (প্রকাশ্যে) তা বেশ, তুমি যা' ভাল বুঝ, তাই রাঁধগে।

রাঁ। আজ কি মিষ্টি কথা! এমনটি এক দিনও দেখিনি। (রামার প্রবেশ) (জনান্তিকে) রাম দাদা! আয় ভাই, আজ একবার কোলাকুলি-

করি আর—আজ একবারে আমি হারিয়ে গিয়েছিরে। আমাদের রাণী আজ একবারে মাটীর মানুষ—আর তেম্‌নি মিষ্টি কথা—একবারে দয়ার শরীর!

রাঁ। (জনান্তিকে) তোরা সকলেই ক্ষেপিচিস দেখ্‌চি যে,—চাঁপা আর পদ্মকেও আজ যে বড় খুসী দেখ্‌চি—ব্যাপারখানা কি?

চাঁ। রাণী-মা, রামদাস এসেছে—আপনার কি আন্‌তে হ'বে?

বৌ। রামদাস—তা' আজ আর তোমাকে কিছু আন্‌তে হবে কি?

রাঁ। (স্বগত) রামদাস!—তোমাকে!! কি আশ্চয্যি, আমি যে একবারে অবাক্ হ'য়ে গিয়িছি। (প্রকাশ্যে) আমি বল্‌চি কি রাণী-মা, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা, আর আর সব মেওয়ার জিনিস না আন্‌লে আপনার জলযোগ হ'বে কেমন ক'রে?

বৌ। (স্বগত) উঃ, এমন নাম মুখে আনাই কি শক্ত! (প্রকাশ্যে) তোমাকে আর কি ব'লে দিব রামদাস, যা' ভাল বুঝ্‌বে, তাই আন্‌বে।

রাঁ। (স্বগত) আজ যে রকম গতিক দেখ্‌চি, আকাশ বা ভেঙ্গে পড়ে।

বৌ। (স্বগত) আমি জেগে আছি কি না, বিশ্বাস ক'ত্তে পাচ্চিনি। এরা সকলে কত আহ্লাদ ক'রে আমার হুকুম শুন্‌লে। সুখেতে আমার মাথা ঘুর্‌চে।

গীত।

কুমোর-বৌ যে ছিলেম আগে হ'লেম রাজরাণী।
ভাগ্যের লিখন্ কখন কেমন কিছুই বুঝিনি।
এত সুখের কোলে ব'সে, প্রাণটা তবু কাঁপ্‌চে ত্রাসে,
আবার কি যে ঘট্‌বে শেষে, ভাবতে পারিনি।
না জানি আজ আমার লেগে, কুমোর কত উঠ্‌চে রেগে,
কাজ নাই এ বিলাস ভোগে, হব কুমোরণী।

(প্রস্থান।)

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। আজ যে বড় সব আশ্চর্য্য দেখ্‌ছি।

চাঁ। এমন একদিনও ঘটেনি মহারাজ! আপনি এ সব দেখে একবারে আনন্দে অধীর হ'বেন, আর অবাক্ হ'য়ে যাবেন।

রাজা। তোরা পাগল হ'লি না কি—আজকের ব্যাপার কি? আজ যে তোদের সকলেরই নতুন ভাব দেখ্‌চি—এর মানে কি?

রা। মহারাজ, আজ আমাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলেই উল্টে গিয়িছি—আজ আমরা সকলের চেয়ে সুখী।

চাঁ। আমাদের রাণী গো আমাদের রাণী—

রাজা। ম'রেচে না কি?

রা। মরেচে! কি সর্ব্বনাশ! ঈশ্বর না করুন, তিনি এখন সব চেয়ে ভাল লোক—আর একবারে গঙ্গাজল।

রাজা। এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা! আমি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি সত্যি কি না? যদি সত্যি হয়, তা' হলে বড় মঙ্গলের বিষয় বটে।

রা। আপনি আমাদের রাজা—আপনার সম্মুখে বল্‌চি, এ সব সত্যি—আজ সকলেই তাই ব'ল্‌চে—ভগবান্‌ আমাদের রাণীকে দীর্ঘজীবী করুন।

(সকলের প্রস্থান।)

(রাণীর দেহধারিণী কুমোর-বৌ'য়ের পুনঃপ্রবেশ।)

বৌ। আমার এখন বেশ মনে প'ড়্‌চে—সেই দৈবজ্ঞ আমাকে বলেছিল, যে, যা কিছু তোমার ঘট্‌বে, সব সহ্য কর্ব্বে। নহিলে আমার মন্দ হ'বে। আমি এখন কত লজ্জায় প'ড়েছি। আর এই সব সৌভাগ্য সম্পদ দেখে কিছুই ঠিক কত্তে পাচ্চিনি। আমি একবারে অবাক্‌ হ'য়ে গিয়েছি। এইমাত্র আর্শিতে মুখ দেখ্‌লেম—আমার এমন সুন্দর মুখ কৈ কখনও ত দেখিনি। আমার বাড়ীতে আমার আর্শিতে যেমন মুখ দেখেছিলেম—আজকে আমার মুখ ঠিক সেই রকমেরই নয়। শুনিচি বটে, বড় মানুষের আর্শিগুলোও খোসামোদ করে—যার যেমন মুখ, তার চেয়েও সুন্দর দেখায়। কিন্তু গরিবের আর্শিতে, যেমন মুখ, ঠিক তেমনি দেখায়।

(চাঁপার প্রবেশ।)

চাঁ। রাজামহাশয়ের বেড়ান হ'ল—এইবার তিনি এখানে আস্‌বেন।

বৌ। (স্বগত) ঐ সুপুরুষ ভদ্রলোকটী আমার সোয়ামী!

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। রাণি! আজ আমার পরিজনবর্গকে প্রফুল্ল দেখে আমিও বড় আনন্দিত হ'য়েছি।

বৌ। আপনি যাতে সন্তুষ্ট হ'ন্‌—আপনার পরিজনেরাও যাতে সন্তুষ্ট থাকে, সেই কাযই আমি ক'রব, আর সেই আমার সদাসুখ।

রাজা। আজ তোমার কথা শুনে, দোহাই বল্‌চি, আজ আমি মোহিত হ'য়েছি—তোমার এই মধুর কথা শুনে আজ আমি বড়ই সুখী হ'য়েছি। তুমি যদি আমার এমনই সুখের থাক, তা'হ'লে আমি স্বর্গ-সুখও চাই না। কিন্তু যা ব'ল্‌ছ, তা কি সত্য ?

বৌ। (জানু পাতিয়া জোড়-হস্তে) ভগবান্ জানেন, আমি সত্যই বল্‌চি।

রাজা। তুমি উঠ—আমি এখন বাস্তবিক সুখী।

বৌ। আজ আপনার কৃপায় আমি গরবিণী—যদি আমার উপর আপনি এইরূপ সদয় থাকেন, তা'হ'লে দেখ্‌বেন, আমি যাবজ্জীবন আপনাকে সুখী ক'র্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(কুম্ভকার-বধূর দেহ-ধারিণী রাণীর প্রবেশ।)

রাণী। আজ বিষম গোলমাল দেখ্‌ছি—রামা কোথায় রে পাজি।

রা। এ কি রকম হ'ল ? তুই কেরে ?

রাণী। পাজি, নচ্ছার কোথাকার—তোদের রাণীকে চিনিস্‌নি ?

রা। রাণী ?—এ পাগলীটাকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিলে কে ? বেরহ' পাগলী কোথাকার।

রাণী। গাধা, তবে দেখ্। (সম্মুখের দ্রব্যাদি রামার প্রতি নিক্ষেপ।)

(দ্বারীর প্রবেশ।)

দ্বা। সাবধান হ'—সাবধান হ'—তোর ভারী সাহস যে রে ! দাঁড়া, ঠিক্ ক'রে দিচ্চি।

রাণী। হ্যাঁরা চাঁপা, তুই নচ্ছারও কি আমায় ভুল্‌লি ?

চাঁ। কেরে মাগী কোথাকার, তোকে ভুল্‌ব কিরে ?—তোকে যে আমি জন্মেও দেখেনি।

রাণী। তবে রে পাজী বেটী, দেখাচ্চি, দাঁড়া, মনে পড়ে কি না ? এই দেখ্—(চুলের মুটী ধরিয়া চাঁপাকে প্রহার।)

চাঁ। মেরে ফেল্লে গো, মেরে ফেল্লে গো, শিগ্‌গির ধর গো ধর।

(রাজা ও রাণীর দেহধারিণী কুমোর-বধূর প্রবেশ।)

রাজা। কি হ'য়েছে—এখানে কিসের গোলমাল ?

রাণী। হাঁরে পদি—তুই বেটীও কি আমায় চিনিস্‌নি ? (প্রহার।)

পদ্ম। ধর গো ধর, দেখ আমাকে মারচে।

রাজা। এখন কি করা যায়?

রা। এ পাগলীটা বলে যে, এ আমাদের রাণী। আর সকলকে মারচে ধ'র্‌চে—জিনিষপত্রগুলো সব ভাঙচে, ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে।

রাজা। তুই রাণী—আমার স্ত্রী—আ হতভাগিনী! আমি ত তোকে কখনও দেখিনি।

রাণী। তবে এখন দেখ্‌চি, তোমার কাছে থেকেও প্রতিকারের আশা বৃথা। তুমিই এই সবের মূল।

বৌ। (স্বগত) এ কি রকম হ'ল? আমিও কিছু বুঝিতে পাচ্চিনি, আমার বড় ভয় হ'চ্চে। ওর যে দেখ্‌চি আমার মতন চেহারা—আমার মতন কাপড় পরা—আমি কি তবে ঐ? এই ভাল ভাল গহনা ও কাপড়ের মাঝে বাঁধা থেকে বড় গোলমালে পড়্‌লেম যে—আমি কুমোরের কাছে না হয় ফিরে যাই।

রাণী। আমি তবে কি ক'র্‌ব গো! আমি কাল যে ঐসব গহনা কাপড় পরেছিনু—তবে এ হ'ল কি? আমি কি তবে দু'জায়গায় র'য়েছি।

রাজা। হতভাগিনী একবারেই উন্মাদ!!

রাণী। তবে কি আমি এখানে আসবার আগে এখানে ছিলাম না? আচ্ছা, ঐ আর্শিতে আমার মুখখানা একবার দেখি। (আর্শিতে মুখ দেখিয়া) হরি, হরি, আমি একবারেই অবাক্! আমিই আমাকে চিন্‌তে পাচ্চিনি—আর্শিতে যে ছায়া দেখ্‌লেম, সে যদি আমার চেহারা হয়, তবে দেখ্‌চি আমি কখনও আমাকে দেখিনি।

রাজা। কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ—বিষম উন্মাদ।

(অঘোরের প্রবেশ।)

রাণী। ঐ পিশাচই আমার মুখ টুক সব বদ্‌লে দিয়েছে—ওকি আবার এখানেও এল!

অ। হাঁরে বৌ, এই এসেছিরে এসেছি—এই দড়ি এনেছি দেখ্‌ছিস ত?

বৌ। (স্বগত) আমার বড় ভয় হ'চ্ছে—কুমোর বুঝি এখনই আমায় মেরে ফেল্‌বে—ঐ ওপাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছে।

অ। মহারাজ! আপনি একে মাপ ক'র্‌বেন—কাল রাত্তিরে একজন ভুতুড়ে ওকে কি খাইয়েছে—আর সেই অবধি পাগল হ'য়ে বল্‌চে—"আমি রাণী।"

রাজা। আহা ও বড় দুর্ভাগিনী, ওকে যত্ন কর। ওকে যেন মের' না। তা'হ'লে অবশ্য আরাম হ'তে পরিবে।

অ। এই দেখুন না মহারাজ—এখনই আরাম ক'রে দি। বৌ, দেখ্‌চিস্‌ ত হাতে কি?

বৌ। আমি কিছু জানিনি গো আমায় মাপ কর।

রাজা। তুমি আবার কি ব'ল্‌চ—ওকে দেখে তুমিও কি পাগল হ'লে?

বৌ। আমার শরীরটা কেমন অসুখ অসুখ ক'র্‌চে। ঘরে যাই।

(রাণীর দেহ-ধারিণী বৌ ও পরিচারিকাদ্বয়ের প্রস্থান।)

অ। আপনি আমার উপর রাগ করবেন না—এ আর কখনও আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌তে আস্‌বে না।

রাজা। ওকে নিয়ে যাও—আর ওর প্রতি ভাল ব্যবহার ক'র।

রাণী। আমার কি হ'বে গো—(কুমোর-বৌয়ের দেহ-ধারিণী রাণী ও অঘোরের প্রস্থান।)

(দ্বারীর প্রবেশ।)

দ্বা। কাল রাত্তিরে যে দৈবজ্ঞ এসেছিলেন, তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাইচেন—বড় দর্‌কার।

রাজা। কি দরকার? আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এস।

(দৈবজ্ঞের প্রবেশ।)

দৈ। মহারাজ, আমি যে কাজ ক'রেছি, তা' প্রকাশ ক'র্‌লে আমার প্রাণ দণ্ড অবধি দিতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি ক্ষমা ক'র্‌বেন। যদি আজ্ঞা করেন, তা' হ'লে আমি সব বলি।

রাজা। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি—আপনার যা' ব'ল্‌তে ইচ্ছে হয়, ব'ল্‌তে পারেন।

দৈ। আমি আপনার স্ত্রীর উপর মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ ক'রেছি, সেজন্য আমি আপনার নিকট অপরাধী। এখন সে শক্তি-প্রয়োগ নষ্ট ক'র্‌তে চাই।

রাজা। তা' হ'লে দেখ্‌চি আমাকে আবার অসহ্য যন্ত্রণায় ফেল্‌তে চান্‌। তবে কি আমার সমস্ত সুখের আশা স্বপ্নে পরিণত হবে?

দৈ। সে ভয় আপনার নাই। যদি কোন ক্ষতি হয়, আমি প্রাণ দিতে রাজি আছি।

রাজা। তবে বলুন, আপনি কি ক'রেচেন?

দৈ। আমি আপনার স্ত্রীর আত্মার সহিত, আপনার প্রজা অঘোর কুমোরের স্ত্রীর আত্মার অদল-বদল ক'রেছি।

রাজা। তবে ত একবারেই সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। আমি আজ যে আশার উপর সুখের ঘর ক'রেচি—আপনি এক ঘাতেই যে তাহা ভূমিসাৎ ক'র্‌চেন। আবার কি আমি শাপগ্রস্তের মত দিন রাত জল্‌তে থাকব?

দৈ। ভাল, যদি তাই মনে করেন, তবে যে রকম আছে, সেই রকমই থাক্।

রাজা। না আমি তা' চাই না। আপনি আপনার মন্ত্র প্রভাব এখনই নষ্ট করুন।

দৈ। আমি এই নিমেষেই ক'র্‌চি—আর এই মুহূর্ত্তও আপনার জীবনের বড় শুভ মুহূর্ত্ত—আপনার স্ত্রীও শুধ্‌রে যাবে। আর কখনও নির্দ্দয় ব্যবহার কর্‌বে না। আমি তবে আমার মন্ত্র শক্তি প্রভাবে উভয়ের দেহ এখন পরিবর্ত্তন করে দিই গে, তা' হ'লেই যে যার আত্মা, সে সেই দেহ আবার পাবে। এখনই তার পরিচয় পাবেন।

(প্রস্থান।)

(অঘোরের প্রবেশ।)

রাজা। অঘোর তোমার বৌ কোথা?

অ। তাই ত মহারাজ—কোন্ দিকে যে ছুটে গেল দেখ্‌তে পাচ্চি না। আপনার ঐ দালানের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়্‌ল—তারপর নাকে গোটাকতক ঘুসি আর এই দড়ির ঘা' কতক দিতেই, উঠে যে কোথায় পালাল—ঐ যে এইদিকে আস্‌ছে। অ বৌ! কোথা গিয়িছিলি?

(কুমোরণীর পরিচ্ছদে রাণীর প্রবেশ।)

রাজা। এ যে দেখ্‌চি আমাদের রাণী।

অ। (স্বগত) রাজা বলে কি, কুমোরণীকে রাণী কর্‌তে চায়!

রা। (স্বগত) এ আবার কি হল? রাণীর প্রবেশ হল কেমন করে?

রাণী। আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর কখনও কাহাকেও কষ্ট দিব না—আমার ঢের শাস্তি হয়েছে—আবার আমাকে ভালবেসে এবার পায়ে স্থান দিন—যেন সোয়ামীর সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তেই ম'র্‌তে পারি—আপনার সুখেই আমার সুখ।

রাজা। উঠ রাণী উঠ, তোমায় আনন্দের সহিত আবার গ্রহণ ক'র্‌চি।

অ। এ আবার তা'র কি মরণ হ'লরে—আমি তবে তা'কে হারালুম?

(চাঁপার প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ পদ্মার আগমন।)

চাঁ। মহারাজ, একটা বড় দুর্ঘটন ঘ'টেচে—আর এত আশ্চর্য্যি যে, আমরা একবারে অবাক্ হ'য়েচি। রাণী ঘোর মূর্চ্ছা গিয়েছেন—আর চেতন হচ্চে না।

প। এখন আবার জ্ঞান এসেছে—কিন্তু চেহারা একবারে বদ্‌লে গিয়েছে।

অ। কি বাবা বদ্দিনাথের এঁড়ে হ'য়ে উঠ্‌ল নাকি?

(রাণীর পরিচ্ছদে কুম্ভকার-বধূর প্রবেশ।)

বৌ। আমার মাথা ঘুর্‌চে, আমি বাড়ী যাব—এই যে তুমিও হেথা আছ।

অ। হা ভগবান্—এই সুন্দরী কি তবে আমার স্ত্রী! ওর কাছে এখন যেতে যে আমার ভয় হচ্চে। আমি যে এ সবের কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি—ব্যাপার খানা কি?

রাজা। আজ এ পরিবর্ত্তন বড় সুখের! এ সুখের দিনে উৎসবের আয়োজন করা যা'ক্।

রাণী। আমার পক্ষে সব চেয়ে আজ সুখের দিন।

রাজা। অঘোর! তুমি তোমার ঐ সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে যাও।

অ। তাই ত মহারাজ—কিছুই বুঝলাম না—না জেনে শুনে—

রাজা। না, না; তোমার কোন চিন্তা নাই—অক্লেশে গ্রহণ কর—তোমাদের কল্যাণে আজ আমাদের এই সুখের দিন—তাই তোমাদের দশহাজার টাকা বকসিস্ দিচ্চি, নাও।

অ। ওঃ বাবা! আজ আমি দেখ্‌চি কুমোরের রাজা—আর আমায় পায় কে? আয় বৌ আয়, আর তোকে মার্‌বোনা।

বৌ। সত্যি গো, এই সব দেখে শুনে আমার পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে গিয়েছে। (রাণীর প্রতি) আপনার এই সব গহনা পত্র নিন্—

অ। দূর হাবি কোথাকার, থাম থাম—গহনাগুলো আবার খুলে দিতে যাচ্চে? জানেনা যে, ও গুলো থাক্‌লে কত সুবিধে?

রাণী। আমার ও গহনাপত্র সব তোমাকে দিলাম—আর তোমার এই শাঁখা, সাড়ী যা' এখন পরে র'য়েছি—যত দিন বাঁচব—আদর ক'রে—যত্ন ক'রে—ভক্তি ক'রে রাখ্‌ব। ঐ সব পরেই আমার স্বভাব শুধ্‌রে গেল—এতদিনে মানুষ হ'লেম।

অ। আমি অকারণ না বুঝে সুঝে আপনাকেই বুঝি মারধোর ক'রেছিলাম,—তা' আমার কোন অপরাধ নেবেন না।

রাণী। না, না, সে আমার মত লোকের উপযুক্ত পুরস্কার!—সেইজন্য বরং সুখী।

রাজা। অঘোর আজ থেকে তোমরা আমাদের বন্ধু হ'লে—এস তোমাদের সঙ্গে আহারাদি করিগে।

শ্রীরসময় লাহা।

কবিতা-কানন।

বাজে বাঁশী বনে শুধু, বাজেনা মরুতে হায়!

১

আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে,
সোণার প্রকৃতি-মেয়ে, আবার আইল ধেয়ে,
অনন্ত সুষমা-হাসি মাখিল আননে;
কোকিল ছাড়িল রব, মুগ্ধ নর নারী সব,
হাসিল বাসন্তী-উষা পূরব গগনে,—
আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে!

২

আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে,
সরসে ফুটিল ফুল, চুম্বনে মধুপ কুল,
আকুল হইয়া ছোটে পুলকিতমনে;
ধীরে ধীরে গন্ধবহ, হরষে সুরভি সহ,
হাসে বসি প্রণয়ীর মুক্ত বাতায়নে,—
আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে!

৩

আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে,
নির্ম্মল সরসী-জলে, সরোজিনী কুতুহলে,
চাহিল রবির পানে সপ্রেম নয়নে;

আনন্দে মরালদল, কাঁপা'য়ে সরসী-জল,
কত খেলা করে আহা, সোণার কিরণে,—
আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে !

৪

আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে,
মৃদুল হিল্লোল তুলি, উল্লাসে তটিনী-গুলি,
উঠিল নাচিয়া চন্দ্র-কর-পরশনে ;
নিরখি বিধুরে সুখী, সরোবরে বিধুমুখী,
বল্লরী সঁপিল মন, ভূরুহ-জীবনে,—
আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে !

৫

আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে,
নবীন নীরদ-বঁধু, লইয়া চপলা-বধূ,
খেলিতে লাগিল দূর-শূন্য-নিকেতনে ;
হইয়া আপনাহারা, কভু বর্ষে জলধারা,
কভু বা বিমল হাসি দেখায় ভুবনে,—
আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে !

৬

আবার বাজিল বাঁশী নিকুঞ্জ-কাননে,
প্রফুল্ল সবাই হায়, দহে শুধু অভাগায়,
তীব্র জ্বালাময় হায় কাল-হুতাশনে !
এসুখের (ও) দিনে মোর, নয়নে বহিছে লোর,
ভাসা'য়ে কপোল গণ্ড, তাহারি বিহনে,—
বাজিল না বাঁশী শুধু এঘোর বিজনে !

৭

নিকুঞ্জ-কাননে বাঁশী বাজিল আবার,
সাগর-তরঙ্গ রাজি, দিব্য আভরণে সাজি,
দুলিয়া দুলিয়া খেলে কোলে বসুধার ;
অভাগার শূন্য কোলে, কই ? সে ত নাহি দোলে,
অনিন্দ্য মাধুরী-রাশি ছড়া'য়ে তাহার ?—
বাজিল বাঁশরী যদি, কই সে আমার ?

৮

বাজিল না বাঁশী শুধু এ মরু-প্রদেশে,
ফুটিলনা ফুল আর, বিকশি' সুষমা তা'র,
এলনা প্রকৃতি-সতী মধুময় বেশে ;

বিমল বিধুর হাসি, আর না পরশে আসি,
গিয়াছে সে যেন কোন সুদূর বিদেশে,—
বাজিল না বাঁশী শুধু এ মরু-প্রদেশে!

৯

এ মেরু-প্রদেশে বাঁশী বাজিল না আর,
দিগন্ত ধ্বনিত ক'রে, কোকিল আসেনা ধ'রে,
মধুর সুকণ্ঠ-তানে বসন্ত-বাহার;
রঞ্জিত উষার রাগে, সে মাধুরী নাহি জাগে,
নাহি সে নীরদ-কোলে ছবি চপলার,
এ মরু-প্রদেশে বাঁশী বাজিল না আর!

১০

নীরব কাননে বাঁশী বাজিল না আর—
ল'য়ে সে উৎসব রাশি, লইয়া আনন্দ হাসি,
রেখে গেছে অশান্তির তীব্র হাহাকার!
নিরাশায় আজি আমি, লভিতেছি দিবা যামী,
তাহারি বিদায়-দত্ত অনন্ত আঁধার!
অভাগার কুঞ্জে বাঁশী বাজিল না আর!

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

কালিপ্সোর বিলাপ।*

১

কেমনে বহিবে হৃদি এই দুঃখ ভার,
হায় বিধি! কেন আমি হইনু অমর?
দুদিনের তরে এল, পরাণ কাড়িয়া নিল,
কেন গেল কাঁদাইয়া বল তবে কার,
ভাবনার এবে মোর শুধু অধিকার।

২

পলায়েছে প্রাণপাখী আমারে ছাড়িয়ে,
ভেবেছিনু মায়াজালে রাখিব বাঁধিয়ে;

---

* তেলেমাক নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, উলিসস্ জলমগ্ন হইয়া ওজিজি দ্বীপে উপস্থিত হন। ঐ দ্বীপাধিশ্বরী কালিপ্সো তাঁহাকে ৭ বৎসর স্বভবনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রস্থানে কালিপ্সো উপরোক্ত প্রকারে খেদ করিয়াছিলেন।

পূরিল না আশা মোর, পলাইল মন-চোর,
বিরহে কেমনে বাঁচি কাহারে হেরিয়ে,
শত হিংসা আজি প্রাণে উঠিছে জাগিয়ে।

৩

বিরাজে বসন্ত সদা এ রাজ্যে আমার,
সুমধুর সমীরণ বহে অনিবার,
বিকসিত উপবন, বিকসিত কুঞ্জবন,
শীতলে না এরা আর ব্যথিত অন্তর,
কেবল বিরহ ক্লেশ বাড়ায় আমার।

৪

রেখেছিনু সদা তারে নয়নে নয়নে,
হেরিতাম সদা তার চারু চন্দ্রাননে,
ভাবিতে পারি না আর, হেরি সব অন্ধকার,
কেমনে বাঁচিব প্রাণে তার অদর্শনে,
তাহার বিহনে সুখ না দেখি জীবনে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অশান্তি।

বিশাল এ বিশ্বমাঝে একটু কি কোথা ঠাঁই
মিলিল না তোর?
তাই এসে বসেছিস্ করিতে একাধিপত্য
হৃদি-রাজ্যে মোর?
রাতদিন হাহাকার, রাতদিন অশ্রুজল,
কোথা হতে আনি,
আমার এ ক্ষুদ্র রাজ্যে অভিষেক করি তোমা
কে বসালে রাণী?
কঠোর শাসনে তব হের সদা ভয়ে ভয়ে
ওই মৌনব্রত,
করিয়াছে সুখ শান্তি হাসি রাশী জীবনের
যাহা কিছু যত,
যেথানে নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার সাধের আশা
খেলিত গোপনে,

কোথা হ'তে জানিনাকো নিরাশা-রাক্ষসী আসি
গ্রাসিয়া সে ধনে,
পুজিতে ও পা-দুখানি চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি
মরম অনলে,
এখন বসেছে এসে হের ওই চুপে চুপে
তব পদ-মূলে।
রাত্রিদিন একাসনে ওই ধ্যান ওই জ্ঞান
ওরূপ সাধনা,
ও যেন যোগিনী মত নীরবে করিছে বসি
রুদ্র আরাধনা।
এ অনন্ত অস'নীয় দারুন কঠোর তপে
দেখ একবার,
আমার যে ছোট খাট শান্তি-পূর্ণ এ নগরী
হ'ল ছারখার।
যেখানে গাহিত পিক বহিত মলয় সদা,
সে সাধের কুঞ্জে,
আর ত ফোটেনা ফুল গাহিয়া মধুপ কুল
মধু নাহি ভুঞ্জে।
ছড়াইত দিশি দিশি স্নিগধ কিরণ রাশী
যে নন্দন ছায়,
চারি দিকে কালি-মাখা এখন বহিছে সেথা
শুধু তপ্ত বায়।
প্রতিপলে যেথা হতে উঠিত রে খাম্বাজের
মধুর নিঃস্বন,
থেমে গেছে সেই তান এবে আছে স্মৃতি টুকু
দগধিতে প্রাণ।
যে নির্জ্জন বনে বসি বিবিধ বরণ পাখী
নব নবশাখে,
একদা শুনাত মোরে কত আশা গীতিময়ী
কত অনুরাগে।
জীবন-জাহ্নবী-জল বহি যেত যেথা সদা
তর তর রবে,
এখন এ মরু দেশে নিভে গেছে সব ধ্বনি
দোঁহার প্রভাবে!

শ্রীমতী সুনীতিবালা ঘোষ।

বিবিধ।

বিলাতে কোন এক সভায় "খুনী আসামীর ফাঁসি হওয়া উচিত কি না" সম্বন্ধে একদিন একটী বক্তৃতা হয়। "ফাঁসির" সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পর তর্ক আরম্ভ হইল; তর্ক হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। এমন সময় সভাপতি মহাশয় সভ্যগণকে বলিলেন "দেখুন, মিঃ রবার্ট "ফাঁসির" সপক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, উহা বড়ই সারগর্ভ; বিশেষতঃ বক্তৃতার শেষ অংশটী বিলক্ষণ যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলিলেন যে, এ পর্য্যন্ত যত লোকের ফাঁসি হইয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার কেহই খুন করিতে দেখে নাই। শাস্তি প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য, লোকে যাহাতে পুনর্ব্বার সেই কার্য্য না করে। অতএব মিঃ রবার্টের এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার মতে ফাঁসি দেওয়া খুব ভাল।" একজন বহুদর্শী উকিল সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন বলিলেন, "আজ আমার চল্লিশ বৎসর ব্যাপী ব্যবসার অভিজ্ঞতা ফলে জোর করিয়া বলিতে পারি যে, মিঃ রবার্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এ পর্য্যন্ত এমন একটী মোকদ্দমা দেখি নাই, যাহাতে খুনী আসামীর ফাঁসি হওয়ার পর সে দ্বিতীয় বার খুন করিয়াছে।" তখন সর্ব্ববাদী-সম্মতি ক্রমে "খুনী আসামীর ফাঁসি হওয়াই উচিত" সাব্যস্ত হইল! এবং সভাপতি, মিঃ রবার্ট ও বৃদ্ধ উকিল মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল!

গুরু। তুমি যতই পাপী হও না কেন, নিশ্চয়ই বিবেক সময়ে সময়ে তোমায় পাপ ক'র্‌তে বারণ করে।

শিষ্য। তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনি ত জানেন, আমি কানে একটু খাটো।

বিচারক। (আসামীর প্রতি) কোর্ট, দণ্ডের অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

আসামী। হুজুর, আর কিছু না, তবে এই মাত্র বল্‌বার আছে যে, আমার উকিলের অল্প বয়সের দরুণ আমাকে যেন লঘু দণ্ড দেওয়া হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এবারে "চারুবালা" [illegible]ত হইল না, আগামী সংখ্যা হইতে পুনরায় নিয়মিত রূপে বাহির হইবে।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩০৮। [৮ম সংখ্যা।

প্রাচীন কলিকাতা।

(৩)

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা ভারতের প্রধান এবং প্রথম রাজধানী। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, এক ইংরাজ-রাজ ব্যতীত চৌদ্দ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত সমগ্র ভারত-ভূমি আর কাহারও ভাগ্যে একচ্ছত্ররূপে কখনও অধিকৃত হয় নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষকে এক সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার ফল যাহা ফলিয়াছিল, মহাভারত-পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। বৌদ্ধ-মহারাজ অশোককে অনেকে ভারতের সম্রাট বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজের ন্যায়, সমগ্র ভারতের উপর কি তাঁহার এরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ খাটিত? মুসলমানদিগের ত কথাই নাই;—যে মোগল সম্রাট্‌গণ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" বলিয়া আপনাদিগের গৌরব প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকেই রাজস্থান, দক্ষিণ

প্রদেশ, প্রভৃতিকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে যাইয়া পদে পদে কিরূপ নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছিল, তাহা কাহারও অগোচর নহে। কেবল, অদৃষ্টবশে, ভাগ্যবান্ ইংরাজ-রাজ আজ এই সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রাধিকারী অধীশ্বর প্রধান সম্রাট্, এবং এই মহানগরী কলিকাতা তাঁহার প্রথম রাজধানী। কিন্তু বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে ধরিতে গেলে কলিকাতাকে প্রথম হইতে ষষ্ঠ স্থানে নামিতে হয়। সেই হিসাবে, গৌড় প্রথম,—সে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু সে অতীত বিষয় আর মনে স্থান দিবার আবশ্যকতা নাই, আমরাও ইংরাজদিগের ন্যায় মনকে প্রবোধ দিবার জন্য তাঁহাদিগের ভাষায় বলি—"Let the past be past" বস্। রাজমহল দ্বিতীয়,—ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, শত নৃপতি এই নগরীতে বসিয়া বঙ্গ শাসন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা তৃতীয়,—প্রাচীন রোমান্‌দিগের সময় হইতে ইহার খ্যাতি-বিস্তার। চতুর্থ নদীয়া,—পাঁচশত বর্ষকাল ইহা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদ পঞ্চম, এবং কলিকাতা ষষ্ঠ। ভারতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী এবং প্রধান রাজধানী কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা সকলেই চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছেন; কিন্তু দুইশত বর্ষকাল পূর্ব্বে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল, এবং কিভাবে, কিরূপ গতিতে, ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কালিঘাট হইতে নগরের নাম কলিকাতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই যে অনেকের অনুমান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব-পর হইলেও তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে। ওলন্দাজেরা ইহাকে "গলগোথা" বলিত। কাহারও কাহারও মতে ১৭৪২ সালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ রোধ জন্য যে "খাল কাটা" হয়, সেই "খালকাটা" কথা হইতে "কলিকাতা" নামের উৎপত্তি। কিন্তু ইহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উলুবেড়িয়ায় রাজধানী স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হয়। ইহা ১৬৯০ সালের কথা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও (ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে) কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা বড় ভাল নহে। Hartley House নামক পুস্তকের লেখক কলিকাতার সেই সময়কার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "the grave of thousands, but

a mine of inexhaustible wealth." ঠিক কথা। ধনের তুলনায় প্রাণ ত তুচ্ছ; নতুবা, এত উই.পোকা (white-ant) কলিকাতাকে তৎকালে ছাঁকিয়া ধরিবে কেন?

কলিকাতার পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে অনেকের অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা। আমরাও সাধ্যমতে তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গের গোচর করিতে প্রয়াস পাইব। কিন্তু কথা হইতেছে, আরম্ভ করিব কোথা হইতে? প্রথমতঃ সহরের মোটামুটি পরিচয় হইতে আরম্ভ করিলে ভাল হয় না কি? তাহাই করা যাউক।

ধর্ম্মতলা। ইহা তখন কলিকাতার শেষ সীমা। অথচ না সহর, না উপনগর, দুয়ের বাহির। সাহেবেরা এই স্থানকে Avenue বলিত, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ কিছু নাম ছিল না। সহর হইতে বাদায় যাইবার ইহা তখন প্রধান রাস্তা ছিল। ইতি পূর্ব্বে, বাদা পর্য্যন্ত প্রবাহিত যে খালের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই খাল এই রাস্তা হইয়া ওয়েলিংটন পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। খাল পারাপার হইবার জন্য রাস্তার উপর একটি উচ্চ সেতু নির্ম্মিত ছিল। সেতুর দক্ষিণ অংশে কয়েকখান সামান্য গোল-পাতার ঘর এবং উত্তর পার্শ্বে Creek Channel নামে এক প্রণালী প্রবাহিত হইত। এখন তাহা বুজাইয়া যে রাস্তা হইয়াছে, তাহার নাম ক্রিক্ রো,—নামেই পূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ।

১৮২২ সালে সুরতি করিয়া ওয়েলিংটন পুষ্করিণী কাটান হয়। পূর্ব্বে ইহার চারিধারে জাহাজের খালাসীদের বাস ছিল। এখন কলের জল রাখিবার জন্য পুষ্করিণীর উপর খিলান গাঁতিয়া মাঠে পরিণত করা হইয়াছে। পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া খালের জল প্রবাহিত হইত বলিয়া পুষ্করিণীর জল সর্ব্বদা অপরিস্কৃত থাকিত। পুষ্করিণীতে প্রত্যহ জোয়ার ভাঁটা খেলিত। খালে নৌকা চলিত, পরিষ্কার রাখিতে পারিলে বড় নৌকা পর্য্যন্ত যাইতে পারিত। এখন সে সকলের আর কোন চিহ্ন নাই। রাস্তার উভয়পার্শ্বে যে বৃক্ষশ্রেণী ছিল, তাহাও লোপ পাইয়াছে। কুক্ সাহেবের আড়গোড়ার পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড জাফর নামক এক মুসলমানের সম্পত্তি ছিল; জাফর ওয়ারেন-হেষ্টিংসের সর্দ্দার খানসামা। ধন এবং ধর্ম্মানুরাগ উভয়ের সম্মিলন হওয়ায়, জাফর এই জমির উপর একটী সুবৃহৎ মস্‌জিদ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরে সেই সাবেক মস্‌জিদ্ ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমানটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

তখন মহরম পর্ব্বোপলক্ষে সারকিউলার রোডস্থিত মওলাওয়ালির দরগার (মৌলবি কি ?) পরিবর্ত্তে এই স্থানে মুসলমানগণ সমবেত হইতেন ; এবং সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে মহা সমারোহে করবলা হইত। এই জন্য পুষ্করিণীর নাম ধর্ম্মতলাও * এবং রাস্তার নাম তদনুযায়ী ধর্ম্মতলা রক্ষিত হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী স্বনামখ্যাত মতিলাল শীলের প্রসিদ্ধ বাজারের নামটা না করা ভাল দেখায় না ; বিশেষতঃ বাজারটী বয়সে যেমন প্রবীণ, এক কালে উহার শ্রেষ্ঠত্বের সেইরূপ দাবী দাওয়া ছিল। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান হগ সাহেব ঐ বাজারটী শীল বাবুদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। এই উপলক্ষে সহরে দশমাস কাল ধরিয়া তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল। শেষে Indian Daily News নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রের তদানীন্তন সম্পাদক মিঃ উইলসন সাহেবের চেষ্টায় শীল বাবুরা বাজারটী ফেরত পান। তৎপরে হগ সাহেব এদেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এই বাজারের পার্শ্বে এক সময় কোম্পানীর আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। অনেকের বিশ্বাস, বাজারের সহিত ধর্ম্মের নিকট সম্পর্ক বশতঃ রাস্তাটির নাম ধর্ম্মতলা রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নহে। জাফর সাহেবের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের “তলাও” এর সন্নিহিত বলিয়া রাস্তার নাম ধর্ম্মতলা।

এই সঙ্গে নেটিব হাঁসপাতাল (চাঁদনি হস্‌পিটাল) এর পরিচয়টা দিয়া লই। ১৭৯৩ সালে জন ওয়েন নামক এক মিসনরী এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম প্রস্তাব করেন। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় দেশীয়দিগের জন্য কোন সাধারণ চিকিৎসালয় ছিল না। ওয়েন সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী চাঁদা করিয়া চুয়ান্ন হাজার টাকার সংগ্রহ করা হয় ; এতদ্ভিন্ন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস তিন হাজার, কৌন্সিলের মেম্বরগণ প্রত্যেকে সাড়ে চারি হাজার এবং মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুর তিন হাজার টাকা দান করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বতন্ত্র মাসিক ছয়শত টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে দানের ব্যবস্থা করেন। ১৭৯৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর চিৎপুর রোডের উপর ইহা প্রথম স্থাপিত হয়, পরে ১৭৯৮ সালে ধর্ম্মতলা রাস্তার উপর স্থানান্তরের জন্য ভূমি ক্রয় করা হয়। তখন এই রাস্তার উপর সবে মাত্র তিন চারিখানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল ; এবং সন্নিহিত জানবাজারে, মহারাজ নন্দকুমারের

---

* মুসলমানেরা জলাশয়কে “তলাও” বলিয়া থাকেন।

প্রাণদণ্ডকারী সার ইলাইজা ইম্পের সহকারী বিচারপতি জষ্টিস লি মেতর (Le Maitre) বাস করিতেন। এখনকার দিনে, এরূপ উচ্চপদস্থ খাস বিলাতী সাহেবের পক্ষে জানবাজারে বাস বড় অপমানের কথা! পার্শ্ব-বর্ত্তী ফ্রী স্কুল ১৭৯৫ অব্দে এইস্থানে বর্ত্তমান নবগৃহে নাম পরিবর্ত্তনের সহিত স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে ইহাকে (Old Charity School) বলা হইত। ১৭৪২ অব্দে ইহা স্থাপিত, কলিকাতার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যালয়। চাঁদা করিয়া এই বিদ্যামন্দির এবং ইহার সংলগ্ন গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে স্কুল-গৃহের জন্য ছাপ্পান্ন হাজার আটশত টাকা সংগৃহীত হয়। ইহার মধ্যে কলিকাতার অধিবাসীরা ছাব্বিশ হাজার এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দুই হাজার টাকা দান করেন। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে নবাব মীরজাফর ও মুসলমান সম্প্রদায় ১৭৫৬ সালে রাইটার্স বিল্ডিং সন্নিহিত যীশুমন্দির ধ্বংশের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে অর্থ প্রদান করেন,—সেই অর্থে, এবং যে বণিক উমিচাঁদের নামে এখনও অনেক ইংরাজের ভ্রূ কুঞ্চিত, নাসিকা সঙ্কুচিত হয়, সেই উমিচাঁদ প্রদত্ত পঁচিশ হাজার টাকায় স্কুল এবং সেণ্ট-টমাস গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। উমিচাঁদের কথা পরে যথাস্থলে বলা যাইবে।

কসাইটোলা। কসাইটোলা প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণসীমা—এক প্রকার খাস সহরের বাহির। সমগ্র কলিকাতা মধ্যে এককালে এই পল্লী হিন্দু-সাধারণের নিকট নিতান্ত হেয়—ঘৃণিত বলিয়া গণ্য ছিল। কালিঘাট যাইবার জন্য তখন লোকে এই পথ পরিত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া লালদিঘীর সম্মুখের পথ দিয়া যাইত। এখন আমরা সভ্য হওয়ায় পাড়ায় পাড়ায় কসাই কালী (এখন আর কালীও নাই) এবং হিন্দু-সাহেবী খানার আড্ডা। শতবর্ষ পূর্ব্বেও, যখন ইংরাজেরা ভারতের জমিদারীতে বেশ এক প্রকার গট্ হইয়া বসিয়াছেন,—ইংরাজী শিক্ষার সহিত ইংরাজী সভ্যতা আমা-দিগকে ধীরে ধীরে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে,—আমরা যখন কিছু কিছু বিলাতী সভ্যতার সুমধুর রসাস্বাদন করিতে শিখিতেছি, সেই সুদিনেও হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগের সহিত সমাজ-শাসন সুদৃঢ় থাকায়, কোন গোপ-তনয়, এখনকার মত অসঙ্কুচিতচিত্তে কসাইএর নিকট গো বিক্রয় করিত না। এখন সভ্যতার ফলে, সামাজিক শাসন শিথিল হওয়ায় ঠিক তাহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে, এখন কলিকাতায়

গোয়ালারা এই কার্য্যে অগ্রগণ্য। আবার গৌরাঙ্গভক্ত কোন কোন কায়স্থ-বৈষ্ণব-পূজ্যপাদ গোরুকে ফুকা দেওয়া ব্যাপারটাকে দোষশূন্য বিবেচনায় তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহা পল্লী ও সংসর্গদোষ, না কাল-দোষ, বলা যায় না। যাহা হউক, শত বর্ষে এই প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, ক্রমে এই সভ্যতা-স্রোত কোথায় গিয়া থামিবে, বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত কারণে, কসাইটোলা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রায় নিবিড় অরণ্যপূর্ণ ছিল, সবে দুই তিনখানি বাড়ী মাত্র মাথা তুলিয়াছিল। চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব সেই অরণ্যমধ্যে প্রথম গৃহ নির্ম্মাণ করেন। নামের পরিবর্ত্তন হইলেও Grant's Lane আজ পর্য্যন্ত বেণ্টিক্ ষ্ট্রীটে অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ রহিয়াছে। ইনি পরে "সার" উপাধি লাভ করিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

লাল বাজার। পাঠক চলুন, এইবার ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, উত্তরে লাল বাজার মধ্যে প্রবেশ করি। যেমন কোন সম্ভ্রান্ত ধনী-সন্তান অদৃষ্টবশে দরিদ্র হইলেও তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া লোকে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, লালবাজারও আমাদিগের চক্ষুতে সেইরূপ সম্মানার্হ।

বর্ত্তমানের জুতা ও চামড়া-ওয়ালা, ঘোড়ার সাজ-ওয়ালা, চুরুট-ওয়ালা এবং Babu—likeness—four annas Sir-ওয়ালা ফটোগ্রাফ-ব্যবসায়ীগণের দূতবর্গের বিচরণক্ষেত্র মনে করিয়া ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না। লালবাজার, সাবেক কলিকাতার সাবেক দেবগণের লীলাক্ষেত্র। চৌরঙ্গী প্রাচীন কলিকাতার West End, বা Aristocratic quarter. মহাভারত-বর্ণিত জরাসন্ধের রাজ্যের ন্যায়, পূর্ব্ব পশ্চিমে, প্রবেশপথের একদিকে ইংরাজের পুলিস, জেলখানা, পিলোরি এবং ফাঁসিকাঠ সকলকে ভয়চকিত করিতেছে; অপর দিকে, ইংরাজের দুর্গ সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদিও আর লালবাজারের সে দিন নাই, তথাপি সেই পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করিয়া চলুন, সসম্ভ্রমে পল্লীর মধ্যে পদবিক্ষেপ করি।

১৭৩৮ সালের বর্ণনায় হলওয়েল সাহেব ইহাকে কলিকাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পল্লী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে ইহার বিস্তৃতি কষ্টম হাউস হইতে সিয়ালদহ পর্য্যন্ত; এখন চিৎপুর রোডের মোড়ে জুতাওয়ালাগণের দোকানের নিকটেই শেষ। এককালে এই লাল-

বাজারে ইংরাজরাজ যে সকল লীলা-খেলা খেলিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৭৫৬ সালের নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পঞ্চাশ সহস্র বাহিনীর গতিরোধ জন্য, বর্ত্তমান বেরিণী কোম্পানীর দোকানের সম্মুখে, বাঁশের গড় বানাইয়া, ভিজা বারুদ, মরিচাপড়া বন্দুক ও ডাহা আনাড়ি বীরপুরুষগণেব রণক্ষেত্রে অবতরণ-ব্যাপার চিরস্মরণীয়। এমন চমৎকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমরাভিনয় ভারতের রণক্ষেত্রে আর কখনও অভিনীত হয় নাই।

পুলিস আদালত বরাবর সমভাবেই একস্থানে রহিয়াছে। পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ধনী বণিক, জন পামর এই গৃহে বাস করিতেন। পামর সাহেবের পিতা ওয়ারেন-হেষ্টিংসের সেক্রেটারী ছিলেন। অতুল ধন-সম্পত্তি, অসাধারণ প্রতিপত্তি এবং দানশীলতা ও ন্যায়পরতার জন্য আজ পর্য্যন্ত "প্রিন্স অব মার্চ্চেণ্ট" বলিয়া তাঁহার নাম সম্মানিত হইয়া থাকে। তাঁহার ন্যায় উদার-চিত্ত সদাশয় ইংরাজবণিক এখনকার দিনে আর দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্টের নোটের ন্যায় পামর সাহেবের নোট তখন সকলে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করিতেন। ইহাই তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা এবং সম্ভ্রমের অন্যতম পরিচয়। বাল্যকালে ফরাসীরা তাঁহাকে যুদ্ধের বন্দী অবস্থায়, ফ্রান্সে লইয়া যায়। তথায় তথাকার বিখ্যাত ব্যাঙ্কার লাফেত কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালীতে দক্ষতালাভ করিয়া ১৭৮৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম অংশীদার,—হেনরী সেণ্টজর্জ্জ টকার,—পরে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর সভার চেয়ারম্যান-পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে কলিকাতায় পামর সাহেবের মৃত্যু হয়। কলিকাতাবাসীগণ তাঁহার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ চাঁদা করিয়া তাঁহার একটী মার্ব্বেল-নির্ম্মিত অর্দ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি টাউনহলে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এখন সেই মহাজন-পরিত্যক্ত গৃহে কলিকাতা পুলিস আদালত স্থাপিত। ইংরাজরাজের শাসনচক্রের মহিমায়, লাল পাগ্ড়ির অনুকম্পায় এবং পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক,—মিউনিসিপালিটীর অভিভাবকগণের অনুগ্রহে, অনেকের ভাগ্যে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায়, এ গৃহে পদার্পণ ঘটিয়া থাকে। যাঁহার ভাগ্যে শুভযোগ না ঘটে, তাঁহার মানবজনম বৃথা কি না বলিতে পারি না; কিন্তু মানবচরিত্র সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইহার মত স্থান দুর্লভ!

পূর্ব্বে কলিকাতায় দুইটি জেল ছিল;—একটী বড়বাজারে, অপরটী লাল বাজারে। বড়বাজারেরটী কটনষ্ট্রীটের চৌমাথার পশ্চিমাংশে এবং লাল

বাজারের কমন জেল এই পুলিস আদালতের সম্মুখে ছিল। জেলের বহির্ভাগে, লালবাজারের চৌমাথার উপর, তখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইত। এখনকার ন্যায় তখন ফাঁসির ব্যাপারটা বিরল ছিল না। তখন না ছিল হাইকোর্টে আপীলের ভয়, না ছিল জুরীর ভাবনা,—অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঝুলাইয়া দিতে পারিলেই লেঠা মিটিয়া যাইত। অন্ধকূপহত্যার অনুষ্ঠাতা হলওয়েল, এবং হেষ্টিংসের সভাসদ বারওয়েল যখন মেয়র ছিলেন, তখন ইহাঁরা অনেকের প্রতি এই প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ডেপুটী জমিদার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণের প্রতি একখান জাল দলিলের জন্য ১৭৬৭ সালে ফাঁসির হুকুম হয়। গোবিন্দরাম অনেক কষ্টে, অনেক সই-সুপারিসের বলে শেষে পৌত্রের জীবন রক্ষা করেন। মুরসিদাবাদের নবাবকে পর্য্যন্ত এজন্য অনুরোধ করিতে হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দিবার সপক্ষে জজ ইম্পে সাহেব এই রাধাচরণ মিত্র ঘটিত মোকদ্দমাকে বলবৎ নজীর ধরিয়াছিলেন। পরে রাধাচরণকে ক্ষমা করা হইয়াছিল। কিন্তু নবাব নাজিমের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার, রাধাচরণ অপেক্ষা ধনে, মানে, পদে শতগুণে শ্রেষ্ঠ লোক—বাঙ্গালার প্রধান লোক হইলেও তিনি ক্ষমাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন নাই!

মেয়র কোর্ট তখন সুপ্রীম কোর্টের স্থানীয় ছিল। চারিজন মাত্র এটর্ণীর এখানে মোকদ্দমা চালাইবার অধিকার ছিল। ১৭২৭ সালে মেয়র আদালত প্রথম স্থাপিত হয়। একজন মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যান ইহার বিচারপতি নিযুক্ত হন। অল্ডারম্যানেরা জজের পদাভিষিক্ত ছিলেন, মেয়র ছিলেন সভাপতি। ইংরাজদিগের দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার-ক্ষমতা ইহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, দেশীয়দিগের বেলায় ফাঁসি পর্য্যন্ত; সামঞ্জস্য চমৎকার! স্বয়ং গবর্ণর তখন আপীল শুনিতেন। অল্ডারম্যানদিগের বেতন ছিল—কেহ হাসিবেন না—মাসিক বাইশ টাকা! সভাপতি মেয়র আর কিছু বেশী পাইতেন। সুতরাং ইহাদিগের ফাঁসী-মাহাত্ম্য কিছু বেশী না থাকিলে চলিবে কেন? একদিকে ত পোষান চাই।

সপাসপ্ বেতান এবং ফাঁসি দেওয়া, এই দুই কার্য্যে মেয়র ও অল্ডারম্যানেরা যেমন সুনিপুণ, তেমনি শীঘ্রহস্ত থাকায়, এবং বিচারকার্য্যে নবাবের কাজী সাহেবদিগকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করায়, ইহাদিগের মহিমা শীঘ্র বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল। তখন কোর্ট অব ডিরেক্টর

সভা এই চমৎকার বিচারপ্রণালী দেখিয়া মানে মানে ইহাদিগকে বিদায় দান করেন। সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের ইহাই মূল কারণ। কিন্তু প্রথম প্রথম সুপ্রীম কোর্টও বড় মন্দ নমুনা দেখান নাই, বিশেষতঃ সার ইলাইজা ইম্পের আমলে। মহারাজ নন্দকুমার সুপ্রীম কোর্টের প্রথম আসামী! ব্রজমোহন নামক একজন ঘড়িওয়ালাকে একটী ঘড়ি চুরি অপরাধে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে ফাঁসী দেওয়া হয়। বিলাতের প্রসিদ্ধ জজ জেফ্রি বা নরবারী ইঁহাদিগের নিকট কলিকা পাইতেন না।

হিন্দু রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ যেরূপ অবধ্য ছিল, * বর্ত্তমান কালে বিলাতী গন্ধবিশিষ্ট হ্যাটকোটধারী যেরূপ অবধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেকালে ইঁহাদিগের এতটা আবদার,—খাতির রক্ষিত হইত না। যে বৎসর ব্রজমোহনের ফাঁসি হয়, সেই বৎসর, তাহারই অব্যবহিত পরে, পাঁচজন ইংরাজকে এক সঙ্গে লালবাজারের Tyburn-এ ঝুলিতে হইয়াছিল। এটা যে একটা খোস্ খবর, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে, ন্যায়পরায়ণ তেজস্বী বিচারপতি জষ্টিস্ হোয়াইট্‌কে কেবলমাত্র একজন নরহন্তা ইংরাজকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে দেখিয়াছি; তাহাও প্রায় বিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল। সে ব্যক্তি বিনা-কারণে, খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া মেটিয়াবুরুজে এক মুসলমানের গলায় ছোরা বসাইয়া দেয়। ইহাকেও বাঁচাইবার জন্য সাহেব মহলে দিন কতক খুব হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বে পিলোরি Pillory নামে ইংলণ্ডে এক প্রকার দণ্ডবিধি ছিল। অপরাধীকে প্রকাশ্যভাবে দণ্ডিত, বিশেষতঃ, অপদস্থ করা এই দণ্ডের উদ্দেশ্য। ইংরাজেরা এ দেশেও সেই পিলোরির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লালবাজারের মোড়ে সেই পিলোরি ছিল। পিলোরির নাম এখন অশ্রুত হইয়াছে।

এখন কলিকাতায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা সামান্য না হইলেও একটিও স্নানাগার (হামাম) দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা এতাদৃশ অধিক না হইলেও পুলিস আদালতের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত গৃহ হামামরূপে ব্যবহৃত হইত। এখানে অল্প পয়সায় বাথের সুখ উপভোগ করা চলিত।

---

* পূর্ব্বে দেশীয় রাজ্যসমূহে স্ত্রীলোক এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রাণদণ্ড হইত না। বিখ্যাত রাজনীতি-বিশারদ মৃত স্যার ত্রিম্বাক মাধব-রাওএর কল্যাণে লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে এই আবহমানকাল প্রচলিত নিয়ম রহিত করিয়া দেওয়া হয়। স্যার টি, মাধব রাও হিন্দু ছিলেন কি না!

এখন যেমন কলিকাতায় অনেকগুলি বড় বড় হোটেল দেখিতে পাওয়া যায়, ১৮২৩ সালের পূর্ব্বে একরূপ হোটেল ছিল না। তবে ১৭৮০ সালে কয়েকখান বিলাতী ময়রার (Confectioner) দোকান খোলা হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রথম "হারমণিকন্ টেবার্ণ" নামে সাহেবেরা এক আড্ডা প্রতিষ্ঠা করেন। লালবাজার জেলের উত্তরদিকে—চিৎপুর রোডের পূর্ব্বকোণে এই আড্ডা স্থাপিত হয়। ইহা কতকটা বিলাতী ক্লব এবং কতকটা পশ্চিম-প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুদিগের কালীবাড়ীর ধরণের ছিল। সাহেবরা এই আড্ডায় সকলে জুটিয়া পানাহার, নৃত্যগীত, আমোদ আহ্লাদ করিতেন; আর পশ্চিমের কালীবাড়ীর ন্যায় বিদেশী সাহেবরা আসিয়া, হোটেলের অভাবে, এইস্থানে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তখনকার কলিকাতার সাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই পঞ্চাশ টাকা বেতনে হাজার টাকা উপার্জ্জন করায়, অর্থের অভাব না থাকায় সকলে চাঁদা করিয়া এই টেবর্ণএর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং অতিথিসৎকার এবং অন্যবিধ ব্যয়-ভূষণ খুব জাঁকালো নবাবীচালে নির্ব্বাহিত হইত। অতিথিরা যতদিন ইচ্ছা, এখানে জামাই-আদরে থাকিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি তখন সর্ব্বদা এইস্থানে জমায়েত হইতেন। এখনকার ন্যায়, তখনকার গবর্ণর জেনারেলেরা এতটা কায়দা-কারণের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। এই হারমণিকন্ টেবার্ণ হইতে সাধারণ হোটেলের সূত্রপাত। ক্রমে চারিদিক হইতে অতিথি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এবং ক্রমশঃ সাহেবদিগের আয় হ্রাস হওয়ায় ইহার নাম ও অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া জাহাজী খালাসীদের আড্ডা—সেলার্স হোমে পরিণত হইল।

এখন যেমন জেলের কয়েদীদিগকে, মরিয়া যাইলেও, discipline এর খাতিরে, বাহিরের কোন জিনিস খাইতে দেওয়া হয় না, তখন এতটা কড়াকড়ি ছিল না। হারমণিকন্ টেবার্ণ হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলখানার কয়েদী-দিগের জন্য তৎকালে অনেক খাদ্য দান করা হইত।

ক্রমে লোকবৃদ্ধির সহিত লালবাজারে ছোট ছোট শুঁড়িখানা, হোটেল, টেবার্ণ প্রভৃতি দেখা দিতে আরম্ভ করিল। লণ্ডন হোটেল নামক এইরূপ একটী আহারের আড্ডার বর্ণনায়, সেই সময়কার একজন সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"এখানে স্বল্পমূল্যে আহার সরবরাহ করা হইয়া থাকে; মদ এবং ফলের মূল্য ব্যতীত লোকপ্রতি এক মোহর দিলেই বেশ আহার করা চলে।" কিন্তু আমরা ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ দেখি না।

বস্তুতঃ তখনকার দিনে সাহেবদিগের এত আয় ছিল যে, সেই সস্তার দিনেও একবারকার আহারের মূল্য, এক মোহর তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। তখন এক পাত্র কাফির মূল্য ছিল, অর্দ্ধ ক্রাউন ১।০, (এখনকার হিসাবে ১৸৵০) তবে এই সঙ্গে দয়া করিয়া সেই সময়কার খবরের কাগজ পড়িতে দেওয়া হইত। Calcutta Advertiser এবং Calcutta Chronicle তখনকার প্রধান কাগজ। পরে হরকরা ও ফিনিক্স দেখা দেন।

ট্রেটিবাজার। লালবাজারের নিকট-প্রতিবাসী হওয়ায় এবং হারমণিকন্ টেবার্ণের পার্শ্ববর্ত্তী থাকায়, এই সঙ্গে ইহার কথাটাও সারিয়া লই। টীরেটা (Tiretta) নামক একজন ফরাসী সেই সময় কলিকাতার রাস্তাঘাটের কর্ত্তা ছিলেন; তিনি ১৭৮৮ সালে এই বাজার স্থাপন করেন। তখন এই বাজারের মাসিক আয় ছিল তিন হাজার আট শত টাকা,—মূল্য ধরা হইয়াছিল দুই লক্ষ টাকা। সাহেব দেউলিয়া পড়ায়, তাঁহার পাওনাদারগণ সুরতি করিয়া এই টাকা তুলেন। তৎকালে এই বাজারের সম্মুখে সুবৃহৎ উদ্যান-সংযুক্ত অট্টালিকায় ওয়েষ্টন নামে একজন দয়ালু ভদ্র ইংরাজ বাস করিতেন। তিনি সৎকার্য্যে বিস্তর অর্থ বিতরণ করিতেন। দরিদ্রদিগকে স্বহস্তে মাসিক ষোল শত টাকা দান তাঁহার জীবদ্দশায় একটী নিয়মিত ব্রত ছিল। মৃত্যুকালে তিনি এক লক্ষ টাকা দানের জন্য প্রদান করিয়া যান। এখন সে মহাত্মার উদ্যান ও অট্টালিকার কোন চিহ্ন নাই, কেবল ওয়েষ্টন লেন নামক একটি ক্ষুদ্র পথ তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। সদাশয় লোক যে জাতি, যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, তিনি সম্মানার্হ।

"লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।" "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।" এই সঙ্গে আমরা আর এক মহাত্মার নাম করিব। ইনি এই পল্লী-নিবাসী না হইলেও মহাত্মার সহিত মহাত্মার যোগাযোগ দেখিতে সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ বলিয়া আমরা এই সঙ্গে তাঁহারও পরিচয় দিতেছি।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে বৈষ্ণবচরণ শেট নামে বড়বাজার অঞ্চলে একজন মহাসম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক মহাত্মা বাস করিতেন। কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়া তৎকালে সকলে ইহাঁকে যথেষ্ট মান্য করিত। কোম্পানীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য-সূত্রে ইনি বিপুল ধনসম্পত্তিশালী হইয়াছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষা, ধার্ম্মিক ও সাধুলোক

বলিয়া ইহাঁর খ্যাতি-বিস্তার ছিল। শুনা যায়, তৈলঙ্গরাজ রামরাজা তাঁহার পূজার্থ গঙ্গাজল, ইহাঁর মোহরাঙ্কিত ব্যতীত যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। গৌরীচরণ সেন নামক শেট মহাশয়ের একজন অংশীদার ছিলেন। একবার ইনি তাঁহার নামে বিস্তর দস্তা ক্রয় করেন। পরে এই দস্তা রূপা বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবচরণ ধর্ম্মভীরু লোক, যখন অংশীদারের নামে ইহা ক্রয় করিয়াছেন, তখন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং গ্রহণ করিলে প্রতারণা-পাপ স্পর্শে; সুতরাং গৌরীচরণের ভাগ্যবলে, দস্তা রূপা হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি নিজে কিছু না লইয়া সমস্ত লভ্যাংশ অংশীদার গৌরীচরণকে প্রদান করেন।* গৌরীচরণ অকস্মাৎ এই অচিন্তনীয় অতুল অর্থ পাইয়া, সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে বিবিধ হিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে জেলখানার কয়েদী-খালাস তাঁহার জীবনের একটী কার্য্য। বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিলে তিনি কখন কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। সকল প্রকার সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা থাকায় আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম পুণ্যশ্লোকের ন্যায় উপরোক্ত প্রবাদবাক্যে ঘোষণা করিতেছে।

এই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত শেট মহাশয়ের আর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাউক। গোবর্দ্ধন রক্ষিত নামক বর্দ্ধমান নিবাসী এক মহাজনের নিকট হইতে বৈষ্ণবচরণ এককালে দশ হাজার মণ চিনি খরিদ করেন। যথাসময়ে চিনি বড়বাজারের কদমতলার ঘাটে উপস্থিত হইলে পর, শেঠ মহাশয়ের কর্ম্মচারীগণ মহাজনের নিকট কিছু দক্ষিণা আদায়ের চেষ্টা দেখেন। কিন্তু তাহাতে সফল-মনোরথ না হওয়ায়, প্রভুর নিকট যাইয়া চিনি নমুনা অনুরূপ হয় নাই বলিয়া মহাজনের নামে প্রতারণার দোষারোপ করেন। রক্ষিত মহাশয়ও তেজস্বী লোক। তিনি এবম্প্রকার মিথ্যাপবাদে ভীত না হইয়া চিনির মূল্য হ্রাস বা কর্ম্মচারিদিগকে ঘুস দিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার লোকদিগকে উহা সমস্ত গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। আদেশানুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইল। কতক চিনি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইলে পর, প্রকৃত ঘটনা বৈষ্ণবচরণের কর্ণগোচর হইতে বাকী রহিল না।

* স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের জীবনেও ঠিক এই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি দশ হাজার মণের পূরা দাম দিয়া, অবশিষ্ট মাল লইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এখানেও মহাবিপদ। রক্ষিত মহাশয়ও অধার্ম্মিক লোক নহেন; সুতরাং যখন অনেক মাল নষ্ট হইয়াছে, তখন তিনিও পূরামূল্য গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। এদিকে শেট মহাশয় যখন দশ হাজার মণ লইতে প্রতিশ্রুত হইয়া বায়না দিয়া মাল আনাইয়াছেন, তখন পূরামূল্য প্রদানে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য; অন্যথা প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত মহাপাপ বলিয়া তিনি জ্ঞান করেন। শেষ অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর রক্ষিত মহাশয়েরই কথানুযায়ী কার্য্য হইল। অবশিষ্ট চিনির মূল্য দিয়া শেট মহাশয় সে যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। বাঙ্গালার মধ্যে এইরূপ লোকের তখন অভাব ছিল না। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেও এক্ষণকার তুলনায় তৎকালে ধর্ম্ম-ভাব বেশী ছিল। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার নিক্তির ওজনে আমরা ইহা-দিগকে ন্যাকা বা ভদ্র ভাষায় Simple বলিতে পারি, কিন্তু ধূর্ত্ত, শঠ, জুয়াচোর, দাগাবাজ বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারি না। বড় দুঃখের বিষয়, লর্ড মেকলে আড়াই বৎসর কাল কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোকের বিষয় তাঁহার একবারে কর্ণগোচরই হয় নাই। হইলে বাঙ্গালীর পৃষ্ঠদেশে তিনি যে "Hall" মার্কের ছাপ দিয়াছেন, সে ভ্রমে পতিত হইতেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

অকারণ মিথ্যা।

(গল্প)

১

আমরা তিন জনেই একবাসায় ছিলাম। তখন বি, এ, পড়ি—একই কলেজে। কলেজের নিকটেই বাসা। দ্বিতলের একটি বড় কক্ষে আমরা তিন বন্ধুতে মিলিয়া থাকিতাম। সে বাড়ীতে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক থাকিতেন—কেহ ছাত্র, কেহ বা কর্ম্মচারী। আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের

কোন সম্পর্ক ছিল না। এক বাসায় থাকার দরুণ তাঁহাদের সহিত যাহা কিছু পরিচয়—মুখের আলাপ মাত্র। আমাদের তিন জনের জন্য পৃথক পাচক ও পরিচারক নিযুক্ত ছিল।

বাসা-বাড়ীর দক্ষিণে একটি সরু গলি; চারিপাশে ডাল, ময়দা প্রভৃতির বড় বড় গুদাম। সকালে কুলি মজুরের চীৎকারের গম্ভীর প্রতিধ্বনি দু'চার-বার শুনিতে পাইতাম; তার পর, দু'টি অন্ন মুখে দিয়া আমাদের কলেজে উপস্থিত হইতে হইত। আমরা তিন-জনেই "অনার কোর্স" (Honour Course) লইয়াছিলাম; সুতরাং বেলা চারিটা অবধি আমাদিগকে কলেজে আবদ্ধ থাকিতে হইত। যখন বাসায় ফিরিতাম, তখন গুদামগুলি ডাল ঝাড়ার শব্দে, হিন্দুস্থানী ক্রেতার উচ্চ স্বরে, কুলিদের চীৎকারে মুখরিত; রাজপথ অসংখ্য গো-যানের অবিরাম ঘর্ঘর শব্দকারী চাকার তলে জর্জ্জরিত। তারপর, ঘণ্টা খানেক পরেই সব নিস্তব্ধ; প্রকাণ্ডকায় গুদামবাটীর দৃঢ়-নির্ম্মিত কপাটে চাবী পড়িল,—সে জনসংঘাত আর নাই, পথে কেবল দু'চারিটি পান্থ:—মন্ত্রবলে যেন হঠাৎ সব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! সে কলরব, সে ব্যস্তভাব, সে জীবন-সংগ্রামের আয়োজন সব থামিয়াছে—শুধু আমরা তিনটি সহপাঠী সেই একঘরে দক্ষিণের বাতায়ন গুলি খুলিয়া আপনার আপনার পাঠে নিমগ্ন; মাঝে মাঝে বা গ্রন্থখানি সম্মুখে ফেলিয়া গল্প করিতেছি।

প্রতিদিন নীরবে যেমন সূর্য্য উঠিত—অস্ত যাইত, দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন দৈব-নিয়ম-বশে চলিয়া যাইত, আমাদের জীবন তেমনই নিয়মিত দৈনিক কার্য্যে অতিবাহিত হইত—সেই জাগরণ, স্নানাহার, পাঠ, কলেজ-গমন, নিদ্রা! বৈশাখের ঝঞ্ঝা, শ্রাবণের ধারা, বসন্তের জীবন-হিল্লোল কিছুই আমাদের স্পর্শ করিত না। যেন আমরা যৌবনমুখেই আকালিক বৃদ্ধত্বকে বরণ করিয়াছি—ঘোর সংসারী। তাহাই বা নয় কেন? আমি আর দীনু ত সংসারীই বটে—দুজনেই পিতৃপদে উন্নীত হইয়াছি। কেবল ললিত আমাদের একঘেয়ে জীবনে মাঝে মাঝে নূতন সুরে বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিত। দলভ্রষ্ট পিক যেন কপোত-বৃন্দের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছিল। কপোতের সেই পুরাতন, আলস্যময়, নিঝুম কূজন; হঠাৎ কোথা হইতে একটি পিক আসিয়া আপনার চিরনূতন, উন্মাদনী পঞ্চম রাগিণীতে জগৎকে জাগাইয়া, প্রকৃতি-হৃদয়ে বিচিত্র বেদনা তুলিয়া

দিল। কিন্তু তাহাকে কপোতদলে বাসা বাঁধিতে হইল। তিনজনে এমন মিলিয়া গেল—আশ্চর্য্য !

ললিতের কথা-বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে এমন একটু রমণীয় সহজ নিপুণতা ছিল যে, আমরা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতাম না। তাহার সকল কার্য্যেই কি মধুর অনায়াস-কৃতিত্ব ছিল। তাহার সহিত আলাপ করিয়া স্নিগ্ধ হইতাম, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিয়া তাহার নিকট অনেক শিখিতাম। যতই কেন গোপনীয় কথা হউক না, ললিতকে না বলিলে আমার তৃপ্তি হইত না। সহধর্ম্মিণীর চিঠিখানি পাইলাম ত আগে ললিতকে দেখাইব। মনের তুচ্ছ ক্লেশ, সামান্য হর্ষ, সবই ললিতকে জানাইতাম। তার সোদরাধিক স্নেহ, অনাবিল সারল্য, চিরফুল্ল শ্রমাপহারী আলাপ, আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত।

ললিতের নিজের মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অবিবাহিত। বাঙ্গালীর ছেলে যে দু'দুটো পাশ করিয়াও অপরিণীত থাকিতে পারে, আমার তাহা ধারণাই ছিল না। তাহাকে যদি বিবাহের কথা বলিতাম, যদি বিবাহ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিতাম, সে গম্ভীর ভাবে "বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই" বলিয়াই অন্য কথার অবতারণা করিত। নারীজাতিকে সে যে ঘৃণা করিত, তাহা নয়। বরং বিশেষ ভক্তিই করিত। মনে পড়ে, সে একদিন "দ্বারং কিমাহো নরকস্য নারী" এই লাইনটি কাটিয়া লিখিয়া দিয়াছিল, "দ্বারং কিমাহো ত্রিদিবস্য নারী।" আমার প্রণয়িনীর পত্রগুলি যেরূপ আগ্রহের সহিত যত্ন করিয়া পড়িত, তাহাতেও বুঝিতে পারিতাম, সে নারীদ্বেষী নয়। কিন্তু সে বিবাহ করিতে কেন অসম্মত, তাহা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতাম না। স্ত্রীটি কেমন হইবে, কত বয়সে বিবাহ করা উচিত, এ সব বিষয়ে তাহার অনেক মত শুনিতাম; কিন্তু তাহার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই, সে বিবাহ-প্রসঙ্গই বন্ধ করিয়া দিত। আমরা তৎসম্বন্ধে আর কোন কথার উত্থাপন করিতে সাহস করিতাম না।

২

একবার ললিত এক সপ্তাহের জন্য দেশে গেল। দেশে সে প্রায়ই যাইত। ছুটী পাইলে ত কথা নাই, মাঝে মাঝে কলেজ কামাই করিয়াও যাইত। এবারেও কলেজ কামাই করিয়া গেল। ললিত বলিত, "আমি

মা'র একমাত্র সন্তান; মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে না দেখা করিয়া আসিলে, তিনি বড় কাতর হন।"

কিন্তু সেবার ললিত দুদিন পরেই ফিরিয়া আসিল। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "দেশে থাকিলে পড়ার বড় ক্ষতি হয়, মা'কে বুঝাইয়া শীঘ্র চলিয়া আসিলাম।"

সে দিন রাত্রিতে যথা সময়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। বিরহ-শয়নে কিশোরী প্রিয়ার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম, জানিতে পারি নাই। আমি নাটক বা নভেলের নায়ক নই, কবিত্ব-ব্যাধি আমার এই দরিদ্র মস্তিষ্কে কখনও আশ্রয় পায় নাই; কিন্তু সারা দিন পাঠচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিয়া, রাত্রিতে প্রবাস-শয্যায় শয়ন করিবামাত্র প্রত্যহ নববধূর ফুল্লারবিন্দ বদন খানি মনে না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কোকিলের কুহুধ্বনি, বসন্তের মলয়, শরতের শশী, কিছুরই প্রয়োজন হইত না। হায় পরবাসী যুবক! দিন-শেষে শূন্যশয়নে পড়িয়া আপনার ছোট্ট গৃহিণীর মুখখানি না ভাবিয়া কি নয়ন নিমীলিত করিতে পারে না? সে রাত্রিতে সকল বিরহীজন আমারই মত কি প্রিয়ানন ভাবিতেছিল?

নিদ্রাভিহত হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ দীনুর ত্রস্ত আহ্বানে চমকিয়া উঠিলাম। এত রাত্রিতে ব্যাপার কি? গৃহমধ্যে অস্ফুট কাতর ধ্বনি শুনিয়া আমার নিদ্রালস অঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া গেল। বিস্ময় ও শঙ্কার প্রথম মুহূর্ত্ত অতিবাহিত না হইতেই দীনু আলো জ্বালিল, আমি সভয়ে দেখিলাম, ললিত বিছানায় ছটফট্ করিতেছে, মুখে ফেনা, আর অব্যক্ত শব্দ! আমি আতঙ্কে জড়প্রায় বসিয়াছিলাম, কথা কহিবার বা নড়িবার শক্তি আমার ছিল না। দীনু রাগিয়া বলিল "কি দেখ্‌ছ? ললিতের ফিট হ'য়েছে, এস, হাত দুটো ধর।"

জীবনে কখন কাহারও ফিট দেখি নাই। ললিতের যে ফিট হয়, তাহাও শুনি নাই। দিনের বেলাও যদি হইত, তাহা হইলে আমার তত ভয় হইত না। কিন্তু সেই নিস্তব্ধ নিশীথে আত্মীয়-বিরহিত প্রবাস-কারায় আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গে প্রিয় বন্ধুর যে অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে নিতান্ত ভীত না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

দীনুর কথায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া ললিতের হাত দুটী চাপিয়া ধরিলাম। মূর্চ্ছিতের কি প্রচণ্ড বল! আমি প্রাণপণ শক্তি-প্রয়োগে বহুকষ্টে তাহার

হাত ধরিয়া রাখিলাম। ললিতের কথাগুলি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই সে বকিতেছিল—বহুলাংশই অসংলগ্ন প্রলাপের মত। দীনু হঠাৎ উঠিয়া একখণ্ড কাগজ আনিয়া লিখিতে বসিল! তাহার পাগলামি দেখিয়া তেমন অবস্থাতেও আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু লিখিয়া সে ভালই করিয়াছিল। দীনু যদি না লিখিয়া রাখিত, তাহা হইলে আজ আমি ললিতের মূর্চ্ছা-বস্থার কথাগুলি আপনাদিগকে যথাযথ বলিতে পারিতাম না। মূর্চ্ছার সময়ে ললিত যে কথাগুলি স্পষ্টতর স্বরে ও সুসংলগ্ন ভাবে বলিয়াছিল, তাহা আমি আপনাদের অবগতির জন্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"——এমনই ক'রে সাত হাত ঘোমটা দিয়ে থাক্‌বে? আমি এই কলেজ পালিয়ে তোমার কাছে এসেছি—আঃ সা-মা-ন্য সুখ হোলো না। সে দিন শুনলুম, তুমি গান গাচ্ছ। দরজার কাছ থেকে ক-ত-ক্ষ-ণ শুনলুম। যেমন আমি ঘরে গেছি, তুমি কি ক'রেই পালালে! তারপর আমার এত অনুরোধ, কিছুই কি কাণে গেল না! O God! what have I done!

"মনে করি, তোমার এই দুষ্টুমির প্রতিশোধ নোবো। কিন্তু Woe to the day which made those bewitching eyes of yours. You know it for certain that I won't be able to bear separation from you. তাই তুমি কিছুতেই আমার কথা রাখ না। কি নিষ্ঠুর! কি ছেলেমানুষ!

"আমি তোমার জন্য পাগলের মত দেশে বিদেশে ছট্‌ফট্ কচ্চি, এত মিনতি কচ্চি, তবু তুমি আমার কথা রাখ্‌বে না? আঃ—Shakespeare ঠিকই বলে'চে, A young man married is a man that's marr'd, বড় সত্যি, তোমার জন্যে আমার জীবনটা গেল! তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালবাস্‌তে, তা'হলে কি আর এমন ক'রে অপমান ক'র্ত্তে!

"আচ্ছা, If you don't sing the song, everything will be at an end between you and me, কি!—কখনই গাইবে না? বেশ, তা-ই-হোক। এই শেষ। কাল সকালেই আমি চ'লে যা'ব। মা'র সঙ্গেও দেখা ক'র্‌বো না। এ-ই-শে ষ——"

ললিতের ফিট ভাঙ্গিল। কিন্তু সে জাগিল না। যেমন ঘুমাইতেছিল, তেমনই ঘুমাইতে লাগিল।

আমি হাঁফ ছাড়িয়া দীনুকে বলিলাম, "এরই নাম ফিট? আচ্ছা, ললিতের কথা থেকে কি বুঝ্‌লে?"

দীনু হাসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া একবার ললিতের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি আর বুঝ্‌ব? ললিত আমাদের কাছে কি মিথ্যে কথাই চালায়? বলে কি না 'আমি bachelor থাকব!' এমন মিথ্যাবাদী! এখন সব ধরা পড়্‌ল।"

ললিতকে মিথ্যাবাদী বলিতে আমার তখনও প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তার এমন সারল্য, এত ভালবাসা, সবই কি মিথ্যা?

দীনুকে বলিলাম, "কাল সকালে ললিতকে কোন কথা ব'ল না; তার যে ফিট হ'য়েছিল, তা'ও জানিও না।"

৩

তাহার পরদিন ললিত উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হ'চ্ছে। কাল রাত্রিতে আমার কোন অসুখ হ'য়েছিল কি?"

আমি বলিলাম, "এমন আজগুবি কথাও ত কখন শুনি নি! তোমার অসুখ হ'বে, তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে না—জান্‌বে অপরে! তুমি কি উন্মাদ হ'লে?"

ললিত অপ্রতিভ হইয়া অন্য কার্য্যে চলিয়া গেল।

বেলায় তাহার এক আত্মীয় আমাদের কলেজে আসিয়া উপস্থিত। ললিত তখন অসুস্থ বোধ করিয়া বাসাতেই ছিল—সে দিন কলেজে আসে নাই।

তাহার আত্মীয়ের কাছে সমস্ত শুনিলাম। ললিত কাহাকেও না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই, তাহার মাতা ঠাকুরাণী উদ্বিগ্ন চিত্তে লোক পাঠাইয়াছেন। তাহার প্রলাপের সমস্ত অর্থ বুঝিলাম। তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। ললিত কিছুই জানিল না।

* * * *

বহুদিন পরে আজ ললিতের সঙ্গে দেখা হইল। কর্ম্মস্রোতে কে কোথায় ভাসিয়া পড়িয়াছি। চির-বিদায়-গৃহীত যৌবনে যে তিনটি সহপাঠী সোদর-ত্রয়ের মত একত্র থাকিয়া ধন্য হইয়াছিল, আজ তাহারা কে কোথায়! কালে ভদ্রে কখনও ক্কচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমি ত সংসার-ভারে জর্জ্জরিত। জীবনে কখনও কোন বিষয়ে আমার প্রবল অনুরাগ বা উৎসাহ ছিল না; বাঙ্গালীর ছেলে প্রাণান্তপণ করিয়া পাশ করিয়াছি; এখন সামান্য চাকরী ভিন্ন অন্য উপায় নাই—তাহাই করিতেছি। কিন্তু ললিতের কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? সেই উৎফুল্লভাব, সেই হৃদয়-

হারী আলাপ! আজ তাহাকে দেখিয়া, আমার পুরাতন দিনের ঘটনাটি মনে পড়িল। সে একটী তুচ্ছ বিষয় লইয়া আমাদের নিকট অকারণে কেন যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, আজও তাহা বুঝিলাম না।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

ভালবাসার চক্ষু নাই।

পথের মাঝারে ঘুরিয়া বেড়ায়,
দুই চক্ষু-হীন বৃদ্ধ কত হায়!
কিন্তু প্রণয়ীর　　চেয়ে অন্ধবীর,
দেখিনি কখন;
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

সে যে মনে করে তার প্রণয়িনী,
সকলের চেয়ে মানস মোহিনী,
হলেও সে ধনি,　　জলদ-বরণী,
বিকৃত-দশন;
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

সে যে মনে করে কোটীচন্দ্র জিনি,
প্রিয়ার তাহার চারু মুখখানি,
হ'লেও বিষম,　　সূর্পনখা সম,
ভীম দরশন;
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

বলে অনুপম প্রিয়ার গঠন,
যদিও সে বাঁকা পাকান এমন,
জিলিপি খাবার,　　যেন অবতার,
করাল বদন;
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

প্রণয়ী যে বলে প্রিয়ার রন্ধন
বড়ই মধুর, অমিয় যেমন,
যদিও সে রাঁধে,　　দিয়ে মন সাধে,
প্রচুর লবণ;
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

লিপি যদি লেখে ভাবী প্রণয়িনী,
আদরে ধরিয়ে প্রণয়ী অমনি,
না পড়িয়া খুলে,　　ধরে মুখে তুলে,
করিতে চুম্বন!
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

অভিসারিকার বেশে যদি আসে,
প্রণয়ী তাহারে নেহারি উল্লাসে,
না বাঁধিয়া ভুজে,　　ধরি পদাম্বুজে,
যাচে যে মিলন!
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

ভালবাসা যেন জলন্ত হাপর,
রহে যে প্রণয়ী তাহার ভিতর,
পুড়ে দিন দিন,　　হয় দৃষ্টিহীন,
ঝলসি নয়ন;
কারণ সে অন্ধ,　　দুই চক্ষু বন্ধ,
জন্মান্ধ যেমন।

শ্রীরসময় লাহা।

অশোকগুচ্ছ।*

(সমালোচনা।)

নামের সার্থকতা। 'অশোকগুচ্ছ' নামটী এক হিসাবে সার্থক হইয়াছে, কবি-প্রসিদ্ধি এই যে, নূপুর-সিঞ্জিত রমণী-চরণ-স্পর্শে অশোকপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে; অশোক গুচ্ছেরও সমস্ত কবিতাগুলিই রমণী-চরণ-ধ্যানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারী-প্রসঙ্গ-বর্জ্জিত একটী কবিতাও 'অশোকগুচ্ছে' খুঁজিয়া পাইলাম না।

কবিতাগুলির স্পষ্টতা। অশোকগুচ্ছে কবির মৌলিকতার প্রমাণ প্রায় প্রত্যেক কবিতাটীতেই আছে। আজকালকার কবিতায় অস্পষ্টতা ও দুরূহতা যেন কাব্য সৌন্দর্য্যের উপাদান বলিয়া অনেকের ধারণা দাঁড়াইয়াছে! অশোকগুচ্ছের কবিতাগুলির সকল গুলিই স্পষ্ট, যে সকল ভাব, চিত্র কিংবা চরিত্রের আভাস কবি প্রদান করিয়াছেন, তাহারা প্রস্ফুট কুসুমদামের ন্যায় আমাদের চক্ষুতে স্পষ্ট ও সুন্দর আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে। ঘুমঘোরে আধ-দৃষ্ট, আধ-লীন স্বপ্ন জগতের প্রহেলিকা সকল এ কাব্যখানিতে দুষ্প্রাপ্য। পাঠক! দেবেন্দ্র বাবুর কবিতার মধ্যে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিবার, কিংবা কি জানি কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যের সুষমার সন্ধান পাইবার প্রত্যাশা করিবেন না। এখানে যাহা দেখিবেন, তাহাতে সৌন্দর্য্যের এক একটী অবয়ব সু-অঙ্কিত হইয়াছে—তাহা দেখিবার, ছুঁইবার ও ঘ্রাণ করিবার যোগ্য,—স্পর্শমাত্র বিলীন হইবার সামগ্রী নহে—স্বপ্নের ভঙ্গ-প্রবণ কুহকজালের ন্যায় অপার্থিবত্ব তাহাতে বিরল।

সৌন্দর্য্য বোধ ও মৌলিকত্ব কবির সৌন্দর্য্য-বোধ অতি তীক্ষ্ণ। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিটি একটু বক্র—সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার যেন একটুকু অপাঙ্গ দৃষ্টি; ইহা বড়ই মধুর এবং আমাদের মনে হয়, ইহাই তাঁহার মৌলিকত্বের প্রধান উপাদান। তিনি যাহা দেখেন বা দেখাইতে চান, তাহা গৃহ-কোণের এমন কোন দৃশ্য নহে, যাহার উপর লোকের দৃষ্টি সহসা পতিত হয় না। চন্দ্র-রশ্মি, পিক-কুহুরব, নক্ষত্রখচিত

---

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল প্রণীত।

আকাশ,—রমণীর মুখ, এ সকল তিনি তাঁহার কাব্যের বিষয়ীভূত করেন নাই। তাঁহার বিষয়—"কালী-ঝুল মাখা", বিধবার আরসী, আবদ্ধকবরী স্মিতমুখী সুন্দরীর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আরসীখানি এখন আর সার্থক হয় না,—পতি-বিয়োগ-বিধুরা আর তাহার প্রতি ফিরিয়াও চান না, এই ভাঙ্গা, অযত্নে রক্ষিত আরসী-প্রসঙ্গে বৈধব্য-চিত্র কেমন অশ্রু-করুণ হইয়া উঠিয়াছে। একটি শিশু তাহার মাতার খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়াছে, রমণী আরক্তিম গণ্ডে শিশুটীকে গঞ্জনা করিতেছেন—কবি এই সুযোগে বলিলেন :—

"আমার মিনতি রাখ,   আজ এলোচুলে থাক,
খোকারে ব'ল না কিছু এ মিনতি মোর।"

একটি রমণী বাক্সের চাবিটী হারাইয়া ফেলিয়াছে, কবি তাহা কুড়াইয়া পাইয়া লুকাইয়া রাখিলেন ; তাহাকে গহনা পরিতে দিবেন না, এই অভিসন্ধি।

"দিব না দিব না চাবি, দিব না ফিরায়ে।
আজ শূন্যদেহে থাক,   আমার মিনতি রাখ,
চির তৃষিতের আশা দেও গো মিটায়ে।
অবিবাদে মনোসাধে,   নগ্ন সৌন্দর্য্যের হ্রদে,
দাঁড়াব সজনি আজ আকণ্ঠ ডুবায়ে।"
"অসত্যেও সত্য রাশি ছিল যে গোপন।
এ অনুপ্রাণিত বক্ষ উঠিছে উথলি,
হেরি তব অনাবৃত আকৃতি মোহন।"

কবির এই এলোচুল ও নগ্ন-সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা নীতিকারগণ কিরূপ চক্ষুতে দেখিবেন, সে বিষয়ে আমরা একবারেই ভরসা দিতে পারিতেছি না। তবে কবি যে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে হেরিয়া গৃহের অতি-নিভৃত প্রদেশ হইতে এক একটী গার্হস্থ্য সৌন্দর্য্যের চিত্র আবিষ্কৃত করিতে পারিয়াছেন, এ জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। যে সকল দৃশ্যের প্রতি কবিগণের সচরাচর দৃষ্টি পড়ে,—তিনি কবিকুলের সেই সাধারণ মার্গ ত্যাগ করিয়া বক্রদৃষ্টিতে পথের নূতন নূতন এক একটী কোণ উজ্জ্বল করিয়াছেন। নাগা সন্ন্যাসিনী—নগ্নসুন্দরী ; সে কেন অঙ্গে ফ্রক মুড়ি দিয়া পথে হাঁটিবে, কবি ইহাই তাঁহার কবিতার একটী বিষয় করিয়া তুলিলেন,—কবিতার বিষয়টী যেমন, ভাষাও তেমনই—লীলাচঞ্চল ও একটু অদ্ভুত রকমের ; যথা—

"গীতগোবিন্দের সঙ্গে, ছিল রে গাঁথিয়া রঙ্গে,
উড়িয়া ভাষার ছন্দ কোন্ দোভাষী ?
শিখি-পুচ্ছ ছিঁড়ি হায়, সে গ্লানি সারিতে চায়,
মোরগ ফুলের গুচ্ছে মরি সাবাসি !
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী।"

কবির শ্রুতিও একটু অনন্যসাধারণ দিকে ন্যস্ত। কোকিলের কুহু, বীণা-ধ্বনি, রমণীর কণ্ঠস্বর, বেহাগ রাগিণীর আলাপ, এ সকল চিরাভ্যস্ত বিষয় পরিহার করিয়া কবি "ডায়মন-কাটা মলে"র ধ্বনি বিশ্লেষণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। অন্ধ যেরূপ কর্ণের সাহায্যে চক্ষুর অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা পায়, কবির চেষ্টাও সেইরূপ ; চক্ষু মুদিয়া শুধু শ্রুতির সাহায্যে তিনি মল-বাদিনীর পরিচয় প্রদানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এখানে বলা উচিত যে, এই মলের শব্দ দ্বারা পরিচয়টী তিনি এরূপ অভ্রান্তভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনে হয় তিনি রমণী-পাদপদ্ম-ধ্যানে জীবনের সামান্য অংশ ব্যয় করেন নাই।

অশোকগুচ্ছের অনেকগুলি কবিতারই এইরূপ এক স্বাতন্ত্র্য ও অদ্ভুতত্ব আছে, তাহা পাঠকবর্গকে সহসা নূতন সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন দেখাইয়া চমৎকৃত করিয়া তুলিবে। "অদ্ভুত রোদন," "অদ্ভুত সুখ," "অদ্ভুত শান্তি" —প্রভৃতি কবিতার প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কবি অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় সৃষ্টি করিয়া কবিত্বের এরূপ নবসৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, যে এই অদ্ভুতত্বই আমরা তাঁহার মৌলিকত্বের প্রধান উপাদান মনে করি। এই ভাবে কবিতাগুলির মধ্যে "লক্ষ্ণৌর আতা" অত্যুৎকৃষ্ট, আমরা তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রূর
"আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর !
"চাহিনাক 'সেউ'—যেন বিরহ বিধুর
"জানকীর চিরপাণ্ডু বদন রুচির !
"একটুকু রসে ভরা চাহি না আঙ্গুর
"সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধুটীর।
"চাহি না 'গন্নার' স্বাদ ! কঠিনে মধুর
"প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতীর।

"দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আত্তা,
"থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া,
"চঞ্চলা বেগম কোন হ'য়ে উল্লসিতা
"ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
"অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দেও মরি
"যেত মরি রসিকার রসনা উপরি।"

চুম্বন। দেবেন্দ্র বাবু অনেকগুলি কবিতা চুম্বন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। চুম্বন যে আমরা বিলাতী কাব্য হইতে বঙ্গসাহিত্যে আমদানী করিতেছি, তাহা বিবেচনা করা ভুল। সংস্কৃতে চুম্বন অর্থ রদখণ্ডন—উহা সাহিত্যিক শীলতাকে কতকটা অতিক্রম করে,—কিন্তু বিলাতী সাহিত্যে এই ব্যাপারের একটু কোমল ও ভদ্র সংস্করণ স্থান পাইয়া থাকে, তাহাতে অশ্লীলতার গন্ধ নাই। আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলে ইহার দৃষ্টান্ত সুলভ। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দদাস একটী পদে লিখিয়াছিলেন, রাধিকা যে পথে হাটিয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও সেই পথে পদাঙ্ক-গুলিকে চুম্বন করিতেছেন; সুতরাং অধর কিম্বা গণ্ডের প্রাপ্য তৃণ-গুল্মগুলি পর্য্যন্ত পাইতেছে। এ অবস্থায় চুম্বনের কবিতাগুলি আমরা ইংরেজীর নকল বলিতে চাহিতাম না, কিন্তু—

"দাও দাও একটী চুম্বন,
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে, সোহাগের কবি পাখা।"

নিতান্ত পক্ষেই ইংরেজীর ঘ্রাণ-বিশিষ্ট, তদপেক্ষা—

"তোমার ও ওষ্ঠ দুটী বাসন্তীযামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহার লাগি"

অংশটি অনেক গুণে মিষ্ট। কবি নিজের প্রিয়তমার মুখের শ্রেষ্ঠ-প্রশংসা স্থলে "চুম্বন আস্পদ" আখ্যা দান করিয়া অধর-উপাসনার একান্ত পরিচয় দিয়াছেন।

পদ্য সাহিত্যে অশোক গুচ্ছের স্থান। অশোকগুচ্ছের কবিতাগুলির মনোহারিত্ব সর্ব্বজনসম্মত হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। যে কোন গীতি পড়িলেই কবির মৌলিক শক্তি ও স্বভাবদত্ত প্রতিভা এবং সুকুমার ভাষার উপর অধিকার অনুভূত হইবে; তবে ইহার হাতে করুণ ও অদ্ভুত রস যেরূপ ফুটিয়াছে, সৌন্দর্য্যের চিত্র যেরূপ বিকাশ পাইয়াছে,—উদ্দীপনা তেমন হয় নাই। কবিতাগুলি

সেতারের রাগ আলাপনের মত, মিষ্ট ঝঙ্কারে মোহিত করে; কিন্তু উচ্চ ভৈরব রাগের সন্ধান জানে না। গীতিগুলি ললিত-লবঙ্গ-লতার মত সুন্দর ও মনোজ্ঞ, নিজ স্বাস্থ্যের মাধুরীতে ক্রীড়াচ্ছলে ছুটিয়াছে; কিন্তু যে কবিতা গভীর ও চিত্তমথনকারী শক্তির সহিত পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া অপার্থিব সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব বহনে উন্মুখ,—এগুলি সে শ্রেণীর কবিতা নহে;—ইহারা ছোট ছোট গার্হস্থ্য সুখ-দুঃখের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ,—কোন উচ্চ আদর্শের তত্ত্ব আবিষ্কার করে নাই; কেবল কবি যেখানে "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়াছেন, সেই সকল স্থানে কবিত্বপূর্ণ গীতি নয়নাসার-সিঞ্চিত হইয়া এক অপূর্ব্ব উত্তেজনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; শিশিরস্নাত মল্লিকার পবিত্রতার সঙ্গে আমরা সেই সকল স্থানে যেন কবিতার এক মহত্তর দীপ্তি দেখিতে পাই। হেম বাবুর "হতাশের আক্ষেপ" কবিতাটির অনুকরণে দেবেন্দ্র বাবু যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা মাতৃপূজার নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র। সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম বার আসলটি হইতে নকলটি সুন্দর হইয়াছে।

মিত্রাক্ষর ও ছন্দ

আমরা 'প্রদীপ' পত্রিকায় "পদ্মা" সমালোচনাকালে কবিতার দুচরণের মিল দেওয়ার সম্বন্ধে একটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম; শুধু শেষ অক্ষরের মিল থাকিলেই ভাল মিল পড়িল, ইহা স্বীকার করা যায় না। জনৈক স্কুলপাঠ্য-পুস্তক-লেখকের কবিতা পুস্তকে আমরা দেখিয়াছিলাম,—

"দিবানিশি থাকে বসি ডানায় ঢাকিয়া।
ইহাকেই বলে লোকে ডিমে তা'. দেওয়া।"

"ঢাকিয়া" এবং 'দেওয়া' এই দুটি শব্দের শেষ অক্ষরের মিল থাকাসত্ত্বেও উহা নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের ঐক্য না হইলে ভাল মিল পড়ে না। হিন্দী সাহিত্যে কবিতা সম্পর্কে এই নিয়মটি সাধারণতঃ রক্ষিত হইয়া থাকে, আজকাল বাঙ্গালা কবিতায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম বড় দৃষ্ট হয় না। রবীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে সতত সতর্ক, এবং তাঁহারই সদ্দৃষ্টান্তে প্রমথবাবু এবং অপর কয়েকজন সুকবি এই নিয়মটি রক্ষা করিয়া কবিতা লিখিতেছেন। দেবেন্দ্রবাবুর কবিতায় অনেক স্থলে 'দূরে'—'ধীরে' 'হতে' 'আচম্বিতে' 'বিভা—বিধবা' 'আরতি—স্মৃতি' 'চেলি—মিলি' 'মরি—ধীরি' 'ঘুরাইতে—ছুঁতে' প্রভৃতি ভাবের মিল দৃষ্ট হয়। আমরা তাঁহার কবিতা-

গুলি পাঠ করিয়া, এত মুগ্ধ হইয়াছি যে, এই ভাবের মিল সম্বন্ধে সর্ব্বদা প্রতিরোধী হইয়াও তাঁহার কবিতাগুলি পরিবর্ত্তিত কিম্বা সংশোধিত দেখিতে ইচ্ছা করি না। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে ভবিষ্যতের জন্য কবিকে একটুকু সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। তার পর, এক একটি গীতিতে, একইরূপ ছন্দ ব্যবহৃত হইলে বোধ হয়, শৃঙ্খলা বেশী থাকে। দেবেন্দ্রবাবুর কবিতার অনেক গুলিতে এ বিষয়েরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়;—তাঁহার এক কবিতাতেই সময়ে সময়ে নানারূপ ছন্দাত্মক অংশ দৃষ্ট হয়, —তাহা কোন নিয়মে নিয়মিত নহে, কোন স্থলে চতুর্দ্দশ অক্ষরের পদ চলিয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই হয়ত ত্রিপদী কিম্বা অন্য ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—সুতরাং কোন কোন কবিতায় একটি সমগ্র ছন্দ ফুটিয়া উঠে নাই। চারিছত্র পয়ারের পরে চারিছত্র ত্রিপদীতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যে কোন ভাবে কবিতাটী আরম্ভ করা যায়, শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাবটী বজায় রাখা বোধ হয় উচিত। এই সকল আঁটাআঁটি নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিলেও আমরা দেবেন্দ্র বাবুর কবিতা উচ্ছৃঙ্খল কোন প্রাকৃতিক মালঞ্চের ন্যায়, সুন্দর বলিয়া মনে করি। তাহাতে মালীর যত্ন ও কৌশলের অভাব লক্ষিত হইলেও পর্য্যাপ্তরূপে স্বভাবের সজীবতা ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।—"অশোক গুচ্ছ" সর্ব্বতোভাবে পাঠককে পরিতৃপ্ত করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শরৎ।

বর্ষীয়সী বরষায় করিয়ে বিদায়,
যোড়শী-রূপসী-বেশে,
মধুর মধুর হেসে,
চঞ্চলা শরৎ নামি আসিল ধরায়।

বসন ভূষণ আর রূপের-প্রভায়,
মোহিতে জগত-জনে,
মিলিয়ে স্বগণ-সনে,
শরৎ-সুন্দরী এসে প্রবেশে ধরায়।

বরষার অন্ধকার দূরিবার তরে,
শরৎ তপন-কর,
করিয়ে প্রখর-তর,
বিমল আকাশ মাঝে বিকীরিত করে।

বরষার মেঘঢাকা আঁধার আকাশ,
শরতের সমাগমে,
আপনা-আপনি ক্রমে,
অপসরি ক'রে দিল নীলিমা-বিকাশ।

বরষা-সঞ্জাত যত ধূলি পঙ্কিলতা,
শরতের পেয়ে সাড়া,
সরিয়ে পড়িয়ে তারা,
ঘুচাইল জগতের যত মলিনতা।

সুন্দর নীলিমাময় নির্ম্মল-আকাশে,
লইয়ে রূপের-রাশি,
উদিয়ে শরৎ শশী,
অতুল রজত রশ্মি জগতে প্রকাশে।

সুবর্ণের ফুলবৎ স্বচ্ছ নীলাম্বরে,
অসংখ্য তারকা-রাজি,
অপরূপ বেশে সাজি,
উজ্জ্বল বিমল-প্রভা বিকীরিত করে।

শরতের সমাদর করিবার তরে,
সবাই আনন্দভরে,
অপূর্ব্ব সুবেশ প'রে,
জগতের ষড়ৈশ্বর্য্য বিভাসিত করে।

সুন্দরী নবীনা আর চঞ্চলা শরতে,
দশদিক্ সুপ্রকাশ,
সুবিমল নীলাকাশ,
উজ্জ্বল তপন কর বিভাসে জগতে।

নির্ম্মল নীলিমাময় সুন্দর আকাশে,
শরতের পূর্ণশশী,
ঢালিয়ে উজ্জ্বল-রশ্মি,
বিমল শরৎ-প্রভা ধরায় বিকাশে।

উদ্যান প্রান্তর বনে বৃক্ষলতা সবে,
আনন্দে সুখের ঘোরে,
দাঁড়াল সুবেশ প'রে,
আগুসরি শরতেরে লইতে নীরবে।

পশুপক্ষী মানবাদি যত জীবগণ,
চঞ্চল-ঋতুর বশে,
সবাই চঞ্চল বেশে,
উচ্ছ্বসিত মনোল্লাসে করে বিচরণ।

কি যেন কি সুখঘোরে সবাই বিভুল,
কার' আশাপথ পানে,
চেয়ে থাকি সবজনে,
কার' আগমন আশে হইয়া আকুল।

দারুণ চাঞ্চল্যবশে ব্যাকুলিত চিতে,
যেন প্রিয় সম্মিলন,
আশা ধরি অনুক্ষণ,
সময় যাপন করে অস্থির ভাবেতে।

চঞ্চলা শরতাগমে বারিদ নিচয়,
ক্ষণে করে গরজন,
ক্ষণে করে বরিষণ,
আবার ক্ষণেকে হয় অদৃশ্যে বিলয়।

আবার ক্ষণেক পরে হইয়ে আগত,
কড় কড় গরজনে,
ছর ছর বরিষণে,
আকাশে বিদ্যুৎপ্রভা বিশ্বভীতি-প্রদ!

আবার মুহূর্ত্তে সব হয় সে বিলয়,
নিরমল নীলাকাশে,
শারদ চন্দ্রমা হাসে,
আবার তারকা রাজি গগনে উদয়।

ঐশীক-সৌন্দর্য্যময়ী মধুর শরৎ,
অতুল সৌন্দর্য্য ভরে,
সবারে ভূষিত করে,
অসীম চাঞ্চল্য-পূর্ণ করিয়ে জগৎ।

মধুর ঐশীকশক্তি সঞ্চারিত ক'রে,
মধুর মধুর ভাবে,
ভজাতে সকলে ভবে,
বরষ বরষ আসে অবনীর'পরে।

মধুর ঐশীক ভাব বিকশিত ক'রে,
মহান্ কামের ভরে,
মহাশক্তি পূর্ণ ক'রে,
অতুল মাধুর্য্যময় করি এ সংসারে।

রঙ্গের প্রাধান্যবশে শরৎ ঋতুতে,
মহান্ বাসনা ভরে,
কাম্য শক্তি হৃদে ধ'রে,
মধুর ঐশীক ভাব পূজে হৃদয়েতে।

নিরমল শরতেতে প্রকৃতি সুন্দরী,
অতুল মাধুর্য্য ল'য়ে,
আপনি মণ্ডিতা হ'য়ে,
অনন্ত বিভুর রূপ ভুবনে বিতরি ;—

অতুল বিভুর জয় করিতে ঘোষণা,
মহান্ বিজয় নাদে,
পূর্ণ করি এ জগতে,
অনন্ত মধুর পদ করেন ভজনা।

শ্রীমতী ফুলকুমারী দেবী।

প্রবাসীর পত্র।

লণ্ডন—১২ই মে, ১৯০১।

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার স্নেহমাখা পত্র ও পুস্তক দুইখানি পেয়েছি। পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, বল্‌তে পারি না। আপনার আমার উপর কত অনুগ্রহ ও স্নেহ, তা' পত্র-খানির প্রতি বর্ণে প্রকাশিত। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে,—আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই যখন একরকম ভুলে গেছে,—পত্র পাওয়াতে বুঝ্‌লেম, আপনার গভীর স্নেহ আজও আমাকে ভুল্‌তে পারেনি।

আপনার পুস্তক দুইখানি পাঠ ক'রে বিশেষ আনন্দিত হ'লেম। প্রত্যেক কবিতাই আমার হৃদয় স্পর্শ করে। হায়! কতদিন বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করি নাই; কতদিন মাতৃভুমির মুখদর্শন করি নাই! আপনার কবিতা প'ড়ে দেশের সব কথা যেন মনে পড়্‌তে লাগলো;—যেন দেশের ছবি চোখের গোড়ায় কে ধরে' এনে দিলে। হায়! কবে যে দেশে ফিরে যাব, জানি না। শুনে হাসবেন, আপনার অবিদিত নাই, আমিও মাঝে মাঝে কবিতা লিখ্‌তেম। এদেশে আসিয়া অবধি সে চর্চ্চা নাই। আপনার কবিতা প'ড়ে, খুঁজে খুঁজে সেই ছেঁড়া খাতা খানি বা'র করলেম; ও তা' থেকে দু একটা পড়্‌লেম। ছেলে খেলা বলে', তাতে'ও একটু আনন্দ অনুভব করিলাম।

আপনি আমাকে সংক্ষেপে এদেশে থাকার বিবরণ লিখিতে বলে'ছেন। যা পারি লিখি; আপনার নিজগুণে হয়ত ভাল লাগতে পারে।

সৌভাগ্য-ক্রমে জাহাজে আমরা তিন জন বাঙ্গালী যাত্রী ছিলেম। বাঙ্গালী অনেক ছিল—মুসলমান খালাসী ও Steward, সে জাহাজে অনেক ছিল। তিন জন সহযাত্রী বাঙ্গালী—স্বামীজী, মিঃ দত্ত ও আমি। আমাদের তিন জনে বেশ সৌহার্দ্দ ছিল। যখনই জাহাজ কিনারায় লাগ্‌তো, আমরা নেমে সহর দেখে আস্‌তেম। কোন স্থানই বাদ দিই নাই। প্রথমে মাদ্রাস—মাদ্রাসটা আমার আসলে ভাললাগে নাই। বেজায় গরম—শীত-কালেও গরম। সহরটী দেখে আমার কটকের কথা মনে পড়্‌তে লাগলো। আপনি কখন কটকে গেছ্‌লেন কি? বোধ হয়, ৺জগন্নাথ-ক্ষেত্রে যাবার সময় গিয়ে থাক্‌বেন। সেই রকম ছোট ছোট ছাড়া ছাড়া বাড়ী—মাঝে মাঝে পচা পুকুর ও বন জঙ্গল। অনেক হিন্দুদেব-দেবীর মন্দির—উড়িষ্যা দেশের মন্দিরের ধরণে নির্ম্মিত। আমাদের বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে বিলাতী ছদ্ম বেশ পরিত্যাগ করলেম; এবং মস্ত এক চারি হাত বহরের চেলীর কাপড়, চাদর পর্‌লেম ও মাদ্রাসী পাক্‌ড়ী মাথায় দিলেম। তার পর স্নানাদি করিয়া নগ্ন পদে ভগবান্ পার্থসারথী দেবের মন্দিরে গমন করলেম। পা পুড়ে যেতে লাগ্‌লো। মন্দিরটী বৃহৎ। মন্দিরের সম্মুখ থেকে ফটক পর্য্যন্ত বৃহৎ আঙ্গিনা, খানিকটা দালানের মত ছাদ দিয়ে ঢাকা; বোধ হয়, এইখানে সময়ে সময়ে যাত্রা, নাচ প্রভৃতি হয়। পার্থ-সারথী অবশ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—সুবৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত বিগ্রহ। ভগবান্ পার্থ-সারথী দেবের পূজা কর্‌লেম। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করাতে লাগ্‌লো, সব বুঝতে পার্‌লেম না; কিন্তু মর্ম্ম এই—"হে দেব! তোমার চারি-হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; কিন্তু সংহার-কারী বিশেষ কোন অস্ত্র নাই। তুমি এই বেশে ধনঞ্জয়ের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলে। এই বেশে তোমার শ্রীমুখ হ'তে গীতা-রত্ন বাহির হইয়াছিল,—যাহা পাঠ করিয়া জগৎ ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে। তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর" ইত্যাদি। তিনি পূজা গ্রহণ কর্‌লেন কি না জানি না, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বিলক্ষণ দক্ষিণা গ্রহণ কর্‌লেন। তবে মোহান্ত মহাশয় অতি সজ্জন ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি আমাদের সহিত মিষ্ট কথা ক'য়ে আমাদের বিশেষরূপে আপ্যায়িত কর্‌লেন।

আবার পা পোড়াতে পোড়াতে বন্ধু মহাশয়ের বাটীতে ফিরে এলেম। তিনি অতি ভদ্রলোক। মনে বড় আশা ছিল যে, গিয়ে দেশী মাছের ঝোল, ভাত প্রভৃতি খাব। ভাত এল—ভাত, অপর্য্যাপ্ত গাওয়া ঘি, লঙ্কার

ঝোল, লঙ্কার চড়চড়ি ও অবশেষে লঙ্কার অম্বল। পায়ের ফোস্কা তিন দিন ছিল, মুখের ঝাল বোধ হয়, আরও তিন দিন বেশী ছিল।

বন্ধু মহাশয় কোন কলেজের প্রফেসর—বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক। আহারের পর তিনি সেখানকার অনেক বড় লোকের বাড়ী নিয়ে গেলেন। একখানি বাড়ী সমুদ্রের কোলে, আমার বড় ভাললেগেছিল। যেথানেই দাঁড়াও, সম্মুখে উদার নীল সিন্ধু, সুন্দর শীতল হাওয়া। গৃহস্বামী আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। চা খেতে দিলেন। আমার ভয় ক'রতে লাগলো, আবার বুঝি বা লঙ্কার ঝোল এসে হাজির হয়।

জাহাজ রাত্রিতে ছেড়ে দিল। আবার পাঁচ ছয় দিন বঙ্গোপসাগরে,—ডেঙ্গার নাম গন্ধ নাই। কেবল মাদ্রাসের কথা মনে হ'তে লাগ্‌লো। সহরটি খারাপ হ'লে কি হয়—লোকেরা অতি সজ্জন। তা' ছাড়া উহা ভারতবর্ষের শেষ বন্দর। মাতঃ আর্য্যভূমি! সে আজ কতদিন তোমার শ্যামল ক্ষেত্র, রজতবাহিনী নদ নদী ছেড়ে, এ ম্লেচ্ছদেশে বাস করিতেছি। মা স্বর্ণপ্রসবিনি! তোমাতে কিসের অভাব? তুমি দুঃখিনী, পরাধীনা জননী; সকল অভাব হয় ত দূর ক'র্‌তে পারবে না। কিন্তু তোমার দান সমস্তই স্নেহের ও মমতার। সে আজ কতদিন—আবার তোমায় দেখ্‌বো!

জাহাজে সমস্ত রাত্রি কেবল দেশের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। শুনেছি, কত লোক মাদ্রাস থেকে বাড়ী ফিরে গেছে; প্রাণ যেন হু হু কর্‌তে লাগলো। মনে হ'ল, আমিও যাই। ক্রমে ভাব্‌লেম,—শত্রু হাস্‌বে; যা'রা আগে সম্মান ক'র্‌ত, তা'দের নিকট হাস্যাস্পদ হ'তে হ'বে; লোকে কাপুরুষ ভাব্‌বে। গীতায় ভগবানের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো। একদিন মহাবীর পার্থ বিকল হ'য়েছিলেন; ক্ষত্রিয়-বীর সমরাঙ্গন হ'তে গৃহে ফিরে যাচ্ছিলেন—চিরদুঃখে, চির বিস্মৃতিতে, কাপুরুষতায় ফিরে যাচ্ছিলেন; সেই সময় ভগবান তাঁ'কে মনের বল দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির রাখিয়াছিলেন। তাঁ'কে ডাক্‌লেম; তিনি অর্জ্জুনের সারথীর মত, লক্ষ্মণের পৃষ্ঠদেশে দশভূজার দশ হস্তের মত, সতত যেন আমার সঙ্গে আছেন—মনে হ'ল। তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ কর্‌লেম। প্রার্থনা কর্‌লেম, যেন তিনি আমাকে এ বন্ধুহীন বিদেশে সতত রক্ষা করেন ও মনে বল দেন।

যা'ক, রোজ ভোরে কেবিন থেকে ডেকে উঠে আস্‌তেম। একদিন ভোর বেলায় উঠে দেখি, জাহাজ ক্রমে এক হরিৎ নারিকেল কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হ'চ্চে। মনে কত আহ্লাদ হ'তে লাগলো—আবার ডেঙ্গা—যেন সেই কুঞ্জবনের পাখীর গান কাণে আস্‌তে লাগ্‌লো। বাল্মীকির স্বর্ণ লঙ্কা, ভগবানের বিচ্ছেদের কথা মনে প'ড়লো, তিনি সেই বিরহ-দুঃখে কি ভীষণ সংগ্রাম ক'রে, জানকীকে উদ্ধার ক'রেছিলেন। মনে যেন শান্তি আস্‌তে লাগ্‌লো।

ক্রমে জাহাজ কলম্বো বন্দরে এসে নোঙ্গর ফেল্‌লে। এখানকার বন্ধু একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী ইংরাজ; তিনি তাঁ'র নিজের গাড়ী ক'রে কলম্বো সহর ভ্রমণ ক'রে নিয়ে বেড়ালেন।

সহরটী অতি সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন; জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। বন্ধু আমাদিগকে একজন সিংহলবাসী ভদ্রলোকের বাড়ী নিয়ে গেলেন। সে বাড়িটী সমুদ্রের ধারে; কতকটা সাহেবদের বাড়ীর মত; সম্মুখে ও পশ্চাতে বাগান। পশ্চাতের বাগানে সমুদ্রের ধারে কেদারায় ব'সে আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রলেম;—কদলী ও সুমিষ্ট নারিকেল, চা প্রভৃতি। কলম্বোতে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, ও প্রশস্ত রাজপথ আছে। সংক্ষেপে কলম্বো অতি রমণীয় স্থান। কলম্বোতে আমরা প্রায় সমস্ত দিন ছিলাম।

তারপর আটদিন আরব সাগরে। সকালে উঠে চা, তারপর breakfast, তারপর dinner, আবার চা, তারপর supper, তারপর নিদ্রা, আর দেখ্‌বার জিনিষের মধ্যে চারিদিকে জল। জাহাজ দিন রাত চলে'ছে। সন্ধ্যা-বেলায় বেড়াতে যাবার জন্য মন কেমন কর্‌তো,—বীডন গার্ডেনে যেতে ইচ্ছা কর্‌তো।

এডেন্—সকাল বেলায় জাহাজ থেকে মন্দ দেখা'চ্ছিল না। অবশ্য আমরা কেবল ইংরাজপল্লীই দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। ভ্রমণেচ্ছা বড়ই বলবতী—তাহা আমরা নেমে গিয়ে গাড়ী ক'রে সহর ঘুরে এলুম। দেশীয় লোকের বাস-স্থান Native Townটা—যেন আমাদের দেশের পশ্চিমের নোংরা একটী ছোট সহরের মতন; চারদিকে বদনা-ধারী মিঞার দল। ভয়ানক গরম। দোকানে ভাঁড়ে ক'রে জল বিক্রী হ'চ্চে,—ইচ্ছা হয়, কিছু দিয়ে জল কিনে খাও। ক্লান্ত হ'য়ে প্রায় আধ-ঝল্‌সান হ'য়ে জাহাজে ফিরে এলেম।

সেখানেও সুখ নাই, কয়লা বোঝাই হ'চ্চে। সব দরজা জানালা বন্ধ ক'রে কেবিনে ব'সে ব'সে ঘামে ভিজে যে'তে লাগ্‌লেম।

তারপর লোহিত সাগর—এত গরম বুঝি সাহারাও নয়। আমরা মেয়ে পুরুষে ডেকে বিছানা ক'রে শুয়ে থাকতেম ;—একধারে মেয়েরা, একধারে আমরা। লোহিত সাগর জাহাজের পক্ষে বড় বিপদ-জনক সমুদ্র; চারিদিকে পাহাড়গুলো মাথা উঁচু ক'রে র'য়েছে; যেন বাঘ শিকার সন্ধানে (Lying-in-wait) ওৎপেতে আছে। এক যায়গায় ক্রমাগত দশটা পাহাড়,—ওগুলিকে যীশুর দশ শিষ্যের পাহাড় বলে।

তারপর সুয়েজ বন্দর। এখান থেকে রেলে চ'ড়ে সুয়েজ সহর দেখ্‌তে গেলাম। সঙ্গে একজন গাইড (পথপ্রদর্শক)। সহরটা কতকটা বিলাতি সহরের মতন। সহর ছাড়িয়া গ্রামে চল্‌লেম। একটা আঙ্গুরের বাগানে গেলেম। আমি ত বাগানে ঢুকেই মাচা থেকে পেড়ে পেড়ে আঙ্গুর খেতে লাগ্‌লাম। একটী ইটালীয়ান ছোঁড়া তেড়ে এসে তার নিজের ভাষাতে কি বল্‌তে লাগ্‌লো! আমি বল্‌লেম, আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি না—তুই Go to hell। সে বোধ হয়, আমার কথা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল। অবশেষে গাইড্‌ আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এ মাঠ নয়, উহা ওদের ব্যবসার জিনিষ, আমাদের কিছু দিতে হ'বে। অবশ্য আমি তা'কে এক-বারে বঞ্চিত কর্‌লেম না। ইজিপ্ট-বাসীরা মুসলমান-মতাবলম্বী হ'লেও বোধ হয়, এদের স্ত্রীজাতির তত পরদা নাই; এক রকম ঘোম্‌টা মাথায় দিয়ে দলে দলে স্ত্রীলোকেরা মসজিদ্‌ থেকে ফিরে যাচ্চে। অনেকেই চোখ ঠার্‌তে লাগ্‌লেন। দুই একজন চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"ইন্দী" "ইন্দী"। আমি ভাব্‌লেম, "বেটীর কি চোখের ঘুৎ, ঠিক ধ'রেচে বাঙ্গাল-পুৎ।" ভারতবর্ষ পশ্চাতে আমরা দেশকে দেশে ফেলে ছুটে আস্‌ছি—সাহেব সেজিচি—কিন্তু তবুও "ইন্দী-ইন্দী"। মন যেন কর্কশভাবে ব'লে উঠ্‌ল, কে "ইন্দী"—আমরা "সাহেব"।

যে রকম ক'রে আরম্ভ ক'রেছি, তাহাতে যে আজ রাত্রিতে কাহিনী শেষ হ'বে, তা' বলে' বোধ হ'চ্চে না। এখনও এদেশের একটা কথা বলা হয় নাই। এখনও Bay of Naples ও পম্পের ধ্বংশাবশেষের কথা বলা হয় নাই। এক নিশ্বাসে রামায়ণ শেষ করার মতন আজ আপনাকে সব লিখ্‌বো। বড়ই সংক্ষেপ হ'বে, আমার মনের মতন বর্ণনা হ'বে না।

ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রতিও নানাবিধ অত্যাচার হ'বে—সে সব ধ'র্‌বেন না।

সুয়েজ কেনাল—সুয়েজ ছেড়ে আমরা সুয়েজ খালে ঢু্‌কলেম। খালটী কতকটা বাগবাজারের খালের মত, যেন হাত দিয়ে ডেঙ্গা ছোঁয়া যায়। দুধারেই মাঠ; এক ধারে রেলের লাইন—মাঝে ষ্টেসন ও কেনাল-অফিসারদের বাড়ী।

বেলা আড়াইটা তিনটার সময় Port Saiidএ এসে জাহাজ লাগ্‌লো। ছোট সহর, কিন্তু বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডাহা বিলাতি সহর। পূর্ব্ব পশ্চিমের সঙ্গমস্থল। সকল জাহাজই এখানে দাঁড়ায়; কয়লা বোঝাই করে, তারপর নানাদেশে চলে' যায়। আমরা নাম্‌লেম, সহরটা বেড়ালাম, মেলাই চুরুট সিগারেট কিন্‌লেম। চারিদিকে কেবল ডক্ ও জাহাজ—এত জাহাজ বুঝি কোথাও নাই।

রাত্রিতে Port Saiid ছাড়্‌লেম। তারপর ক্রমাগত পাঁচ ছয় দিন ভূমধ্য-সাগরের উপরে। গাঢ় নীল জল; এত গাঢ় নীল কোথাও দেখি নাই।

ভোর হ'চ্চে; তখনও অন্ধকার ছাড়ে নাই, আমরা Bay of Naplesএ এসে পড়্‌লেম। আমরা ডেকের উপর বসে' দেখ্‌ছি, মনে কত আশা-এইবার ইউরোপের প্রথম সহর দেখ্‌বো। দেখছি ক্রমে ফরসা হ'চ্চে, একটী একটী করে আলো নিবে যাচ্চে; ইটালিয়ান বালিকারা যেন আমাদের দেশীয় সুরে গান গাচ্ছে। সুর বড় মিষ্ট। অন্ধকার যেমন আলো হ'তে লাগ্‌লো, তেমনি মনে হ'তে লাগ্‌লো, যেন চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজ্‌ছে, আরতি হ'চ্চে।

Bay of Naples অতি সুন্দর; আমি তার বর্ণনা ক'রতে অক্ষম। সমুদ্রের উপরে দাঁড়িয়ে তীর যেন অর্দ্ধ চন্দ্রাকারের শোভা পাচ্ছে। তীরে সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি। এক পার্শ্বে ভিসুভিয়স্ অগ্নি উদ্গীরণ কর্‌ছে। সমুদ্রের উপর অসংখ্য জাহাজ।

Breakfast খেয়ে আমরা পাঁচ ছয়জনে মিলে একজন লোক (গাইড) সঙ্গে নিয়ে সহর ভ্রমণে বেরুলাম। ইটালী দেশটী ঠাণ্ডা নয়—আমাদের গরম লাগ্‌তে লাগ্‌ল। সহরের নানা গির্জ্জা, মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখে, আমরা পম্পের ধ্বংশাবশেষ দেখ্‌তে চল্‌লেম। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে 'একদিন সন্ধ্যা বেলা পম্পেবাসীরা প্রত্যহ যেমন আমোদ আহ্লাদ, গান

বাজনা, নাচ থিয়েটার প্রভৃতি করত সেই দিনও তেমনই ক'রছিল। সেই প্রমোদের মধ্যে হঠাৎ ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার! যারা পাব্‌লে পালাল; অনেকেই পুড়ে ম'রলো; সমস্ত সহরটা ছাই-পাঁশে মাটীতে ঢেকে গেল। সহরের চিহ্নই রহিল না। কেউ আর পম্পের কথা ভাবে না। পম্পে যেন ছিল না। কেবল ইতিহাসে পম্পের গৌরবের কথা পুরাণ কাহিনীর মত শোনা যায়। বেশী দিন নয়, একজন কৃষক লাঙ্গল দিতে দিতে কি একটা পুরাণ পাত্রের মতন কুড়িয়ে পায়; ক্রমে খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে অস্ত্র শস্ত্র, নর-কঙ্কাল, ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত বেরুতে লাগ্‌লো। ক্রমে রাস্তাঘাট, মন্দির, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতি কত কি বেরুতে লাগ্‌লো। ইতিহাসের লিখিত অলিখিত নানা প্রকার জিনিষ বেরুল। আমরা যখন দেখি, তখনও খোঁড়া শেষ হয় নাই; অনেক জায়গায় অর্দ্ধেকটা বেরিয়েছে; অর্দ্ধেকটা বাকী আছে। ভাবুন দেখি, স্থানটী কত interesting; পুরাতন ইতিহাসের জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

আজ বড় ঘুম পাচ্ছে; আপনাকে অন্যান্য কথা বারান্তরে লিখিব।

স্নেহাভিলাষী—শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র।

কবিতা-কানন।

নীরবে।

নীরবে উঠিয়া সূর্য্য
　　নীরবে ডুবিয়া যায়;
নীরব নলিনী তাই
　　নীরবে সে-পানে চায়!

নীরবে চন্দ্রমা হাসে
　　নীরবে চকোর উঠে;
নীরব আকাশ গাত্রে
　　নীরবে তারকা ফুটে!

নীরবে বাড়িলে বৃক্ষ
　　নীরবে মুকুল ধরে;
নীরব নিয়মে শেষে
　　নীরবে তাহারা মরে!

নীরবে বেসেছি ভাল
　　নীরবে দিয়েছি প্রাণ;
নীরব প্রাণের সনে
　　নীরবে গাহিব গান;

নীরবে তোমায় হেরে
　　নীরবে পাইব সুখ;
নীরব তোমার মূর্ত্তি
　　নীরবে নাশিবে দুখ!

নীরবে মরিয়া গেলে
　　নীরবে খুঁজিয়া দেখো;
নীরব এ হৃদিতলে
　　নীরবে কি—কথা রেখো!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

আক্ষেপ।

আহা কিবা সরোবরে কুমুদিনী ফুটে'ছে,
সুনীল আকাশে কিবা শশধর ভাসি'ছে,
চারিদিকে তারাগুলি কি শোভায় শোভি'ছে,
হেরিয়া ধরিত্রীসতী উল্লাসেতে হাসি'ছে !

মধুর পবন কিবা বহিতেছে সঘনে,
ফুলবাসে আমোদিত করি এই বিজনে,
নীরোর্ম্মি খেলি'ছে কিবা মৃদু মৃদু স্বননে,
হেরিয়া আমার হৃদি দুখ-নীরে ভাসি'ছে।

আমার হৃদয়-বৃন্তে যে কলিকা রহিত,
অফুটন্ত, তবু কত সুসৌরভ বহিত,
সুষমা হেরিলে তার মন প্রাণ মোহিত,
আজ যেন তার কথা পুনঃ মনে উদি'ছে !

এক দিন তারে ল'য়ে এই খানে বসিয়ে,
কত কি হেরিতেছিনু সুখ-নীরে ভাসিয়ে,
সে আমারে ব'লেছিল সরসীরে দেখা'য়ে,
হের নাথ নীলজল কি শোভায় শোভি'ছে !

মনে পড়ে এক দিন সুমধুর সমীরে,
ভ্রমিতেছিলাম সুখে ধরি প্রিয়া-সু-করে,
হাতে ধরি প্রিয়তমা সুধেছিলা আমারে,
বিধি কি এ সুখ মোর চিরভাগ্যে লিখেছে !

সান্ধ্যকালে কোন দিন মনোহর বাগানে,
বসিয়ে দু'জনে মোরা হেরিতাম প্রসূনে,
মন প্রাণ সুখী হ'তো কুসুমেরি আঘ্রাণে,
এ জীবনে সেই সুখ চির তরে গিয়েছে !

আর না জীবনে মম সেই সুখ হইবে,
সে বদন নেহারিয়ে মনোদুখ ঘুচিবে,
সে অমিয় হাসি হেরি এ পরাণ জুড়া'বে,
না জানি কি পাপে বিধি হৃদি-নিধি হ'রেছে !

মোহিনী প্রতিমা তার সদা জাগে হৃদয়ে,
নিদ্রাতে স্বপন হেরি যেন তারে লইয়ে,
প্রেমালাপ করি কভু, কভু বক্ষে রাখিয়ে,
পরাণ আমার যেন সুখ-স্রোতে ভেসেছে !

সুষুপ্তি টুটিয়া গেলে, সব শূন্য হেরিয়া,
হতাশে পরাণ মম উঠে তবে কাঁদিয়া,
মনে করি কাঁদিব না, কিন্তু চক্ষু বাহিয়া,
কথা নাহি শুনি, অশ্রু আপনিই ঝরেছে!
যত দিন দগ্ধ হৃদি ল'য়ে রব বাঁচিয়া,
কাটাইতে হবে কাল নীরবেতে কাঁদিয়া,
না ফুটিতে ফুল আহা গেছে ভূমে ঝরিয়া,
নগ্ন-বৃন্ত হ'য়ে কে বা সুখী হ'তে পেরেছে?

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে।

ব'লোনা ভুলিতে।

স্মৃতি টুকু আছে যাই, আজ(ও) বেঁচে আছি তাই,
এ স্মৃতি হৃদয় হ'তে নিওনা নিওনা হরি;
অন্য যাহা ইচ্ছা নাও, কেবল ভাবিতে দাও,
'এভবে তোমার(ই) আমি,' সতত পরাণ ভরি।
নাহি চাই ভালবাসা, অন্য কোন(ও) নাহি আশা,
নিয়ত রহিব এই মধুময়ী স্মৃতি ল'য়ে,—
"এ ভবে আমি তোমার, অন্য কেহ নহে আর,"
যাবৎ জীবন র'বে এ ভাবে বিভোর হ'য়ে।
এ হৃদয় পদ্মাসনে, বসাইয়ে সযতনে,
তোমার মূরতি-খানি মুগ্ধকরা-প্রাণ-মন;
কতই কুসুম তুলি, দিব প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি,
নেহারিব অনিমেষে, ভরি দুটী এ নয়ন।
এ স্মৃতি-মদিরা-ঘোর, যেন নাহি ঘুচে মোর,
দিওনা প্রাণেতে ব্যথা, তোমারে ভুলিতে বলি;
ও কথা শুনিব যবে, নিশ্চয় জানিও তবে,
এ দেহ-পিঞ্জর হ'তে প্রাণ-পাখী যাবে চলি!

শ্রীঅনাথবন্ধু দে।

বিবিধ।

কয়েকটী প্রশ্ন।

১। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা ক্ষণকালের জন্য অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া নিবে কেন?

২। অত্যন্ত উত্তপ্ত ধাতুখণ্ড শীতল জলে নিমজ্জিত করিলে চোঁ চোঁ করিয়া এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? জ্বলন্ত অঙ্গারও জলে নিক্ষেপ করিলে এইরূপ শব্দ হয়, ইহারও কি একই কারণ?

৩। বাতি, প্রদীপ, কেরোসিন ল্যাম্প প্রভৃতির ক্ষুদ্র অগ্নি-শিখায় সামান্য বেগে বাতাস লাগিলেই উহা নিবিয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডে বাতাস লাগিলে অধিকতর প্রবল হয়, ইহার কারণ কি? এবং শিখাহীন ক্ষুদ্র অগ্নিও বায়ুর সাহায্যে প্রবল হয় কেন?

৪। একখণ্ড শ্বেত-বর্ণের ডুম বা চিমনি ভাঙ্গা কাচ লইয়া উহার মধ্য দিয়া সূর্য্যকে দেখিলে সূর্য্যকে পাট্‌কিলে রংয়ের দেখায় কেন? উহা কি এমন কোন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত, যাহা সূর্য্যের লোহিত ভিন্ন অপর ছয় প্রকার বর্ণকে ঢাকিয়া রাখিয়া থাকে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহা কি?

৫। যদ্যপি কোন বায়ু-শূন্য (Vacuum) স্থানে একটী গোল খেলিবার মারবেল বা রবারের বল, কিছু উচ্চ হইতে একখণ্ড ঠিক সমতল প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সেই বল বা মারবেল পড়িয়া ঠিক তথায় থাকিবে; না, কোন দিকে সরিয়া যাইবে? যদ্যপি সরিয়া যায়, তবে কোন্ দিকে যাইবে, এবং সে দিকে যাইবার কারণই বা কি?

৬। নিদাঘকালে জীব-দেহ এবং কোন কোন উদ্ভিদ-দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, এই ঘর্ম্ম নির্গত হয় কেন? শীতকালেই বা সচরাচর হয় না, কি কারণে?

৭। আকাশের বর্ণ নীল কেন?

৮। বঙ্গের কোন প্রথিতনামা লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন,—"চতুর্দ্দিকের আনন্দের মর্ম্মবেদনা-সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রোতার মর্ম্ম স্পর্শ করিতেছিল।" 'আনন্দের মর্ম্মবেদনা' কিরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

যদ্যপি কোন মহোদয় উল্লিখিত প্রশ্ন কয়টীর অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর দেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।

শ্রীহরিহর শেট।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩০৮। [৯ম সংখ্যা।

কৃষি-শিক্ষা।

ইংরাজজাতি স্বাধীন বৃত্তির পক্ষপাতী। ইহারা কি কৃষি, কি বাণিজ্য, কি আর কোন বৃত্তি, রাজকীয় ধনকোষের সাহায্যে যে পরিপোষিত হয়, ইহা ইচ্ছা করেন না। যে যে বৃত্তি অবলম্বন করুক না কেন, স্বাধীন ভাবে, বিনা-সাহায্যে যেন উহার অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাই স্বাধীনচেতা ইংরাজ জাতির প্রবৃত্তি। তবে ইংলণ্ডের বাহিরে, অর্থাৎ উপনিবেশাদিতে, ইংরাজ জাতির এই প্রবৃত্তি তাদৃশ বলবতী নহে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে কৃষি, বাণিজ্যাদি বৃত্তির সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের মাতৃ-রাজ্য ইংরাজ কৃষক, বণিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য ততদূর সাহায্য করিতেন না। আমরা রাজদ্বারে যখন তখন সাহায্যার্থে যে প্রার্থনা ও ক্রন্দন করি, আর সেই প্রার্থনা ও ক্রন্দনের ফল আশানুরূপ পাই না, তাহার মূলে ইংরাজ রাজ-শাসনের এই মূলতন্ত্র রহিয়াছে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডের প্রথম কৃষি-বিদ্যালয় ১৮৪৫ সালে সাইরেণসেষ্টর নগরে স্থাপিত হয়,—কিন্তু ইহা এক

কৃষক-সমিতির (Fairford Farmer's Club) উদ্যোগের ফল। সাইরেণ-সেষ্টর কলেজ গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয় নহে; সাধারণ জমিদার ও কৃষকদত্ত অর্থ হইতেই এই বিদ্যালয়ের ব্যয় সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণ ধন-কোষ হইতে সাইরেণসেষ্টর কলেজ স্থাপনের উদ্দেশে কোনই সাহায্য করা হয় নাই। ভারত-গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য তাদৃশ ব্যয় বা যত্ন করেন না, এ কথা বলিবার পূর্ব্বে ইংরাজ-জাতি স্বদেশে এ সম্বন্ধে কিরূপ নীতির অনুসরণ করেন, এ বিষয় জানা আবশ্যক। আমাদের দেশের জমিদারগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও উদ্যোগ ব্যতিরেকে যে একটী রীতিমত কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া উঠিতে পারেন, সে বিষয়ে আশা কম। কিন্তু স্বাধীনচেতা, দেশ-হিতৈষী জমিদার যে এককালে বঙ্গদেশে নাই, এ কথা বলাও ঠিক নহে। ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে, ইংরাজ-জমিদারদিগের ন্যায় বিচক্ষণ ও স্বাধীনচেতা অথচ প্রজাহিতে অনুরক্ত জমিদার বঙ্গদেশের মধ্যেও স্থানে স্থানে উদ্ভূত হইতেছেন। ইঁহাদের কয়েক জনের উদ্যোগে ও সাহায্যে বঙ্গদেশের মধ্যে যে সাইরেণসেষ্টরের ন্যায় একটী কলেজ স্থাপিত হইতে পারে না, এরূপ আমি মনে করি না। বি-এ, এম-এ পাস করিবার জন্য কয়েকটী কলেজ একণে জমিদারগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই সকল কলেজের দ্বারা দেশের যতদূর উপকার হইতেছে, একটী রীতিমত কৃষি-কলেজ দ্বারা তদপেক্ষা দেশের চতুর্গুণ মঙ্গল সাধিত হইবে। সকল দেশে কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন হইয়াছে, ভূমির উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে, আর ভারতবর্ষের কৃষি-বৃত্তিরই এরূপ চরম অবস্থা, যে, ইহার উন্নতির প্রয়াস ও উদ্যোগ বিড়ম্বনা মাত্র, এ কথা বাতুলের কথা। কৃষি-বৃত্তি সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা ভিন্ন আর যাহা কিছু উপায় দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ উদ্ভাবিত হইতেছে বা হইবে, সমস্তই ইহার তুলনায় অপদার্থ।

অবশ্য লোকে বলিবে, "কৃষিশিক্ষা দ্বারা দেশের উপকার হয় হউক, ভালই কথা, গবর্ণমেণ্ট এই উপায় অবলম্বন দ্বারা দেশের উদ্ধার করুন।" কিন্তু যে কোন উদ্যোগ বা বন্দোবস্ত দেশের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন, সে সমস্তই সাধারণ প্রজার সাহায্যে। কি শিক্ষাদান, কি রোগীর চিকিৎসা, কি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের অন্নদান, সকল কার্য্যেই সাধারণের সাহায্য গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সাধারণ কিন্তু নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ,

আলস্য-পরায়ণ, উদাসীন; সাধারণের বিশ্বাস নাই যে, কৃষিশিক্ষা দ্বারা দেশের কোন উপকার হইবে, এমন স্থলে গবর্ণমেণ্টেরও উদাসীন হওয়া সম্ভব। সাধারণ লইয়াই গবর্ণমেণ্ট। যে কোন অভাব সাধারণে অনুভব করিতে পারে, সেই অভাব মোচনেই গবর্ণমেণ্ট যত্নবান্ হয়েন। সে দিন ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করিয়া, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বীজ, কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, শিবপুর কলেজ হইতে কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনৈক ছাত্রকে নিযুক্ত করিয়া, দেশে যাহাতে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট উন্নতির ভিত্তি-স্থাপন করিতে পারেন, এই সঙ্কল্প করিয়া গৌরীপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বৎসরে বৎসরে যদি দশজন জমিদার এইরূপ উৎসাহ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে শিবপুর কলেজের কৃষি-বিভাগের উন্নতি হইবে এবং দেশেরও উন্নতি হইবে।

উদ্যোগ ও সাহায্য অন্যদিকেও আবশ্যক। কে না জানে, গবর্ণমেণ্ট শস্তায় কাজ সারিবার জন্য শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সহিত একটী কৃষি-বিভাগ খুলিয়া দিয়াছেন?—পৃথক্ অধ্যাপক, পৃথক ল্যাবরেটারি প্রভৃতি না আবশ্যক হয়। বৎসরে ১২,০০০ হাজার টাকা মাত্র ব্যয়ে যাহাতে কৃষি-শিক্ষা বঙ্গদেশে চলিয়া যায়, এই উদ্দেশেই শিবপুরে 'কৃষি-শ্রেণীর' স্থাপন। গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, শিবপুর কৃষি-পরীক্ষার, কৃষি কার্য্যের উন্নতির, কৃষি-শিক্ষার, কেন্দ্র হইতে পারে না; কিন্তু পৃথক আয়োজন করিতে গেলেই অর্থের আবশ্যক। অর্থের আবশ্যক হইলেই "গৌরী সেনের" অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়ে। "গৌরীসেন"গণ এ বিষয় এখনও উদ্যোগী হয়েন নাই,—কিন্তু হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র, কৃষককুলের মধ্যবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। শিবপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা উন্নতির সোপান দেখাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কয়জন কৃষক এই সকল দেখিতে পায়? যে কয়জন ক্ষেত্রে নিযুক্ত, তদ্ভিন্ন এক জনও নহে। শিবপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্র ১৬ একার জমী লইয়া। এক একটী পরীক্ষা ১০ একার জমী লইয়া করিতে পারিলে, তবে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে পারে,—"হাঁ, এই উপায়টি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে;" নতুবা ১০।২০ হাত জমী লইয়া তথায় এক নূতন প্রকার ফসল উত্তম জন্মিল, ইহাতে কৃষকদের সহজেই মনে হইতে পারে, "কোম্পানীর ঢের

টাকা, অনেক টাকা খরচ করিয়া সার—পাট করিয়া, একটী নূতনতর দেখাইয়া দিল, আমাদের জমিতে সাপ্টা কোব,—এ সকল আমাদের জমিতে চলিবে না।" বস্তুতঃ এক শত একার ভিন্ন একটা রীতিমত কৃষিপরীক্ষা বা শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে পারে না। সাইরেণসেষ্টর কলেজ সংস্রবে যে কৃষি-ক্ষেত্র পরিচালিত হইয়া থাকে, উহা ৩০০ একার পরিমাণ ক্ষেত্র। আর এক কথা, শিবপুরে মজুরী খরচ প্রায় দ্বিগুণ পাড়িয়া যায়। চারি দিকে কল-কারখানা, তাহার উপর আবার বেঙ্গল-নাগপুর রেলের বিরাট আয়োজন। এই সকল কারণে শিবপুরে কুলি-মজুর নিতান্ত মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। একে ত শিবপুরের মজুরেরা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া অর্দ্ধেক কার্য্য মাত্র করিতে সক্ষম, তাহার উপর প্রায় দ্বিগুণ মজুরী। এমন স্থলে কোন ফসল জন্মাইয়া লাভবান্ হওয়া বড়ই দুরূহ। একার প্রতি গড়ে হয় ত ১০০৲ টাকা উৎপন্ন হইল; পল্লীগ্রামে কার্য্য করিয়া এই ১০০৲ টাকার মধ্যে হয় ত ৫০৲ টাকা নিট্ লাভ থাকিত; কিন্তু শিবপুরে লাভের পরিবর্ত্তে হয় ত কিছু লোকসানই দাঁড়াইয়া গেল; —ছাত্রদের ধারণা হইয়া গেল যে, কৃষি-কার্য্যের উন্নতির দ্বারা উদরপূর্ত্তি হয় না।

কৃষি-বিদ্যালয়ের পৃথক্ আয়োজন আবশ্যক। পৃথক্ আয়োজন করিতে গেলে প্রায় তিন লক্ষ টাকা মূলধনের ও ২৫,০০০ টাকা বাৎসরিক ব্যয়ের আয়োজন করা আবশ্যক। অবশ্য এরূপ আয়োজনে বিলাতী অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে পারা যাইবে না,—কিন্তু বিলাতী অধ্যাপকের নিয়োগ আমি আবশ্যক মনে করি না। দেশের মধ্যে যদি পাঁচজন ইংরাজ-জমিদারের ন্যায় জমিদার থাকেন, তাহা হইলেই অনায়াসে এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। কি হিন্দুকলেজ, কি সংস্কৃত কলেজ, কি মেডিকাল কলেজ, কি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দেশের জমিদারের সাহায্য ভিন্ন কোন্টী স্থাপিত হইয়াছে? কৃষি কালেজের বেলাই যে গবর্ণমেণ্ট বিনা-সাহায্যে সাধারণ ধনকোষ হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া সম্যক্ আয়োজন করিবেন, ইহারই বা কারণ কি? যদি অন্যান্য প্রদেশে ইহার বিশেষ কারণ থাকে, বঙ্গদেশে তাহা নাই। বঙ্গদেশ প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। এখানে ফসল অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তদ্দ্বারা রাজস্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। এখানে গবর্ণমেণ্টের উদাসীন হওয়াই সম্ভব; কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন না হইয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যাঁহারা জমির

উন্নতি বা অধোগতির দ্বারা লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, সেই জমিদার-কুলের এ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থে সমীচীন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন।

কৃষি শিক্ষার সাহায্যার্থে ইংলণ্ডের ধনকোষ হইতে ১৮৮৮ সাল হইতে বৎসরে ৮,০০০ পাউণ্ড মাত্র ব্যয়িত হইয়া থাকে; ইহার পূর্ব্বে এ উদ্দেশে কিছুই ব্যয়িত হইত না। এরূপ স্থলে সাধারণ ধনকোষ হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে অধিক টাকা ব্যয় করিবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। এই কার্য্যে অন্যান্য দেশের ব্যয়ের সহিত ইংলণ্ডের ব্যয়ের তুলনা করিলে, ইংরাজ-জাতির প্রবৃত্তি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ফ্রান্সে কৃষি-শিক্ষার জন্য বৎসরে ১,৫৩,০০০, ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে ৬,২৬,২৫৪, পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। কানেডা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলেও কৃষি-শিক্ষার্থ ঐ দেশে বৎসরে ১,৫৬,২৫০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। হলাণ্ডদেশে ওয়াগেন্ইঙ্গেন্ কৃষি-বিদ্যালয়ে বৎসরে সাধারণ ধনকোষ হইতে ১৫,৯১০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। হলাণ্ড দেশের কৃষি-বৃত্তি যেরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোন দেশে সেরূপ হয় নাই। ফলতঃ ওয়াগেন্ইঙ্গেন্ কৃষি-বিদ্যালয়ের কার্য্যের ফলেই এইরূপ হইয়াছে। ঐ দেশে কৃষি-শিক্ষার জন্য বৎসরে ৪০,৯০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ মোটে যত টাকা ব্যয়িত হয়, তাহার প্রায় অৰ্দ্ধেক টাকা উক্ত কলেজ সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত হয়। ডেন্মার্কের কৃষি-কার্য্যের অবস্থাও বেশ সমুন্নত। এ দেশে কৃষি-শিক্ষার জন্য বৎসরে ১,০৮,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। সভ্যজগতে, কৃষি-শিক্ষার আয়োজন দ্বারা যে উপকার দর্শে, এ বিশ্বাস অনেক পরীক্ষার পরে, বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চক্ষু কয়েক বৎসর মাত্র হইল উন্মীলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এখন বোর্ড-অব-এগ্রিকাল্চার (Board of Agriculture,) বোর্ড-অব-এডুকেশন (Board of Education) হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, এবং কৃষি-বৈঠক বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বৎসরে বৎসরে কৃষি ও বৃত্তি-শিক্ষার জন্য সাধারণ ধনকোষ এবং "লোকাল্-ফণ্ড" সকল হইতে, অধিক অর্থ ব্যয় করা হইবে, এরূপ সঙ্কল্পও হইয়াছে। ইংলণ্ডের এই নূতন প্রবৃত্তি ও উৎসাহ, কৃষিবিষয়ে ইউরোপীয় প্রতিদ্বোগিতার এবং ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার

ফল। কৃষি-শিক্ষা দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় না, এমন কথা সভ্য-জগতে আর কোথাও গ্রাহ্য হয় না।

কৃষি-কলেজ হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সাধারণ বিদ্যালয়ে, সাধারণ বিদ্যালয় হইতে কৃষকদিগের ঘরে ঘরে কৃষিশিক্ষা বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। পল্লীগ্রামস্থিত বিদ্যালয় সমূহের জন্য পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন অপেক্ষা কৃষি-বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত বিষয় বলিয়া, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি গ্রাহ্য করিয়াছেন। মফঃস্বলের কলেজ ও হাই-স্কুলগুলির জন্যও এই নীতির অনুসরণ আবশ্যক। এ বিষয়টী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে বিচার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কৃষি-শিক্ষার পৃথক্ আয়োজনও আবশ্যক, আবার সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য হওয়াও আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যেরূপ উদাসীন, বোম্বাই ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাদৃশ উদাসীন নহে। যাহা হউক, কলঙ্ক অপনোদনের সময় এখনও অতিবাহিত হয় নাই।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

শিবপুর।

অনুতপ্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জাগরণে।

"আমি ত অনেকবারই বলিয়াছি যে, আমা হইতে তুমি সুখী হইতে পারিবে না; আমি কষ্ট দিতে আসিয়াছি, কষ্ট দিয়াই যাইব।" সিত-নয়না যুবতী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া স্থির মৃদুস্বরে এই কয়টী কথা বলিল।

স্বামী অমরনাথ তখন বলিলেন,—"মোহিনী! কেন তুমি আবার ঐ কথা বল? আমি আর কিছু চাহি না, তোমার কিসের কষ্ট, আমি

কেবল এইটুকু জানিতে চাই। দিবা রাত্রি তুমি অমন করিয়া বসিয়া থাক কেন ?"

মোহিনী। আমার কি যন্ত্রণা, তাহা আমি জানি না। এ যন্ত্রণা দূর করিতে তুমি পারিবে না, বৃথা আর সে জন্য চেষ্টা করিও না। যতদিন বাঁচিব, নিজেও জ্বলিব, আর সেই সঙ্গে সকলকেও জ্বালাইব।

অমর। আমি যাহাতে মনে যাতনা পাই, তোমার বার বার তাহাই বলিতে এত ভাল লাগে ?

মোহিনী কোন উত্তর দিল না, তখন অমর বলিলেন,—"মোহিনী! কথা কহিবে না ?" কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিলেন,— "আমার কথায় কি উত্তর দিবে না ?"

মোহিনী। কি উত্তর দিব ; তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর এ হত-ভাগিনীকে ভাবিয়া ভাবিয়া মন ও শরীর নষ্ট করিও না। তুমি আবার বিবাহ কর।

অমর। মন ত দেখা'বার নয় মোহিনী! নচেৎ দেখা'তাম, আজ আমার বুকের ভিতর কি যাতনানল প্রজ্বলিত! তাই একটী কথার উত্তর দিবে কি ?

মোহিনী বলিল,—"কি।"

অমর। তোমায় স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, এই সহস্র জ্বালাপূর্ণ সংসারে যতক্ষণ তোমায় ভাবি, তোমায় দেখি, তোমার কাছে থাকি, ততক্ষণই আমার সুখ। তুমি যখন আমার নিকটে থাক, তখনও কি মনটা একটুও ভাল থাকে না ?

মোহিনী। জানিনা।

অমর। তোমার আপনার মনের কথা আপনিই জান না ? আমি যদি তোমার মুখে একটী বারও শ্রবণ করি যে, আমার নিকটে থাকিলে সামান্য মাত্রও ভাল থাক, তাহা হইলেই আমি অনেক সুখী হই।

মোহিনী। না।

অমর। না কি মোহিনী ? আমাকেও কি আর ভাল লাগে না ?

মোহিনী নিরুত্তরা।

"মোহিনী, তবে আর আমাকেও তোমার ভাল লাগে না ? বিবাহ করা তত কঠিন কথা নয়, কিন্তু তাহা করিব না। দেখি, মোহিনী ছাড়া

জগতে সুখ আছে কি না। চেষ্টায় সুখের সৃজন হয় কি না। যাহা ভাল লাগে, এইবার করিও। আমি, চিরদিনের মত বিদায় লইলাম।" এই কথা বলিয়া অমরনাথ একাকী গভীর রজনীতে ক্ষিপ্রপদে বাটী ত্যাগ করিলেন।

অমরনাথ একটী শিক্ষিত অর্থশালী সুশ্রী যুবক, আর মোহিনী একটী সরলা লাজময়ী পতিপ্রাণা সুন্দরী যুবতী। উভয়ের বিবাহ হইয়াছে তিন চারি বৎসর। উভয়েই উভয়কে প্রাণের সহিত ভালবাসে, সর্ব্বদা সুখী করিতে চেষ্টা করে; তথাপি বিশেষ সুখী কেহই নন। তাহার কারণ দুইজনের প্রকৃতি ভিন্নরূপ।

অমরনাথ একজন কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েট, ইংরাজী মন্ত্রে সম্পূর্ণ দীক্ষিত। সেক্সপীয়র, সেলী, বায়রণ হইতে বঙ্কিম, রবিবাবুর সকল কাব্য ও উপন্যাস পড়িয়াছেন। এ হেন অবস্থায় পাশ্চাত্য প্রকৃতি ও সভ্যতার আলোক যে ক্ষীণভাবে তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রতিবিম্বিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! অমর চাহেন, মোহিনী হারমোনিয়াম বাজায়, গান গায়, কবিতা লিখিতে শিখে, উপন্যাসের নায়িকা-জনোচিত সম্ভাষণাদি করে; কিন্তু মোহিনী তাহার কিছুই পারে না,—সাধ্যমত চেষ্টা করে, তথাপিও পারে না। লজ্জাই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক। মোহিনীর ভালবাসা অমরের অপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের,—সে পরিমাণ-শূন্য নীরব ভালবাসার উষ্ণতা নাই; আর বলিতে কি, সে রূপেরও দাহিকাশক্তি একবারে নাই। সে প্রাণভরিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছে, কিন্তু কিরূপে তাহা দেখাইতে হয়, তাহা আদৌ জানে না। মোহিনীর দুর্লভ চরিত্রে অমর এইগুলিকে দোষ বলিয়া মনে করিতেন, এবং বিবাহের পর তিন চারি বৎসর ধরিয়া উহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃত-কার্য্য হইয়া শেষে আর বড় উক্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন না। তিনি জানিতেন, মোহিনী প্রাণপণে তাঁহার মনোমত হইতে চেষ্টা করে, এবং সফলকাম হইতে না পারিয়া অন্তরে দুঃখিত। যাহা হউক, মোহিনী যে তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বিবেচনা করিয়া ভালবাসে, অমর এক্ষণে ইহা মনে করিয়াই সুখী।

অমরনাথ এক্ষণে ইহা মনে করিয়া সুখী হইলেও, মোহিনী তাহা বুঝে না, সে বড়ই অসুখী। সে মনে করে, স্বামী তাহার জন্য অন্তরে

অসুখী ; কেবল পাছে তাহার মনে অধিক কষ্ট হয়, এই জন্য বাহ্যিক প্রফুল্লতা দেখাইয়া থাকেন। মোহিনী সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করেন, যেন স্বামীর মনোমত হইতে পারেন। তাঁহার কেবলই মনে হয় 'যদি স্ত্রী-জন্মগ্রহণ করিয়া স্বামীর মনোমত হইতে না পারিলাম, তবে জীবন বৃথা।' এইরূপ অহর্নিশি চিন্তাদ্বারা মোহিনী দিন দিন বিমর্ষ ও ম্লান হইতে লাগিল।

অমর স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত ও কাতর হইতে লাগিলেন। ভ্রম ধারণা মনোমধ্যে একবার প্রবেশ-লাভ করিলে, তাহা সহজে তিরোহিত হয় না ; কেহ সংশোধনের চেষ্টা করিলে, অধিকাংশ স্থলেই ফল বিপরীত হইয়া থাকে। মোহিনীরও তাহাই হইয়াছে। অমর যতই বুঝাইতে চেষ্টা করেন, মোহিনী স্বামীকে তাহারই জন্য কাতর ও দুঃখিত দেখিয়া ততই অধিক ব্যথিত হয়। অমর তাহা বুঝিতে পারেন, মনোদুঃখে নিশা অতিবাহিত করেন। ক্রমে অমর এই বিষয়ের কথাবার্ত্তা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। মনে সুখ নাই, অন্য কথাই বা কি কহিবেন ? স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন একরূপ বন্ধ হইয়া আসিয়াছে ; নিতান্ত আবশ্যক হইলেই, এক আধটী কথা মাত্র হয়। এখন মোহিনী ভাবেন "মৃত্যু কিসে হয়," আর অমর ভাবেন 'অদৃষ্ট !' এইরূপে অসীম সংসারের দুইটী প্রাণী শুখাইতে লাগিল।

রমণীর দুঃখের সর্ব্বপরিণাম মৃত্যু ; আর পুরুষের দুঃখ হইতে বিরক্তি, বিরক্তি হইতে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ এবং অবস্থা-ভেদে হত্যা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির তুলনায় পুরুষের এই প্রাধান্য, ইহা প্রকৃতির একটি পক্ষপাত-পূর্ণ নিয়ম। তবে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সকলেরই একটা সীমা আছে। অমরনাথ পুরুষ, তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। এখন সময় সময় তাঁহার দুঃখরাশি ক্রোধে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু সযত্নে তাহা সংবরণ করিয়া থাকেন। পরন্তু রিপুগুলিও মানুষের ক্ষমতাধীন নহে ; সুতরাং ক্রোধ সংবরণও অমরনাথের পক্ষে এক সময় নিতান্ত ক্ষমতাতীত হইয়া পড়িল।—অনেক দিন পরে অমর আজি একবার মোহিনীকে বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—নির্দ্দোষী, সাধ্বী মোহিনীকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

. হায়, হায়! জগতের ইহাই নিয়ম! এই অভিনয়ই ক্রূর জগতে নিত্য দৃশ্যবস্তু! ইহা কবির কল্পনা নহে, বাস্তবের নিষ্ঠুর চিরসত্য। বুঝি বা এই ভ্রান্তিতেই বিশ্ব প্লাবিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নাবেশে।

যথার্থ ভালবাসার বন্ধন দুশ্ছেদ্য। মানবের দুর্জ্জয় শত্রু কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণ সময়-বিশেষে ভালবাসার উপরও আধিপত্য করে সত্য, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। প্রেমের প্রভুত্ব অনন্ত সময়ের জন্য,—বুঝি বা মৃত্যুরও পর।

ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে ক্রোধবশে অমরনাথ মোহিনীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—প্রায় এক মাস; কিন্তু আজিও তাঁহার প্রাণ মোহিনীর জন্য আকুল! মোহিনীর কথা যাহাতে মনে না আইসে, অমর সে জন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু দাহ্য-পদার্থ-নির্ম্মিত আবরণ যেমন ক্ষণকালের জন্য জ্বলন্ত অনলকে আবরিত রাখিলেও অল্প পরেই সর্ব্বসমেত ভীষণতর হইয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ অমরের চেষ্টা মোহিনী-বিষয়িণী চিন্তাকে সামান্য সময়ের জন্য নিবৃত্ত রাখিতে পারিলেও, পর মুহূর্ত্তে সেই চিন্তা দ্বিগুণ-বলে উদিত হইয়া মন প্রাণ হু হু করিয়া জ্বালাইয়া দেয়। অমর এক একবার মনে করেন,—বাটীতে ফিরিয়া যাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা যে, মোহিনী-ছাড়া জগতে অন্য সুখ আছে কি না, একবার দেখিবেন।

অমরনাথ এখন কলিকাতাবাসী. সার্কুলার রোডের পার্শ্বস্থিত একটী সুরম্য উদ্যান-ভবনে বাস করেন। তিনি যখন দেখিলেন, দিন যাইতেছে, অথচ মোহিনীর জ্বালাময়ী স্মৃতি, তাহাকে দেখিবার উচ্ছ্বসিত বাসনা প্রশমিত না হইয়া, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন অল্প অল্প পরিমাণে সুরাপান আরম্ভ করিলেন। সুরার মোহকরী শক্তি মোহিনীর স্মৃতি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবতী; অমর যতক্ষণ এই শক্তির অধীনে থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার সকল যাতনা দূরে যায়। ক্রমে যত দিন গত হইতে

লাগিল, ততই তিনি পানাসক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি এখন বুঝিয়াছেন যে, সুরাই মর্ত্ত্যধামে মানবের একমাত্র বন্ধু।

অমরের ন্যায় অবস্থায়, আত্মীয়জন-বিরহিত প্রমোদ-ভবনে একাকী থাকিয়া কাহারও কেবলমাত্র সুরাদেবীর অর্চ্চনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং অমরের পক্ষে যথা সময়ে সুরার আনুষঙ্গিক সকলই জুটিল।

অমরনাথের কলিকাতায় দুইটী বৎসর কাটিল। মদ্য ও বারনারী ইত্যাদির কৃপায় এক্ষণে তাঁহার আর কোন আপদ নাই। এখন তাঁহার হৃদয়রাজ্যের মোহিনীচ্যুত সিংহাসনে একটী অনিন্দ্য-সুন্দরী বারবিলাসিনী উপবেশিতা; তাহার নাম বসন,—ওরফে বসন্ত। অমর এখন তাহার প্রেমে একবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। কুহকিনী মায়াবিনী রমণীর কটাক্ষবাণে বিদ্ধ না হয় কে? আর তাহার সযত্ন-নিক্ষিপ্ত মায়াজালেই বা আবদ্ধ না হইয়া কোন যুবক নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে? অমর একজন লঘুচিত্ত সামান্য মানব, তিনি যে বসনের পদপ্রান্তে আপনাকে বিকাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তিনি তাঁহার প্রিয়জন-পরিপূরিত বাসভবনে কৈশোর-কল্পিত যে সকল সুখরাশির সৃজন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে রাজধানীর বিলাস-কোলাহলপূর্ণ বক্ষোপরি রম্য বিলাসভবনে তাহার সৃজন করিয়াছেন। এখন হারমোনিয়মের সহিত গায়িকা প্রণয়িনীর আর অভাব নাই, বা উপন্যাসোচিত-মধুর-সম্বোধন-শ্রবণের তৃষা অতৃপ্ত থাকে না। অমর যখন সুসজ্জিত, প্রসূন-পরিমলবাহী-সমীরণ-পূরিত, প্রখর গ্যাসালোকিত কক্ষ-মধ্যের প্রশস্ত কোচে বসিয়া বসনের সহিত প্রেমের সম্ভাষণে রত থাকেন, যখন প্রেমিকার মধুর অধরের নয়ন-মনোহর ঈষদ্ধাস্যের সহিত রসালাপে সুরোন্মত্ত প্রাণে সুধার আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাকেন, তখন বসনের ভালবাসার কথা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া এই নশ্বর জগতে অমরেন্দ্রের স্বর্গীয় সুখ অনুভব করেন।

সময় ও সাক্ষাতের সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ নিকট। অনেক দিন অদর্শনে, বিশেষতঃ যদি সেই অদর্শনের কালে মনোমধ্যে কোন নূতন সুখের প্রবেশ-লাভ ঘটে, তবে দম্পতি-হৃদয়ে প্রায়ই ভালবাসার হ্রাস হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর পক্ষেই অধিক সংযোজনীয়। অমরের এখন নূতন জীবন বলিলেও হয়, মোহিনীর সে প্রাণ-মনোমোহিনী পবিত্র মুখছবি এখন আর বড় তাঁহার মানসপটে উদিত হয় না। শুধু

তাই বা কেন, অমরের এখন আর অতীত বা ভবিষ্যতের কোন কথাই মনে হয় না ; এখন শুধু বর্ত্তমানের মোহময় সুখ-স্বপ্নেই মানস পূরিত।

অমরনাথের ন্যায় মোহিনীরও বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে প্রভেদ এই, অমরের চক্ষুতে পৃথিবীতে সুখ ভিন্ন আর কিছুই নাই, আর মোহিনীর চক্ষুতে জগৎ অনন্ত দুঃখের আধার মাত্র। আমরা এখন অমরের সুখের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাই বলিব ; অনুতাপদগ্ধা, শীর্ণকলেবরা মোহিনীর দীর্ঘনিশ্বাসের উষ্ণ বাতাসে আপনাদের অঙ্গে লাগাইয়া ব্যথিত করিব না।

অমরনাথ সুদীর্ঘ দুইটি বৎসর কলিকাতায় অতিবাহিত করিবার পর, বসনের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রবাস-ভ্রমণে যাইবেন, বাসনা করিলেন। তাঁহার ন্যায় লক্ষ্যহীন মানবের পক্ষে যে কোন বাসনাই হউক, কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হয় না। অবিলম্বেই অমরনাথ দ্বারবান্, দাস দাসী ও আবশ্যক দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে বসনকে লইয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। কয়েক মাস ধরিয়া বেনারস, দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, অযোধ্যা, কাশ্মীর প্রভৃতি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, অনেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ অবলোকন করিয়া এবং নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া শেষে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্থানে আসিয়া মনে করিলেন, কয়েক মাস বাস করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন।

এলাহাবাদে আসিয়া একটী নাতিবৃহৎ দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে কলিকাতা অপেক্ষা তাঁহার অধিক সুখ বোধ হইতে লাগিল। বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণে, জ্যোৎস্নার শুভ্র কোমল আলোকে, উন্মুক্ত বাতায়ন সমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া, বসন তাহার অলস দেহভার ও ঈষদবনত মস্তক অমরের শরীরে স্থাপন করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক যখন দূরস্থিত যমুনার নীল জল কিরূপে ভাগিরথীর শুভ্র জল-রাশিতে মিশ্রিত হইয়াছে দেখায়, তখন অমরের তাহা বড় ভাল লাগে। এখানে তাঁহাদের আসিবার পর প্রায় তিন চারি মাস গত হইয়া গিয়াছে, এখন সময়ে সময়ে অমরের ইচ্ছা হয়, আর কলিকাতায় না যাইয়া এই স্থানেই একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করেন।

অমর এক্ষণে এখানে একজন ধনী বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত। অনেকের

সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছে। এক দিবস এক ব্যক্তি একটী বাটী ও ভাল বাগান বিক্রয়ের সংবাদ তাঁহাকে জানাইল। বসন এই কথাটী কক্ষান্তর হইতে শ্রবণ করিয়াছিল, সমাগত ব্যক্তিগণ বিদায় হইলে অমরকে ধরিয়া বসিল যে, উহা ছাড়া হইবে না। অমরের সুরা ও বসন ছাড়া আর কে আপনার আছে? তিনি স্বীকার করিলেন, বাটীটি দেখিয়া যদ্যপি পছন্দ হয় এবং মূল্য অত্যন্ত অধিক না হয়, তাহা হইলে ক্রয় করা হইবে। দুই চারি দিবসের মধ্যে উভয়েই বাটী দেখিলেন, উহা বাস্তবিকই মনোরম, দুই জনেরই মনোমত হইল। মূল্য স্থির হইল সার্দ্ধ সাত সহস্র টাকা। একটী স্থানীয় ভদ্রলোকের পরামর্শ মত উপস্থিত সামান্য টাকা বায়না স্বরূপ দেওয়া হইল এবং বাটীর দলিল পত্র দেখিয়া বাকী টাকা দুই সপ্তাহ পরে দেওয়া হইবে, স্থির হইল।

একজন আইনজ্ঞ লোক দলিল পত্র দেখিতে লাগিলেন। অমর তাঁহাদের বাটীর একজন প্রধান নায়েবকে "একটি বাটী ক্রয় করিব, সত্বর আট সহস্র টাকা পাঠাইবে" এই মর্ম্মে একখানি টেলিগ্রাম করিলেন।

অমরের দেশত্যাগের পর হইতে কনিষ্ঠ সহোদর যতীনই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। যতীন বা মোহিনী প্রথম প্রথম অনেক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতি-উত্তরের পরিবর্ত্তে যতীন কেবল পুনর্ব্বার পত্র লিখিবার বিরক্তিসূচক নিষেধাজ্ঞা পাইয়াছিলেন! সেই পর্য্যন্ত আর অমরকে কেহ সহজে পত্র লিখিতেন না। টাকার প্রয়োজন হইলে অমর নায়েবকে লিখিতেন। জলের ন্যায় অনেক অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে দেখিয়াও বাধা দেয় কে? নায়েব টেলিগ্রাফ পাইয়াই ছোট বাবু অর্থাৎ যতীনকে উহা দেখাইলেন। যতীন কিয়ৎকাল চিন্তার পর কোন লোক দ্বারা ঐ টাকা পাঠাইতে আদেশ করিলেন। ঐ দিবসই সিদ্ধেশ্বর নামে একটী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মারফৎ টাকা পাঠান হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন-শেষে।

সন্ধ্যা গত হইয়াছে। অমরনাথ ও বসন মদ্যপান ও প্রেমালাপে রত রহিয়াছে, এমন সময় দ্বারবান্ দেবী সিং আসিয়া বলিল,—"একঠো আদমি আয়া, আপ্‌কো সাথ মুলাকাৎ করণে মাঙ্গ্‌তা।"

অমর। উস্‌কো পুছো, নাম কেয়া, কাঁহাসে আতা?

দেবী সিং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় উপরে আসিয়া বলিল,—"আপ্‌কো বাড়ীসে আয়া; নাম সিদ্ধেশ্বর।"

অমর। সিদ্ধেশ্বর।

দেবী সিং। জী।

অমর। হিঁয়া আনে বোলো।

দেবী-সিং সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে সিদ্ধেশ্বর উপরে একবারে অমরের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল; অনেকদিন পরে বড়বাবুকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, যেন বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

অমর। কি সিদু, কি মনে ক'রে, দেখ্‌চ কি?

সিদু। আজ্ঞে না, আপনি বেশ ভাল আছেন?

অমর। হাঁ বেশ ভাল। বাড়ীর খপর ভাল ত?

সিদু। আজ্ঞে শরীর গতিক সব ভাল আছে। মা ঠাকরুণ গত হ'য়েছেন, তা' শুনেছেন ত?

(অমরের মাতা-ঠাকুরাণীর মৃত্যু-সম্বন্ধীয় যে সকল পত্র বা টেলিগ্রাফ আসিয়াছিল, তাহার একখানিও তিনি পান নাই।)

অমর। না, মা ম'রেছেন, তা বেশ। আর সব কি বেঁচে আছে? মোহিনী কেমন?

সিদু। তাঁ'র কথা আর কি ব'ল্‌ব, তিনি—

অমর। না না থাক, সে কথা আর ব'লে কাজ নাই। সিদু! বড় ফূর্ত্তি।

এই কথা বলিয়া অমর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন। তারপর বলিলেন,—"এখন এসেছ কি মনে ক'রে?"

সিদু। আজ্ঞা আট হাজার টাকা এনেছি।

"ওহো হো, বসন টাকাটা দেরাজে রাখ ত।" এই কথা বলিয়া সিদুকে নিম্নতলে যাইতে অনুমতি করিয়া পুনরায় পূর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সিদ্ধেশ্বর দেখিয়া শুনিয়া এক প্রকার অবাক্ হইয়া গিয়াছে; রাত্রিতে সেইখানেই থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রভুর নিকট বিদায় লইতে গেল। অমরের এখন আর নেশা নাই, সিদুকে বিদায় কালে দশটী টাকা হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন,—"এ টাকা কয়টী তোমায় দিলাম, বাটীতে ব'ল, আমি বেশ ভাল আছি, সুখে আছি, আমার কথা কেহ যেন মনেও আনে না।"

সিদ্ধেশ্বর দাস বাটী ফিরিয়া গিয়া অমরের সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছে, যাহা বুঝিয়াছে, বা দ্বারবান্ ও দাস দাসীর মুখে যাহা শুনিয়াছে, সকলই সবিশেষ বলিল।

বাটী খরিদের বায়না দেওয়ার পর দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দলিলে সামান্য গোলমাল বাহির হওয়ার কারণ এখনও বাকি টাকা দেওয়া হয় নাই। অদ্য রবিবার, কয়েকটী মদ্যপায়ী বন্ধু জুটিয়াছিল। আমোদ প্রমোদে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা চলিয়া গেলে পর বসন ও অমর শয়ন করিয়াছেন। রজনী এখনও তৃতীয় প্রহর অতিক্রম করে নাই, অমর শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া স্বপ্নে দেখিতেছেন, যেন, সহপাঠী অচ্যুতকুমারের সহিত কলেজের কম্পাউণ্ডে তর্ক করিতেছেন, অচ্যুত বলিতেছেন যে "Theoryর সহিত Practical lifeএ সকল বিষয় সব সময় ঐক্য হ'তে পারে না, তোমার সেটা আশা করাই মহাভুল।" আর অমর যেন বলিতেছেন "কেন মানুষের কল্পনার উৎপত্তি কোথা থেকে, real life-এ যদি একবারে নাই ঘটে, তবে idea গুলা আসে কেমন ক'রে?" অনেক-ক্ষণ এইরূপ তর্ক বিতর্কের পর অচ্যুত যেন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, 'যাও, তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে আর ইচ্ছা করি না' বলিয়া চলিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি অমর 'যাও কোথা' বলিয়া যেমন অচ্যুতের হাত ধরিতে গেলেন, আর তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল।

অমর নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, এক কৃষ্ণকায় বলবান্ ব্যক্তি উজ্জ্বল-উন্মুক্ত-কৃপাণ-হস্তে সবেগে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আর এক ব্যক্তি পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অমর নিমেষ মধ্যে শয্যাতল হইতে রিভল্‌ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিলেন। সেই

ভীষণ শব্দের সহিত আলোক নির্ব্বাপিত হইল ও গৃহ ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অমরনাথ ভয়-বিহ্বলচিত্তে কয়েকবার বসন বসন বলিয়া ডাকিলেন, কোনও উত্তর পাইলেন না। ত্বরায় গৃহের আলোক প্রজ্বালিত করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন গবাক্ষদ্বারের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, দূরে রাজপথের উপর দিয়া দুই বা তিন ব্যক্তি বেগে পলায়ন করিতেছে।

অমরনাথের পিস্তলের শব্দে বাটীস্থ লোক-সমূহের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি সকলকেই বসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। দেবী-সিংকে ডাকিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অমরের এখন মদিরার নেশা ছুটিয়া গিয়াছে, সব বুঝিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার পর টাকার কথা মনে পড়িল। চাবির রিং অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন না। তখন দেরাজের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, উহাতে চাবি লাগান রহিয়াছে। তখন কম্পিত হস্তে তাহা খুলিয়া দেখিলেন, একটী টাকাও উহার মধ্যে নাই। তখন বসনের গহনার বাক্স দেখিতে গেলেন, দেখিলেন, উহাতে একখানিও অলঙ্কার নাই, কেবল কতকগুলি চিঠি ও দুই তিন খানি টেলিগ্রামের খাম পড়িয়া রহিয়াছে।

অমরের মনে এখন দুইটি প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল,—বসন কোথায় গেল? তাহাকেও কি অর্থ ও অলঙ্কারাদির সহিত দস্যুতে লইয়া গেল, না তাহারই ষড়যন্ত্রে এই সকল কার্য্য সমাহিত হইয়াছে? শেষেরটী এক এক বার মনে হইলেও তাঁহার বিশ্বাস করিতে আদৌ ইচ্ছা হইতেছিল না; কারণ বসনের তাঁহাকে ত্যাগ করিবার কোন কারণই তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। অমরের পত্রগুলি দেখিবার জন্য এইবার কৌতূহল জন্মিল। তিনি আলোকের সাহায্যে দেখিলেন, সকল পত্র বা টেলিগ্রামগুলি তাঁহারই নামে, কেবলমাত্র একখানিতে বসনের নাম লেখা আছে। প্রথমেই সেইখানি দেখিলেন; তাহাতে কেবল লেখা আছে,—"সব ঠিক হইয়াছে, তুমি আগেই সাবধান হইও। দেবীসিংকে হস্তগত করিয়া তাহার সহায়তা লইতে ভুলিও না। রবিবার রাত্রিতে সব শেষ হইবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। ইতি——"

অমরনাথের হৃদয় কম্পিত হইল, চক্ষুর সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল! নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও পৈশাচিকতার জীবন্ত মূর্ত্তি যেন

চতুর্দ্দিকে বিকট হাসি হাসিতেছে, মনে হইতে লাগিল! তাঁহার মনে ইতি-পূর্ব্বে যে প্রশ্নের উদয় হইতেছিল, এইবার তাহার মীমাংসা হইল।

অমরনাথ বসনের কপট ভালবাসার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় অন্যান্য পত্রগুলির কথা মনে পড়িল। সর্ব্বোপরি যে চিঠিখানি ছিল, তাহাই প্রথমে দেখিলেন। তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ লেখা ছিল, পাঠ করিলেন, যথা :—

"জীবনবল্লভ! আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ কর। আমার জীবনের দিন ফুরা'য়েছে। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, ইহাই শেষ ভিক্ষা। সিদুর মুখে সব শুনেছি, তুমি সুখী আছ। তুমি যে সুখে আছ, ইহাতেই আমি সুখী, কিন্তু তোমার যে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে, ইহার কারণ আমি। অনুতাপে এই হতভাগিনীর প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টই হইয়াছে। তথাপি পর-জন্মের জন্য আরও কি বাকী আছে, তাহা জানি না। তিন বৎসরেরও অধিক হইল, তোমার একখানিও পত্র পাই নাই, কিন্তু তথাপি আজ একটী উচ্চ আশা হৃদয়ে ক'রে তোমায় পত্র লিখিতেছি, জানি না তুমি বিরক্ত হইবে কি না। আমার শেষ সময় উপস্থিত, একবার বড় সাধ হয়, অন্তিমে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া মরি। প্রাণনাথ! দাসীর এই শেষ সাধ কি পূর্ণ করিবে?

দেবতার নিকট আমার অন্তরের প্রার্থনা, তোমার অবশিষ্ট জীবন যেন এ পাপিনীর মৃত্যুর সহিত শান্তিময় হয়। আর পরজন্মে যেন তোমার মনোমত হইয়া পদসেবা করিতে পারি। অধিক লিখিবার শক্তি নাই। শ্রীচরণে নিবেদন, ইতি—

তোমার শ্রীচরণ-দর্শনপ্রার্থিনী—মোহিনী।"

এই পত্রপাঠ সমাপনান্তে অমরের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। স্বার্থপর জগতের, ভীষণ প্রতিশোধের শত বৃশ্চিক-দংশনতুল্য যাতনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিলেন। অনুতাপ, ক্রোধ, প্রতি-হিংসা ও অনন্ত বিরহের সহস্র উচ্ছ্বাস তাঁহার মনোমধ্যে একত্র হইয়া এক পৈশাচিক যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।

ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া, ইহা স্বভাবের নিয়ম। অনেক দিনের পর আজি আবার মোহিনীর কথা মনে পড়িল, আবার মোহিনীর মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, তাঁহার সহিত যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও একে একে মনে পড়িতে লাগিল। দারুণ অনুতাপে অস্থির হইয়া যখন মোহিনীকে দেখিবার জন্য অমরনাথের প্রাণ একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি

আর কোন চিন্তা না করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। প্রবাসের এই ঘোর তমসাময়ী নিস্তব্ধ যামিনীতে স্বপ্নভঙ্গের সহিত জীবনের অলীক স্বপ্নও আজি শেষ হইল। তবে নিদ্রার স্বপ্নের সহিত এ স্বপ্নের একটু বিভিন্নতা আছে। সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইলে ক্ষণকালের জন্য মনে ব্যথা থাকে বটে, কিন্তু কিছু পরে তাহা আরোগ্য হইয়া যায়; আর এই জীবনের সুখ-স্বপ্ন একবার ভঙ্গ হইলে প্রায় সে ব্যথা কখন আরোগ্য হয় না, বরং ক্রমশই বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। হায়! অধিকাংশ মনুষ্যের সুখ-স্বপ্নের ইহাই শেষ পরিণতি! মানব এই স্বপ্ন-রাজ্যে যদি অনন্ত সময়ের জন্য পরিভ্রমণ করিতে পায়, তবে আর কিছুই চাহে না।

অমরনাথ অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে মোহিনী-বৰ্দ্ধিত সুখের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া চারি বৎসর পূর্ব্বে যে মোহিনীকে রাখিয়া একাকী ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে বাটী ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজি সেইরূপ রজনীতে সেই মোহিনীকে দেখিবার আশায় একাকী প্রয়াগের অপরিচিত পথে পদার্পণ করিলেন। একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই এক হিন্দুস্থানী মূর্ত্তিকে নিকটে আসিতে দেখিয়া ভীত চকিত প্রাণে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে আসিলে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি?"

আগন্তুক। হাম পিয়ন হায়।

অমর। কাকে খুঁজিতেছ?

আগন্তুক। অমর বাবুকা এই বাড়ী?

অমর। হাঁ, এই বাড়ী। কি দরকার আছে?

আগন্তুক। একঠো টেলিগ্রাম হায়।

অমর পিয়নের হস্ত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া সহি করিয়া দিবার পূর্ব্বেই, তাহারই লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে পড়িলেন,—Your wife died, start immediately you urgently required.

শ্রীহরিহর শেঠ।

অনাথ।

১

আমার নাইক ঢাকাঢাকি,
বল্‌চি আমি সত্যি কথা—
এবার পূজায় বেঁচে থেকে
দেখ্‌বো ঠাকুর যথা তথা।

২

যদিও আমি নই বিলাসী,
হইনি বড় সুখের কোলে,
তবুও আমি বাঁচ্‌তে যে চাই,
নতুন কাপড় পাব ব'লে।

৩

নতুন নতুন পোষাক পরে'
সাজ্‌বে কত ছেলে মেয়ে;
এই ছেঁড়া চাদর কে ঘুচায়ে
দীনের পানে দেখ্‌বে চেয়ে?

৪

দুঃখী আমি—তবু মায়ের
আরতি দেখে পাই যে সুখ;
আমার আশা—নতুন কাপড়
প'রে দেখ্‌ব মায়ের মুখ।

৫

একটা বছর গেল কেটে,
বেঁচে আছি প্রাণে প্রাণে;
বার মাসের আশা পূর্ণ
হ'বে মায়ের আগমনে।

৬

আমার কাছে সত্যি কথা,
নাইক আমার ঢাকাঢাকি,
তোমরা থাক চির সুখে
পূজার দিনে ক'রো সুখী।

শ্রীরসময় লাহা।

কুড়ান খাতার এক পৃষ্ঠা।

মান্যবর প্রয়াস সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

বহুকাল পূর্ব্বে আপনি একখানি "কুড়ান খাতা" হইতে একটী গল্প আপনার মাসিক পত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। আজ আমি পাগলাগাবদের নিকট হইতে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া আনিয়াছি, উহার মধ্যে

হইতে একখানি জীর্ণ খাতার এক পৃষ্ঠা পাইয়াছি। লেখাটা বাঙ্গালা বলিয়া আপনার নিকট এক্ষণে পাঠাইলাম। পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পত্রে উহা প্রকাশ করিতে যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তাহা করিবেন। ইতি ২৬শে আষাঢ়, ১৩০৮।

ছেঁড়া কাগজ বিক্রীওয়ালা।

"মধুমাসের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে, মধুর সঙ্গীত ঢালিয়া সাগর পানে ছুটিতেছে। পুষ্পগণ বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া হাসিতেছে। বায়ু পুষ্পের গন্ধ লুটিয়া মৃদু মন্দ বহিতেছে। শিশু মাতৃক্রোড়ে স্বর্গীয় পবিত্র হাসি হাসিতেছে। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেই আনন্দে মগ্ন। নগর বহুজনাকীর্ণ ও আনন্দময়। রাজপথ কোলাহলপূর্ণ। পথিক রাজপথ দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

'কাদা মাখা সার হ'ল সই
মাছ ধরা হ'লো না।
শুনেছিলাম বড় পুকুর,
তা'তে আছে নেটা মাগুর,
আমার ভাগ্যে মাকাল ঠাকুর,
মুখ তু'লে চাইলে না।।'

আমি নিবিষ্টচিত্তে ঐ গীত শুনিতেছিলাম।

আজ ঐ গীত আমার কর্ণকুহরে অমৃত-বর্ষণ করিল, এবং 'কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' কেন? যেন বহুকালের বিস্মৃত কোনও সুখের স্বপন মনের মধ্যে জাগাইয়া দিল। পথিকের কণ্ঠ মধুর স্বীকার করি, তাহাতে ভাবের সংযোগ হওয়ায় মধুর হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিলাম। আবার মনের মাধুর্য্য বিকীরণ করিতেছে বলিয়া আরও মধুর শুনাইল, তাহাও মানিয়া লইলাম। কিন্তু বীণার তারে বাদ্যকরের কর-সংযোগের ন্যায় ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল কেন? কেন কে জানে? কি যেন ছিল—তাহার অভাব যেন মনোমধ্যে উদিত হইল। তাই বুঝি ঐ সঙ্গীতে আমার মনের মধ্যে বাজিল—

"কাদা মাখা সার হ'ল সই
মাছ ধরা হ'লো না।"

বাল্যে যাহা দেখিতাম, তাহাই নূতন বলিয়া বোধ হইত এবং তাহাতেই

আনন্দ হইত। প্রাণ খুলিয়া প্রাণের হাসি হাসিতাম। পিতা মাতা আমার আনন্দ দেখিয়া হাসিতেন। সমবয়স্কেরা আমার সহিত হাততালি দিয়া হাসিত। পৃথিবী কতই সুন্দর দেখিতাম! আকাশের নীলিমা দেখিয়া কতই আনন্দ করিতাম। তারাগুলি দেখিয়া মন কতই পুলকিত হইত। গগনে তূলারাশির ন্যায় মেঘের চলাচল দেখিতাম। পূর্ব্বগগনে প্রত্যহ নবীন রবি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতাম। ঐ বৃষ্টি হইতেছে! ঐ দেখ রামধনু! ঐ দেখ বকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড়িয়া যাইতেছে! এইরূপ সমস্ত কতই সুন্দর দেখিতাম! ক্ষুদ্র মনে কতই ভাবের তরঙ্গ উঠিত, কে জানে? কিন্তু এখন সে সমস্তই দেখি বটে, মনে হয় যেন কি নাই। যেন কি হারাইয়াছি। যেন কি ভুলিয়া গিয়াছি। মন কাঁদিয়া উঠে। আর ঐ সঙ্গীতের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে ইচ্ছা করে :—

"কাদা মাখা সার হ'ল সই
মাছ ধরা হ'লো না।"

বাল্যকাল গিয়াছে, যৌবন আসিয়াছে। জীবনের মধ্যাহ্ন উপস্থিত। এখন বাল্যের চপলতা নাই বটে, কিন্তু উহার সঙ্গে সরলতাও গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, দিবসের পর রজনী আছে। সুখের পর দুঃখ আছে। নির্ম্মল গগনেও মেঘ আছে। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। কুসুমেও কীট থাকে। মধু মধ্যে গরল থাকিতে পারে। মনুষ্য-হৃদয়ে কপটতা থাকিতে পারে। এইরূপ জ্ঞানের সঞ্চারের সহিত শান্তিরও অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। বাল্যকালে মনে হইত, কবে বড় হইব, কবে জ্ঞান হইবে, তাহা হইলেই বুঝি যাহার অভাব আছে, তাহা পূর্ণ হইবে। এখন দেখিতেছি, বাল্যে যে অভাব ছিল, এখনও সেই অভাব রহিয়াছে। তবে যেন একটা আশা আছে। যেন পরে—বহুপরে—যাহা খুঁজি, তাহা পাইব। যেন—

"শুনেছিলাম বড় পুকুর,
তা'তে আছে নেটা মাগুর।"

মনে হয়, এই ক্লেশপূর্ণ জীবনে বুঝি কখন না কখন নিত্য সুখ মিলিবে। বুঝি বালুকাময় প্রান্তর-মধ্যেও অদূরে কোথাও তৃণময়, তরুলতাপূর্ণ, মলয় সেবিত কোনও স্থান আছে, তাহা পাইব। এইরূপ আশায় বুক বাঁধিয়া কিছুকাল পরে যখন দেখি, কৈ যাহা চাই, তাহা ত পাই নাই, তখন আবার কান্নার সুরে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"কাদা মাখা সার হ'ল সই
মাছ ধরা হ'লো না।"

প্রৌঢ় অবস্থায় 'নেটা মাগুর' পূর্ণ "পুকুরের" অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় বটে, কিন্তু শীঘ্রই হতাশ হই। প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, বাল্যে সুখের অনুভূতি ছিল না, সুখ ছিল। যৌবনে 'অর্জ্জিত' সুখ অল্প ছিল, কিন্তু সুখের আশার সীমা ছিল না। বাল্যে সুখের অনুভূতির অভাব ছিল, সে জন্য কি যেন খুঁজিতাম। যৌবনে সুখের আশা ছিল 'অপরিমিত' সে জন্য অশান্তি। আর প্রৌঢ়াবস্থায় অর্জ্জিত সুখ অধিক হইতে পারে, কিন্তু সে বিশ্বব্যাপিনী আশা কোথায়? কুহকিনীর কুহকে আর মন ভোলে না। আবার সেই অশান্তি। সেই অতৃপ্তি-জনিত খেদ-সূচক গীত মনের মধ্যে উঠে—

"কাদা মাখা সার হ'ল সই
মাছ ধরা হ'লো না।"

তিনকাল গিয়া ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইলে বুদ্ধির পরিপকতার সহিত নিজকৃত ভ্রমগুলিও বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায়, জীবন একটী প্রহেলিকা মাত্র। ইহার কি উদ্দেশ্য—কি কর্ত্তব্য—কোন্‌দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। বুঝা যায়, যখনই মনে করিয়াছি, আর একটু অগ্রসর হইলেই নিজের ঈপ্সিতকে পাইব, তখনই ভ্রমে পড়িয়াছি। প্রকৃতপক্ষে অগ্রসর না হইয়া কেবল ঘুরিয়াছি মাত্র। তখন হতাশ হইয়া পড়ি।—তখন বুঝি যে, জীবনে কেবল কালের চক্রে ভ্রমণ করিতে হয় মাত্র। জীবন অনিত্য, ইহাতে নিত্যবস্তু মেলা সুকঠিন। জীবন দুঃখময়। জীবনে কেবল তৃষা—নিবৃত্তির আশা মাত্র নাই। তাই হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বিষাদময় গীত আপনা হইতে উদিত হয়:—

"আমার ভাগ্যে মাকাল ঠাকুর
মুখ তুলে চাইলে না।
কাদামাখা সার হ'ল সই
মাছ ধরা হ'ল না॥"

কোথায়?

বাসন্তীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল নীলিম গগনে,
ভাসিছ কি কৌমুদীর সনে?
প্রভাতের নীলাকাশে, শুভ্র মেঘছায়া-পাশে
প্রীতিমাখা প্রেমানন দেখাও নয়নে,
উষায় সুন্দর মুখ পড়ে আসি প্রাণে,
অস্ফুটন্ত কলিকায়, দোলায় সে ধীর বায়,
গাতে প্রাণ পাপিয়ার মধুর ঝঙ্কারে;
এসে ধীরে,
হিয়ার মাঝারে,
জুড়াও হৃদয় কিবা প্রেম আলিঙ্গনে;
সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য ঢালি, কল্পনা নয়নে,
প্রেম আঁখি নীর ঝরে সুন্দর চরণে!
কোথা তুমি প্রিয়তম কল্পনার ছবি,
স্বপনের স্মৃতি রেখা, জীবনের-রবি?
ভ্রমিছ কি নন্দন কাননে,
সৌন্দর্য্য বিমানে,
মন্দার কুসুম মাখি, মন্দাকিনী তীরে?
কত দূর প্রিয়তম—আছ কত দূরে,
শুধু চাই সতৃষ্ণ নয়নে!

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা।

শিক্ষার উন্নতির সহিত সভ্যতার উন্নতি হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ক্রমশঃ সভ্য হইতেছি কি অসভ্য হইতেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ। আমরা প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষা পাইতেছি কি না, সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ। বিশ্ব--

বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যে উচ্চশিক্ষা বা গভীর জ্ঞান লাভ হইল, এ কথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। গভীর জ্ঞানলাভ ত হয়ই না, কারণ নির্দ্দিষ্ট কতিপয় পুস্তকের বাছা বাছা কতিপয় প্রশ্নোত্তর কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, কিরূপ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেইজন্য আজকালকার বি এ, এম্ এ, উপাধি-ধারীদিগের সহিত সেকালের "সিনিয়ার স্কলার" দিগের এত প্রভেদ। তার পর আবার আমাদের দেশে বি এ, এম্ এ, পাশ করিলেই লেখা পড়ার শেষ হইল মনে করি, এবং অধিকাংশকেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তখন বাস্তবিকই লেখা পড়ার সংস্রব ও চর্চ্চা একবারে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বি এ, এম্ এ, পাশ করিবার পর হইতে শিক্ষার শেষ না হইয়া আরম্ভ হওয়া উচিত। ইচ্ছা থাকিলেও অনেকের পক্ষে সাংসারিক ভাবনায় ও অর্থাভাবে জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করা অসম্ভব হইয়া উঠে। একে ত জ্ঞান-পিপাসা আমাদের দেশে ততটা প্রবল নহে, অর্থোপার্জ্জনের পথ বলিয়া অধিকাংশ লোকে লেখা পড়া করিয়া থাকে। যদি বা দুই এক-জনের যথার্থ জ্ঞান-পিপাসা হয়, তাহা নিবৃত্তির উপায় থাকে না। উৎসাহ অভাবে তাহাদের মনের আশা মনেই রহিয়া যায়,—

"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্য-যুক্তানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব॥"

(বালবিধবা কুলস্ত্রীর কুচদ্বয়ের ন্যায়, দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লয়প্রাপ্ত হয়)।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি ব্যতীত অন্যরূপ উৎসাহ লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বা জে, এন্ টাটার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ধনকুবের কয়জন আছে? ধনকুবের অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত অবিদ্যাকে প্রতি মাসে তিন, চারি, পাঁচ শত বা ততোধিক মুদ্রা অকাতরে দিতে পারেন, কিন্তু বিদ্যার উৎসাহের জন্য এক পয়সা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন। যদি এই সকল ধনবান্ ব্যক্তি বিদ্যাবিষয়ক গবেষণার জন্য কোনও রূপ বৃত্তি স্থাপন করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়।

আমাদের বিশ্বাস, এখন প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইতেছে না। প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। কেন না, যে শিক্ষায় নৈতিক বা

সামাজিক বল শিথিল হয়, তাহাকে শিক্ষা বলিতে ইচ্ছা হয় না। নীতি-জ্ঞানহীন শিক্ষাকে আসুরিক শিক্ষা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যে শিক্ষায় নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় বললাভ হয়, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও ঐ শিক্ষা লাভ হইতে পারে! কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা আসুরিক শিক্ষাই লাভ করিতেছি, আধুনিক সভ্যতাও সেই আসুরিক শিক্ষার ফল।

আধুনিক সভ্যতার সকলই মন্দ, কিছুই ভাল নহে—একথা ঘোর বাতুল ব্যতীত অপর কেহ বলিতে সাহস করিবে না। তবে কতকগুলি যে অত্যন্ত মন্দ—বর্ব্বরতার বীভৎস রূপান্তর মাত্র, তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদি-সম্মত। এই মনে করুন, পান-দোষ। ইহা আধুনিক সভ্যতায় দোষ বলিয়াই পরিগণিত হয় না; বরং যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াও মদ্যপান করিতে শিখেন নাই, কোনও কোনও সভ্যমহলে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ ও উপেক্ষা সহ্য করিতে হয়; এবং তথাকথিত সভ্যেরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ঐ "tee-totaller" দিগের আদৌ শিক্ষালাভ হয় নাই। তাঁহাদের ধারণা, সুরাপান উচ্চশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ! ইহাই যদি শিক্ষা ও আধুনিক সভ্যতা হয়, তাহা হইলে মূর্খ ও বর্ব্বর হইয়া থাকা শতগুণে শ্রেয়ঃ নয় কি? আধুনিক সভ্যতার আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে; যথা,—প্রণাম বা নমস্কারের পরিবর্ত্তে করমর্দ্দন, কুশল-জিজ্ঞাসা করিতে হইলে "হাউ আর ইউ" বলা, কেহ মরিলে কাঁদ দেওয়ার পরিবর্ত্তে "Condolence letter" (সহানুভূতি পত্র) লেখা, কথায় কথায় "থ্যাঙ্ক ইউ" ব্যবহার করা, পিতা কিম্বা ভ্রাতাকে পত্র লিখিতে গেলে ইংরাজীতে লেখা, এবং দাঁড়কাক হইয়াও হ্যাট কোট পরিয়া ময়ূর সাজিবার বলবতী ইচ্ছা।

"আমরা ফরাসী ধরণে হাসি, রুশীয় ধরণে কাসি,
পা ফাঁক করিয়া সিগারেট টানিতে বড্ডই ভালবাসি।"

এই সকল সভ্যতা নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য, ইহাতে জাতীয়ভাবের লেশমাত্র নাই। যে সভ্যতায় জাতীয়ভাব নষ্ট হয়, তাহাকে সভ্যতা বলিব কেমন করিয়া? চাল চলনে, কথা বার্ত্তায়, আচার ব্যবহারে পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুসরণ করিতে পারিলেই, আমরা সভ্যতার চূড়ান্ত হইল মনে করি। পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা অনুমোদন করে,

আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার পক্ষপাতী হই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার প্রশংসা করিলেন, অমনই শিক্ষিত-মহলে গীতার ইংরাজী অনুবাদ পড়িবার আগ্রহ পড়িয়া গেল। অবশ্য, পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ-যোগ্য অনেক গুণ আছে, সেগুলি অনুকরণ করিলে আমাদের উপকার ব্যতীত অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা এমন কথা কখনই বলি না, হিন্দুদের সমস্তই ভাল, আর অ-হিন্দুদের সমস্তই মন্দ, এরূপ গোঁড়ামি নিতান্ত অসহ্য; কিন্তু এ সকল সভ্যতা বরং মার্জ্জনীয়, কারণ ইহাতে আমাদের ততটা অনিষ্ট হয় না। আজকাল কন্যার বিবাহে যেরূপ সভ্যতা বাড়িয়াছে, (যে সভ্যতা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে) ও যে সভ্যতার গুণে অনেক পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহাকে ঘোর বর্ব্বরতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক সভ্যতাব আর একটী বিষময় ফল—একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার ক্রমশঃ অন্তর্ধান। কুড়ি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেরূপ সদ্ভাব ও প্রীতি দেখা যাইত, এখন তাহা যায় কি? একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথার দোষগুণ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এ স্থলে তাহা বিচার্য্য নহে।

আধুনিক সভ্যতার আর একটী বিষময় ফল—ধর্ম্ম বিষয়ে অনাস্থা বা আন্তরিকতার অভাব। শিক্ষিত বাঙ্গালী ঠিক কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা বলা বড় সুকঠিন—কবির কথাতেই বলি,—

We are reformed Hindus.

* * * * *

আমাদের dress হবে English কি Greek.
তা এখনো কত্তে পারিনি ঠিক;
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali;
করি Englsih ও Bengali'র খিচুড়ি পাকিয়ে,
Conversationএ use.
কিন্তু একটিও ঠিক কহিতে পারি if you think.
তা'হ'লে you are an awful goose,
আমরা পড়ি Mill, Hume and Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারিনাকো ধার,

আমরা curious commodities, human oddities
Denominated "the Baboos."
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি,
কিন্তু কাজের সময় সব ঢুঁ ঢুঁs,
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley and goose."

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

কবিতা-কানন।

বৈরাগ্য।

নাহি সুখ এ সংসারে, মায়াময় কারাগারে,
যে দিকে ফিরায়ে দেখি আঁখি।
তবে কেন বারম্বার, অসম্ভব পাইবার
তবে, আশা কর মন-পাখী॥
শোক দুঃখ মৃত্যু জরা, চতুর্ব্বিধ পূর্ণ ধরা,
কভু সুখ হ'বেনা রে মন।
অতএব সাধ্যমত, ঈশ্বরেতে হও রত,
যাতে পাবে অক্ষয় রতন॥
ভুলনা কখন তাঁয়, বিশ্ব যাঁর মহিমায়,
দিবা রাত্রি করিছে ক্রীড়ন।
কিবা পক্ষী কিবা নর, কি বরাহ কি বানর,
সদা তাঁর করিছে কীর্ত্তন॥
যত শীঘ্র পার, ছাড়, মায়াময় এ সংসার,
ত্যজি কর বৈরাগ্য-আশ্রয়।
নতুবা হে সুখ নাই, সদা পুড়ে হবে ছাই,
থাকিতে এ সংসার-আলয়॥

যদিও থাকে হে তব, অসীম ধন বৈভব,
তবু তুমি সুখী নও ভবে।
যত ধন তত আশা, ততই হয় নিরাশা,
এই কথা ব'লে থাকে সবে॥
আশাধীন যতদিন, নাহি সুখ ততদিন,
জানিবে এ নীতির বচন।
তাই বলি সব ত্যজি, হরিপদে সদা মজি,
কর তাঁর মহিমা কীর্ত্তন॥
যদি শান্তি চাও মন, কর তাঁর অন্বেষণ,
নতুবা হে নাহিক উপায়।
দুখ যা'বে, সুখ পা'বে, সদানন্দে গান গা'বে,
অপরূপ স্মরিয়া তাঁহায়॥
মায়াশূন্য হ'বে যবে, অনুপম সুখ তবে,
উদিত হে হইবে তোমার।
সেইজন্য প্রাণপণে, ত্যজ তুমি মায়াগণে,
নতুবা হে হ'বে না উদ্ধার॥
জয় জয় ভবপতি, এই ক'রো মম মতি,
সদা আমি ডাকিহে তোমায়।
ক্ষণসুখে কাজ নাই, সদা তব নাম গাই,
মম মন অন্য নাহি চায়॥

শ্রী——

এস।

এস, তুমি হৃদয়ের শান্তি-স্বরূপিণি,
চির আকাঙ্ক্ষিত হৃদি-বাঞ্ছিত রতন;
এস, হৃদয়ের চির আনন্দ রূপিণি,
রেখেছি পাতিয়া মম হৃদি-সিংহাসন!
বসন্তের পিককুল, কুসুমের হাসি,
তটিনীর "কুলু কুলু" ধ্বনি মনোহর;
অনন্ত চন্দ্রমা-কোলে ফুল্ল তারারাশি,
তোমারি আহ্বান-গীতি গাহে নিরন্তর!
মানবের অন্ধকার-হৃদি নিকেতনে,
তুমি সে প্রতিভা, সুখ-শান্তি সমুজ্জ্বল;
প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি তুমি চন্দ্রাননে,
এ তুচ্ছ জীবনে শুধু তুমি সে সম্বল!
হে চিরবাঞ্ছিত, চির উপাসিত মোর,
এস, মুছাইয়া দাও এ নয়ন-লোর!

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

"তারা আর ফুল"।

১

হেব তারা নভঃপটে,
হের ফুল গাছে ফুটে,
এই দু'য়ে নহে সমতুল ?
আকাশে তারার শোভা,
গাছে ফুল মনোলোভা,
এ জগতে দুইই অতুল।

২

নিশার কুন্তল-মালা,
গগন করিছে আলা,
দেববালা-রচিত সুন্দর ;
নারী-কবরী-ভূষণ,
যেই ফুল অনুপম,
তারা সম হয় মনোহর।

৩

একে মত্ত দেববালা,
অন্যে যাচে কুলবালা,
বল দেখি, কে বেশী সুন্দর ?
এক প্রকৃতির আভা,
অন্য কবরীর শোভা,
কেবা হয় মনোমুগ্ধকর ?

৪

সুনীল গগন-পটে,
তারকার শোভা ফুটে,
করিবারে সুধা বরিষণ।
সবুজপাতার মাঝে,
ফুল রহি তারা সাজে,
করিতেছে মধু বিতরণ।

৫

তারা প্রতি চন্দ্র ধায়,
অলিকুল ফুল পায়,
ভাব দেখি, সুখী কোন্ জন ?
চন্দ্র রহি তারা-মাঝে,
অলি রহি ফুল মাঝে,
হয় প্রেম-ধেয়ানে মগন।

৬

রবি-কর পরশনে,
চিন্তাক্লিষ্ট হ'য়ে মনে,
উভয়েই মনে ব্যথা পায় ;
তাই সে সুন্দর ফুল,
তাই সে তারাস কুল,
আধ আধ জ্বলি, নিভে যায়।

৭

আবার সুধাংশু যবে,
গগনে উদয় হ'বে,
নর-প্রাণে শান্তি উৎস ব'বে।
গগনে তাবার কুল,
গাছেতে নবীন ফুল,
আধ আধ হাসিয়া উঠিবে।

৮

চিরকাল তারা তুমি,
চির তরে ফুল তুমি,
রহিবে আমার প্রাণ ভরি।
হেরিয়া তোদের তায়,
নাচিব আনন্দে হায়,
ভবের অশান্তি পরিহরি।

শ্রীনৃসিংহদাস-বসু।

জাগা'য়োনা স্মৃতি তার।

১

ভুলে আছি আছি ভাল,
জাগা'য়োনা স্মৃতি তার,
দিওনা অশান্তি ঢালি,
বাড়া'য়োনা দুখভার।

২

জাগিতে চাহিনা আর,
আছি ভাল ঘুমঘোরে,
কেন বা জাগায়ে বল,
যাতনা দিবেক মোরে?

৩

আঁধারেতে সুখ যার,
সে কি গো আলোক চাহে?
হয় মন উচাটন,
ঝরে সদা আঁখি যাহে!

৪

তারে ত পাবনা ফিরে,
মিছে মনে করি আর,
অশেষ যাতনা সহি,
অশ্রু কেন করি সার?

৫

দেখা'বার হ'তো যদি,
দেখা'তেম চিরি' বুক,
কিরূপ দগধ হিয়া,
তবু নাহি ফুটে মুখ!

৬

ভুলে যাও তার কথা,
আমায় (ও) ভুলিতে দাও,
মনে করি মিছে কেন,
শুধু যাতনা বাড়াও!

শ্রীঅনাথবন্ধু দে।

আবেগ।

শৈশব বৃক্ষের তলে আমোদে মাতিয়া,
আপনা পাশরি আমি ছিনু এতদিন,
সরল প্রকৃতি সনে আছিল মিশিয়া,
সহজ সরল আত্মা ভাবনা-বিহীন॥

না ছিল ভাবনা শাস্ত হৃদয়-আকাশে,
সুবিমল চিত্ত-রবি আছিল তথায়।
গাহিতাম কত গীত আপন মানসে,
শুনাতাম কত গাঁথা প্রকৃতি মাতায়॥

সুনীল গগন মাঝে যবে শশধর,
প্লাবিত করিত ধরা রজত কিরণে।
বসিয়া একাকী আমি চন্দ্রাতপতলে,
"অর্থহীন" কত কথা কহিতাম মনে॥

বালিকার শান্ত ধীর মানস সরসে,
সুখ দুঃখ উর্ম্মিগুলি করিত না খেলা।
বিরহ মিলন ভেদ জানি নাই কভু,
আপন ভাবেতে ছিনু মগন একেলা॥

বালিকা ছিলাম আমি ছিল না যৌবন,
আপনার ভাবে ছিনু আপনি মগন।
হাসিতাম কাঁদিতাম নাচিতাম কভু,
বালিকা-সুলভ চিত্তে যা' উদিত মনে॥

নাহি জানিতাম আমি পতি যে কি ধন,
পুণ্যময় প্রেমময় দেবতা সুজন।
প্রেম-শিক্ষা-গুরু তিনি স্বরগ-দুয়ার,
অবলা-রমণী-গতি স্নেহ-প্রস্রবণ॥

স্থাবর জঙ্গম কীট পশুপক্ষী আদি,
প্রেমময় আজি হেরি নয়নে আমার।
উচ্চকণ্ঠে গাহি সবে প্রেমের গরিমা,
জগতে অনন্ত প্রেম করি'ছে প্রচার॥

তুমি(ই) শিখা'য়েছ নাথ প্রেমতত্ত্বজ্ঞান,
যাহার আলোকে দেখি সেই প্রেমময়।
অনাদি-কারণ যিনি প্রেমের আধার,
যাঁহার কৃপায় আমি লভেছি তোমায়॥

(নাথ) তুমিই দিয়াছ মোরে এ নব জীবন,
চিনা'য়ে দিয়া'ছ মোরে সেই চিন্ময়ে।
ধর নাথ হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্পরাশি,
যা' ল'য়ে এসেছি দিতে ঢেলে তব পায়ে॥

জ্ঞানহীনা পত্নী আমি কি জানি প্রণয়,
তবু নিজগুণে ভাল-বেসেছ আমায়।
প্রেমের বন্ধনে মোরে রেখেছ বাঁধিয়া,
আমায় দিয়াছ স্থান তব পূত পায়॥

ক্ষণিকের পরিচয় তোমায় আমায়,
তবু কেন এত ভাব, এত অধিকার ?
মনে হয় আমি তব, তুমিগো আমার,
অভেদ অনন্ত আত্মা দোঁহে দোঁহাকার॥

হায় যদি হইতাম কাননের ফুল,
তা'হ'লে মাখিয়া গায় প্রেমের চন্দন,
মন-সুখে শুদ্ধচিত্তে আপনা পাশরি,
পূজিতাম চিরদিন যুগল চরণ॥

অথবা হইতে যদি কাননের ফুল,
মালাগাথি অনুরাগে পরিতাম গলে।
অথবা মিশিয়া ঐ কুসুমের সনে,
থাকিতাম চিরদিন আপনায় ভুলে॥

কেন নাথ কর মোরে এতই আদর,
আমা লাগি কেন এত যতন প্রয়াস ?
স্বরগ-দেবতা তুমি, আমি স্বার্থপর,
তাই গো পূরা'তে নারি মন-অভিলাষ॥

আপনা পাশরি ভালবাসিব তোমায়,
দাসী হ'য়ে চিরকাল সেবিব চরণ।
অবলা রমণী, তুমি একমাত্র গতি,
অনন্ত কালের বন্ধু তুমি প্রাণধন॥

হে ঈশ্বর! তব কাছে এই নিবেদন,
পতিভাবে এই ভবে দিয়েছ যাঁহায়,
হৃদয়ের প্রীতি আর ভকতি লইয়া,
যেন নিশি দিন পারি পূজিতে তাঁহায়॥

শ্রীমতী অনুপমা ঘোষ।

বিবিধ।

পিতা পুত্র—

পিতা পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা প্রতাপ! তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ, জ্ঞানবান্ হইয়াছ, এখন যদি আমাদের কথা না শুন, তা' হ'লে তোমার বড়ই অন্যায়। দেখ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমার জননীও বৃদ্ধা হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় আমাদের সেবা-শুশ্রূষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তা' না করিয়া, আমাদের কথায় অবাধ্য হইয়া, তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আজ এখানে, কাল সেখানে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছ, ইহা কি ভাল? আমরাও এককালে পিতার পুত্র ছিলাম, আজ না হয় পুত্রের পিতা হইয়াছি। পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পুত্রের পালন করা উচিত। আর পিতার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পিতারও করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পুত্রেরা অনেক সময়ে পিতাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করেন।" প্রতাপ উত্তর করিল, "কেন, বাপ মা হ'য়ে কি মাথা কিনে রেখেছ? আমরা শিক্ষিত সভ্য এবং উচ্চালোক-প্রাপ্ত, আমাদিগকে আর প্রাচীন কুসংস্কারের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন হইতে বলিও না। যদি বেশী বাড়াবাড়ি দেখি, তা' হ'লে আমরা প্রাচীন সম্বন্ধের নামকরণ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া নব নামের সহিত নবকর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ম করিব। সেদিন আমার একটী বিশেষ বন্ধু হরনাথ বাবু বলিতেছিলেন, আজকাল পিতা-মাতার গঞ্জনায় গৃহে তিষ্ঠান দায় হইয়াছে; ইহার একটা প্রতিবিধান না করতে পার্‌লে, সংসারে শান্তিলাভ করিবার আশা নাই। অনেক চিন্তার পর কয়েকটী সম্ভ্রান্ত চিন্তাশীলে গভীর চিন্তায় অবধারিত হইয়াছে, মাতা-পিতার প্রতি পুত্রের যে প্রাচীন কর্ত্তব্য-নির্ণয় আছে, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক, এবং সেই কর্ত্তব্য দীর্ঘকাল পালনের পরিবর্ত্তে একটা থোক-থাক কিছু কম্পেন্‌সেশন ধরিয়া দিলেই চলিবে; সকল জঞ্জালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যাইবে। আমিও সেই দলের একজন পৃষ্ঠপোষক। অতএব পিতা! আজ হইতে আমাকে আর কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য বলিয়া সারাদিন জ্বালাতন করিও না। তোমাদের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব জন্য না হয় কিছু কম্পেন্‌শেসন (Compensation) ধরিয়া দিব।" বৃদ্ধ পিতা, গুণবান পুত্রের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া শেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "হায় রে শিক্ষা! হায় রে কাল! অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।"

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৩য় বর্ষ।] কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। [১০।১১শ সং।

উড়িষ্যার তিনটী শ্রেষ্ঠ মন্দির।

নূতন রেলপথের কল্যাণে, আজকাল তীর্থযাত্রী ব্যতীত অনেক শিক্ষিত ও কলানুরাগী ব্যক্তি প্রাচীনকীর্ত্তি দর্শন-মানসে উৎকল-ভূমিতে গমন করিয়া থাকেন। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দর্শকের কুতূহলী মন সেই কীর্ত্তি-নিচয় সম্বন্ধে কত কথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে; কিন্তু সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবার সেখানে কোন উপায় না থাকায়, অনেকেরই মনে কি যেন একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। আমরা ভুক্তভোগী, এবং উক্ত অভাব কথঞ্চিৎভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

উড়িষ্যার প্রাচীনকীর্ত্তি ভুবন-বিখ্যাত। খ্রীষ্ট জন্মিবার দুই তিন শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বুদ্ধদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মগ্রহণের প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত উৎকলদেশে বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য ছিল। সেই বৌদ্ধপ্রাদুর্ভাবকালের অগণ্য গুহাগৃহ (খণ্ডগিরিতে অনন্তগুম্ফা, সাত ঘরা গুহা, উদয়গিরিতে রাণী গুম্ফা, গণেশ গুম্ফা, হাতী গুম্ফা প্রভৃতি,)

গিরিগাত্রে খোদিত জলাশয় (খণ্ডগিরিতে আকাঁশ-গঙ্গা, গুপ্ত-গঙ্গা, উদয়-গিরিতে ললিতাকুণ্ড,) স্তম্ভ "(লাথ)" প্রস্তরলিপি প্রভৃতি স্মৃতি নিদর্শন আছে। সে গুলিতে বৌদ্ধযুগের বিপুল-পরিশ্রম-সাধ্য স্থপতিবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং কোন কোন গুহা খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ভারতের স্থপতি ও ভাস্কর নৈপুণ্যের অমর নিদর্শন। খণ্ডগিরির দ্বারদেশোপরি, বিশেষতঃ উদয়-গিরিদ্বারের চতুষ্পার্শ্বের মনোজ্ঞ কারুকার্য্য—হস্তীযূথসহ মানবের দ্বন্দ, স্ত্রীপুরুষের অসি চর্ম্ম হস্তে দ্বৈরথ যুদ্ধ, রাজমৃগয়া প্রভৃতি, পাষাণে উচ্চখোদিত আলেখ্যাবলী বৌদ্ধ ভাস্করের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। পরবর্ত্তী কালে এই ভাস্কর্য্য হিন্দুরাজগণের উৎসাহে চরমোৎকর্ষ লাভ করে, এবং উড়িষ্যাই ভারতের সেই চিরগৌরব-স্থানীয় অমর প্রাচীনকীর্ত্তির প্রকৃষ্টরূপ লীলাভূমি।

খৃষ্টীয় ৪৭৪ অব্দে যযাতি-কেশরী "যবন"-আখ্যায়িত বিধর্ম্মিগণের হস্ত হইতে উৎকল-ভূমি মুক্ত করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত কেশরীরাজ-বংশ ও হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। কেশরীবংশ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ভুবনেশ্বরের মহামন্দির-স্থাপনা হয় ও অপরাপর দেবমন্দিরে কেশরী-ভূপালগণের রাজধানী ভুবনেশ্বরক্ষেত্র ইন্দ্রপুরীর আকার ধারণ করে। খৃষ্টীয় ১১৩২ অব্দে কেশরীরাজবংশের পতন ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এক নূতন হিন্দুরাজবংশের আবির্ভাব ও তৎসঙ্গে উৎকল-ভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। এই বৈষ্ণবরাজন্যবর্গের প্রাদুর্ভাবের সময়, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জগন্নাথদেবের সুবিশাল পুরী ও মন্দির এবং শত সহস্র দেবতা ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করে। জগন্নাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের পঞ্চাশৎ বর্ষ পরেই কণারকক্ষেত্রে হিন্দুগণের সূর্য্যোপাসনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জগতে অতুল্য অর্ক মন্দির বিনির্ম্মিত হয়। সে মন্দির এক্ষণে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান বাদসাহ ও নবাবগণ যেরূপ সুমোহন সমাধি-মন্দির, বিলাস-ভবন, প্রাসাদ, উপাসনালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের বিপুল ধনরত্ন ও কলানুরাগের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি-চিহ্ন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমায় রাখিয়া গিয়াছেন, এই প্রাচীনকালের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাজগণও আপনাদের সর্ব্বধন-সম্পদ দেবসেবায় ও দেবালয়-নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিয়া প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্পের সেইরূপ অনুপম নিদর্শন উৎকল-ভূমিতে বিকীর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যায় ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব-

ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের এতগুলি পুরাতন মহান্ ও সুন্দর মন্দির, গুহা, ভগ্নদুর্গ, ভগ্নপ্রাসাদ, সেতু স্তম্ভ, সরোবরাদি স্মৃতি-চিহ্ন এখনও বিরাজমান আছে যে, ভারতের আর কোন প্রদেশে সেরূপ নাই। সে গুলির নামোল্লেখ করাও এস্থলে সম্ভবপর নহে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইং ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত সুবৃহৎ তালিকা-পুস্তকে ৭৫টীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এ প্রবন্ধে কেবল হিন্দুরাজগণের তিনটী শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির ও কণারকে অরুণদেবের ভগ্নমন্দিরের ইতিহাস, গঠন, ও কারুকার্য্য সম্বন্ধে স্থূলতঃ কয়েকটী কথা বলিব। *

জগন্নাথ-মন্দির। উড়িষ্যার দেব-মন্দিরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে জগন্নাথদেবের মন্দিরের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। এই মন্দির প্রাচীনত্বে বা সূক্ষ্ম শিল্প-শোভায়, উৎকল দেশের সকল মন্দিরের শীর্ষস্থানীয় না হইলেও, স্থান-মাহাত্ম্যে, হিন্দুগণের ভক্তি-মহিমায় এবং বিরাট শোভায় ইহা অপরাজিত। "পুরী"ই হিন্দুগণের নিকট অতি প্রাচীন কাল হইতে মর্ত্ত্য-ভূমিতে বিশ্বপতির প্রকৃষ্টরূপ পুরী বা আবাস-নিকেতন।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী সেই মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিহ্বলকণ্ঠে-বলিয়াছিলেন—'জগন্নাথদেবের সকলই বিরাট! প্রভুর মূর্ত্তিও যেরূপ বিরাট, তাঁহার ভোগের সেইরূপ বিপুল আয়োজন, তাঁহার মন্দিরও যেমন প্রকাণ্ড

* পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত মন্দিরত্রয়ের, বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ-দর্শন অভাবে কলিকাতা মিউজিয়মে ঐ মন্দিরগুলির বহুসংখ্যক ফটোগ্রাফ ও কয়েকখানি কারুকার্য্যের প্লাষ্টার-প্রতিকৃতি দেখিয়া আসিতে পারেন, ও নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন।

1. Dr. Rajendra La'la Mitra's Antiquities of Orissa.
2. Dr. W. W. Hunter's Orissa. Vol 1.
3. Dr. W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol XIX.
4. Mr. James Fergusson's History of Architecture. Vol II.
5. Archaeological Survey Reports. Vol XIII.
6. Mr. A. Stirling's Account (Geographical, Statistical, and Historical) of Orissa published in Vol XV of the Asiatic Society's Journal, printed in 1825.
7. List of Ancient Monuments in Bengal. Edition 1896.

ও গগনস্পর্শী, তাঁহার জলাশয়ও তাই বুঝি অনন্ত বারিধি!' বাস্তবিকই জগন্নাথদেবের মন্দিরের তলদেশে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে চূড়ার পানে চাহিয়া দেখিলে, শান্ত চিত্তে তাঁহার পুরী পরিক্রম করিলে, মনে ঐ রূপই ভাব উদিত হয় বটে। জগন্নাথের পঞ্চদশ হস্ত উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত পুরী-প্রায় ষড়বিংশতি বিঘা ভূমিব্যাপী। প্রাচীরাভ্যন্তরে জগন্নাথের প্রকাণ্ড মন্দির শ্রেণী ব্যতীত, লক্ষ্মী, সূর্য্য, গিরিজা, নৃসিংহ প্রভৃতি পঞ্চাশটীর উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দিরের সঙ্কুলান হইয়াও মন্দির-প্রাঙ্গণে শত সহস্র যাত্রী সমবেত হইবার স্থান আছে। পুরীর মধ্যস্থলে আর একটী প্রাচীর-সীমাবদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির। পুরী চতুষ্কোণ—চারিদিকে চারিটী দ্বার, পূর্ব্বে সিংহদ্বারই প্রধান। সিংহদ্বার দিয়া প্রশস্ত ও অনুচ্চ প্রস্তর-সোপানাবলী আরোহণ করিয়া "আনন্দ বাজার"—সেখানে প্রভুর ভোগ বিক্রয় হয়। পরে সম্মুখেই জগন্নাথের শ্রেণীবদ্ধ ও পরস্পর-সংলগ্ন মন্দির চতুষ্টয়। প্রথমেই ভোগমণ্ডপ, পরে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ নাটমন্দির, তৎপরে জগমোহন, সর্ব্বশেষে বড় দেউল। প্রথমোক্ত তিনটী মন্দির চতুষ্কোণ ও তাহাদের ছাদ চতুর্দ্দিক হইতে স্তরে স্তরে সোপানের ন্যায় ক্রমে সূক্ষ্মচূড় হইয়া উঠিয়াছে। জগমোহনে জগন্নাথের ভোগান্তে বিরামের সময় নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত হয়, এবং সেইখান হইতেই ঠাকুরের শয়ান অবস্থায় যাত্রীগণকে দেবদর্শন করিতে হয়। নাটমন্দির স্তম্ভশ্রেণীবিশিষ্ট সুপরিসর গৃহ। বড় দেউল বা শ্রী-মন্দিরেই কৃষ্ণ-প্রস্তর (Stealite) নির্ম্মিত সুবৃহৎ বেদিকায় বা "রত্নসিংহাসনে" জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার অধিষ্ঠান।

বড় দেউল ২৮ বর্গহস্ত পরিমিত ভূমির উপর বিনির্ম্মিত, উহা গোল বালিশের আকারে ভূমি হইতে ১৩৩ হস্ত (২০০ ফিট) উত্থিত হইয়াছে। ঐ মন্দির-ভিত্তি ও প্রাচীর-বেষ্টিত পুরী পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি হইতে প্রায় চতুর্দ্দশ হস্ত সমুচ্চ "নীলাচল" অভিহিত সমুন্নত ভূমির উপর নির্ম্মিত বলিয়া, দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ঐ মন্দিরচূড়ার উপরিস্থিত সুদর্শন চক্র ও পতাকা দেড় শত হস্ত উর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইতে দেখা যায় এবং বহুদূর হইতে উহা পুরুষোত্তম-দর্শনাভিলাষী যাত্রীর নয়নপথে পতিত হইয়া তাহাদের অভীষ্টলাভের অচির-সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া পথশ্রান্তি লাঘব করে। মন্দিরোপরিস্থিত চক্রের ব্যাস ৮ হস্ত, কিন্তু উচ্চতা-নিবন্ধন উহা সাধারণ একখানি থালার অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা ময়দানে অক্টার-

লোনী মনুমেণ্টের উচ্চতা ১০১ হস্ত (১৫২ ফিট) মাত্র, এই কথা স্মরণ করিলেই, পাঠক উহার প্রায় দেড় গুণ উচ্চ শ্রীমন্দিরের উচ্চতা অনুমান করিতে পারিবেন।

জগন্নাথ বহু প্রাচীন। হাণ্টার সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ৩১৮ অব্দে জগন্নাথের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার বহুকাল পূর্ব্বে উৎকলভূমিতে জগন্নাথের আবির্ভাব হয়। জগন্নাথের আদিম নীলপ্রস্তর-মূর্ত্তি, অরণ্যে অজ্ঞাতবাস, কাষ্ঠ-মূর্ত্তি গ্রহণসম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, ও পুরাতত্ত্ববিদগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবার জন্য এ প্রবন্ধে স্থান হইবে না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি-প্রাপ্তি ও মন্দির-নির্ম্মাণ বিষয়ে জনপ্রবাদ এবং কেন যে জগন্নাথ-মূর্ত্তি বিরূপ ও বীভৎস—ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের কথায় "the most hideous caricatures of the human face divine" হইল, সে সম্বন্ধে গল্পও এত প্রচলিত যে, তাহা উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন। জগন্নাথ-মূর্ত্তি যত প্রাচীন, তাঁহার পুরী ও মন্দির তত পুরাতন নহে। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গা-বংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেব তদীয় রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে খৃষ্টীয় ১১৮৪ অব্দে ঐ মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং ১১৯৮ অব্দে ঐ কার্য্য সমাপ্ত হয়।* হুগলী নদী হইতে গোদাবরী তটদেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্য রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের শাসনাধীন ছিল, এবং কথিত আছে, তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকে এক অশুভ মুহূর্ত্তে ব্রহ্মহত্যা পাতকে পতিত হয়েন। সেই মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তিনি দশটী বিস্তৃত নদীর সেতুবন্ধন, চল্লিশটী কূপ খনন, এক শত বায়ান্নটী ঘাট নির্ম্মাণ, বাইটটী প্রস্তর-মন্দির গঠন, চারি শত পঞ্চাশটী ব্রাহ্মণপল্লী স্থাপন ও তদধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করেন। জগন্নাথদেবের চিরস্মরণীয়

---

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডাক্তার হাণ্টার (W. W. Hunter) তালপত্রে লিখিত পুরীর ইতিহাস—মাদল পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া এই তারিখ ও ইতিহাস দিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে কয়েকটী প্রস্তর-লিপির আবিষ্কারে মাদল পঞ্জিকার উক্ত ইতিহাসের সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহা স্থির হইয়াছে যে, অনঙ্গ ভীমদেবের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গাবংশীয় নরপতিগণের প্রথম রাজা অনন্ত বর্ম্মণ চোড় গঙ্গা জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যদিও মন্দির-গঠনের কাল-সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নাই, তথাপি শেষোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন যে, মন্দির খৃষ্টাব্দ ১১৮৫ হইতে ১১৯০ এর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দিরনির্ম্মাণ, অনঙ্গভীমদেবের সেই পুণ্যকীর্ত্তি সমূহের অন্যতম। পঞ্চদশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মণিকাঞ্চন (বর্ত্তমান কালের ৫০ লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রার তুল্য মূল্য বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন) ব্যয়ে, অগণ্য স্থপতি ও ভাস্করের চতুর্দ্দশ বর্ষ পরিশ্রমে ঐ মন্দির গঠিত হয়।

জগন্নাথের পুরীর প্রাচীর হইতে প্রাঙ্গণতল পর্য্যন্ত মন্দিরাদি সমস্তই প্রস্তর-গঠিত। মর্ম্মর প্রস্তর নহে, কলিকাতার রাজপথের ফুটপাথ যেরূপ প্রস্তরে বদ্ধ করা হয়, সেইরূপ ধরণের কঠিনতর প্রস্তর। তবে দেওয়াল-গাত্রে ভাস্কর-কারুকার্য্য-খচিত শ্বেত-কৃষ্ণ-লোহিতাদি বর্ণের উৎকৃষ্ট প্রস্তর স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। জগন্নাথদেবের মন্দিরে সূক্ষ্ম ভাস্কর্য্য ভোগমণ্ডপের বহির্দ্দিকস্থ গাত্রেই দৃষ্ট হয়; নতুবা বড় দেউল বা অপরাপর মন্দিরের বাহির্দ্দেশে ও অভ্যন্তরে দেবদেবী, নরনারী, ও সিংহাদি পশুমূর্ত্তির বৃহদাকার ও সূক্ষ্ম-শিল্পবিবর্জ্জিত। সিংহদ্বারের গাত্রও কারুকার্য্যময় এবং সিংহ-মূর্ত্তি-শ্রেণীবিশিষ্ট, দ্বার মন্দিরাকৃতি ছাদবিশিষ্ট। সিংহদ্বারের সম্মুখেই রাজপথের মধ্যস্থলে যে অনিন্দ্যসুন্দর অরুণ-স্তম্ভ আছে, তাহার পরিচয় পরে লিপিবদ্ধ করিব। সিংহদ্বার হইতে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ উভয় দিকে অর্দ্ধ মাইল পথ গমন করিলেই উচ্চ বালুকা-স্তূপের পাদদেশে সুবিস্তীর্ণ সৈকত ভূমি, সেথানে দিগন্তপ্রসারিত সাগরের গাঢ় নীল জল নিশিদিন অবিশ্রামে ভীম গর্জ্জনে ফেণরাশি উদ্গীর্ণ করিতেছে।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের উপর দিয়া আট শত বর্ষের শীতাতপ-বর্ষাদি চলিয়া গিয়াছে, ভোগ-মণ্ডপের গাত্রের সুচারু ভাস্কর্য্যের সুচিক্কণ সুষমা কালবশে বিমলিন হইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থানে স্থানে বিচ্যুত হইয়াছে। বড় দেউল ও জগমোহনের কয়েকখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িয়াছিল, এবং উহা জীর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে সংস্কার করা হইয়াছে। সংস্কারকগণ মন্দিরকে ঠিক পূর্ব্বাবস্থ করিতে পারেন নাই, মন্দিরের বার্দ্ধক্য-শ্রী হরণ করিয়াছেন মাত্র। এক স্থলে সুউচ্চ কার্ণিসের গুরুভার প্রস্তর যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার জন্য লোহার রেলখণ্ডের স্তম্ভ করা হইয়াছে, মন্দির-গাত্রে চূর্ণ বিলেপন করা হইয়াছে। গতবর্ষে বড়লাট বাহাদুর পশ্চিমাঞ্চলে কোন প্রস্তর-কারুকার্য্য-খচিত প্রাচীন অট্টালিকার দেওয়ালে চূর্ণ-বিলেপন হইয়াছে দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের বোধ হয়, তাঁহার যদি জগন্নাথ-পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তিনি

এই প্রাচীন মন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিত হইতেন। অর্থাভাবে অথবা এই বৈজ্ঞানিক যুগের ইঞ্জিনিয়ারিং-বুদ্ধির উন্নতি (!) হেতু, ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে গুরুভার-প্রস্তর সমূহে হিন্দু কারিকরগণ ঐ মন্দির গঠিত করিয়াছিল, তাহার একখানিকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য রেলখণ্ড স্থাপনের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু জরাগ্রস্ত সন্ন্যাসীকে কালাপাড় সিমুলিয়ার ধুতি পরিহিত করার ন্যায় সেই কাল ধূসর পাষাণ-মন্দির-গাত্রে চূর্ণ হরিদ্রা বর্ণাদি বিলেপন নিতান্তই বিগর্হিত ও রুচিবিরুদ্ধ বোধ হইল। যে মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধ, মোগল ও পাঠানের কত ধর্ম্মবিপ্লব ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়াছে, যে মন্দির-প্রাঙ্গণে লক্ষ্মণসেন, শিবজী আদি রাজন্যবর্গ, কবীর চৈতন্য আদি ধর্ম্মপ্রচারকগণ একদিন বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, যে মন্দির কাল-মাহাত্ম্যে ঐতিহাসিক সুষমায় বিমণ্ডিত, সেই মন্দির-গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবার সময় যাহাতে তাহার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য, প্রাচীন বেশ অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সংস্কার-সমিতির সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত ছিল। আমাদের চক্ষে জগন্নাথমন্দির হইতে অনেক প্রাচীন, বোধ হয় জগন্নাথ-ক্ষেত্রের সর্ব্ব প্রাচীন মার্কণ্ডদেবের জীর্ণ ও বিমলিন বর্ণ এই সংস্কৃত মন্দির হইতে সুন্দরতর বোধ হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে জগন্নাথ-মন্দিরের নবধবল বেশ স্থায়ী হইবে না, বোধ হয় এত দিনে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর-মন্দির।—ভুবনেশ্বরের মন্দির জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে প্রায় সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু বহু-শত-বর্ষ-ব্যাপী নব নব উদ্যমে উহার গাত্র এত প্রচুর ও মনোহর ভাস্কর-কারুকার্য্যে খচিত হইয়াছিল যে, তাহার সহিত জগন্নাথ-মন্দিরের শিল্পশোভার তুলনা হয় না। ভুবনেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ উনবিংশ বিঘা ভূমি ব্যাপৃত এবং চতুর্দ্দিক ৩৩ হস্ত উচ্চ ও ৫ হস্ত প্রসারিত প্রস্তর-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। এক সময়ে এই প্রাচীর, যাহাতে দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় মন্দিরকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সুবিধাজনক হয়, সেই উদ্দেশ্যে ঐ প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ গাত্রে অস্ত্রধারী পুরুষগণের দণ্ডায়মান হইবার উপযোগী উচ্চ বেদিকা নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু উহা শেষ হয় নাই, কেবল উত্তর-পূর্ব্ব অংশে উহার নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার তিনটী দ্বার,—দুইটী ক্ষুদ্র, কিন্তু পূর্ব্বদ্বারটী একাদশ হস্ত প্রসারিত ও সুউচ্চ মন্দিরাকার ছাদ যুক্ত। প্রাচীর-সীমা মধ্যে চারি হস্ত উচ্চ হইতে

বিংশতি হস্ত উচ্চ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র মন্দিরে পরিব্যাপ্ত। সকল গুলিই জরাজীর্ণ, কোনটী বা ভগ্নাবশিষ্ট। এই মন্দিরগুলির মধ্যে একটীর তলদেশ প্রাঙ্গণতল হইতেও প্রায় চারি হস্ত নিম্নতর। সে মন্দিরটীই ভুবনেশ্বরের আদি মন্দির বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সেটী ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে যে প্রাচীনতর, তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান,—তাহাতে এখনও একটী শিবলিঙ্গ আছে, লিঙ্গ একবার স্থাপিত হইলে আর স্থানান্তরিত করিতে নাই বলিয়া ঐ পরিত্যক্ত মন্দির হইতে উহা উত্তোলিত হয় নাই। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থল হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণের অর্দ্ধপথে আর একটী পরিত্যক্ত মন্দির আছে, সেটী ভুবনেশ্বরের মন্দির ব্যতীত অপরাপর মন্দির হইতে বৃহদাকার ও সুউচ্চ; সেটী এখনও অটুট আছে। এই মন্দিরের সন্নিকটেই পার্ব্বতীর সুমোহন মন্দির। ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণের প্রায় দুই শত বর্ষ পরে গঙ্গাকেশরী কর্তৃক এই সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের দুইটী গৃহ মোহন ও দেবীর মন্দির এবং ইহার দেওয়ালগাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, পুষ্প-স্তবকাদি উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যে সুসজ্জিত। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে দেবাদিদেবের রন্ধনশালা। সে বাটী এত পুরাতন এবং লক্ষ লক্ষ চর্ম্মচটিকার আশ্রয় হেতু অপরাহ্নকালে উহাতে প্রবেশ করিলে উহার বিজনতা ও প্রাচীনতা যেন গুরুভারে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

প্রাঙ্গণের মধ্যে উত্তরাংশে ভুবনেশ্বরের মন্দির। এ মন্দিরও জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বান্তে ভোগমণ্ডপ, পরে নাটমন্দির, তৎপরে ভদ্রক বা মোহন, সর্ব্বশেষে রেখা বা বড় দেউল। বড় দেউলের দেওয়াল ঋজু ভাবে ৫৫ ফিট উঠিয়া পরে ছাদ উর্দ্ধমুখে আরও ১০৫ ফিট উঠিয়াছে। প্রাঙ্গণতল হইতে মন্দির একশত সাত হস্ত (১৬০ ফিট,) অর্থাৎ মনুমেণ্ট অপেক্ষা ৬ হস্ত উচ্চ। বড় মন্দির জগন্নাথ মন্দিরের ন্যায় গোলাকার ও শিখরদেশ সমতল চূড়ায় শেষ হইয়াছে; দ্বাদশটী অবনতজানু কেশরী এই চূড়ার কার্ণিস বহন করিয়া আছে,—সিংহগুলি অস্বাভাবিক আকৃতির। বড় মন্দিরের বহির্দ্দেশে পাদমূলে কলস শ্রেণীর উপর হইতে চারিধারে অর্দ্ধ স্তম্ভশ্রেণী উঠিয়া গিয়া উর্দ্ধে ও নিম্নে সেই স্তম্ভের অন্তর্ব্বর্ত্তী খাঁজে অনেক কোলঙ্গা আছে, এবং খাঁজের মধ্যে সেই স্তরে স্তরে কোটরগুলি আসাতে মন্দিরের দেওয়াল যেন ত্রিতল বলিয়া বোধ হয়। নিম্নস্তরের কোটরগুলিই বিশেষ সুরম্য গঠন ও প্রচুর কারু-

কার্য্যময়। সেই কোটরের মধ্যে একদিকে ভগবতী, অপর দিকে গণেশ ও কার্ত্তিক মূর্ত্তি। এই প্রতিমাগুলিকে শীত-বর্ষাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছাদ-বিশিষ্ট ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে—সে গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের। সে গুলির গঠন-পারিপাট্য নাই এবং তাহাদের দেওয়াল-গাত্র ভাস্কর্য্য-বিরহিত—সে গুলি কেবল বড় মন্দিরের নিম্নপ্রদেশের শ্রী-শোভা দর্শনের ব্যাঘাত করিয়াছে। বড় মন্দিরের কোণের কোটরগুলিতে দিক্‌পাল-গণের মূর্ত্তি,—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, কুবের, মরুৎ, ঈশান, স্ব স্ব দিকে স্থাপিত হইয়াছে, কেবল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মা ও অধোভাগে অনন্ত মন্দিরে স্থাপনা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইবে বলিয়া স্থান পান নাই। এই মূর্ত্তিগুলির কোন কোনটীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে। উত্তর দিকের একটী নবনির্ম্মিত বড় মন্দির-সংলগ্ন গৃহছাদে উঠিবার সোপান আছে। উপরে উঠিয়া একটী প্রকাণ্ড সুমসৃণ উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত দিক্‌পাল-মূর্ত্তি দেখিলাম। তাহার একটী হস্ত ভগ্ন; পাণ্ডারা বলিল, কালাপাহাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। মন্দির-চূড়ার অর্দ্ধপথে জগমোহনের ছাদের দিকে একটী প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি দেওয়াল হইতে ব্র্যাকেটের মত বাহির হইয়া আসিয়াছে; সেইখানে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বায়ুনির্গমের জন্য একটী গবাক্ষের ন্যায় ছিদ্র আছে। মন্দিরের অপর দিকে সেই সুউচ্চ স্থলে রাজবংশ চিহ্ন (সম্ভবতঃ কেশরী বংশের ও Coat of Arms ছিল) স্বরূপ প্রস্তরের সমুন্নত কারুকার্য্য আছে। নাটমন্দির "ফ্লোর" বিশিষ্ট, সেই ফ্লোরের নিম্নে ভূমিতলে একটী বলীবর্দ্দ শয়ন করিয়া আছে;—ভুবনেশ্বরের সেই বলীবর্দ্দকে হঠাৎ দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মন্দিরের উত্তর ধারে একটী বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তরবদ্ধ কূপ—এই কূপের জলে ভুবনেশ্বরের স্নান হয়।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, উড়িষ্যার মন্দির-গঠনের একটী ত্রুটী দর্শক-মাত্রকেই অনুভব করিতে হয়—সেটী মন্দিরাভ্যন্তরের অন্ধকার। জগমোহনে প্রবেশ-দ্বারের পর সেই গৃহের যে অংশ অতিক্রম করিয়া বড় মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, সেই পথে বা বড় দেউলে আলোক বা বায়ু আগমের কোনরূপ উপায় নাই। জগমোহনে দুই একটী গবাক্ষ ছিল, তাহাও ছাদভারে দেওয়াল-গাত্র প্রপীড়িত দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে রুদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষণে মন্দিরের প্রবেশ-পথে ও মন্দিরের ভিতরে মধ্যাহ্ন কালেও নিবিড় অন্ধকার, ক্রোড়ের মানুষ চেনা যায় না। ভুবনেশ্বরের নিকট

অহরহঃ যে প্রদীপ জ্বলে, তাহাতে যেন সেই আঁধার আরও গাঢ়তর করিয়া জানাইয়া দেয়। জগন্নাথের মন্দিরে জগমোহনের দ্বার প্রকাণ্ড ও সুপ্রশস্ত বলিয়া এই ক্রটী তত উপলব্ধি হয় না।

ভুবনেশ্বরের মন্দির-চতুষ্টয়ের বহির্গাত্রময় বিশেষতঃ সুরম্য নাটমন্দিরের আপাদ-মস্তক অতি শোভন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময়। নাটমন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে অপর কোনও কারুকার্য্য নাই, পশ্চিম দিকের মধ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকে গাঢ়নীল প্রস্তরের উপর যে অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য্য আছে, তাহা কণা-রক মন্দিরের দ্বারের বেষ্টনকারী অতুলনীয় ভাস্কর-শিল্পের প্রতিকৃতি। নাট-মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী কুলঙ্গীতে হর-পার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি। দেউলের কোন কোন স্থানে ভগ্ন, কোন কোন প্রস্তর জীর্ণ, কোনখানি বা স্খলিত হইয়াছে। সেই প্রস্তরগুলি পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত করা অচির-আবশ্যক হইয়াছে। পূর্ব্ব-কালের বিনষ্ট কারুকার্য্য পুনরুদ্ধার করা বোধ হয় সম্ভবপর নহে—সামান্ত অর্থের কর্ম্ম নহে, কেবল জীর্ণ বা স্থানচ্যুত প্রস্তরগুলি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে হয়। সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে-ছেন, দেখিয়া বড় আনন্দ হইল; কিন্তু ভয়ও হইল, পাছে চূর্ণ ও বালুকা বিলেপনে জগন্নাথ মন্দিরের ন্থায় দুর্দ্দশা ঘটে।

খৃষ্টীয় ৫০০ হইতে ৫২৬ অব্দের মধ্যে হিন্দুরাজা যযাতি কেশরী এই মহামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যযাতি কেশরী বৌদ্ধ প্রতাপ হইতে উৎকল দেশ মুক্ত করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত কেশরী-রাজবংশের স্থাপনা করেন, ও ইষ্টদেবতা ভুবনেশ্বর স্থাপনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘোষণা করেন। তিনি বড় দেউল ও ভদ্রকটী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া গতায়ু হয়েন। তাঁহার পুত্র সূর্য্যকেশরীর রাজত্ব কালে মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয় না। সূর্য্যকেশরীর পুত্র অনন্তকেশরী এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা ললিতেন্দ্র বা অলাবুকেশরী খৃষ্টীয় ৬৫৭ অব্দে এই মন্দির-গঠন সম্পূর্ণ করেন। ভোগ মণ্ডপটী খৃষ্টীয় ৮৫০ হইতে ৮৭০ অব্দের মধ্যে জগৎকেশরী কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয় এবং সর্ব্বশেষে কেশরী-রাজবংশ পতনের ত্রিংশৎ বর্ষ মাত্র পূর্ব্বে, নলিনী কেশরীর রাজ্ঞী কর্ত্তৃক ১০৯৯ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দে পরম রমণীয় নাট-মন্দিরটী বিনির্ম্মিত হয়। কেশরী বংশের ক্রমান্বয়ে ৪৩ জন নরপতি উড়িষ্যার ছয়শতাধিক কাল রাজত্ব করেন। তাঁহারা কেবল ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিরস্ত ছিলেন না, সমস্ত নগরময় অসংখ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে ৬০০ শত হস্ত উত্তরে প্রকাণ্ড বিন্দু সরোবর, উহাকে কেহ বা সাগর, কেহ বা হ্রদ বলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যাবতীয় জলাশয়ের বারিবিন্দু অবিরল ঐ সরোবরোপরি বর্ষিত হইতেছে, এই বিশ্বাসে ঐ সরোবরের নাম বিন্দু সাগর হইয়াছে। উড়িষ্যার অপরাপর সরোবরের ন্যায় এই পরমপবিত্র সরোবরের তটদেশ প্রস্তর-গ্রথিত; পরন্তু ইহার চারিধারেই অবিচ্ছিন্ন প্রস্তর-সোপানশ্রেণী ছিল, এক্ষণে তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের 'নরেন্দ্র তালাও' এর ন্যায় ইহারও মধ্যস্থলে দ্বীপোপরি প্রস্তর-মন্দির। তাহার সম্মুখে একটী কৃত্রিম উৎস শোভা পাইত। কিন্তু নরেন্দ্র তালাও হইতে বিন্দু সরোবর অনেক বড়। এখনও ইহার দৈর্ঘ্য ১৪০০ ফিট এবং বিস্তার ১১০০ ফিট অর্থাৎ প্রায় এক শত সাত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া আছে।

এক সময়ে এই পবিত্র হ্রদের তটোপরি সপ্ত সহস্র দেব দেবী-মন্দির বিরাজ করিত এবং সেই সপ্ত সহস্র মন্দির হইতে ততোধিক ব্রাহ্মণ ও ভক্তকণ্ঠে শিবনাম ধ্বনিত হইত। একদিন সেই সপ্ত সহস্র মন্দির হইতে সান্ধ্য আরতীর মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিয়া ভুবনেশ্বর নগরীর দিগদিগন্ত মুখরিত করিত এবং শত সহস্র সমুজ্জ্বল দীপালোকে সেই সরসীজল নাচিতে থাকিত। এখন সেই সপ্ত সহস্র মন্দিরের পাঁচ ছয় শত মাত্রের অস্তিত্ব আছে—তাহাও ভগ্নাবশেষ ও পরিত্যক্ত—সে দীর্ঘিকা শ্রীহীন ও তাহার জলরাশি জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণু পরিপূর্ণ।

এই ভগ্ন মন্দিরগুলির গাত্র দেখিয়া ষষ্ঠ শতাব্দীর উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যের স্থূল ধারণা হইত। দ্বাদশ শতাব্দীর অতি সুকুমার কল্পনা ও অক্লান্ত শ্রমসাধ্য সূক্ষ্ম শিল্প এবং অধুনাতন কালের স্থাপত্য-অপভ্রংশ ও অনুকরণচাতুরী, সমস্তই পরিলক্ষিত হয়। সার উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব বলেন—

"They exhibit every stage of Orissa Art, from the rough conceptions of the Sixth Century through the exquisite designs and ungrudging artistic toils of the twelfth to the hurried and dishonest Stucco-like make beliefs of Hindu architecture at the present day."

কেবল এই বিন্দু সাগরের চতুষ্পার্শ্বে নহে, সমগ্র ভুবনেশ্বর নগরীময় যে অসংখ্য পাষাণ মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলি

এখনও বিদ্যমান আছে, কোনটী ভগ্ন, কোনটা বা জরাজীর্ণ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক একটীর গঠন-নৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্য এত সুন্দর ও মহান্, যে কলানুরাগী দর্শক যদি তাহার একটী দেখিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহার উড়িষ্যা-ভ্রমণ ব্যর্থ হয় নাই বলিয়া সন্তোষ পাইবেন। যিনি গৌরী কুণ্ডের তটদেশে মুক্তেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দিরটী বা বেতাল দেউল, পরশুরামেশ্বরের মন্দির, ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি মন্দিরগুলি দেখিয়াছেন, তিনি আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মুক্তেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য্য বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর ভুবনেশ্বরের নিজ মন্দিরগাত্রে হিন্দু-ভাস্কর্য্যের চরমোৎকর্ষ খোদিত হইয়া আছে। সে কারুকার্য্যই বা কত প্রচুর ও কত সূক্ষ্মশিল্পময়! তপোনিরত ভক্তমূর্ত্তি, নরনারী মূর্ত্তি, পদাতিক শ্রেণী, অশ্বারোহী যোদ্ধৃবর্গ, পত্র-পল্লবের কৃত্রিম কারুকার্য্য ও পশুমূর্ত্তি, অহিফণার শত বিচিত্র ভঙ্গী, সকলই সুন্দর ও অসামান্য গুণপনার পরিচায়ক,—হিন্দু ভাস্করের সৌন্দর্য্যসার। পশু বা নরনারী মূর্ত্তি ভারতের অপরাপর স্থানের ন্যায় অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গী-বিশিষ্ট বা মুখে জীবন্তভাব (expression) বিরহিত নহে। তবে যে সেরূপ অস্বাভাবিক মূর্ত্তি একবারে নাই, এরূপ নহে; ভুবনেশ্বর মন্দিরে সেরূপ মূর্ত্তি বড় বেশী নাই,—অধিকাংশই স্বভাবসুন্দর। নিপুণ শিল্পির অমর কীর্ত্তি। ডাক্তার হাণ্টার সাহেবের কথায় "যোদ্ধৃবর্গ সুঠাম পুরুষবরের আদর্শস্থানীয়, এবং গ্রীসীয় শিল্পীগণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে অতি সুকুমার মুখশ্রীর যে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীমূর্ত্তিগুলিতে তাহা প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়।"—"The warriors form models of manly grace and the ladies frequently exhibit that exquisite type of face which the Greecian Artists have left behind them alike in Eastern and Western India."

যে দিন অপরাহ্নে ভুবনেশ্বর তীর্থ ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, সে দিনের স্মৃতি কখন ভুলিব না। শুভাদৃষ্টবশতঃ সে দিন ভুবনেশ্বরে যাত্রীর সমাগম ছিল না। যে দিকে যাই, সে দিকই শৈবাল-মণ্ডিত, ভগ্ন, জীর্ণ বা পরিত্যক্ত, হয়ত দেড় সহস্রবর্ষের পুরাতন,—মন্দির। চারিধারেই ত্রিচত্বারিংশ সংখ্যক কেশরীবংশীয় নরপতিগণের অতীত সমৃদ্ধির চিতাভস্ম মাখিয়া এক নীরব দৈন্য একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে,

আর পথিকজনের মনে সেই রাজন্যবর্গের অমরলোক-লাঞ্ছিত রাজধানীর শ্রীসৌভাগ্যের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

একখানি চিত্র।

(গল্প)

১

"মেয়ের বের কি করলে গো? সে যে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তের বছরেরটি হল, আর বে না দিয়ে কি রাখা যায়?"

একদিন গৃহিণী আমায় এই কথা বলিলেন। আমি বলিলাম "চেষ্টা ত যথাসাধ্য করছি, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাই কই?"

গৃহিণী। "তোমার চেষ্টার মুখেও ছাই, আর তোমার মুখেও ছাই।"

আমার মুখে ছাই পড়িলে গৃহিণীর মুখেও যে ছাই ভিন্ন একবেলাও অন্ন জুটিবে না, সে কথা তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

আমি। "তা আমার মুখে ছাই পড়্‌লে তোমার বড় স্থবিধে হয়, না?"

গৃহিণী। "ওগো, যাও, যাও। অত হ্যাক্‌রা কেন? মেয়ের বে না দিলে যে দশের কাছে মুখ দেখান ভার হয়। লোকে কত কথা বলে। এখন মনে হয় যে, গলায় দড়ি দিয়ে মরি, কি আফিম্‌ খেয়ে মরি!"

আমি। "আর চোক কপালে তুলে হাত পা ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে পিতৃকুল, পতিকুল উদ্ধার করি।"

গৃহিণী। "ওই জন্যে তোমায় কিছু বলি না। বল্‌লেই তুমি ঠাট্টা কর। সত্যি, বলনা, মেয়ের বের কি কর্‌লে?"

আমি। "একটী পাত্র সন্ধানে আছে। কাল তা'কে দেখ্‌তে যাব, মনে করছি।"

গৃহিণী। "যা'তে শীগ্‌গির হয়, সেই চেষ্টা কর। শেষ যেন এক-ঘ'রে না হ'তে হয়।"

আজ এই পর্য্যন্ত।

২

পরদিন রবিবার। আহারাদি করিয়া কলিকাতার পাত্র দেখিতে আসিলাম। দেখা শোনা সব শেষ হইল। এই বার ফর্দ্দ। ফর্দ্দ দেখিয়াই ত আমি অবাক্! দু-হাজার টাকা। পাত্রের গুণ কি,—না তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাহাতেই এত! ক্ষুদ্রপ্রাণ, মাসিক বিংশতি চক্‌চকে রৌপ্য মুদ্রার বেতনভোগী আমি ত ফর্দ্দ দেখিয়াই কাঁপিয়া উঠিলাম। সেখানে "হাঁ, হুঁ, না," এইরূপ গোছের উত্তর দিয়া ফিরিলাম। পথে ভাবিলাম, "হায় বিশ্ব-বিদ্যালয়! তোমার গুণে কত কন্যাদায়-গ্রস্ত পথের ভিখারী হইতেছে, কত মনুষ্য গর্দ্দভ-শ্রেণীভুক্ত হইতেছে, কত হৃদয় চিরদিনের মত শুকাইতেছে, কে বলিতে পারে? পরমেশ্বর! এ দরিদ্রের উপর এত ক্রোধ কেন যে, একটি কন্যা সন্তান দিয়াছ!"

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, ঘটক আসিয়াছে। দেখা করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলেও দেখা করিতে হইল। তাহার সন্ধানে বলুটীতে একটী পাত্র আছে। তাহাদের উদরপূর্ত্তির জন্য এক সহস্র মুদ্রা হইলে চলিবে। আমি ঘটককে বলিলাম, পর রবিবার পাত্র দেখিতে যাইব। সে বিদায় লইল।

নির্দ্দিষ্টদিনে পাত্র দেখিতে গমন করিলাম।

পাত্র একটী ফুরফুরে পাঞ্জাবী গায়ে, পম্‌শু পায়ে, হাতে ছড়ি, টেড়ি কাটিয়া বাবু (!) সাজিয়া উপস্থিত হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

"সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

ভাবিলাম নামটিকে শ্রীহীন করিল কে?

"এখন কি কর?"

"পড়ি।"

"কোন্ শ্রেণীতে?"

"ফাষ্ট ক্লাশে।"

"এইটি ইংরাজীতে অনুবাদ কর,—রাম শ্যামকে কেবলমাত্র তিনটি টাকা ধার দিবার কথা বলিল।"

"আমি ইউনিভার্সিটী হলে এক্‌জামিন দিতে আসি নাই।"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই তিনজন বন্ধু তাহার পক্ষ সমর্থন করিল।

আমি দেখিলাম, কামড়ায় বা! এই বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে সভ্যতা-তরঙ্গে ভাসমান, ইয়ার-বন্ধু পরিবেষ্টিত বঙ্গীয় যুবককে এরূপ সর্ব্বজন-সমক্ষে লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি!

পাত্রের পিতার সহিত এইবার দেনা পাওনার * কথা হইতে লাগিল। তিনিও সহস্রের কম নামিবেন না, আমিও পাঁচ শতের অধিক উঠিতে অক্ষম। অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক চখের জল, অনেক পদধারণ তাঁহার মন টলাইল। এইবার ঘটকের মধ্যস্থতায় সাত শত নিরূপিত হইল।

৩

বলুটিতেই বিবাহের স্থির হইল। পাত্রের পিতা বেশ টাকার মানুষ, কুলীনও বটে। তবে সুবিধার মধ্যে খাঁই কম। তবু প্রায় আট শত টাকা খরচ। তাহারই বা সংস্থান কোথা? টাকা পাই কোথা? আহারে সুখ নাই, বিহারে সুখ নাই, চাকরিতে সুখ নাই; কেবল চিন্তা,—টাকা পাই কোথা? দিবারাত্রি হৃদয়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল,—টাকা পাই কোথা? গৃহিণী অনেক সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু মন শান্ত হয় কই? প্রাণ প্রবোধ মানে কই? যদি টাকা না দিতে পারি, ত দাঁড়াইয়া অপমান হইতে হইবে। একদিন গৃহিণী তাঁহার গহনার বাক্স আমার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। বলিলেন "আমার আর গহনার আবশ্যক কি? আমি গহনা লইয়া সুখে বাস করিব, আর তুমি টাকার জন্য অপমানিত, লাঞ্ছিত হইবে? তুমিই আমার গুরু। তোমার দুঃখ-মোচন সর্ব্বতোভাবে আমার কর্ত্তব্য। তোমার কষ্টের শতাংশের একাংশও যদি এই গুলি লাঘব করিতে পারে, তাহা হইলেও আমি ধন্য। মনে দ্বিধা করিতেছ? কেন, আমি কি তোমার কেহ নহি?"

আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

অহো বঙ্গ-মহিলা, তোমরাই ধন্য! জগৎ তোমাদের পদতলে বসিয়া স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্র শিক্ষা করিবার যোগ্য!

গহনা বিক্রয় করিয়া সাড়ে চারি শত টাকা হইল। এখনও প্রায়

---

* পাওনা কোথায়? ষোল আনাই ত দেনা!

সাড়ে তিন শত টাকা বাকী। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন গৃহিণীর পরামর্শ মত, আমি যে মার-ওয়ারীর নিকট চাকরি করিতাম, তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম। তিনি ত শুনিয়াই অবাক্। সভ্যতা-আলোকে আলোকিত বঙ্গ-সংসারে যে এরূপ পিশাচের আবাস, সভ্যতার সহিত যে এরূপ পাশব রীতি-নীতি থাকিতে পারে, একথা তাঁহার নিকট যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। বাহ্য চাক্‌চিক্যকে তিনি অন্তরেরই প্রতিকৃতি মনে করিয়াছিলেন।

প্রভু শুনিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তিনি আমায় একশত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিলেন, এবং বিনা সুদে আড়াই শত টাকা হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া ধার দিলেন।

আমি বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে, ভক্তি-বারি-পরিপ্লুত-নেত্রে, উর্দ্ধমুখে ভগবানের নিকট তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করিলাম।

কুসীদ-জীবী মারওয়ারি জাতিতে এত সদাশয়,—এত মহৎ ব্যক্তি!

৪

আজ লাবণ্যের (আমার কন্যার) বিবাহ। যে প্রাণের লাবণ্যকে এতদিন এত যত্ন করিয়া লালন পালন করিয়াছি, যাহাকে নিজের শোণিত দিয়া পরিপোষণ করিয়াছি, না খাইয়া খাওয়াইয়াছি, যাহার চরণে অঙ্কুশ বিদ্ধ হইলে আমাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইত, যাহার চখে জল দেখিলে জীবন দুঃসহ বোধ হইত, যাহার মুখখানি মলিন দেখিলে আমরা জগৎ অন্ধকারময় দেখিতাম, সেই করুণার আধার, চখের পুতলী, স্নেহের প্রতিমা, জীবনের জীবনকে আজ জন্মের মত পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, আজ তাহার জীবন পরের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে, আজ তাহার মায়া কাটাইয়া তাহাকে পর করিতে হইবে? কি করিব! অদৃষ্টচক্রে সকলেই ঘুরিতেছে। আমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট অপেক্ষাও অধম, তৃণ অপেক্ষাও লঘু,—কোন্ ছার,—কত রাজা মহারাজারও এদিনে এই দশা।

সন্ধ্যার পর বর আসিল। সকলকে যথাবিধি অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক আমি আপন কার্য্যে ঘুরিতে লাগিলাম।

রাত্রি দশটা। বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম। বর-যাত্রীগণও সকলেই বরের সহিত অন্তঃপুরে যাইবার জন্য মহা গোলযোগ আরম্ভ করিল। এখনকার মত তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম, বরযাত্রীগণ বড় অত্যাচার করিতেছে। তাহারা পরের নিকট হইতে যাচিত একটী লণ্ঠন ইট মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সতরঞ্চি খানিকটা পোড়াইয়া দিয়াছে, যাহাকে তাহাকে ইট কিম্বা অগ্নি-মুখ বাউসাই ছুঁড়িয়া মারিতেছে।

মনুষ্যত্বহীন নর-পিশাচগণ দরিদ্রের সর্ব্বনাশে এত সিদ্ধহস্ত! ইহাদের বীরত্ব দরিদ্র-পীড়নে,—দরিদ্র-পালনে নহে। ধন্য ইংরাজী-শিক্ষা! ধন্য শিক্ষা-পদ্ধতি!

বর কনে সবে মাত্র বাসরঘরে গিয়াছে, এমন সময় বাহিরে মার মার রবে চতুর্দ্দিক কাঁপিয়া উঠিল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, ভয়ানক মারা-মারি চলিতেছে। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীগণ পরস্পর পরস্পরকে অতি ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। আমি থামাইতে গিয়া মার খাইয়া পশ্চাৎ-পদ হইলাম। কিছুক্ষণ পরে বরযাত্রীগণ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। শত অনুসন্ধানেও কাহাকে পাওয়া গেল না।

আজ এই শুভদিনে, অশুভ মুহূর্ত্তে এ অশুভ কাণ্ড দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আহূতগণ অনাহারে গেল দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

প্রভু! এ আবার কি খেলা! আজ এ হাসির দিনে চখে জল দিলে কেন প্রভু!

হায়, হায়! তখন জানিতাম না যে, ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গহ্বরে নিহিত চিত্রপটের প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত হইয়াছিল,—তখন জানিতাম না, অদৃষ্টের মর্ম্মভেদী তিরস্কারের পূর্ব্বসূচনা সেই চখের জলেই সূচিত হইয়াছিল।

মর্ম্মান্তিক আঘাতে ভগ্নহৃদয় হইয়া সে রাত্রির অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিলাম।

৫

লাবণ্যের বিবাহ দিয়া আমি একটু ঝাড়া-হাত-পা হইলাম। ছুটী ফুরাইল, আমিও আপিসে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। খুচরা দেনা পরিশোধ করিতে প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। এমন সময় আমার দয়াময় প্রভু আমার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিলেন। এ সম্বাদে আপি-সের সমস্ত লোক আমার প্রতি ভীষণ ভ্রূকুটী করিল, যেন আমি কতই অপরাধী, যেন আমি তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছি। আমার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তবে আপাততঃ

তাহারা প্রভুর ভয়ে কিছু করিতে পারিল না। পূর্ব্বে আমার পুরস্কার-প্রাপ্তির সম্বাদে তাহারা ত ষোল আনাই বিরূপ ছিল, এখন বুঝি আরও অধিক হইল। আফিসের বড় বাবু আমার প্রত্যেক কার্য্যে ছুতা-লতা ধরিয়া আমার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। একদিন আমার নামে প্রভুর নিকট আফিসের কাগজ পত্র বাহিরে প্রকাশ করার মিথ্যা অভিযোগ আসিল। পরমেশ্বরের কৃপায় সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলাম। আমি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলাম। অভিযোগকারীগণ তিরস্কৃত হইল।

এইরূপে দিন যায়। আমি আমার প্রভুর পাওনার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ টাকা পরিশোধ করিলাম, এমন সময় আমার দয়ার সাগর প্রভু ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। আমার বিপক্ষ পক্ষ এইবার মাথানাড়া দিয়া উঠিল, এবং আমার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। আমারও অন্ন উঠিল। আফিসের অন্যান্য কেরাণী আমার নামে ঘুষের অভিযোগ আনিল। আমার নূতন প্রভু আমায় জানিতেন না, সুতরাং তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া আমাকে বিনা-বিচারে চাকরী হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া কত কাঁদিলাম, কত অনুনয় বিনয় করিলাম, কত বলিলাম "অভিযোগ মিথ্যা", কিন্তু কাণ-ভাঙ্গানির এমনি জোর যে, আমার সমস্ত কথা ভাসিয়া গেল। হিমাদ্রির প্রস্তরবক্ষ সামান্য বৃষ্টিপাতে গলিল না। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি আমি এক মাসের মধ্যে তাঁহার বাকী পাওনা দুই শত টাকা না পরিশোধ করি, তাহা হইলে তিনি আমার নামে নালিশ করিবেন। আমি অন্ধকার দেখিলাম। ভগবন্! এ কি করিলে প্রভু! অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিলাম। হায় অদৃষ্ট! যেখানে অন্নচিন্তা, হাহা-কার, সেইখানেই তোমার বজ্র। দয়াময়! এ দরিদ্রের আর অগ্নি-পরীক্ষা কেন?

কাঁদিতে কাঁদিতে, চখের জলে ভাসিতে ভাসিতে, বাটী ফিরিলাম! কাল কি খাইব, তাহারও যে সংস্থান নাই! গৃহিণী কত বুঝাইলেন, কিন্তু মন বোঝে না। এ হৃদয়ে যে ভীষণ তুফান! এ তুফান কি সামান্য তৈলে উপশম হয়?

কোনও দিন অনশনে, কোনও দিন অর্দ্ধাশনে কাটিতে লাগিল। গৃহিণী ঠাকুর, দেবতার কাছে নিত্য গড় করিতেন, কত প্রার্থনা করিতেন, কত মানসিক করিতেন, সব বিফল হইল!

কত লোকের কাছে একটী চাকুরীর জন্য কত উমেদারি করিলাম।

যখন আমার চাকরী ছিল, তখন যাহারা আমায় "উহা অপেক্ষা ভাল চাকরী করিয়া দিব" বলিত, এখন তাহারা পাশ কাটাইল। বড় বড় চাকুরের বাটীতে হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের শির ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন যাহারা বন্ধুভাবে কথা কহিত, এখন তাহারা আমায় দেখিলেই সরিয়া পড়ে। হায় রে, সুসময়ে যাহারা নিতান্ত আপন, দুঃসময়ে তাহারা নিতান্ত পর। আমরা চলিত কথায় যাঁদের বন্ধু বলি, তা'রা বন্ধু নহে, মৌমাছি; যতক্ষণ মধু, ততক্ষণ তা'রা। জগতে দরিদ্রের আপনার বুঝি কেহ নাই!

৬

এক মাস পূর্ণ হইতে আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী আছে। আগামী সপ্তাহে ঠিক এই দিনে আমায় মহাজনের নিকট দুই শত টাকা পৌছাইয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে মান সম্ভ্রম সমস্ত যাইবে, উদ্বাস্ত হইব। প্রাণের আগুন ধূ ধূ রবে জ্বলিতেছে। ভগবান এমনই কি করিবেন!

গৃহিণীর পরামর্শ মত একদিন বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। দেখিলাম, আমার লাবণ্য আর সে লাবণ্য নাই। তাহার সে লাবণ্য কোথায় পলাইয়া গিয়াছে! সে এখন দড়ি হইয়া গিয়াছে, সে সোণার প্রতিমা আজ মসীময়ী হইয়া গিয়াছে, সে প্রশান্ত হাসিটুকু মুখে লুকাইয়া গিয়াছে, দেহের সে সৌষ্ঠব বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, সে সুখে আছে; কিন্তু বিশ্বাসে প্রবৃত্তি হইল না।

বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত টাকা কড়ি সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাবার্ত্তা হইল। তিনি বাড়ী বন্ধক রাখিয়া মাসিক তিন টাকা হার সুদে তিন শত টাকা ধার দিতে সম্মত হইলেন। অনেক কসা মাজার পর সুদ দুই টাকা হারে নামিল।

আমি বাড়ী ফিরিবার মুখে শুনিলাম, সুরেন্দ্র বাবাজী লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া বৈদ্যনাথের বাহন হইয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে পাড়ার প্রতিবাসী সকল ব্যতিব্যস্ত। মদ খাইয়া যেখানে সেখানে মাতলাম করে। পাড়ার যেন নদের চাঁদ!* একটী লোককে ছুরি মারায় তাহার ফৌজদারী আদালতে পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড হয়। দিবা রাত্রির মধ্যে কেবল আহারের সময় তাহাকে বাড়ীতে পাওয়া যায়। পাড়ার লোকের মুখে এরূপ শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। লাবণ্য আমার সমক্ষে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। হিন্দু-স্ত্রীর স্বামীনিন্দা যে মহাপাপ!

* ৺দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতীর "নদের চাঁদ"।

বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট হইতে তিন শত টাকা লইয়া দুইশত টাকা দেনায় শোধ দিলাম। এতদিন পরে বাড়িটী বন্ধক পড়িল। হায় রে কপাল!

গৃহিণীর হস্তে বাকী এক শত টাকা দিলাম। তিনি বলিলেন, "দেখ, বসিয়া খাইলে রাজার রাজ্যও উপিয়া যায়, এ একশত টাকা কোন্ ছার। তুমি এই টাকা হইতে কুড়িটী টাকা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ কর। ঠাকুর যদি মুখ তুলিয়া চান, ত আর চাকরীর প্রত্যাশায় থাকিতে হইবে না।" আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। গৃহিণীর পরামর্শানুযায়ী আমি এক খানি ছোট খাট মণিহারী দোকান খুলিলাম। প্রথম চোটেই দশ টাকা লোকসান হইল। আমার বুক দশ হাত দমিয়া গেল। আকাশ যেন মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৃহিণীও ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমি পূর্ব্বে সর্ব্বদাই যে কথা বলিতাম, তিনি আজ সেই কথাতেই আমায় উৎসাহিত করিলেন। সে কথাটী এই—

"যে মাটীতে পড়ে নর উঠে তাই ধরে,
বারেক নিরাশ হলে কে কোথায় মরে?
তুফানে পড়েছি তবু ছাড়িব না হাল,
আজ নাহি হ'তে পারে হ'তে পারে কাল।"

আমি ভাবিলাম এ কে?—দেবী না মানবী! এ দুঃসময়ে আমার হৃদয়ে নব বল কে দিল?

আবার মূলধন হইতে কুড়িটী টাকা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। এবার লাভ হইল। ক্রমে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইবার গৃহিণীর পরামর্শে কাপড়ের দোকান খুলিলাম। যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন ধুলোমুঠো ধরিলে সোণামুঠো হয়। আমার এখন তাই হইল। পরমেশ্বর! বড় তুফানেই হাল ধরিয়াছ! যাহারা আমায় দেখিয়া পূর্ব্বে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত, এখন তাহারা আবার জুটিতে লাগিল। আমি কিন্তু আর আমল দিলাম না।

প্রায় দুই বৎসরে বৈবাহিক মহাশয়ের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিলাম। আমার যা কিছু ছিল, সবই আবার আমার হইল।

এখন আমি পরমেশ্বরের কৃপায় টাকার মানুষ, সুতরাং দশের মধ্যে এক জন। কিন্তু আমার এত ঐশ্বর্য্য সমস্তই গৃহিণী হইতে। মনের মতন পত্নীলাভ বহু তপস্যার ফল; আমার বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-ফল।

বৈবাহিক মহাশয়, প্রায় দুই বৎসর হইল, ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার বিষয়ের একমাত্র অধিকারী আমার গুণের জামাতা সুরেন্ তাঁহার সমস্ত বিষয়ই উড়াইতেছে।' আমার বড় দুঃখ, লাবণ্যকে সুখী করিতে পারিলাম না, তাহার হাসিমুখ দেখিতে পাইলাম না।

সুরেনের চরিত্র এতদূর কলুষিত যে, সে চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিতে ঘৃণা বোধ হয়। তবুও যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক, ততটুকু দিলাম।

সে এখন বারবিলাসিনীগণের গৃহেই দিবারাত্রি পড়িয়া থাকে। সেই খানেই আহার নিদ্রা হয়। মাসান্তে একবার যদি বাড়ী আসিত, তবে সে টাকার জন্য,—আর লাবণ্যকে পীড়নের জন্য।

সাবধান সুরেন্দ্র! অধঃপতনের চরম সীমার আর অধিক বিলম্ব নাই! সতী-লক্ষ্মীর গায়ে হাত তোলা, সতী-লক্ষ্মীকে পীড়ন, ধর্ম্মে সহিবে না! তার প্রতিফল শীঘ্রই পাইতে হইবে!

একদিন সুরেনের রক্ষিতা বেশ্যা তাহাকে চোর বলিয়া পুলিসে দিল। অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সমস্ত বিফল হইল। আদালত তাহাকে তিন মাসের জন্য কারাগারে পাঠাইলেন। লাবণ্যের হাহাকারে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হা ভগবন্! শনির ত্যাগ কি এত মর্ম্মভেদী ঘটনায়!

পরদিন কলিকাতায় আসিয়া বড় বড় ব্যারিষ্টারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আপীল করিলাম। অনেক টাকা খরচের পর, অনেক বাক্যব্যয়ের পর বাবাজী মুক্তিলাভ করিল।

* * * * * *

এখন লাবণ্য সুখী হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় সুরেন সম্পূর্ণ সংশোধিত হইয়াছে। আবার চতুর্দ্দিকে হাসির লহর উঠিয়াছে। লাবণ্যের একটী পুত্র ও কন্যা তাহাদিগের গৃহ আলোকিত করিয়াছে।

শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল।

প্রবাসী মিত্রের প্রতি।

১

বিজয়া-দশমী পুনঃ এল বঙ্গভূমে,
হে প্রবাসি, বঙ্গবাসি, হে সতীর্থ মোর,
তোমার প্রশান্ত ছবি মরমে, মরমে,
জাগিয়া বাঁধিছে দিয়ে প্রীতি-পুষ্প-ডোর!
পঞ্চবর্ষ গেছে চলি, আজ পড়ে মনে
সে শুভ বিজয়া তিথি—তোমায় আমায়,
হ'য়েছিনু সম্মিলিত স্নেহ-আলিঙ্গনে;
আজ দূরে, কতদূরে আছ তুমি হায়!
দূরে—দূরে? একি ভুল? হৃদয় আবাসে
বিরাজিছ তুমি নিত্য। তবু আঁখি চায়
হেরিতে সে সৌম্যমূর্ত্তি—আলিঙ্গন-পাশে
তেমনি মধুর স্নেহে বাঁধিতে তোমায়
লালায়িত ভুজযুগ। বল তবে সখা,
স্বদেশে ফিরিয়া পুনঃ কবে দিবে দেখা?

২

হ'য়েছে বাঞ্ছিত ব্রত তব উদ্‌যাপন,
কি সুখের আশে তবে একাকী বিদেশে?
যে প্রতিভালোক-দীপ্ত তব দু'নয়ন,
সে প্রতিভা বিচ্ছুরিত হ'বেনা এ দেশে?
ফিরে এস মাতৃ-ভূমে পরবাস হ'তে,
ভাই বলি' তুলে লও হেথা আত্মজনে,
তোমার হৃদয় ভরা করুণার স্রোতে,
পরিপ্লুত করে' দাও আত্মীয় স্বজনে।
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা আছে দীর্ঘপথ চেয়ে
বুকে ধরি শিশুটীরে; অশ্রু-মুক্তারাশি
দিয়ে সতী দিবে তব পদযুগ ধূয়ে,
মুছা'বে বিতত কেশে। তুমি হে প্রবাসি,
আনন্দে চুমিবে পুনঃ নন্দনের মুখ।
সখাহে, ভুঞ্জিবে কবে সে ত্রিদিব-সুখ?

শ্রীরসময় লাহা।

সমাধিক্ষেত্রে।

এ সাম্য-মৈত্রের দেশ, এদেশে সকলকেই সমান হইতে হয়। এদেশে রাজধানী ও পল্লীগ্রামের পার্থক্য নাই; যদি রাজধানী বল, তবে সমস্ত দেশ জুড়িয়া রাজধানী—সমস্ত দেশ জুড়িয়া প্রাসাদ অট্টালিকার সমুদ্র; কিম্বা যদি পল্লীগ্রাম বল, তবে সারা দেশময় পল্লীগ্রামের ছড়াছড়ি—সারা দেশময় পল্লীগ্রামের বাহুল্য। এখানে ইংরেজ ধর্ম্মের নামে রেড রোড প্রস্তুত করিয়া—ইন্দ্রভবনে থাকিয়া সুদূর মফস্বলের কথা ভুলিয়া যাইতে পারে না। এখানে অর্থ-গৃধ্নুর অত্যাচারে—সবলের উৎপীড়নে দুর্ব্বলকে দুর্ভিক্ষ-প্রকোপ সহ্য করিতে হয় না। এখানে যদি রাজা বল—পৃথীশ্বর বল—ভুবনেশ্বর বল, তবে এখানে সকলেই রাজা—সকলেই পৃথীশ্বর—সকলেই ভুবনেশ্বর; কিম্বা এদেশবাসীকে যদি গরীব বল—দুঃখী বল—নিঃস্ব বল—অসহায় বল, তবে এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই গরীব—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দুঃখী—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিঃস্ব—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অসহায়। এখানকার সকলকেই যদি কবি কালিদাস কিম্বা সেক্সপীয়র বলিতে চাও, তবে এখানকার সকলেই কবি কালিদাস—সকলেই সেক্সপীয়র; কিম্বা এখানকার সকলকেই যদি বটতলার নাটক-লেখক কিম্বা 'ফ্লিটষ্ট্রীটের ছ্যাক্‌রা গাড়ী' বল, তবে এখানকার সকলেই বটতলার নাটক-লেখক—সকলেই 'ফ্লিট্‌ষ্ট্রীটের ছ্যাক্‌রা গাড়ী'। এ সাম্য-মৈত্রের দেশ, এদেশে রাজা প্রজা নাই—ধনী নির্ধন নাই—সৎ অসৎ নাই—জ্ঞানী মূর্খ নাই—ছোট বড় নাই; এ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যতদূর দেবদৃষ্টি পরিচালিত হইতে পারে, তত দূরের মধ্যে কেবল সাম্য-মৈত্রের একাধিপত্য, কেবল গলাগলি—কেবল ঢলাঢলি, কেবল ভালবাসা—কেবল প্রেম, কেবল স্নেহ—কেবল প্রীতি, কেবল প্রণয়—কেবল অনুরাগ। যাহারা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমাদের এ দেশে রাজা প্রজার সম্বন্ধ-বন্ধনে ভয়ে ভয়ে যোড়করে দিনাতিপাত করিত, যদি কাহারও জ্ঞানচক্ষু থাকে, তবে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ—তাহারা এখন ঐ দেবতার দেশে একঘরে ঘর করিতেছে—তাহারা এখন ঐ দেবতার দেশে একধর্ম্ম-ভাবে পরিপূর্ণ। এখানে অহ-

ক্ষারীর অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়—জ্ঞানীর জ্ঞানগরিমার প্রখর উত্তাপ এদেশে প্রবেশলাভ করিতে পারে না—ধনীর উচ্চাভিমান, বংশ-গৌরব, অঙ্গ-সৌষ্ঠব এখানকার পবিত্র সাম্রাজ্যে খুঁজিয়া পাইবে না—জগতের যাবতীয়—যত কিছু বৈষম্য সমস্তই এইখানে তিরোহিত হয়। পরের জন্য ভাই! তোমরা যে কাঁদিতেছ, তোমাদিগকেও যাইতে হইবে; আর দুর্ভিক্ষ-নিষ্পীড়নে উন্মাদিনী মাতা নির্দ্দয় আবেগে তাহার 'অন্ধের যষ্টি' একমাত্র জীবন-সম্বল সন্তানকে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট জঠরে পুনঃ প্রেরণ করিয়াছে শুনিয়া যে হাসিতেছে, তাহাকেও একদিন ওইখানে যাইতে হইবে। কি, যাইবে না? যে দুর্দ্দমনীয় পরাক্রম ও বিশ্বগ্রাসিনী আকাঙ্ক্ষা একদিন সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—প্রচলিত জগৎ-পদ্ধতিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিয়াছিল, তাহাকে এইখানে আসিতে হইয়াছে—তুমি ছার ভারতের ধন-গন্ধ-সুখে মাতোয়ারা এই ভারতবাসী! যে দশমুণ্ড-কুড়িহস্তধারী রাক্ষসাগ্রগণ্য রাবণ স্বর্ণলঙ্কায় বাস করিত—যাহার দ্বারদেশে স্বয়ং আদ্যাশক্তি প্রতিনিয়ত প্রহরীর কার্য্য করিতেন—যাহার অতুলবিক্রমে পরাজিত হইয়া দেবাদিদেব ইন্দ্রকেও তাহার আলয়ে দাসানুদাসের কার্য্য করিতে হইয়াছিল, তাহাকেও এইখানে আসিতে হইয়াছে—তুমি ত হা-হতোহস্মির ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ মাত্রে এত জ্বলিয়া উঠিয়াছ! বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, প্রভুত্ব যত কিছুর শ্রেষ্ঠত্ব তোমার থাকুক না কেন, একদিন এই খানে সকলই শেষ হইবে, সকলই ছাই ভস্মে পরিণত হইবে। যখন তুমি জন্মিয়াছ, তখন তোমার মরণ অবশ্যম্ভাবী। কয়দিনের জীবন? কয়দিনের আড়ম্বর? প্রতি মুহূর্ত্তে কি পল্লী-প্রতিবাসীর হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-রোল তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না? প্রতি মুহূর্ত্তে কি লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জীবন তোমার উন্মীলিত নেত্রের সম্মুখে জলবুদ্‌বুদের মত কোথায় মিশিয়া যাইতেছে না? তাই বলি ভাই! শ্মশানে যাও, শ্মশানের নীরব দৃষ্টি-নিক্ষেপের ভিতর যে কত জ্ঞান লুক্কায়িত আছে, তাহা আজই তাহার অঙ্কে বসিয়া শিখিয়া ফেল। শিখিয়া, নিজ জীবনের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে তাহা উপলব্ধি কর, আর ঐ চিন্তা তোমার অস্থি-মজ্জাগত হউক। শ্মশান! তুমি আজ যে জিনিস আমাকে দয়া করিয়া জানিতে দিলে, তাহার ঋণ জীবনে শোধ করিতে পারি না। তুমি স্বর্গ; না, তুমি স্বর্গ অপেক্ষা আরও উচ্চে—তোমার ঋণ শোধ করে কার সাধ্য?

—ইহা পার্থক্য-সংস্থাপন ও বৈষম্য নিরাকরণেরও দেশ। ইহা যেমন স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সকল বৈষম্যের সাম্য-সংস্থাপক, তেমনই ইহা ব্রাহ্মণ শূদ্রের—ক্ষুদ্র-মহতের—সুন্দর-কুৎসিতের প্রকৃত মূল্যও নির্দ্ধারিত করে। সত্য কথা, বুদ্ধ জ্ঞানী হইয়াও এখানে গিয়াছেন—যীশু প্রেমিক হইয়াও এখানে গিয়াছেন—মহম্মদ ইচ্ছাবৃত্ত হইয়াও এখানে গিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধভাব আবহমানকাল এখানে প্রচলিত। হোমর যখন অন্ন-সংস্থানের জন্য মুষ্টি-ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন তিনি কবিগুরু হোমর ছিলেন না—তখন তিনি সাতটা স্থানে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মাইকেল মধুসূদনের যখন অন্নাভাবে দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ-প্রদীপ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল—যখন তিনি মরণ-শয়নে শুইয়া তাঁহার স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতার—স্বীয় অমিতব্যয়িতার—স্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত (!) করিতেছিলেন—যখন ছুছুন্দরী-বধ-কাব্য বঙ্গের প্রত্যেক কৃতবিদ্যের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার জন্য কাঁদে নাই—তখন তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের নেত্রে অশ্রুবারি বর্ষণ করাইতে পারেন নাই—তখন বঙ্গদেশে তাঁহার স্মরণস্তম্ভ স্থাপিত হয় নাই। গোল্ডস্মিথ যখন সুদূর বিদেশে অর্থাভাবে নগণ্য দরিদ্রের মত দিনাতিবাহিত করিতেন—যখন গ্রন্থকার-সম্প্রদায় বা স্বজাতির নিকট কোন আশা নাই দেখিয়া, নয়শত নিরানব্বই বৎসর পরে সহস্র পাউণ্ড মূল্যের প্রশংসা দানের জন্য Posterityকে বিল লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি 'ভিকার অফ ওয়েকফিল্ডের' প্রণেতা ছিলেন না। আর যতদিন আমার এই ক্ষুদ্র ও নির্জ্জন হৃদয় বিচ্ছেদে পুড়িয়াছিল না, ততদিন আমার সংসার-সাগরের তরি, হৃদিকাননের কুসুম, কত অপার্থিব—কত স্বর্গীয়, তাহা বুঝি নাই,—যতদিন তাহার চন্দ্রকর-সমুজ্জ্বল মুখকমল এ বক্ষের উপর অনায়াসেই পাইতে পারিতাম,—যতদিন তাহার মৃদুপবনান্দোলিত চূর্ণ কুন্তলগুলি আমার সম্মুখেই শিশু-ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার মুখে ঢলিয়া পড়িত, দেখিতে পাইতাম,—যতদিন তাহার ক্ষীণ বক্ষখানি মৃদুতরঙ্গাকুল তরণীর ন্যায় আমার বাহুতলে ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইত,—যতদিন নির্জ্জন গৃহে আমার আবির্ভাবে সেই চির-নবীন ব্রীড়ালতা তাহার সেই চির-পুরাতন নয়নদ্বয়ে ধীরসঙ্গোপনে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত, ততদিন সে যে কি জিনিষ, তাহা বুঝিতে পারি নাই। সে যতদিন ছিল, ততদিন সে একা ছিল; কিন্তু সে যখন গেল, আমার তখন চমক ভাঙ্গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, তাহার আসা যাওয়ার কত

দর—এখন বুঝিয়াছি, তাহার থাকা না থাকার কি মর্ম্ম। শ্মশান! তুমি যেমন চিরশান্তি-প্রিয়—চির-বিবাদ-ভঞ্জন, তুমি তেমনই মূল্য-নির্দ্ধারক—দর-নির্ণায়ক। তোমার আশ্রয়ে মাইকেল দত্ত আজ বঙ্গদেশের গৃহ-দেবতা;—তোমারই আদরে আজ গোল্ড্স্মিথ্ নির্ব্বাণমুক্ত, অনন্ত যন্ত্রণায়ও তিনি সুখী;—তোমার স্নেহে আজ হোমর এই পরিদৃশ্যমান জগতের কবিশ্রেষ্ঠ;—তোমারই কৃপায় আজ লর্ড বায়রণের চরিত্র-দোষ প্রায় বিলুপ্ত। তাই বলিতেছিলাম—তুমি যেমন সকলকে সমান কর, চিন্তা-কার্য্য, বাক্য-মন, কাপট্য-সরলতা, সকলেই যেমন তোমার সহবাসে এক হইয়া যায়, তেমনই তুমি নষ্টকোষ্টি উদ্ধার কর—লুপ্তগৌরব প্রতিষ্ঠা কর। তোমায় আবার বলি—তুমি স্বর্গ,—না, তুমি স্বর্গ অপেক্ষা আরও উচ্চ।

কিন্তু তুমি শ্মশান? এত বড় হইয়াও একটা ভয়ানক অন্যায় কাজে তুমি অভ্যস্ত আছ। তুমি অনেক বড় বড় কাজ কর—এ সংসারে তোমার নাম ডাক বেশ আছে; কেন না, জ্বালা যন্ত্রণায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া আধমরা হইয়া যে তোমার কোলে বিরাম খুঁজিয়াছে, তুমি তাহার সর্ব্বাঙ্গে তোমার ঐ সুকুমার সহানুভূতিমিশ্রিত হস্ত বুলাইয়া তাহাকে চির-শান্ত-ঘুমে ঘুম পাড়াইয়াছ,—কেন না, ভালবাসা-হীনতার পোড়া বাজারে যাহার অন্তঃকরণ তুষানলের ন্যায় ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল—যাহার গায়ের রক্ত সূর্য্য-কিরণে তুষারের ন্যায় ধীরে ধীরে গলিয়া জল হইতেছিল, তুমি তাহাকে স্বতঃপ্রস্তুত হইয়া তোমার কোমল বুকের উপর ঝাঁকিয়া ধরিয়াছ—তাহার সকল আশার সমাধি হইয়াছে—তাহার সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু এত বড় কাজ করিয়াও তোমার সমস্তটা মঙ্গলময় হইয়া যায় নাই, তোমার মধ্যে একটী মহাপরাক্রমশালী 'কু'র ঐরাবত দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন চাঁদে কলঙ্ক, আলোকে আঁধার, কুসুমে কীট আছে—যেমন মিলনে বিচ্ছেদ, ভালবাসায় দুঃখ, জীবনে মরণ দেখিতে পাই, তেমনই তোমারও একটা দুর্নাম না থাকিবে কেন! তুমি যেমন একজনকে তোমার মনুষ্য-সমাগমহীন প্রান্তরতলে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার জন্ম-মৃত্যুর দশম দশায় তাহাকে উপনীত কর, তেমনই জীবন-সংগ্রাম যাহার ধর্ম্ম—অনন্ত যাহার লক্ষ্য—সুদূরগামিনী যাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহাকেও তুমি অকালে তোমার কোলে টানিয়া লইয়া কত বীভৎস ব্যাপার সংসাধিত কর! তুমি যেমন একদিকে কত কোমলতা—কত সরলতা—

কত বিনয়-নম্রতা—কত সহানুভূতি ধ্বংস বিধ্বংস কর, তুমি যেমন এক দিকে কত পবিত্রতা—কত সৌন্দর্য্য—কত মধুরিমা—কত হৃদয়গ্রাহিতা পোড়াইয়া শেষ করিয়া ফেল, তেমনই অন্যদিকে তোমার প্রপীড়নে কত ব্যক্তিকে তৃষিত—তাপিত—ব্যথিত—মর্ম্মাহত হইয়া জীয়ন্তে মরিয়া থাকিতে হয়, —তেমনই কত ব্যক্তির আশা-ভরসা—উৎসাহ-প্রফুল্লতা—সুখ-সম্পদ—উচ্চা-ভিলাষ তোমার উৎপাতে জাহ্নবীর তীরে চিরজন্মের মত হারাইয়া যায়—প্রাণান্তপণে যাহা খুঁজিয়াও আর পাওয়া যায় না। আমার এ ক্ষুদ্র সসীম হৃদয়াকাশে—সে বেশী দিনের কথা নয়—কিছুদিন হইল, কত কাল্পনিক অশরীরী-সুখস্বপ্নের মেঘ উঠিয়াছে; ভয় হয়, তুমি কখন বলিতে কখন আমায় চুরি করিতে গিয়া আমার সে সাধের ঘর ভাঙ্গিয়া দিবে! তুমি বড় প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন! ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা হয় দিও, কিন্তু এ দাবদগ্ধ পরাণে যে আঁচড় লাগিয়াছে, তাহা মুছিয়া দিও না—নন্দনকাননের পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া দু'জনে বিজনে যে পুঁথি পড়িবার কথা হইয়াছে, তাহার মূলচ্ছেদ করিও না। তুমি শ্মশান! তুমি আমার প্রণম্য—তুমি আমার বরেণ্য, কিন্তু তুমি এই কারণে মাঝে মাঝে আমার ঘৃণার্হ হও। সত্য বটে শ্মশান! আমি নিতান্ত নগণ্য ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সংসার-কীট—আমি পাপা-চারী স্বার্থপর মানুষ, কিন্তু তুমি তোমার সহৃদয়তা গুণে কি আমার সহিত ব্যথিত হইবে না? এই দিগন্ত-লম্বিত সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত ব্যক্তি কত মতে তোমার পূজা আরাধনা করিতেছে—কত উচ্চকণ্ঠ তোমার অত্যুচ্চ সিংহাসন সমীপে কলরোল উৎপাদন করিতেছে, আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠের অব্যক্ত ভাষা কি তোমার নিকট পৌছিবে? তুমি কি আমার এ কাতরোক্তিতে দ্রব হইবে না?

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

কবিতা-কানন।

অনুতাপ।

১

অনুতাপ-অশ্রু সদা হ'তেছে পতন,
কি কারণে হেরি তব বিরস বদন?
করেছ কি গুরুতর পাপ আচরণ?
জানিনা, বুঝি না, কেন হয় বা এমন॥

২

কখন কি প্রিয়জনে করেছ পীড়ন?
যে তোমারে ভালবাসে তাহারে বঞ্চন?
অথবা আশ্রিতজনে করিয়া তাড়ন,
আপন মনের শান্তি দে'ছ বিসর্জ্জন?

৩

জিজ্ঞাসিছে সখা তুমি বল সত্য বল,
কোথায় গিয়াছে তব চরিত্রের বল?
অনুভবে বুঝি তব সকল সম্বল
ভাসাইয়া লয়ে গেছে বন্যা সে প্রবল।

৪

তাই সেই পূর্ব্বভাব নাহি দেখি আর,
বিষাদ-কালিমারেখা নয়নে তোমার
কঠোর প্রতিজ্ঞাবহ্নি ভস্মে পরিণত!
কি কারণে হ'লে তুমি এত অবনত?

৫

জানিনা, বুঝি না, কেন হয় বা এমন,
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পাই কারণ।
অতীত ও বর্ত্তমান করিলে তুলন,
অনুতাপ-অশ্রু মম ঝরে অনুক্ষণ॥

৬

কি ছিলাম, কি হ'লাম, কি হইব পরে,
সদা এই চিন্তা মম উদয় অন্তরে।
জানিনা, বুঝি না, কেন হয় বা এমন,
তাই অনুতাপ-শ্বাস বহে অনুক্ষণ॥

৭

নাহি আর পূর্ব্বভাব গিয়াছে সকল,
সংসার আবর্ত্তে পড়ি হয়েছে গরল।
কেহ নয়—কেহ নয় সংসারে সরল।
এখানে শান্তির বারি মরুভূমে জল!

৮

যদি পুনঃ ফিরে পাই শৈশবের মন,
বুঝাইতে পারি তবে করিয়া যতন।
হইয়াছে মম মন অশান্ত এখন,
কি উপায়ে বল হায় করি নিবারণ?

৯

বিধাতা বিমুখ যারে কি উপায় তার।
ভাবিলে নিস্তার নাই ভাবনা অপার!
হয় হ'ক যাহা আছে অদৃষ্টে আমার।
(পারিনা ভাবিতে ছাই অকুল পাথার)
কোন দিকে কুল নাহি অকুল পাথার॥

১০

কোথা ওহে শান্তিদাতা কর শান্তিদান,
বিষম বিপদে পড়ে কাঁদে হে সন্তান!
কিসে পরিত্রাণ লাভ হইবে তাহার,
বল প্রভু দয়াময় ভব-কর্ণধার॥

১১

বিবেক ও সৎসঙ্গ, সৎ আলাপন,
সময় বুঝিয়া তারা করে পলায়ন।
একদিন ছিল যবে সময় আমার,
বুঝি নাই কোন দিন অভাব কাহার॥

১২

আজ আমি দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ,
মাগিতেছি কৃপা ভিক্ষা কর বিতরণ,
বন্ধু হও, শত্রু হও, কৃপাকর দীনে,
অনাথ অধম অকিঞ্চন দীনহীনে॥

শ্রী——

যুগল দেবতা।

জনক।

জন্মদাতা, মাতৃগুরু, পুরুষ-প্রধান,
প্রণমে চরণে দেব! প্রকৃতি অধম,
চিরদোষী, ভক্তিহীন, দুর্ব্বল সন্তান,
অনুতপ্ত হৃদি লয়ে; তারে তুমি ক্ষম।
'তুমি স্বর্গ, তুমিধর্ম্ম, পরন্তপ তুমি,'
ঋষিবাক্য ভরে গেছে তব মহিমায়;
অলকা, অমরাবতী, এই মর্ত্ত্যভূমি,
মেঘমন্দ্রে নিত্য ঘোষে তব গরিমায়।
হের পিতঃ! লয়ে অই অর্ঘ্য পুষ্পপাত্র,
তোমার সন্তান পূজে দেবতা নিচয়;
'পিতরি প্রীতিমাপন্নে' দেবপূজা মাত্র,
প্রণতির কালে শুন এই বাক্য কয়।
বিধি কভু রুষ্ট নয়, তুমি তুষ্ট যারে,
জীবন্ত দেবতা তুমি নমি বারে বারে।

জননী।

একি স্নেহ! একি মায়া! আত্মত্যাগ একি
সন্তানের লাগি দেবি! আপনি বিভোলা,
জগতে এমন আর কারেও না দেখি—
মূর্ত্তিমতী, দয়াময়ী, প্রাণ মন খোলা।
জনমের পর হ'তে যে দেশ আমারে
দেছে তার বক্ষঃ মাঝে এতটুকু স্থান;
তোমার দোহাই দিয়ে, ডাকিগো তাহারে
জননী জনমভূমি ব'লে; পায় মান
সেও স্বর্গ হ'তে। কিন্তু মাগো, তব ঋণ
কি কঠিন, কি অসীম, সন্তানের কাছে!
বেঁধে রাখে শত পাশে সারা নিশি দিন
তার প্রাণ, কত প্রেম দেছ তার পাছে
এই কর মাতৃরূপা ওগো মহাদেবি!
জনমে জনমে যেন তো'র পদ সেবি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

"ভবে কি আছে আমার।"

১

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
এসে দুদিনের তরে, খেলা করি খেলা ঘরে;
খেলা সাঙ্গ হ'লে, ফিরে যাব পুনর্ব্বার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

২

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
একাকী এসেছি ভবে, একাই যাইতে হ'বে;
পড়ে রবে সাজ শয্যা সোণার সংসার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৩

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
এই যে সংসার-মায়া, পিতা মাতা পুত্র জায়া;

কালে স্নেহ ভুলে যাবে, কেহ নয় কারি,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৪

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
আমোদ প্রমোদে মিলি, যাঁহারে আত্মীয় বলি;
ভেবে দেখ সময়েতে সে কি আপনার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৫

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
আপন কেহ না ভবে, সকলেই পর হবে;
নয়ন মুদিত হ'লে, সকল(ই) আঁধার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৬

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
অচেনা প্রদেশে আসি, পাই কত প্রতিবাসী;
(তারা) দিনেক দুদিন পরে ভুলিবে আবার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৭

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
যারে আমি করি স্নেহ, সে মোর পোড়া'বে দেহ;
অনলেতে পুড়ে আমি হ'ব ছার খার,
আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?

৮

আপন বলিতে ভবে কি আছে আমার?
এক মাত্র বিশ্বপতি, তিনি অগতির গতি;
যেবা করে চরমেতে ভব-নদী পার,
আপন বলিতে "তিনি" আমা অভাগার।

শ্রীললিতমোহন মণ্ডল।

প্রকৃতির খেলা।

১

সুনীল আকাশ গায়,
ম্লান তারা শোভা পায়,
পূর্ণশশী ছড়াইছে সুধা স্নিগ্ধকর,
দূরে শোভে ঘন মেঘ যেন গিরিবর।

২

স্বরগ-আসনে বসি,
পূর্ণিমার রাকা শশী,
হাসিছে কতই হেরি, ম্লান তারাদলে,
কুমুদী হাসিছে বসি সরসী-সলিলে।

৩

নাচাইয়া ফুলকুলে,
কাঁপাইয়া তরুদলে,
মাতাইয়া জীবগণে—প্রেমিক হৃদয়,
মৃদু মন্দ বহিতেছে শারদ মলয়।

৪

শশাঙ্কের সুখ হেরে,
বারিদ থাকিতে নারে,
ছড়াবি বারিদ তবে উঠিল সঘনে,
গ্রাসিতে আসিল চাঁদে পবন বিমানে।

৫

বিজলি হানিল হাসি,
জলদের পাশে আসি,
রূপের প্রভায় দিক্ মাতাইল ধনি—
হেরি নিশানাথে কিন্তু লুকা'ল তখনি।

৬

রঙ্গরস-সুনিপুণা,
ক্ষণপ্রভা সুলোচনা,
কহিল জলদে তবে জোড়কর করি,
"আজি না গ্রাসিও নাথ চাঁদে কৃপাকরি।

৭

কল্পনা করেছি মনে,
খেলিব চন্দ্রমা সনে,
করিব কৌতুক তব অন্তরালে থাকি,
দাঁড়া'ও সম্মুখে তুমি চন্দ্রমারে ঢাকি।"

৮

দামিনীর বাণী শুনে,
জলদ হাসিয়া মনে,
দাঁড়াল সম্মুখে, পিছে বিজলিরে রাখি,
কহে বিজলিরে "খেল মন-সাধে সখি!"

৯

মেঘের আড়ালে থাকি,
বিজলি মারিছে উঁকি,
অপাঙ্গে তাকায়ে ক্ষণে মেঘেতে লুকায়,
এইরূপ-নানারঙ্গে চাঁদেরে ভুলায়।

১০

ক্ষণপরে দেখি চাহি,
জলদ-দামিনী নাহি,
নির্ম্মল আকাশে স্নিগ্ধ স্ফটিকের কণা,
তার মাঝে বসি চাঁদ ছড়ায় জোছনা।

১১

বিশ্বপতি রাজা প্রতি,
দেখিলে হয় ভকতি,
দেখি নানা সাজে কত প্রকৃতির খেলা,
নবতানে নব প্রাণে খেলিছে দুবেলা।

শ্রীমতি বসন্তকুমারী দেবী।

বিবিধ।

প্রঃ। মানুষের দেহের সঙ্গে গাছের পাতায় কিসের সাদৃশ্য বল দেখি? সেই যে সে দিন ব'লে দিলাম।

উঃ।—উভয়েরই—শিরা আছে ব'লে।

প্রঃ।—আচ্ছা, পাকা দালিমে আর পচা বেলে প্রভেদ কি বল দেখি?

উঃ।—জানি না।

জান না, সে কি? তোমায় দালিম কিনতে পাঠালে আজ ঠিক হ'ত।

সতীশ বাবু। "এই নে তোর টাকা। আচ্ছা বল্‌তে পারিস, তোর মনিব এই কটা টাকার জন্য এত তাগাদা করে কেন? কিছু না হবে এর জন্য আমাকে থান কুড়ি চিঠি লিখেছে।"

ভৃত্য। "তা'ত বল্‌তে পারি না বাবু, তবে বোধ হয়, উনিশখানা চিঠি লিখে আদায় হয় নি বলে।"

পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক। (দোকানদারের প্রতি) হাঁ হে দোকানদার—তুমি কি রকম লোক বল দেখি! পূজার সময় আমার সব ছেলে মেয়েদের জামা তোমার এখান থেকে নিলুম—আর বাড়ী গিয়ে কাচ্‌তেই সব লাল রঙ্গ ধুয়ে গিয়ে আর এক রকম রং বেরিয়ে পড়েছে। এ রকম জেনে শুনে কি লোককে ঠকাতে আছে?

দোকানদার। আজ্ঞে ঠকান কি? সে কাপড়টা আমার নিজের পেটেণ্ট তা' কি জানেন না? গৃহস্থ ভদ্রলোকে সব পরবে কিছু ছেলে পুলেদের নূতন নূতন জামা কিনে দিতে পারে না। এ কাপড়ের জামা পূজার সময় এক রঙ্গ, আবার কাচিয়া শ্যামাপূজার সময় রঙ্গ বদ্‌লে নূতন জামা বলে চালাতে পারবে, কেউ ধরতে পার্ব্বে না। এটা শুদ্ধ আপনাদের খরচ বাঁচাবার জন্যে আমরা আমদানী ক'রেছি।

পল্লী-ভদ্র। বটে, ঠিক বলেছ ত। ও কাপড়ের সাড়ী আছে?

প্রশ্ন।—দিন কাটে কিসে?

উত্তর।—পাঁজির পাতে কাঁচির ব্যবহারে।

প্রঃ।—কিসে দোকানদারের অভদ্রতা প্রকাশ পায়?

উঃ।—বৃষ্টির সময় ছাতাওয়ালার দোকানে দাঁড়াইলে।

চারুবালা।

প্রথম অধ্যায়।

সংসারের আনন্দছায়া।

পাঠক! এই উপন্যাসে কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ নাই, সংসারের সামান্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে মাত্র; সুতরাং ভাষার আড়ম্বর বা ভাবলহরীর সমাবেশ ইহাতে নাই। সরল চলিত ভাষায় চারুবালার আদর্শ-চরিত্র চিত্রিত করিয়া গ্রন্থকার বিদায় হইবে। আড়ম্বর-প্রিয় পাঠক সময় নষ্ট না করিয়া অন্য পুস্তকের আলোচনা করুন।

বৈশাখ মাস, বেলা দ্বিতীয় প্রহরে একটী ত্রয়োবিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়াও রাজপথ বাহিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। যুবক দেখিতে অতি সুন্দর। একে যৌবনের আমোদময়ী মধুরিমা, তাহাতে আবার নিঁখুত অঙ্গসৌষ্ঠব,—এই উভয়ের সমাবেশে তাহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইয়াছে। এই রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া প্রায় একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছে। যুবকের মুখাবয়ব দেখিলে প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাতে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। যুবক ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ডতাপ ভুলিয়া গিয়াছে,—কার্য্য উদ্ধার চেষ্টায় তন্ময়। আর কিছুদূর পথ অতিক্রম করিয়া পার্শ্বে একটী অপ্রশস্ত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। গলির উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। এই সকল কুটীরশ্রেণী অবলোকন করিলে মনে হয়, ইহাতে নীচ জাতির বাস। এক এক খানি ঘর দীর্ঘে ৮।৯ হাত ও প্রস্থে ৫।৬ হাতের অধিক হইবে না; কুটীর-প্রাঙ্গন আবর্জ্জনা-পূর্ণ। পূতিগন্ধে যুবক নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কায়ক্লেশে এই সঙ্কীর্ণ গলির পথ অতিক্রম করিতেছে। কিছু দূর

গিয়া "হরির মা" "হরির মা" বলিয়া চীৎকার করিল। "হরির মা" কে, এবং যুবক কি জন্যই বা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া দুইপ্রহর রৌদ্রে তাহার নিকট আসিয়াছে?

"হরির মা" নীচ-বংশীয়া বিধবা রমণী। বয়স আন্দাজ ৫০।৫৫ বৎসর হইবে; দেখিতে খর্ব্বকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। "হরির মা" হরি-ছাড়া হইয়া অবধি অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছে। কেবল মাত্র পাড়া-প্রতিবাসীর সাহায্যে ও তিন চার ঘর অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে চাকরাণী-গিরি করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া সে আর একটী ব্যবসায় জানিত—ধাত্রীগিরি। স্কুলে পড়িয়া বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ধাত্রীর কাজ শিক্ষা করে নাই; পাড়াগাঁয়ে যাহারা ধাই নামে অভিহিত, সে সেই শ্রেণীভুক্ত। ইহাতে তাহার কিছু কিছু উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

তিন চার ডাকের পর "হরির মা" বাহির হইয়া আসিল, এবং বলিল, "সতীশ বাবু! আমাকে ডাকছ কেন, তোমার ব'য়ের কি ব্যাথা ধ'রেছে?"

সতীশ। হাঁ তুমি শীঘ্র চল, আমি বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

হরির মা। একটু দাঁড়াও, ঘরে তালা বন্ধ করি, বাহিরে কিছু পড়িয়া আছে কি না দেখি, পরে যাইতেছি।

যুবক বলিল, "বেশী দেরি করিলে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। বাড়ীতে কেবল ঘোষেদের বৌ ও শৈবাল আছে, আর কেহ সাহায্য করিবার লোক নাই।"

"হরির মা" ঘরে তালা বন্ধ করিয়া সতীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্বরিতপদে চলিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ে গৃহে পৌঁছিল। আসিয়া দেখিল,—গৃহিণী যন্ত্রণায় অস্থির, এক একবার অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। ধাই আসিয়া সূতিকা-কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, সম্মুখে এক বড় তক্তপোষ; তদুপরি একখানি মাদুর এবং তাহারই উপর প্রসূতি উপবিষ্টা। ধাই দেখিয়াই অবাক্ হইল। বলিল, "ওমা একি গো, এসব বিছানপত্র কেন, সমস্তই নষ্ট হবে, বাবুর কি জানা নেই।" এই সময় প্রসূতি ধাইকে ইসারা করিল, ধাই অমনি পর্য্যঙ্কে উঠিল। ৫।৭ মিনিট পরে একটি সুন্দর বালক ভূমিষ্ট হইল। গৃহ আনন্দে পূর্ণ হইল।

ঘোষেদের বধূর আর আনন্দ ধরে না। শৈবালও ততোধিক আনন্দিত হইল। এই আনন্দ-সংবাদ দিবার জন্য ঘোষ-বৌ গৃহ হইতে বাহির হইল। বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুরাণীকে এই শুভ সংবাদ দিল। তিনি সংবাদ পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "আহা সতীশ বড় ভাল ছেলে, বৌ-মাও যেন সাক্ষাৎ সাবিত্রী। তা বেশ হ'য়েছে ব্যাটা হ'য়েছে বেশ হ'য়েছে।" ক্রমে পাড়ার সকলে এই শুভ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিল।

সতীশচন্দ্র মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইল, এবং যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহারই কিয়দংশ দরিদ্র অনাথদিগকে দান করিবে মনস্থ করিল। পাড়ার জনৈক বালককে ডাকিয়া বলিল, "ভাই! পথে যে যে ভিখারীকে দেখিতে পাও, আমাদের এখানে ডাকিয়া আন ত।" বালক তাহাই করিল এবং প্রায় ১০০ লোককে সতীশ স্বহস্তে আটটি করিয়া পয়সা বিতরণ করিল। এতক্ষণে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, চিত্ত প্রফুল্ল হইল, হৃদয়ে আনন্দ পাইল।

ধাই এদিকে প্রসূতির শুশ্রূষা করিতেছে, বালক রোদন করিতেছে বলিয়া ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছে। এত আনন্দের মধ্যেও বিষাদের চিহ্ন দেখা দিল। প্রসূতি যন্ত্রণায় অস্থির, এখন পর্য্যন্ত ফুল পড়ে নাই। এই দুঃসংবাদ পাইয়া সতীশচন্দ্রের আনন্দ-বদন আবার বিষাদে পূর্ণ হইল,—আবার চিন্তিত হইল। বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে, ভাবিয়া নিজে যে সামান্য হোমিওপ্যাথিক জানিত, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং তাড়াতাড়ি এক মাত্রা ক্যান্থারিস্ আনিয়া প্রসূতিকে সেবন করাইল। পরক্ষণেই ঔষধের আশ্চর্য্য ফল পাইল। ক্রমে ক্রমে চিন্তা দূর হইল; বদন-মণ্ডল আবার আনন্দে ভাসিতে লাগিল—আবার গৃহ শান্তি-ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই রূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সতীশ ও শৈবাল আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

শৈবাল সমস্ত আয়োজন করিল। সতীশকে আর কিছুই দেখিতে হইল না। গৃহের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম শৈবাল একাকী মনোযোগের সহিত করিতে লাগিল। সতীশ এক রূপ নিশ্চিন্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সতীশচন্দ্র কে ?

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ভূতনাথ বসুর বাস। ভূতনাথ বসুর বয়স ৫০ বৎসর,—দেখিতে গৌরবর্ণ। মজিলপুর অঞ্চলে তাঁহার একখানি জমিদারী আছে। জমিদারীর আয় ন্যূনকল্প বাৎসরিক ১৪০০৲ টাকা; সুতরাং মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন লোক অপেক্ষা তাঁহার সংসার সচ্ছল। সংসারে তাঁহার স্ত্রী সুশীলা গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সুশীলার বয়স ৩২।৩৩এর অধিক নহে। তাঁহার শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিলে সংসারের সকল কষ্ট দূরে পলায়ন করে। এই বয়সে তাঁহার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে একে একে সকলেই এ পাপ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন দুই পুত্র ও এক কন্যা মাত্র অবশিষ্ট। প্রথম পুত্রের বয়স একাদশ, দ্বিতীয়ের নবম ও কন্যার বয়স সপ্তম বর্ষমাত্র। অনেক গুলির অকাল-মৃত্যুতে সুশীলা বড়ই শোকবিহ্বলা হইয়া কয়েক বৎসর কাল যাপন করিয়াছেন। সুখদুঃখ চির-সহচর। সংসারী ব্যক্তি সুখদুঃখের অতীত নহে। সুখ ও দুঃখ না থাকিলে সংসারের অস্তিত্ব লোপ পায়। কয়েক বৎসরের নিদারুণ দুঃখের পর সুশীলার সংসারে আবার সুখের উদয় হইল, তিনি মৃত পুত্র-কন্যাগণকে একবারে বিস্মৃত হইলেন।

ভূতনাথ ইদানীন্তন কালের ন্যায় কড়া জমিদার নহেন। অজন্মা বৎসরে প্রজাবর্গকে নিষ্পেষিত করিয়া কর আদায় এ কালের ধর্ম্ম। যখনকার কথা আমরা বলিতেছি, তখন ধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা ছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পাপের স্রোত ইদানীন্তন কালের ন্যায় এত খরতর বেগে প্রবাহিত হইত না। পরদুঃখকাতর ভূতনাথও পরের দুঃখে বিগলিত হইতেন। তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে জানিতেন। তাই প্রজামণ্ডলী তাঁহার গুণে মুগ্ধ ও তাঁহার সুখ-দুঃখে বিজড়িত হইত এবং বিপদ-আপদে প্রাণ দিয়া উপকার করিত। রাজার

গুণে প্রজা আপনার, ও রাজার দৌরাত্ম্যে তাহারা পর হইয়া যায়। শাসন-কর্ত্তা যে প্রকৃতির, শাসিতের সেই প্রকৃতি হওয়াই স্বাভাবিক। ভূতনাথ প্রজাপালনে অভিজ্ঞ, অধিকন্তু প্রজার দুঃখে দুঃখিত ; তাই প্রজারাও তাঁহার অমায়িকতায়, তাঁহার আদরে—ভালবাসায় তন্ময়। যে দুর্দ্দান্ত, সেও ভালবাসায় বিমুগ্ধ, আদরে বিগলিত হয়। অনাবৃষ্টি, অজন্মা হইলেও প্রজারা কখনও কাতর হইত না। জমিদারের দ্বারে আসিয়া আপনাদের দুঃখ জানাইত এবং জমিদার দুঃখাপনোদন-তৎপর হইয়া তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

ভূতনাথ মিতব্যয়ী ছিলেন। যে অবস্থায় থাকিলে সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দীন দরিদ্রের দুঃখ-দারিদ্র্য বিমোচন হয়, তদতি-রিক্ত ব্যয় তাঁহার একবারেই ছিল না। সংসারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত কখনও অতিরিক্ত অনাবশ্যক বিলাসিতার সামগ্রী ক্রয় করিতেন না।

ভগবান্ সমানে সমানে মিলাইয়া দেন। নিজে যেমন পরদুঃখকাতর, সুশীলাও তদ্রূপ। এ সংসারে বালক-বালিকার চরিত্র যেরূপ গঠিত হইবে, তাহার ছায়া প্রথম হইতেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুশীলার যত্নের নিধি, হারাণ ধন বড়ই আদরের সামগ্রী। তাঁহাদের চক্ষের অন্তরালে যাইতে দেন না, যত্নের ধন বুকে করিয়া লইয়া বেড়ান। সতীশ যেমন আদরের, শরৎ ও নলিনী ততোধিক আদরের। সতীশ জ্যেষ্ঠ ও শরৎ কনিষ্ঠ পুত্র এবং নলিনী একমাত্র কন্যা। সতীশ শরৎকে যেমন আদর করে, নলিনীকেও তদ্রূপ আদর করিয়া থাকে। তিনে যেন এক-হৃদয়, এক-প্রাণ। সতীশ শরৎকে না দেখিলে যেমন অজ্ঞান হয়, নলিনীকেও না দেখিতে পাইলে তেমনি অজ্ঞান হইত।

পাঠক ! আমার মনে হয়, এত সুখ ভাল নয় ; কেন না সুখের আধিক্যে দুঃখের উদয় অনিবার্য্য। তাই একবারে এত সুখ ভাবিয়া ভাবিয়া আমার পাপ মনে এক একবার ঘোর অমানিশার অন্ধকার আসিয়া সমস্ত হৃদয়ে কালিমা ঢালিয়া দেয়—আমি শোকে বিহ্বল হইয়া যাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুখ দুঃখ।

সতীশ যেমন শিষ্ট শান্ত, লেখাপড়ায়ও তাহার তেমনি মনোযোগ। সে যত্ন-পূর্ব্বক তাহার ভ্রাতা ভগিনীদিগকে একত্র বসাইয়া আপনি তাহাদের পার্শ্বে বসিত, এবং নিজের পাঠ অভ্যাস কবিত ও ভ্রাতা-ভগ্নিদিগকে স্ব স্ব পাঠাভ্যাসে রত কবিত। এইরূপে শিক্ষার কাৰ্য্য চলিতে লাগিল। সুশীলা দেখিলেন, এরূপ আর কত দিন চলিবে,—ইহাদিগকে স্কুলে না দিলে সর্ব্বদা ইহাদের তত্ত্বাবধান কবা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে। কিন্তু আবার ভাবিয়া দেখিলেন, "আজকাল বালক-বালিকারা এত দুরন্ত, এত দুরভিসন্ধিপ্রিয়, একবার তাহাদের কুহকে পড়িলে, যত্নের লালিত পালিত ননির পুতুলগুলি আর মানুষ করিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া সুশীলা কর্ত্তাকে সমস্ত কথা জ্ঞাত করিলেন এবং যাহাতে বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, সে জন্য তৎপর হইলেন।

এই ঘটনার এক মাস পরেই বাটীতে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পাড়ার জন কয়েক শিষ্ট শান্ত বালক বালিকা এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। সুখের হাটবাজারে দিন দিন নূতন জিনিসের আমদানী হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সতীশচন্দ্র ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিল। শরৎ ও নলিনী এখন আর ছোট নাই; বিশেষ নলিনী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বাল্যখেলা ক্রমে ক্রমে ফুরাইয়া আসিয়াছে। সতীশচন্দ্র উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। সতীশ অঙ্ক, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃত বিদ্যায় সমান পারদর্শী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল। মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিল।

এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। নলিনীর পাঠানুরাগ কিছু শিথিল হইল, কিন্তু সতীশ ও শরতের যত্ন ও উৎসাহ সমান রহিল। দেখিতে দেখিতে শরৎও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল।

ভূতনাথ বাবুর এত দিন কিছু ভাবনা ছিল না। কন্যার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার অন্তরে চিন্তা আসিয়া অধিকার লাভ করিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা, আর বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না। যদিও তিনি বাল্য-বিবাহ ঘৃণা করিতেন, কিন্তু যখন কন্যা ১৪।১৫ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিল, তখন আর তাহাকে অবিবাহিতা রাখা কোন মতে বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিয়া আবার সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার অহর্নিশি সেই চিন্তা। নানা স্থান হইতে নানা পাত্রের সংবাদ আসিতে লাগিল। শুধু লেখা পড়া শিখিয়াছে, এমন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে; সদ্বংশসম্ভূত শিষ্টাচারী ও নম্র-স্বভাব-সম্পন্ন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। লেখা পড়া শিখিয়াও আজ কাল যেরূপ যুবকের দল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাতে অসৎপাত্রে পড়িলে কন্যা চিরদিন কষ্ট পাইবে, ইহা তিনি কোন ক্রমে দেখিতে পারিবেন না। অপরের কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজে পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ বসন্তকুমার মিত্রের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহে ভূতনাথ বাবুর অনেকগুলি টাকা ব্যয় হইল। বিবাহ-রাত্রিতে জ্ঞাতি, প্রতিবাসী ও কুটম্ব ভোজন অপেক্ষা দীনদরিদ্র ভোজনে তাঁহার অনেক অধিক ব্যয় হইল। শুধু তাহাদিগকে যত্নে আহার করাইয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; প্রায় ৫০০ শত লোককে এক খানি করিয়া কাপড় ও দুই আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। ইহাতে তাঁহার যশঃ-সৌরভ বৃদ্ধি হউক আর না হউক, লোকে ভাল বলুক, আর নাই বলুক, তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইল—চিত্ত প্রফুল্ল হইল ও ঘোরতর চিন্তাজাল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

আবার সুখের দিন আসিল—আবার আনন্দে তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এদিকে সতীশচন্দ্র বি, এ, ও শরচ্চন্দ্র এল্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সতীশচন্দ্রের ইচ্ছা সে পাঠ সমাপন করিয়া বিষয়-কার্য্যে মনোনিবেশ করে, এবং পরোপকারের জন্য আপনাকে গঠিত করে। পিতা কখনও সতীশের কার্য্যে বাধা দিতেন না, বা কখনও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন না; কেন না, পুত্র তাঁহার অবাধ্য নহে। আত্মোন্নতিকল্পে সে সতত যত্নবান্। সুতরাং পুত্রের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত

হইল। কিন্তু শরতের জ্ঞানলিপ্সা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা যে, ভারতীয় বিদ্যা সমাপন করিয়া, বিলাত গমন করে। পিতা পুত্রদের সদিচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও বাধা দিতে জানিতেন না; তাই পুত্রদ্বয়ের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইত।

সতীশ বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত হওয়া অবধি পিতাকে আর সেরূপ পরিশ্রম করিতে দিত না; সে বিষয়-কার্য্য রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে ভূতনাথ অনেক শান্তি পাইলেন। পুত্রদ্বয়ের পিতৃভক্তি ও তাঁহার অনুমোদিত কার্য্যে তাহাদের সহানুভূতি পাইয়া, ভূতনাথ বাবু অধিকাংশ সময় নিশ্চিন্তায় ও নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত; এখন অবসর পাইয়া এই ব্রতপালন-মানসে নানা সদুপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। দীন-দুঃখীদিগকে প্রত্যহ গোপনে দান তাঁহার নিত্য কার্য্যের মধ্যে হইল। অনাথা-বিধবার রীতিমত সাহায্য, ব্যাধিগ্রস্তের শুশ্রূষা, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধানিবারণ ভূতনাথের জীবনের প্রধান কার্য্য। এতদিন সংসারসুখের যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহার আনন্দ শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে; —যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

সময়ে সময়ে অন্যান্য জমিদারের উৎপীড়নে সতীশকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত; সেই কারণ ভূতনাথ বাবুকে মধ্যে মধ্যে বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত; কিন্তু ইহাতে তাঁহার তাদৃশ আন্তরিক যত্ন ছিল না। এখন সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে তাঁহার অন্তরের বাসনা; এই কারণ বিষয়-আশয় সম্বন্ধে একটু গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। অন্যান্য জমিরদারগণ যাঁহারা ইহা অপেক্ষা ক্ষমতাবান্, নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া, তাঁহারা ভূতনাথ বাবুর বিষয় স্বাধিকারে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন অপর জমিদারের কয়েকজন কর্ম্মচারী ভূতনাথ বাবুর জনকয়েক লোককে 'আমাদের সীমানায় গাছ রোপণ করিতেছিস্' বলিয়া, গুরুতর প্রহার করে। দুই একজন এরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, তাঁহাদিগকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। এই দাঙ্গাহাঙ্গামার বিষয় তদন্ত করিতে গিয়া ভূতনাথ বাবু দেখেন যে, তাঁহার লোকে কোন অন্যায় কার্য্য করে নাই;

তাঁহারই জমির উপরে কয়েকটী কলমের চারা তাহারা রোপণ করিতে-ছিল, সুতরাং বিনা-অপরাধে তাহাদিগকে মণিলাল বাবুর লোক আসিয়া অযথা গালি দিয়াছে ও গুরুতর প্রহার করিয়াছে। অন্য পক্ষের জমি-দারের ইচ্ছা,—জোর করিয়া ভূতনাথ বাবুর জমিদারীর কিয়দংশ দখল করে। ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন এবং এই সকল বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, পুত্রের সহিত তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পুত্র প্রতিশোধ-পক্ষে অনেক কথা বলিলেন এবং এরূপ তর্কে উপনীত হইলেন যে, অপরাধী ব্যক্তিদের সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য তাহাদের নামে আত্মম্ভরিতা ও অযথা অত্যাচারের প্রশ্রয়-দাতা বলিয়া মণিবাবুর নামে যথারীতি রাজ-দরবারে অভিযোগ করা হউক। ভূতনাথ বাবু এ সকলের কিছুই অনুমোদন করি-লেন না। বরং পুত্রকে বুঝাইলেন যে, উভয় পক্ষে সমান-বিরোধী হইলে অর্থ নাশ ও নানা বিষয়ে মনঃকষ্ট পাইতে হইবে। অতএব সতীশকে এই সকল অযথা বিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সতীশের মন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল এবং পিতার বিরুদ্ধমত কার্য্য করিতে একবারও আর চেষ্টা করিলেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

চারুবালা কে ?

যখন লোকের দুঃসময় সমুপস্থিত হয়, তখন তাহার সকল অবস্থাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়; দুঃখ বা কষ্টের পর সুখ বা শান্তির পরিবর্ত্তে নিয়ত উপর্য্যুপরি দুঃখ ও অশান্তি আসিয়া প্রতিকূল অবস্থায় অনুকূল হইয়া উঠে। জগৎ-সংসারে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ এরূপ ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে না পারিলে, এই দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ অবনী-মণ্ডলে কাহারও হৃদয় গঠিত হয় না। মানবকে কত বিপদ আপদ, সংসা-রের কত জ্বালাময়ী তীব্র যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করিতে হয়! তাই বলিতে

ছিলাম, গঠিত-হৃদয় না হইলে এই সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা কয় জনের হয়?

আমাদের ভূতনাথ বাবু, জমিদারের এই সকল অন্যায় উৎপীড়ন অবাধে সহ্য করিতে লাগিলেন; এবং পুত্রের হৃদয় সেই সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ীভূত করণাভিপ্রায়ে নানা উপদেশ ও সৎপরামর্শ দিতে লাগিলেন। যুবক, পিতার উপদেশ পাইয়া মনে মনে নানা সৎপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন, এবং যাহাতে জীবনে পিতার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন, পরমেশ্বরের নিকট সে জন্য সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পিতা বালকের অন্তরে যে সকল মহৎ-উদ্দেশ্যের বীজ রোপণ করিয়া দিলেন, উত্তরকালে বালক তদুৎপন্ন বৃক্ষের ফলভোগ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে পারিবেন।

ভূতনাথ বাবু সৎলোক হইলেও, পরের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলেও, জমিদারের অত্যাচার হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন না,—দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভূতনাথ বাবু যতই এই সকল চিন্তা হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, ততই উপর্য্যুপরি চিন্তা-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। অত্যাচারের বৃদ্ধি সত্বেও ভূতনাথ বাবু আপনার হৃদয় দৃঢ় রাখিলেন। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও তাঁহার ধ্যান-আরাধনায় আপনাকে নিয়ত নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয়কে তিলার্দ্ধও টলাইতে পারিল না। সতীশচন্দ্র মনে মনে ভাবিতেন, জমিদারের উৎপীড়ন যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। অন্যায়ের প্রতীকার করা পিতার অনুমোদিত না হইলেও যখন জমিদারী ভরণ-পোষণের প্রকৃত উপায়, তখন অবাধে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিলে মনুষ্য-সমাজে হেয় এবং জীবনোপায়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে। নানাদিক্ বিবেচনা করিয়া সতীশ অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতীকার-কল্পে সদুপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নিজের মস্তিষ্ক উষ্ণ না করিয়া, জমিদার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন।

একদিন দিবা দুই প্রহরের সময় পিতার অগোচরে তিনি মণি বাবুর বাটী গমন করিলেন। মণি বাবু সেদিন বিষয়-কার্য্য উপলক্ষে

কলিকাতায় গিয়াছেন, সুতরাং সতীশচন্দ্র একটু ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং বিফল-মনোরথ হইয়া চিন্তিত মনে চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় জনৈক আমলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কেও সতীশ বাবু না কি! আস্তে আজ্ঞা হউক। এখানে কিসের জন্য আসা হ'য়েছিল।"

সতীশ। মণি বাবুর সহিত কোন বিশেষ পরামর্শ ছিল, তাই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। শুনিলাম, তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন।

আমলা। হাঁ মহাশয়, তিনি বিগত কল্য কলিকাতায় গিয়াছেন, সম্ভবতঃ আগামী কল্য ফিরিয়া আসিবেন।

সতীশ। তাঁহার সহিত দেখা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাড়ীতে আরও অনেক কাজ আছে, বসিতে পারিব না; ক্ষমা করিবেন!

আমলা। তাঁহার সহিত কি এমন দরকারি কাজ আছে, আমরা কি শুনিতে পাই না? কর্ত্তা ফিরিয়া আসিলে—তাঁহাকে আমরা বলিতাম।

সতীশ। এমন কিছু নহে; বিষয়-আশয় সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব।

আমলা। আচ্ছা আপনি যাইতে পারেন, কর্ত্তা আসিলে তাঁহাকে আপনার আগমনের বৃত্তান্ত অবগত করাইব।

এইরূপ কথোপকথনের পর সতীশচন্দ্র বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন এবং আহারাদি শেষ করিয়া গিবনের রোম্যান এম্পায়ার (Gibbon's Roman Empire) পড়িতে লাগিলেন। কিরূপে রোমরাজ্য ধ্বংস হইল, ক্রমে ক্রমে রাজ্যের পতন কিরূপে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, সেই সকল বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া নানা ভাবনায় তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিল। ক্রমে ক্রমে তিনি চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড় আশ্রয় করিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি একটি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন, দেখিলেন—যেন মণিলাল বাবু তাঁহার লোকজন সমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতেছেন। বিষয়-আশয় সমস্তই জাল পাট্টা সাজাইয়া মণিলাল বাবু আত্মসাৎ করিতেছেন এবং সতীশচন্দ্রকে জোর করিয়া সেই জাল পাট্টায় সহি দিতে বলিতেছেন। সতীশ কিছুতেই স্বীকার করিতেছেন না। মণিবাবু লাঠি তরবারি, দেখাইয়া তাঁহাকে বধ করিবার ভয় দেখাইতেছেন। পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মাতা সহমৃতা। সাহায্যের জন্য উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন, কেহ তাঁহার চীৎকারের প্রত্যুত্তর দিতেছে না, যেন ঘৃণায় অট্টহাসি দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিতেছে। দুই তিনবার সতীশ নিদ্রিত অব-

স্থায় চমকিত হইলেন। পরক্ষণেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়াই আবার মুদিত করিলেন, আবার যেন সেই ভীষণ চিত্র তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। সতীশ সজোরে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণের পর প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে তাঁহার একজন পরিচারিকা ব্যজন করিতেছে।

পরিচারিকা। বড় দাদাবাবু! আপনার আজ মুখ শুকনো কেন! নিদ্রিত অবস্থায় আপনাকে সিহরিয়া উঠিতে দেখিলাম। শরীর অসুস্থ হইয়াছে কি?

সতীশের বদন-মণ্ডল অবলোকন করিলে প্রতীয়মান হয়, যেন তিনি নিদ্রা যান নাই। কোন ঘোরতর বৈষয়িক চিন্তায় তাঁহার মুখারবিন্দে চিন্তার কালিমা রেখা অঙ্কিত হইয়াছে।

সতীশ। দেখ, শৈবাল! আজ বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, তাই তুমি আমাকে বিস্মিত দেখিতেছ।

শৈবাল। দিবানিদ্রা ভাল নয়। দিবাভাগে নিদ্রা গেলেই নানা প্রকার কুস্বপ্ন দেখিতে হয়। স্বপ্ন সকলই অলীক। এত ভাবিত হইবেন না।

সতীশ। না আর চিন্তা করিব না। তোমাকে আর বাতাস করিতে হইবে না। তুমি অবসর লইতে পার।

শৈবাল চলিয়া গেলে সতীশ অমূলক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বালিকা চারুবালার বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিল।

পাঠক! চারুবালার বৃত্তান্ত জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হইতেছে, সন্দেহ নাই। চারুবালা বালিকা, শ্যামাধন ঘোষের কন্যা। বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—চম্পক পুষ্প সদৃশ। কেশরাশি নিতম্ব-সংলগ্ন। এই অল্প বয়সে এত কেশের শোভা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখশ্রী অতীব মনোমোহকর। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যুগ্ম ভ্রূ, বিস্ফারিত আয়ত লোচন, উন্নত নাসিকা, প্রকৃতির পূর্ণ সৌন্দর্য্যে গঠিত বদন মণ্ডল! বাস্তবিক শরীরের কোন অংশের সৃজনে সুনিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। যেখানে যেরূপ সৌন্দর্য্যের আবশ্যক, বিধাতা সেই খানে সেইরূপ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন, সুতরাং চারুবালা রূপে যে অতুলনীয়, তাহার পূর্ণাবয়ব যে নিখুঁত, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

শ্যামাধন ঘোষ জাতিতে কায়স্থ, অবস্থা-বৈগুণ্যে জাতিত্বের উচ্চতা হীনপ্রভ। শ্যামাধন মণিলাল বাবুর প্রজা। কর দিতে অক্ষম বলিয়া

মণিলালবাবু তাঁহাকে নিজ জমিদারীর বাহির করিয়া দেন। আমাদের ভূতনাথবাবু তাঁহাকে আশ্রয় দেন।

সাংসারিক নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া এবং কন্যার ভবিষ্য-জীবনের বিষয় ভাবিয়া শ্যামাধন বাবু এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ক্রমে কালের কবলে নিপতিত হন। শ্যামাধনের প্রাণহীন সংসারে কেবল মাত্র এই চারুবালা, আর তাঁহার বিধবা পত্নী ভিন্ন আর কেহ নাই। শ্যামাধন বাবুর মৃত্যুর পর হইতে আমাদের ভূতনাথবাবু মাসে মাসে উভয়ের জীবনোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

বালিকা চারুবালা প্রায়ই সতীশদের বাড়ীতে আসিয়া থাকে। সুশীলা তাহাকে বড় ভাল বাসে। তিনি বলেন, "রূপে গুণে মা চারুবালা যেন দেবী। হ্যাঁ মা! তুই কি আরজন্মে দেববালা ছিলি?" বালিকা সুশীলার পানে চাহিয়া চাহিয়া এক এক বিন্দু চক্ষুর জল ফেলিত এবং মনে করিত "আমার দুই মা; এক মা কুঁড়ে ঘরে থাকেন, আর এক মা রাজ-অট্টালিকায় থাকেন। দুইয়ের মধ্যে একটু মাত্রও করুণার পার্থক্য নাই।"

সতীশ বালিকাকে দেখিয়া অবধি আত্মহারা হইয়াছে। তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিয়াছে। যখন চারুকে সতীশের মা আদর করিতেন, তখন সতীশ অত্যন্ত সুখী হইত।

সতীশের এখনও বিবাহ হয় নাই। সংসারের সুখ দুঃখ কি, তাহা সে ধারণা করিতে অক্ষম। চারুবালাকে ভালবাসিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার আশা কি ফলবতী হইবে! কেন, চারুবালা ত কায়স্থ কুলীন-কন্যা, সতীশও কুলীন বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র! তবে আর আপত্তি কি? আপত্তি আছে,—সতীশ জমিদার-পুত্র চারুবালা, অনাথিনীর দুহিতা। যখন পিতা বর্ত্তমান, তখন পিতার ইচ্ছায় কার্য্য হইবে।

ভূতনাথ বাবু জমিদার হইলেও উদারমনা, পরের দুঃখে বিগলিত-হৃদয়, পরোপকারে আত্মহারা। ভূতনাথ বাবু যে পুত্রের বিবাহের বিষয় একবারও চিন্তা করেন নাই, তাহা নহে। চারুবালার প্রতি তাঁহার পুত্রের যে ভালবাসা হইয়াছে, তাহা তিনি অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য মনে মনে একরূপ স্থির করিয়াছেন যে, সময়ে পুত্রকে বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া মনোভাব জানিবেন, তাই ভূতনাথ বাবু নিশ্চিন্ত; সতীশের বিবাহ-সম্বন্ধে একবারও বিশেষ চিন্তিত হন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

মণিলাল বাবুর দরবার।

মুক্তিলপুরের সন্নিকট রিসড়া একটী প্রসিদ্ধ সহর। সহরের নানাস্থানে দোকানের পারিপাট্য দেখিতে অতি সুন্দর। সহরের বহির্দ্দেশে বিস্তৃত ময়দান। ময়দান শস্য-পরিপূর্ণ—যেন অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গন। এইত গেল গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। উত্তরে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হই-তেছে। পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। এই গৃহ সকল অতিক্রম করিলেই ঐ কারুকার্য্য-খচিত সৌধমালার সম্মুখীন হওয়া যায়। এই সকল সৌধ-শ্রেণীই মণিলালের দরবার গৃহ ও ভদ্রাসন। অট্টালিকা-প্রাচীরের মধ্য-প্রদেশে লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ দ্বার। দ্বারের দুই পার্শ্বে দ্বারবান বিদ্যমান থাকিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ সকল সুসজ্জিত নহে, প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরের চতুর্দ্দিক নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। এক এক প্রকোষ্ঠে প্রায় ৪।৫ জন কর্ম্মচারী বসিয়া লেখা পড়া করিতেছে, কেহবা কাগজ-পত্র পরিত্যাগ করিয়া তাম্রকুট-সেবনে ক্লান্তি দূর করিতেছে। বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়াছে। রামধন শ্যামধন চীৎকারে প্রাঙ্গন প্রতিধ্বনিত করি-তেছে। "রামধন শীঘ্র তামাক দেরে" "উদিকে যাস্‌নে, বরাবর এখানে নিয়ে আয়।" এইরূপ কত প্রকার অসংলগ্ন বাক্যাবলি বায়ুহিল্লোলে বাহিত হইতেছে।

এই সকল প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেই একটী সুন্দর সজ্জিত গৃহ নয়ন-পথে পতিত হয়। গৃহের ভিতরে চারি পার্শ্বের দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর নানা প্রকার নয়ন-তৃপ্তিকর ছবি দোদুল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহের মধ্যপ্রদেশে তিন চার খানি ইজিচেয়ার (Easy Chair) ও দুই তিন খানি আরম চেয়ার (Arm Chair)। একখানি মেহগ্নি কাষ্ঠের টেবিল পরিবেষ্টন করিয়া এই সকল চেয়ার বিরাজমান। একখানি ইজিচেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, পরিপাটী পরিচ্ছদ পরিয়া একটী মনুষ্যমূর্ত্তি নিদ্রা যাইতেছেন। ইহার বয়স অনুমান চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর। দেখিতে সুন্দর,

ইঁহার আয়ত লোচন, শ্মশ্রু-পরিশোভিত বদন-মণ্ডল, দেখিলেই বোধ হয়, চিন্তায় অভিভূত হইয়া যেন তিনি নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক ক্ষণের পর তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং হস্ত মুখ প্রক্ষালন মানসে বাহিরে আসিলেন। দুই তিন জন পরিচারক জল, গামছা ইত্যাদি লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, বাবুকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা শশব্যস্তে স্ব স্ব কার্য্যে মনোযোগী হইল। ইনিই আমাদের দরবারের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিলাল বাবু হস্ত মুখ প্রক্ষালনানন্তর পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আরম্ চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ গণ্ড করতল-ন্যস্ত করিলেন। এইরূপে প্রায় দশ মিনিট কাল ঘোর চিন্তার পর "ক্ষীরোদ ক্ষীরোদ" রবে তিন চারিবার চীৎকার করিলেন। পরক্ষণেই একজন ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "আমাকে এত তাড়াতাড়ি কেন ডাকিতেছেন? বিগত কল্য যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহারই বিষয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিধান করিতেছিলাম।" যে ব্যক্তি মণিলাল বাবুর সম্মুখে আসিয়া এই সকল কথা বলিলেন, তাঁহারই নাম ক্ষীরোদ। ইনি ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক। ইহারই পরামর্শে মণিলাল বাবুর জমিদারী পরিচালিত হয়। লোকের সর্ব্বনাশ কি করিয়া করিতে হয়, ক্ষীরোদ বাবু সে বিষয়ে একজন পাকা পরামর্শ-দাতা। বিগত কল্য যে ভয়ানক মারামারি হইয়া গিয়াছিল, তাহার নেতা ক্ষীরোদ বাবু। মণিলাল বাবুর বিষয়ে তাঁহার দরদ থাকুক আর নাই থাকুক, নিজে যে এই অত্যাচারের প্রশ্রয়-দাতা—পাছে দেশে ইহাই প্রকাশ হয়, এবং রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়, এই বিষয় লইয়া ঘোরতর সমালোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে মণিলাল বাবু তাঁহাকে ডাকিলেন। তাই আসিয়া প্রকৃত উত্তরই প্রদান করিলেন।

মণিলাল। আমি ত তোমাকে সেই জন্য ডাকিতেছিলাম। তা যাহ'ক এখন ভাবিয়া কি ঠিক করিলে? ঘটনা প্রমাণ হইলে, তোমাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, এবং আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিবে।

ক্ষীরোদ। আমি প্রমাণ করিব যে, ঘটনার দিন আমি কলিকাতায় ছিলাম; এবং বলিব, এই ভয়ানক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের বিষয় আমি অদ্য অবগত হইয়া ইহার রীতিমত তদন্ত করিতেছি। কে এই ঘটনার নেতা—শীঘ্রই তদন্তে প্রকাশ পাইবে।

মণিলাল। ইহা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ ভূতনাথ বাবু নাকি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছেন। তিনি কি এরূপ গুরুতর অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? ইহার উপর আবার দেশের বড় বড় লোক হরির বিধবা পত্নীর সাহায্যের জন্য ভূতনাথ বাবুর নিকট পাঠাইয়াছেন।

ক্ষীরোদ। ভূতনাথ বাবু নেহাত বোকা। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি ত এক বারেই নাই। তিনি যে হরির বিধবা পত্নীকে অর্থ-সাহায্য করিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে পরামর্শ দিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।

মণিলাল। তুমি সকলই কল্পনা-প্রসূত কথা বলিতেছ! কার্য্যে ঘটনা অন্য প্রকার হইতে পারে।

ক্ষীরোদ। যদিই ভূতনাথ বাবু তাহার সাহায্য করেন, তাঁহাকে কি এ গ্রামে মাথা লইয়া বাস করিতে দিব? প্রাণে না মারি, সমুদয় বিষয় আত্মসাৎ করিব, এবং মজিলপুর হইতে বাহির করিয়া দিব।

মণিলাল। এক অত্যাচারের ফলাফল কি হয় তা দেখ, পরে অন্য অত্যাচারের বিষয় ভাবিও। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে হইলে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া করিতে হয়।

ক্ষীরোদ। আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন যাই, সমস্ত মতলব ঠিক করিয়া রাখি। শুনিতেছি, কল্যই পুলিস তদন্ত করিতে আসিবে।

রিসড়ার উত্তর পল্লীতে হরি সর্দ্দার নামক একজন লোক বাস করিত। ইহার বয়স অনুমান বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর হইবে। হরি কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, স্থূলকায়। হরি সর্দ্দার মণিলাল বাবুর জমিদারী-ভুক্ত জনৈক প্রজা। চাষ-বাস করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। অনেক পরিশ্রম করিয়া দুই খানি লাঙ্গলের চাষ করিয়াছিল। প্রতিবর্ষেই যে জমি হরি সর্দ্দার কর্ষণ করিয়া বীজ রোপণ করিত, তাহাতেই প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিত। ইহা দেখিয়া সেই সকল জমির উপর ক্ষীরোদ বাবুর লোভ পড়ে, ও হরিসর্দ্দারকে বলিয়া পাঠান যে, বাৎসরিক ফসলের অর্দ্ধেক ক্ষীরোদ বাবুর গৃহে না পাঠাইতে পারিলে জমি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে গ্রামের বাহির করিয়া দিবেন, এবং রীতিমত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হরি সর্দ্দারের এক মাত্র স্ত্রী ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। হরি সর্দ্দার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাৎসরিক যে কয়েকটী টাকা পাইত, তাহাতে

তাহার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণোপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, গৃহের মেজেয় বা দেওয়ালে তাহা পুতিয়া রাখিত। হরিসর্দ্দারের এখনও মনে মনে কামনা ছিল যে, ভগবান তাহাকে একটী পুত্র-সন্তান দেন এবং তাহাকে লালন পালন করিয়া বিবাহ দিয়া জন্ম সার্থক করে। এই আশায় সে ধন সঞ্চয় করিত। হরিসর্দ্দার কিছু গোঁয়ার লোক। ক্ষীরোদ বাবু লোকের দ্বারা যে তাহার স্বোপার্জ্জিত ধনের ভাগ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে নানারূপ কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছিল। ক্ষীরোদবাবু দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত অপমান হইয়াছে, এবং এই অপমানের প্রতিশোধ-কল্পে তাহার প্রাণদণ্ড ভিন্ন কিছুতেই তাহার পূরণ হইতে পারে না। তিনি জমিদারের কয়েকজন লাঠিয়ালকে তলপ করিলেন, তাহারা যথা সময়ে ক্ষীরোদবাবুর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে এই আদেশ দিলেন যে, অদ্য রাত্রিতেই তাহারা যেন হরিসর্দ্দারের প্রাণ সংহার করিয়া আইসে। যে যে ব্যক্তি দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। চারিজন লাঠিয়াল এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া হরিসর্দ্দারের মুণ্ড আনয়ন করিবে প্রতিজ্ঞা করিল।

হরিসর্দ্দার ক্রোধান্বিত হইয়া নায়েব ক্ষীরোদবাবুর লোককে যে উত্তর দিয়াছিল, এতক্ষণ সে সেই বিষয় আন্দোলন করিতেছিল। মনে মনে ভাবিতেছিল, "কাজটা ভাল হয় নাই। নায়েব যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ, তাহাতে জগতে এমন কোন পাপ কার্য্য নাই, যাহা তাহার দ্বারা না হইতে পারে। এই সামান্য কারণে হয়ত আমাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। যাহা হউক, যদি কোন অমঙ্গলই ঘটে, তাহার পূর্ব্বে ভিন্নগ্রামে বন্ধু গদাই কাওড়ার বাড়ীতে পরিবারকে রাখিয়া আসাই উচিত। কি জানি, যদি তাহার উপর কোন অত্যাচার করে।" ইহাই স্থির করিয়া স্ত্রীকে সে সমস্ত কথা বলিল এবং সত্বরে উভয়েই গদাইয়ের বাড়ী গমন করিল। গদাই ভূতনাথবাবুর প্রজা এবং হরিসর্দ্দারের পরমবন্ধু, তাহাকে সকল কথা বলিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। যাহা হউক, সে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া একাকী গৃহে ফিরিয়া আসিল। পথশ্রান্তি-ক্লেশ হেতু গৃহে ফিরিয়া শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাভিভূত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—লাঠিয়ালেরা মৃদুপদ-বিক্ষেপে শাণিত কৃপাণ ও সড়্‌কি হস্তে হরিসর্দ্দারের প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত হইল। উত্তর-

পাড়ার সকলেই নিদ্রিত, মধ্যে মধ্যে শৃগাল কুক্কুরের কর্কশ ধ্বনি ব্যতীত অপর কিছুই শ্রুত হইতেছে না। প্রকৃতি ঘোর নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছে। এই গভীর নিশীথে চারিজন মৃদুস্বরে পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতেছিল।—

১ম লাঠিয়াল।—ভাই! আমি কখন হত্যা করি নাই, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। আমি এইখানে থাকি, তোরা কাজ সাবাড় ক'র্‌গে।

২য় লাঠিয়াল।—তখন কেন বলিস্‌নি, তা'হ'লে তোকে সঙ্গে নিতাম না। বাহাদুরি ক'রে তখন যে বড় আস্ফালন ক'র্‌লি, এখন পেছুলে হ'বে কেন?

৩য় লাঠিয়াল।—ঠিক্ ত, তখন ব'ল্লে তোর কথা নায়েবকে খুলে বল্‌তাম। তিনি যা ভাল মনে ক'র্‌তেন, সেইমত করা যেতো।

৪র্থ লাঠিয়াল।—নে নে, ন্যাকাম রেখে দে। এখন ধর্ম্মকথা ভুলে যা। চল্, ওঠ্, তোরা সকলে উঠানে থাক্, আমি একাই কাজ ফতে ক'রে আসি।

এই বলিয়া চতুর্থ লাঠিয়াল সঙ্গীদিগকে প্রাঙ্গনে অপেক্ষা করিতে বলিয়া একখানি কৃপাণ হস্তে ঝাঁপ কাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহ অন্ধকার, কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে; সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ লাঠিয়াল আস্তে আস্তে তাহার পার্শ্বে যাইয়া তাহার বক্ষস্থল লক্ষ্য করিল। হরিসর্দ্দার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পথিক পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যেরূপ গভীর নিদ্রা যায়, হরিসর্দ্দারও সেইরূপ প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। লাঠিয়াল এইবার কৃপাণ উত্তোলন করিয়া একবারে হরিসর্দ্দারের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিল। একবার মাত্র আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল, পরক্ষণেই সমস্ত নিস্তব্ধ।

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড শেষ করিয়া চারিজন লাঠিয়াল হরিসর্দ্দারের মুণ্ড লইয়া ত্বরিত পদে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, এবং নিমেষ মধ্যে অদূরে একটী পুষ্করিণীর সম্মুখে আসিয়া চতুর্থ ব্যক্তি গাত্র ধৌত করিয়া ক্ষীরোদবাবুর চণ্ডী-মণ্ডপে উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদবাবু তখন ভাবিতেছিলেন, কাজটা হাসিল হইল কি? লোক এখনও ফিরিল না, তবে কি কোন গোলমাল ঘটিল? না তা' হ'লে কেহ না কেহ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিত। এমন সময় সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ঘটনা বিবৃত করিল। ক্ষীরোদবাবু মুণ্ডটা কোন গোপনীয় স্থানে প্রোথিত করিতে বলিলেন। তারপর গৃহে প্রবেশ করিয়া আনন্দে সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রেমালাপ করিতে করিতে সুখে নিদ্রা গেলেন।

প্রাতঃকালে হরিসর্দ্দারের হত্যাসংবাদ গ্রামে প্রচারিত হইল। পুলিসে সংবাদ গেল। কে হত্যা করিল, কে হত্যা করিল, এই সংবাদে গ্রাম পূর্ণ হইল। বলিতে কি, গদাই ও হরিসর্দ্দারের স্ত্রীর এ দুসংবাদ শুনিতে আর বাকী রহিল না! হরিসর্দ্দারের স্ত্রী এসংবাদে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং বলিল "এ নায়েবের কাজ"। গদাই ভূতনাথবাবুকে সংবাদ দিল। এ ভীষণ হত্যা-কাণ্ডের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল। ভূতনাথবাবু এই সংবাদ পাইয়া শিহ-রিয়া উঠিলেন এবং মণিবাবু যে ইহার ভিতরে আছেন, অনুমানে তাহা স্থির করিলেন। প্রজার মধ্যে ভাল মন্দ সকল রকম লোক থাকে। বিশে-ষতঃ ক্ষীরোদবাবু ভূতনাথবাবুর অর্থলোলুপ প্রজাদিগকে অনেক অর্থ দিয়া আপনার বশে আনিয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবুর উদ্দেশ্য, ইহাদের দ্বারাই ভূতনাথবাবুর উচ্ছেদ সাধন করেন, সুতরাং অশিক্ষিত প্রজাগণ টাকার লোভে ভূতনাথবাবুর অনিষ্ট করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

যে সময়ে গদাই ভূতনাথবাবুকে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ দিল, সেই সময় কয়েকজন প্রজা ক্ষীরোদবাবুর নিকটে আসিয়া প্রকৃত ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট বিবৃত করিল। অদ্য ক্ষীরোদবাবু সেই বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মণিবাবু ডাকিয়া তাহারই সংবাদ লইতেছিলেন।

ক্ষীরোদবাবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—বিপদ কাটিয়া গেলে দেখি ভূতনাথবাবু কিরূপে মজিলপুরে বাস করে ও আপনার জমিদারী রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

এদিকে ভূতনাথবাবু গদাইকে বলিলেন "সমস্ত প্রকৃত ঘটনা পুলিসে ডায়েরী করিয়া আইস।"

ভূতনাথবাবু অমায়িক, হৃদয়বান্ ও মহৎব্যক্তি হইলেও এই ভয়ানক ঘটনায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং দেশের মঙ্গলার্থে এরূপ ঘোরতর অপরাধীর শাস্তি-বিধানকল্পে গদাইকে পুলিসের আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহাতে যে তিনি আন্তরিক বেদনা পান নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নলিনীর পরিচয়।

আমরা নলিনীর সংবাদ অনেকদিন লই নাই। বসন্তকুমারের সহিত বিবাহের পর যে কিরূপ অবস্থায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, পাঠকের তাহা জানিতে কৌতূহল হইতেছে, ভাবিয়া, এইস্থানে নলিনী-সম্বন্ধে দুই একটী কথার অবতারণা করিয়া এ অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

বসন্তকুমারের পিতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র মেকিঞ্জি লায়েল কোম্পানীর আফিসে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার সংসারে তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ ব্যতীত আরও একজন তাঁহার আত্মীয় বাস করিতেন, তিনি সুরেশবাবুর শ্যালক—নাম হারাণচন্দ্র বসু। হারাণবাবুর কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তাঁহার পিতা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু কলিকাতা-সিমলায় চারি পাঁচ খানি দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। হারাণচন্দ্র এই সকল বাটীর এখন উত্তরাধিকারী। হারাণবাবুর সংসারে এক মাত্র স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ ছিলনা। কিন্তু কালচক্রে তিনি অকালে প্রিয়-তমার বন্ধন-রজ্জু হইতে ইহকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। তাঁহার বয়স এখন ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে; তথাচ বিবাহ-কামনা একবারে পরি-ত্যাগ করিয়া আপনার একমাত্র আত্মীয় সুরেশচন্দ্র বাবুর বাটীতে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন অতিবাহিত করিবেন বলিয়া তাঁহার আশ্রিত হইয়াছেন। এখন ভাগিনেয় এবং ভাগিনেয়-বধূ তাঁহার ভালবাসার সামগ্রী,—তাঁহার সুখের হাটবাজার। তাই তাহাদের লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন। নলিনীর বিবাহের পর প্রায় আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন নলিনীর বয়স একুশ বৎসর। নলিনী এখন একজন পাকা গৃহিণী। নলি-নীর শুশ্রূঠাকুরাণী নলিনীকে আপনার কন্যা-নির্ব্বিশেষে লালন-পালন করেন। নলিনী ক্রমে ক্রমে দুইটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা মাতার ক্রোড় হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! নলিনী কন্যা-রত্ন হারাইয়া অবশ্য বড়ই শোকবিহ্বলা হইয়াছিল, কিন্তু বিধির চক্রে

ক্রমে ক্রমে সে শোক ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বের মত সুখে সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিতেছে।

নলিনীকে সকলেই ভালবাসে। নলিনী বড় শান্ত, কাহারও বাক্য অবহেলা করে না। গৃহের কাজকর্ম্মগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নরূপে নির্ব্বাহ করে। যিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সে প্রাণ দিয়া তাহা করিতে সতত যত্নবতী। ইহার উপর আবার পরোপকার করিতে পারিলে সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। পাড়ায় কাহারও অসুখ হইলে, সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেনা; তখনই গিয়া যথারীতি সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাদের যন্ত্রণার লাঘব করে। আবার সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে, আত্মীয় স্বজনের বাটীতে রন্ধনাদি কার্য্যেও ব্যাপৃতা থাকে।

এমন স্ত্রীর হাতে পড়িয়া, দুরন্ত চরিত্রহীন স্বামীও শুধরাইয়া যায়। প্রথম প্রথম বসন্ত নলিনীর উপর বিরক্ত হইত, নলিনীর সুন্দর চরিত্র-মাধুর্য্যে বসন্তের মন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল,—সে দেব-প্রকৃতি হইয়াছিল। এখন হইতে বসন্ত নলিনীর কার্য্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল।

জগতে একটী অতুলনীয় বস্তু আছে, যাহার মনোমোহকর সৌন্দর্য্যে মানুষের মনুষ্যত্ব জন্মায়, যাহার সুবিমল সৌরভে মানুষ আপনি মাতোয়ারা হইয়া অপরকে মাতায়, অপরকে আপন মনের মত করিয়া ফেলে। সে বস্তু পবিত্র চরিত্র। একমাত্র এই চরিত্র-বলে বলীয়ান হইয়া মানুষ অসম্ভব সম্ভবে পরিণত করিতে পারে; এই চরিত্র-কবচ ধারণ করিয়া অনায়াসে অত্যুচ্চ পর্ব্বত উলঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়। ইহা দ্বারা মানুষ আপনাকে জগতে শ্রেষ্ঠ জীব নামে অভিহিত করিতে সমর্থ হয়। চরিত্র-বলের নিকট সকল বল পরাস্ত। আমাদের নলিনী যে নিজ চরিত্র-বলে স্বামীর অশেষ দোষ-রাশি উৎখাত করিয়া, আপনার চরিত্র অজ্ঞাতসারে স্বামীর চরিত্রে মিশাইয়া দিয়া, একাকার করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

বসন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় মামার বাড়ীতে থাকিয়া স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া, অবশেষে পিতার সঙ্গে আফিসে যাতায়াত করিতে লাগিল। বসন্ত পরিশ্রমী, আফিসে পরিশ্রমের কাজ অতি যত্নের সহিত সমাধা করিত; সুতরাং অবিলম্বেই সাহেবের অনুগ্রহে ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতনের একটী

চাকরী হইল। বসন্ত এইরূপে মনোযোগের সহিত চাকরি করিতে লাগিল, এবং অবসর সময় নলিনীর সহিত সৎপ্রসঙ্গে সদালাপ-সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইল।

একদিন অপরাহ্নে বসন্ত একখানি আরম চেয়ারে করতল ন্যস্ত করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে, এমন সময়ে নলিনী আসিয়া সংবাদ দিল যে, সরকারদের মেয়েটীর বড় অসুখ হ'য়েছে। বলিল "বাছা কয়েকদিনের জ্বরে যেন একবারে কাঠখানা হ'য়ে গেছে। শুনিতেছি, ভাল চিকিৎসা হইতেছে না। আমার ইচ্ছা—ভাল ডাক্তার আনাইয়া মেয়েটীর চিকিৎসা করাই। তোমার অনুমতি পাইলেই আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।"

বসন্ত। নলিনী, তুমি সকল বিষয়েই আমার অনুমতির অপেক্ষা কর কেন? পরোপকার করিবে, ইহা ত আমার অনুমোদিত। ইহার জন্য আবার আমার নিকট অনুমতি লইতে হইবে!

নলিনী। স্বামীর অনুমতি ভিন্ন স্ত্রীর এক পাও চলিবার যো নাই। আমি তোমার অনুবর্ত্তিনী; তুমি যা' বলিবে, আমি তাই করিব। যা' বারণ করিবে, তা' কদাচ করিব না। আমি যে তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কাজ করিতে সাহস পাই না, তাই সকল কাজে তোমার অনুমতি চাই।

বসন্ত। আমি তোমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার মত যা'র গৃহলক্ষ্মী, তার সংসারে সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমান আনন্দ বিরাজ করিতেছে। তুমি আমার শান্তি ও আনন্দের আধাব। আশীর্ব্বাদ করি,—জন্ম জন্মান্তরে এইরূপে স্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন কর।

নলিনী। আর আশীর্ব্বাদ কর—যেন জন্মে জন্মে তোমার মত স্বামী পাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সরকারদের বাড়ীর বৌ আসিয়া নলিনীকে সংবাদ দিল যে, ছেলের অসুখ বড়ই বাড়িতেছে। আকুল ভাবে বলিল "হ্যাঁ মা! কি হবে মা!" নলিনী যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "আমরা তাহাই পরামর্শ করিতেছিলাম। ভাল ভাল ডাক্তার আনাইয়া আপনার মেয়ের চিকিৎসা করাইব। টাকার জন্য আপনাকে কোনরূপ ভাবিতে হইবে না। যত টাকা আবশ্যক হইবে, তিনি তাহা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

সরকার বৌ। ওমা, তোমরা যেই ছিলে, তাই রক্ষা! নইলে কি যে হ'ত, মা! মা, তুমি জন্ম এয়োস্ত্রী হও, তুমি রাজরাণী হও।

নলিনী। ঝি, ও ঝি! একবার শীঘ্র এস, কথা বলি শোন।

ঝি আসিলে তাহাকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিল, এবং স্বামীকে বলিল "ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সরকারদের বাটীতে এসো, আমি চলিলাম।" সরকার বৌ ও নলিনী উভয়ে চলিয়া গেল।

দুই তিন দিনের মধ্যে সরকারদের মেয়ে অনেকটা সারিয়া উঠিল, এবং সরকারেরা নলিনীকে এবং নলিনীর স্বামীকে যে কত আশীর্ব্বাদ ও ঈশ্বরের নিকট তাহাদের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

নলিনীর দিন বেশ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু এইরূপ বেশী-দিন কাটিল না। একটী দুঃসংবাদ আসায় নলিনীর অন্তরে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। নলিনী পরোপকারার্থে প্রাণ-পণ করিয়া যেমন খাটিত, এখনও সেইরূপ করিতে লাগিল; তবে চিন্তা—পিতার জন্য;—মণিলালবাবু জাল-পাট্টা তৈয়ারি করিয়া পিতার বিষয় আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছে, পিতা আদালতের আশ্রয় না লইয়া হতবুদ্ধি নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। এই দুঃসংবাদ পাইবার পর হইতে নলিনীর বুকে যেন কে পাষাণ চাপাইয়া দিয়াছে। তাই আর নলিনীর এখন তেমন চিত্ত-প্রফুল্লতা নাই—সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। নলিনী বড়দাদাকে একখানি পত্র লিখিল, এবং কিছুদিন পরে তাহার উত্তর পাইয়া জানিতে পারিল যে, জাল-পাট্টার কথা দুষ্টলোক রটনা করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মণিলাল বাবু এরূপ ঘোর অত্যাচারের কার্য্যে আপনার হস্ত কলুষিত করেন নাই। নলিনীর অন্তরের চিন্তা-মেঘ অপসারিত হইল, আবার অধরে হাসি দেখা দিল—আনন্দে আবার দিবস-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিল। সুখ দুঃখ মানবের চিরসহায়। সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ, হাসির পর কান্না এবং কান্নার পর হাসি, বিধাতার অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। এ সনাতন নিয়ম আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

সপ্তম অধ্যায়

—— *:* ——

ভুতনাথ বাবু ও নলিনীর কথোপকথন।

দেখিতে দেখিতে চারুবালা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সে এখন ভুতনাথবাবুর পরিবারের মধ্যে একজন। সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে থাকে, সকলেই চারুবালাকে বড় ভালবাসে। সতীশচন্দ্র চারুবালাকে না দেখিলে তাহার সংসারে কিছুই ভাল লাগে না! একদণ্ড সে মুখারবিন্দের মধুর হাসি দেখিতে না পাইলে, সতীশের বদন-মণ্ডল কালিমা-রেখা-অঙ্কিত করে, দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়। চারুও সতীশকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। যে অল্প সময় সে গৃহে কাটায়, সে যে কি কষ্টে থাকে তাহা বলা যায় না। কতক্ষণে সে সতীশের চাঁদমুখ দেখিবে, কতক্ষণে সে গৃহ ছাড়া হইবে, কতক্ষণে তাহার বড়মার কাছে যাইয়া গলা জড়াইয়া ধরিবে, এই চিন্তায় অস্থির। এখন উভয়ে পলকে প্রলয় দেখে। পলক-মাত্র উভয়ে উভয়কে দেখিতে না পাইলে তাহাদের হৃদয়ে প্রলয় উপস্থিত হয়।

ভুতনাথ বাবু সুশীলার প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন,—সতীশ চারুবালাকে বড় ভালবাসে, চারুবালাও সতীশকে ভালবাসে। স্বয়ংও তাহার অনেক নিদর্শন পাইয়াছেন। গৃহিণীর ইচ্ছা—সতীশের সহিত চারুবালার বিবাহ দেন। পাছে স্বামী কিছু মনে করেন, সেই ভয়ে তাঁহার নিকট মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না। একদিন কথা-প্রসঙ্গে চারুবালার কথা উঠিল—সুশীলা বলিলেন, "চারু বড় ভাল মেয়ে, রূপে গুণে অতুলনীয়। সে এক দণ্ড আমার কোলছাড়া হইলে কত মনে বেদনা পায়! সতীশকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সতীশ যে ঘরে থাকে, সে বাহির হইয়া গেলে চারু তথায় যাইয়া সতীশের বিছানা, জুতা, কাপড় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। সতীশ যে জিনিস পছন্দ করে, চারু যত্নে তাহা আনিয়া আমাকে দেয়। একদিন সে বাগান হইতে কয়েকটী ঢ্যাঁড়স তুলিয়া আনিয়া আমাকে বলিল "আজ বামুন-মাকে এই তরকারি রাঁধিতে বল ত, বড়দাদা এ বড় ভালবাসে।" আমি যখন বলিলাম "তোমার ছোট দাদা যাহা

ভালবাসে, তুমিত একদিনও তাহা বাঁধিতে দাও না;" তখন সে লজ্জায় একবারে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, আর কথা কহিতে পারিল না।

"আর একদিন সতীশের বাড়ী আসিতে বড় দেরি হইয়াছিল; বৈকালে বেড়াইতে গিয়া সে সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে প্রত্যহ ফিরিয়া আসে। যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন একটু রাত্রি হইয়াছিল। চারু আমার কাছে আসিয়া কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "বড় দাদা এখনও বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন না; মা! চাকরকে বল না, সে তাঁহাকে শীঘ্র ডাকিয়া আনে। তিনি ত রোজ সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসেন, আজ এত দেরি হইতেছে কেন!" আমি বলিলাম, "মা! কিছু ভেবনা। বোধ হয়, কোন কাজে ব্যস্ত আছে, একটু পরেই আসিবে।" চারু বলিল, "কেন লোক পাঠাইলে দোষ কি? মা! রামচরণকে পাঠাইয়া দিব?" এই সকল নিদর্শনে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, সতীশকে চারু বড় ভালবাসে। আহা! চারুর কেহ নাই; মা ভিন্ন আর আপনার লোক কেহ নাই। আমার আন্তরিক ইচ্ছা—সতীশের সহিত চারুর বিবাহ দাও। এ বিবাহে সুখের সীমা থাকবে না। যাদের বিবাহ, তাদের যখন মনোমত হইতেছে, এর চেয়ে আর সুখের বিষয় কি হ'তে পারে? আমার বোধ হয়, যদি কোন রকমে তুমি এ বিবাহে বাধা দাও, তাহা হইলে সতীশ কখনও সুখী হইবে না।"

ভূতনাথ। দেখ সুশীলা! এমন বিবাহের আমি কি অমত করিতে পারি? হ'লই বা চারু গরিবের মেয়ে, যখন তাহার সদ্বংশে জন্ম, তখন তিলমাত্র আমার আপত্তি নাই। আপত্তি থাকা দূরে থাক্, আমি বিবাহ দিয়া আন্তরিক বড়ই আনন্দিত হইব। বিশেষতঃ সতীশের বয়োবৃদ্ধি সহকারে চারুর সহিত তাহার ভালবাসা ঘনীভূত হইয়াছে।

সুশীলা। আমি শীঘ্রই সমস্ত উদ্যোগ করিব। একবার এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য ভাবি-বেহাইন ঠাকুরাণীকে ডাকিতে পাঠাই।

ভূতনাথ বাবু অন্তঃপুর হইতে চলিয়া যাইবার অনতিবিলম্বে মনোরমা আসিল। সুশীলা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন এবং বসিতে আসন দিলেন।

পাঠক! মনোরমা যে চারুর মা, তাহা আর বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

সুশীলা। আজ আপনাকে একটী শুভ সংবাদ দিব বলিয়া ডাকিয়া

পাঠাইয়াছিলাম। মনে করিতেছি, সতীশের সহিত চারুর বিবাহ দিব। আপনার ইহাতে মত আছে কি ?

মনোরমা। আপনি আমাকে ওরূপ সম্বোধন করিবেন না, 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলে, আমি ইহা অপেক্ষা আরও সুখী হইব।

সুশীলা। আচ্ছা তাই হবে। এখন তোমার মত কি ?

মনোরমা। আমার জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর শুভ সংবাদ কি হইতে পারে? আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, এমন কি মনে স্থান দিতে সাহস করি নাই, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল; এ সংবাদে আমার যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা দেখাইবার হইলে তোমাকে দেখাইতাম। আমি অনাথিনী দরিদ্রা রমণী, তোমরা আমাকে অন্নজল দিয়া না রাখিলে এত দিন কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। তোমরা আমার চারুকে রাজরাণী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, ইহা তাহার পরম সৌভাগ্য এবং পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলিতে হইবে।

বলিতে বলিতে মনোরমার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সুশীলা চারুকে ইঙ্গিত করিয়া জলখাবারের রেকাবটী মনোরমাকে দিতে বলিলেন। চারু তৎক্ষণাৎ নানা ফল, মূল ও মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ একখানি রেকাব আনিয়া তাহার মা'র সম্মুখে রাখিল।

মনোরমা মনে মনে বলিলেন "এখন হইতেই চারু আমাদের বসুদের বৌ হইয়াছে! আহা! কর্ত্তা থাকিলে এ দৃশ্য দেখিয়া তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন।" প্রকাশ্যে বলিলেন 'ও কি চারু! এত জলখাবার তোকে কে দিল? তুই খানা, মা! আমার কাছে রাখ্‌লি কেন।' চারু উত্তর করিল, 'আমায় বড় মা দিয়েছেন। ও তোমার জন্য আনিয়াছি। আমি যে এখনী অনেক জিনিস খেয়েছি, তুমি খাও।'

মনোরমা। এত খেতে পার্‌ব না, কিছু সরিয়ে রাখ।

চারুবালা। না খেতে পার, আরও খাবার লোক আছে; তুমি যা পার খাও না মা।

মনোরমা অগত্যা কিছু কিছু খাইয়া রেকাব ঠেলিয়া রাখিলেন। সুশীলা ও চারুবালা উভয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। জলখাবারের রেকাব সরাইয়া চারু তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এ দিকে ভূতনাথ বাবু পুরোহিত ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির করিতেছিলেন। দিন স্থির হইলে বাড়ীর ভিতর আসিয়া সুশীলাকে বলিলেন "আগামী ২৫শে বৈশাখ সতীশের শুভবিবাহ হইবে। বেহাইন ঠাকরুণকে বলিয়া দাও, এবং তাঁহাদের ব্যস্ত হইতে বারণ কর, আমি সমস্ত উদ্যোগ করিব।"

আজ ৫ই বৈশাখ; সুতরাং বিবাহের আর ২০ কুড়ি দিন মাত্র বাকী। মনোরমা সেদিনকার মত চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন "পরমেশ্বরের লীলা কে বুঝিতে পারে? কে মনে করিয়াছিল যে, সতীশের সহিত চারুর বিবাহ হইবে? হায়! এই সময় যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আর আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিত না।" বলিতে বলিতে মনোরমা গৃহে পৌছিলেন এবং সে রাত্রিতে তিনি সুখে নিদ্রা গেলেন। এত দিনে একটী মহা ভাবনার বোঝা তাঁহার মাথা হইতে নামিয়া গেল।

আজ ২৫শে বৈশাখ। ভূতনাথ বাবুর গৃহ আজ আনন্দ-কলরবে পরিপূর্ণ। গৃহ সুসংস্কৃত, পরিপাটীরূপে সজ্জিত। আজ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। সতীশ আনন্দে একবারে মাতোয়ারা। যে যাহা চাহিতেছে, দেশকাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া সে তাহারই মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছে।

আজ পূর্ণিমা তিথি। চন্দ্রালোকে জগৎ উদ্ভাসিত। ভূতনাথ বাবুর সৌধমালায় চন্দ্র আজ নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। শশধরের মধুরিমা আজ দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ যেন সতীশের অন্তরে সুধা ঢালিয়া দিবার জন্যই চন্দ্রের এ নূতন সজ্জা। সতীশের বিবাহ, সতীশ নানা কারুকার্য্য-খচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদে আপনাকে বিভূষিত করিয়াছে দেখিয়া, শশধরের কি হিংসা হয় না। চন্দ্র মনে করিলেন,—দেখ্ সতীশ! তুই ধার করিয়া রূপের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিস্, দেখাদেখি আমারও কি সাধ যায় না? রূপ ধার করিবার আমারও কি কেহ নাই? এই দেখ্ আমার তোর রূপ অপেক্ষা সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না?—শশাঙ্ক! বাস্তবিক তুমি, সতীশকে রূপে হারাইয়াছ। ইচ্ছা হইতেছে, আজ তোমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করি। সতীশ ও চারুবালার আমোদ আহ্লাদ কাল দেখিতে আসিব।

আজ চারুবালার কি আনন্দের দিন! আজ তাহার অনেক দিনের

সাধ মিটিল। অনেক দিনের হৃদয়ের আশা, যাহা এত দিন আকাশকুসুম বলিয়া মনে করিত, আজ তাহা পূর্ণ হইবে!

রাত্রি দশ ঘটিকা অতীত হইলে পর, আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আজ সতীশ একটী অবলা-হৃদয় চিরদিনের মত প্রেম-রজ্জুতে বন্ধন করিলেন। দুই হৃদয়-নদী একত্র মিলিত হইল।

সতীশের বিবাহে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভূতনাথ বাবুর অনেক গুলি টাকা জলের মত খরচ হইয়া গেল। এ বারও দীনদরিদ্র-ভোজনে তাঁহার প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয়িত হইল। এতদিনে সতীশ সংসারী হইল।

বিবাহের পর চারুবালা আর বাপের বাড়ী গেল না। পিতার কি গৃহ আছে যে, তথায় যাইবে? যে একটী সামান্য কুটীর ছিল, তাহাও ভগ্নপ্রায়!

ভূতনাথ বাবু মনোরমাকে আর কুটীরে থাকিতে দিলেন না। আপনার পরিবারভুক্ত করিলেন। এখন ভূতনাথ বাবুর সংসারে আর একটী লোক বাড়িল।

সতীশ ও চারু আনন্দে সংসার-যাত্রানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দে পিতামাতার আনন্দ দশগুণ বৃদ্ধি করিল।

অষ্টম অধ্যায়।

শরতের সংবাদ।

আমরা অনেক দিন শরতের খবর লই নাই। শরৎ এখন কেমন আছে, কি রূপ লেখাপড়া করিতেছে, সেই সকল বিষয় পাঠক মহোদয়-দিগকে অবগত করাইবার জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা করিলাম। শরৎ বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং অঙ্কশাস্ত্রে

এম এ, পরীক্ষা দিবার জন্য অতি যত্নের সহিত দিবা রাত্রি বিদ্যাধ্যয়নে রত।

বাল্যকাল হইতেই শরতের বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার অনুরাগ দ্বিগুণ হইয়াছে। বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের বিদ্যা সমাপন করিয়া সে বিলাত যাইবে এবং সেখান হইতে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। জ্ঞান-লিপ্সা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, শরৎ আপনার প্রতিজ্ঞা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিবে।

শরতের পাঠাগার দেখিতে অতি মনোহর। বাটীর বাহিরে অতি নির্জ্জন ভূমিখণ্ডোপরি একখানি সুন্দর বৈঠকখানা। বাহিরের কার্ণিস কারুকার্য্য-সম্বলিত অতি চমৎকার। ভিতরে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সারি সারি প্রায় ৮।৯টি গ্লাসকেস। গ্লাসকেসগুলি সুবর্ণাক্ষরাঙ্কিত পুস্তকাবলীতে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে দুইটিতে বাঙ্গালা পুস্তক এবং অবশিষ্ট গুলিতে ইংরাজী পুস্তক সুন্দর রূপে সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহের মেজে মাদুর দিয়া মোড়া। দেওয়াল নানা রঙ্গের চিত্রে চিত্রিত। তদুপরি রামমোহন, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, নগেন্দ্রনাথ এবং শিবনাথ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের ছবি বিলম্বিত।

শরৎ বন্ধু-বান্ধবের সহিত বড়-একটা মেশে না। আপনার পাঠাগারে পুস্তকপাঠে সময় অতিবাহিত করে। সমবয়স্ক কয়েকটী সহপাঠী শরতের সহিত প্রত্যহ বৈকালে দেখা করিতে আসিত। তাঁহাদের রুচি মার্জ্জিত, সুতরাং প্রত্যহই সদালাপে সময় অতিবাহিত হইত।

শরৎ সতীশের বিবাহে প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিয়াছিল। আহা! তাহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। আপন হাতে সমস্ত কাজ সম্পাদন করিয়াছিল। শরৎ চারুবালাকে বড় ভালবাসে। চারুর মধুর স্বর শুনিতে সে ভালবাসে। শরৎ যেরূপ চাহে, চারু তদনুরূপ করিতে পারে, তাই চারুর প্রতি শরতের এত স্নেহ, এত ভালবাসা। এখন চারু তাহার আপন ভ্রাতৃজায়া; সুতরাং, এখন স্নেহ ও ভালবাসার সহিত সম্মান বিজড়িত হইল। তিনের অপূর্ব্ব সম্মিলনে চারুবালা শরতের চক্ষুতে এখন দেবী। আগে চারুবালা বলিয়া কতবার সম্বোধন করিয়াছে, কতবার তাহাকে উপদেশচ্ছলে কত সুনীতি শিক্ষা দিয়াছে; এখন সে চারুর উপদেশপ্রার্থী।

চারু সম্মুখে আসিলে তাহার কথা শুনিবে বলিয়া সম্মান-সহকারে এক পার্শ্বে দাঁড়ায়। চারু তাহাতে একটু অপ্রতিভ হয়, বলে, "তোমাকে আমি ছোট দাদা বলিয়া ডাকিব। তোমার কাছে কত উপদেশ পেয়েছি, তুমি আমাকে কত আদর করেছ, আমি তোমাকে দাদা বলিব না ত কি বলিব?"

শরৎ। আপনি এখন আমার ভ্রাতৃজায়া; এখন আমারে কর্ত্তব্য, সেই-রূপ আপনাকে সম্মান করি। দাদাকে যেমন সম্মান করি, তাঁহার উপ-দেশ যেমন যত্নের সহিত শ্রবণ করি, আপনাকেও সেইরূপ সম্মান করিব, আপনার উপদেশ সেইরূপ শ্রবণ করিব।

চারু। কিন্তু আমি তোমাকে পূর্ব্বের মত দেখিব। পূর্ব্বের মত বিপদে উপদেশ লইতে যাইব, পূর্ব্বের মত তোমার নিকট বসিয়া পুস্তকের পাঠ শুনিব। যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে, দাদাকে বলিব, তখন ত তাঁর আজ্ঞা তুমি অবহেলা করিতে পারিবে না।

শরৎ। আপনি যাহা যাহা বলিতেছেন, তা সকলই করিব, কিন্তু পারিব না কেবল আপনাকে 'তুমি' সম্বোধন করিতে। ইহা ভিন্ন আর সকলই করিব।

চারুবালা। তুমি আমাকে সেইরূপ ভালবাসিবে?

শরৎ। বাসিব।

চারু। সেইরূপ স্নেহ করিবে।

শরৎ। আপনাকে সম্মান করিব এবং স্নেহ করিব।

চারু। স্নেহ সম্মান দুই একত্র কিরূপে করিবে?

শরৎ। সংসার সুখ-দুঃখ-পরিপূর্ণ। সুখের সময় মানুষের চিত্ত প্রফুল্ল থাকে। গঠিত-হৃদয় না হইলে সে সকল অবস্থায় আপনাকে সমান ভাবে রাখিতে পারে না। আমি আশা করি না যে, আপনি দুঃখে বিগলিত হই-বেন। কিন্তু যদি কখন ভুলিয়া বা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দুঃখ করেন এবং আপনার চিত্ত স্থির রাখিতে অক্ষম হন, তখন আপনার প্রতি স্নেহ করিতে আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইব। তখন স্নেহভরে সাধ্যানুসারে আপনাকে উপদেশ দিব এবং সান্ত্বনা বাক্যে আপনার বিক্ষোভিত চিত্ত শান্ত করিতে চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত সকল সময়ে বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিব।

চারু। আজ তোমার নিকট অনেক উপদেশ পাইলাম। চিরদিন তুমি আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, আমার অবলা-হৃদয়ে বলের সঞ্চার করিয়া দিও, তাহা হইলে আমি চিরসুখে থাকিব।

চারু চলিয়া গেলে শরৎ পাঠে মনোযোগ দিল। এইরূপ সদালাপে সেদিনকার দিন অতিবাহিত হইল।

শরতের বয়স অনেক হইয়াছে। এত বয়স হ'ল, শরতের বিবাহ হওয়া ত উচিত। ভূতনাথ বাবু কি সে বিষয় একবার ভাবেন না? তিনি শরতের বিবাহের প্রস্তাব অনেক বার উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বার বার শরৎ পিতার নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে আপনার অমত জ্ঞাপন করিয়াছে। শরৎ পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না, তাই শরতের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষের অধিক হইলেও ভূতনাথবাবু বিবাহের কোন উদ্যোগ করেন নাই।

পড়িয়া পড়িয়া শরতের মস্তকে রোগ জন্মিয়াছিল। কোন কোন দিন মাথার পীড়া এত বৃদ্ধি হইত যে, চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই আরোগ্য হইত না। ব্যাধির হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ঔষধ ব্যবহার করিত। নিয়মিতরূপ চিকিৎসা বা ঔষধ সেবন করিতে তাহার ইচ্ছা হইত না। মনে করিত, ব্যাধি ক্রমে আপনা হইতে সারিয়া যাইবে। আপনার ব্যাধি আপনি না বুঝিলে অন্য লোক কি করিবে? ভূতনাথ বাবু অনেক সময় শরতের রোগের জন্য চিন্তিত হই-তেন। শরৎ ব্যাধি কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দিত। শরৎ বুদ্ধিমান্ এবং বিচক্ষণ হইয়াও আপনার শারীরিক ক্লেশ ও অসচ্ছন্দতা দূর না করিয়া কেন উপায়হীন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বোধ হয়, অজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ। ক্রমে এই অজ্ঞতাতেই রোগের বৃদ্ধির সূত্রপাত হইয়া উত্তরোত্তর রোগ উৎকট আকার ধারণ করিল। ভাল ভাল চিকিৎসক আনিয়া শরতের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। ইহাতে রোগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল সত্য, কিন্তু ব্যাধি একবারে নির্ম্মূল হইল না। এইরূপ এক রকমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শারীরিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল।

শরতের মনে আর সেরূপ স্ফূর্ত্তি নাই। পাঠাগারে আর বেশীক্ষণ থাকে না। বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবন তাহার নিত্য কাজের মধ্যে হইয়াছে। প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা বাহিরে থাকিয়া ব্যাধিগ্রস্ত চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্ত করে। ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়াছে, মস্তিষ্কের ক্রিয়া একবারে বন্ধ রাখিতে হইবে, নচেৎ ব্যাধিমুক্ত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে।

শরৎ দিন দিন কৃশ হইতেছে। পূর্ব্বে সে যেরূপ স্থূলকায় ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। এখন আর তেমন পরিশ্রম করিতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম করিতে ডাক্তার বারণ করে নাই। কিন্তু এ শরীরে কে আর পরিশ্রম করিবে? ব্যায়াম—তাও বুঝি শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন পরিত্যাগ করিতে হয়!

আহা! শরতের যে অবস্থা হইয়াছে, দেখিলে রোদন সম্বরণ করা যায় না। বিধির মনে কি এই ছিল? প্রকৃতি সামঞ্জস্য চায়, অসামঞ্জস্যে অসদ্‌ভাব হইয়া থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে তাহার ফল অচিরে ভোগ করিতে হয়।

আহা! পিতা চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত। তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্ট বুঝি সহ্য করিতে হয়! একে পুত্রের এই অবস্থা, তদুপরি মণিলাল বাবুর অত্যাচার। উভয় চিন্তায় ভূতনাথ বাবুকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। বিধির বিধান অবশ্যম্ভাবী, যা ঘটিবার তা অবশ্যই ঘটিবে।

নবম অধ্যায়।

সতীশ ও চারুবালার কথোপকথন।

শরতের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা, তাহার উপর আবার শ্বশুরের মনস্তাপ; এ দৃশ্য দেখিয়া চারুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। বিবাহের পর কয়েক দিন যেমন সে আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছিল, এখন সেইরূপ শোকে মুহ্যমান। যদি জীবন দিলে শ্বশুর ও শরতের অবস্থা ফেরে, চারু তাহা এখন দিতে প্রস্তুত। সতীশও বিশেষ চিন্তিত, তাহারও হৃদয়ে কিছু সুখ নাই। তবে সে চারুর মত অত ভাবেনা। ইহাতে সতীশকে যে নিষ্ঠুর বা নির্ব্বোধ ভাবে সে অতি নির্ব্বোধ; কেননা নারী যেরূপ অপরের সুখ-দুঃখ আপনাতে মিশাইয়া দিয়া অপরের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে সক্ষম

হয়, পুরুষ তেমন পারে না। ইহা পুরুষের দোষ নহে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম; কারণ, পুরুষ ও স্ত্রীলোককে সমান করিতে গেলে অপদস্থ হইতে হয়। পুরুষের যে কাজ, নারীর তাহা নহে। কোমলাঙ্গী নারী কঠিন পরিশ্রম করিতে অক্ষম। যেখানে কবিত্ব নাই, সেখানে কোমলতা নাই—তথায় নারীরও আসন নাই।

সতীশ পুরুষ-প্রকৃতিগত স্বভাবে যাহা করিতে সক্ষম, সে তদতিরিক্ত করে না; তাই তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে তিলমাত্র অবহেলা নাই। কোথায় ভাল ডাক্তার পাইবে, কিসে পিতা ও ভ্রাতার রোগ সারিবে, তাই এখন সতীশের দিবারাত্রি চিন্তা।

এতদিন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতেছিল, কলিকাতা হইতে ভাল ভাল ডাক্তার আনাইয়া যথেষ্ট অর্থব্যয় হইতেছিল, কিন্তু রোগের কিছু-মাত্র উপশম হইতেছে না দেখিয়া সতীশ মনে করিল, একবার হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করাইয়া দেখি।

সতীশের হোমিওপ্যাথিতে আস্থা বরাবর। সে নিজে পুস্তকাদি ও ঔষধাদি রাখিয়া পাড়ার দীন-দুঃখীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিত এবং সময়ে সময়ে তাহাদের গৃহে যাইয়া রোগীর অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া আনিত। হোমিও-প্যাথিতে সতীশের একটু অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল; কিন্তু শরতের ও পিতার এই অবস্থায় আপনার হাতে চিকিৎসার ভার লইতে সাহসে কুলায় নাই। সেইজন্য মনে করিল, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার সালজার মহোদয়কে আনাইয়া তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। অবিলম্বে চিকিৎসক আসিয়া রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রোগের অনেক উপশম হইল, রোগী এক্ষণে অনেক সুস্থতা লাভ করিল। দিন দিন উভয়েই শরীরে বল পাইতেছেন। উভয়েরই পূর্ব্বাপেক্ষা আহারে রুচি হইয়াছে।

এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল। পিতা সুস্থ হইলেন। শরৎও অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। আবার একটী নূতন উপসর্গ দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে রোগী মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলিয়া ডাক্তার সাহেব পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

এই ত গেল শরতের অবস্থা। পিতা সুস্থ হইয়াছেন; কিন্তু বিষয়-পরিদর্শন একবারে বন্ধ হওয়ায় দিন দিন নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। বিশেষতঃ সতীশও সময়াভাবে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। গোমস্তা প্রভৃতি সময় বুঝিয়া জমিদারকে ফাঁকি দিতে ছাড়িতেছে না। আগে বৈষয়িক আয় ইত্যাদিতে ভূতনাথ বাবুর বাৎসরিক অনেক টাকা আদায় হইত, এখন টাকা আদায় অভাবে হউক বা গোমস্তাদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় হউক, প্রায় এক চতুর্থাংশ কমিয়া গিয়াছে। এই সকল অতৃপ্তিকর বৈষয়িক গোলযোগের নিবারকরণ করিবার সময় সতীশের একবারেই ছিল না। সুতরাং উত্তরোত্তর বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

চারু প্রাণপণে শরতের শুশ্রূষা করে। শরৎ কিসে সুখে থাকে, কিসে সুস্থ হয়, সারাদিন সেই চিন্তা করে। যে দিন মূর্চ্ছা হইত, সে দিন চারু সমস্ত রাত্রি দেবরের শুশ্রূষা করিত, কত খাটিত—আপনার সুখ দুঃখের প্রতি কত অবহেলা করিত! কিন্তু সতীশের কাছে আপনার ক্লান্তির কথা কখনও বলিত না, কখনও আপনার পরিশ্রমের কথা লইয়া তোলাপাড়া করিত না।

একদিন রাত্রিতে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "চারু তুমি বড় কষ্ট পাইতেছ নয়! তোমাকে ত দেখি সর্ব্বদাই শরতের শুশ্রূষা করিতেছ। এত পরিশ্রম কর, কৈ তোমাকে ত কখনও কাতর হইতে দেখি না। বিবাহের পরে তোমার যেরূপ চিত্ত প্রফুল্ল ছিল, এখনও ত তোমাকে সেই প্রকার দেখিতেছি। সত্য করিয়া বল, চারু তোমার কি কষ্ট হয় না!

চারু। কষ্ট আমি ত কখনও অনুভব করি নাই। যখন তোমাকে পা'বার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলাম, নিজের অবস্থার সহিত তোমার অবস্থা তুলনা করিয়া আপনাকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিতাম, তখন এক একবার কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম। যখন তোমার সহিত বিবাহ হইল, তখন মনে করিলাম, জীবনে এর চেয়ে আর সুখের বিষয় কি আছে? যাঁকে পা'বার আশা আকাশ-কুসুম ব'লে বোধ হ'ত, তাঁকে যেদিন পাইলাম, সেইদিন থেকে আমার জীবনের সুখ, দুঃখ, ক্লান্তি, কষ্ট সকলই তোমাতে মিশাইয়া ফেলিলাম। কষ্ট যে না হয়, তা নয়; যখন তোমার মুখ মলিন দেখি, যখন তোমার ঐ চাঁদ-মাখা মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়, তখন আমি কষ্ট পাই; তখন মনে করি; আমার আত্মাটা তোমাতে মিশাইয়া দিয়া আমার অস্তিত্ব লোপ করি,—কেন না কষ্ট আর সহ্য করিতে পারি না।

সতীশ। মনে করি, আমি তোমার মত হই, তোমাকে প্রাণে পূরে রাখি। তোমার সহিত তা' হলে আর বিচ্ছেদ হবে না; কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও পারি না। চারু! আমার সে ক্ষমতা নাই। আমাকে শিখাইয়া দাও, আমায় বল দাও, তোমার ক্ষমতা আমাতে সঞ্চার কর, 'আমি' 'তুমি' এক করিয়া দাও, তা'হ'লে আমি বাঁচিয়া যাই। নচেৎ তোমার সহিত আমার তুলনা ক'র্‌লে আমাকে বিশেষ মনস্তাপ পে'তে হয়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার কান্না আসে, আবার তোমাকে দেখে চিন্তা যায়,—কষ্ট যায়,—সব ভুলে যাই। তুমি চলিয়া গেলে, আবার সেই কষ্ট উপস্থিত হয়।

চারুবালা। নাথ! কেন এত আত্মনিন্দা করিতেছ? তোমার কথায় আমার মনে কষ্ট হইতেছে। স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রতি যা' কর্ত্তব্য, তা'ই তোমাকে বলিলাম, আমি বেশী কিছুই বর্ণনা করি নাই। তোমার যা' কর্ত্তব্য, তুমি তদতিরিক্ত কখনও করিতে পার না। আমি তোমার মত স্বামী পাইয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য—আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল! স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন অন্য গতি নাই। স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামীই আরাধ্য দেবতা। আমার তুমি ভিন্ন অন্যগতি নাই। তোমাকে আপনার করিতে পারিয়াছি, এরূপ আত্মশ্লাঘা করি না,—যে দিন পারিব, সেইদিন আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিব। কিন্তু নাথ! তোমার অন্যপথ,—আমা ছাড়া তোমার ভাবিবার অন্য বস্তু আছে, তাহার জন্য ব্যাকুল হও, তাহার জন্য আপনাকে প্রস্তুত কর। স্ত্রীর আরাধ্য স্বামী, স্বামীর আরাধ্য দেবতা, হৃদয় মন তাঁহাতে অর্পণ কর। তাঁহাকে হৃদয় মন অর্পণ করিলে দেখিবে, আজ যে মনের কষ্ট,—কাল আর তা থাকিবে না, কাল তোমার হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হইবে, তা পাইয়া তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হইবে। তখন আমার জন্য তোমার এত হৃদয়বেগ থাকিবে না, এত অস্থির হইবে না, এত অনুতাপ করিবে না।

সতীশ। তুমি আমাকে আজ দীক্ষা দিলে। তুমি যে পথ দেখাইয়া দিতেছ, আমি তাহারই অনুসরণ করিব; কিন্তু এক একবার আশ্চর্য্য হই, তুমি কিরূপে কাহার নিকট এরূপ শিক্ষা পাইলে!

চারু। ইহা আবার শিক্ষার বিষয় কি? স্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, ইহা সকল পুস্তকেই আছে। আমি দুই একখানি যাহা পড়িয়াছি, তাহাতেই আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। আমাকে কেহ শিখায় নাই।

সতীশ। তোমাকে পাইয়া অবধি আমার সুখের সীমা নাই। তোমাকে পাইয়া আমার পাপ-হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার সদ্‌গুণরাশি সঞ্চারিত হইয়া আমার হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হইয়া যাইবে। আমি অধম, আমি তরিয়া যাইব।

চারু। তুমি আপনার আত্মা, আপনার হৃদয় এত কলুষিত মনে করিও না। দেখিবে, এই হৃদয় দয়া, ধর্ম্ম ও বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ হইয়াছে। সংসারের বিষয়-চিন্তা আসিয়া আর অভিভূত করিতে পারিবে না, তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিবে।

সতীশ। আচ্ছা, তাঁহার প্রতি প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি, আপনা-আপনি কিরূপে হইবে? এ সকল কেহ সঞ্চার না করিলে কিরূপে হৃদয়ের নিভৃত স্থান অধিকার করিবে?

চারুবালা। মনুষ্য-হৃদয়ে এ সমস্তই নিহিত রহিয়াছে। ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারিলেই এ সকলের বিকাশ আপনা-আপনি হইতে থাকিবে। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁহার প্রতি ভক্তি কর, একমনে তাঁহাকে ডাকিতে শিখ, দেখিবে, হৃদয়ে যে সমস্ত সদ্‌গুণরাশি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া তোমাকে দেবোপম করিয়াছে। তখন এ মনস্তাপ—আমার জন্য এ অধীরতা—আমাকে হৃদয়ে বসাইতে এত আগ্রহ—সমস্তই স্তিমিত হইয়া যাইবে, দেখিবে আনন্দময়ীর আবির্ভাবে আনন্দে বিভোর হইয়াছ।

সতীশ। অদ্য বেলা হইয়াছে, বারান্তরে তোমার সহিত আবার কথোপকথন হইবে। এখন তুমি অবকাশ লইতে পার।

দশম অধ্যায়।

হরিসর্দ্দার খুন হইয়াছে, একথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছে। যেখানে সেখানে সেই একই কথা। জলের ঘাটে, মেয়ে মহলে কেবল হরিসর্দ্দারের খুন লইয়া সমালোচনা হইতেছে। কেহ বলিতেছে, ভুতনাথ বাবুই এ কাজ করিয়াছে। আবার কেহ বলিতেছে, এ কাজ ক্ষীরোদের। ক্ষীরোদের ন্যায় অত্যাচারী এ ভূভারতে নাই। এ তাহারই কাজ।

এদিকে ক্ষীরোদ ভাবনায় আকুল হইয়া একবার মণিলাল বাবুর সহিত, একবার আপনার আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে এ ঘোর বিপদ হইতে ও গুরুতর চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়! ভাবনায় তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, আর কাজ কর্ম্মের প্রতি তত আস্থা নাই; কিসে কি হইবে, ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে। এক একবার মনে করিতেছেন, 'কেন একাজ করিলাম? এমন ঘটিবে, তা জানিলে কখনই এরূপ কার্য্যে আমার হস্ত কলুষিত করিতাম না।' আবার মনে করিতেছেন, 'কেন, আমি ত স্বহস্তে কিছুই করি নাই। হত্যা করিয়াছে অপরে,—আমিই যে তাহাদিগকে হত্যা করিতে বলিয়াছি, তাহার প্রমাণ কি? যাহারা ডাকাইত,—খুনে, নিয়ত গ্রামে অত্যাচার করে, তাহাদের দ্বারাই একাজ হইয়াছে। এই প্রকার প্রমাণ করিতে পারিলে তাহারাই শাস্তি পাইবে। যদি তাই হয়, তবে আর ভাবনা করি কেন? কিন্তু ইহাতেও ত নিস্তার নাই। ভূতনাথ বিরোধী। সে যদি প্রমাণ করিতে পারে, আমিই এ হত্যাকাণ্ডের নেতা, আমিই এ গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তা হ'লে আমার নিস্তার কোথা? মণিলাল ত বলিয়াছে, অর্থ সাহায্য করিব! অর্থে কি পুলিসকে বশ করিতে পারিব না? অর্থে কি না হয়? অনেক টাকার লোভ দেখাইলে তাহারা আমার নির্দ্দোষের প্রমাণ করিয়া দিবে। আর এক উপায় আছে। ভূতনাথের সহিত আমার বিষয় লইয়া ভূতনাথের লোকের সহিত সর্ব্বদাই ঝগড়া বিবাদ হইত, ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য ভূতনাথ আমার উপর এই কলঙ্কের ভার আরোপ করিতেছে। এ মতলব ভাল। আচ্ছা মণিলালের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক। দেখি তিনি কি বলেন।

মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া ক্ষীরোদ বাবু মণিলালের গৃহে গমন করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। মণিলালের মস্তিষ্ক ঠিক্ ছিল না, তিনিও এই অত্যাচারের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। উভয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, পুলিসের কয়েকজন লোক মণিবাবু ও ক্ষীরোদ বাবুকে ডাকিতেছেন। ক্ষীরোদ বাবু সংবাদ পাইয়া চমকিত হইলেন। মণিলাল ব্যস্ত হইয়া উঠি-

লেন এবং কি করা বিধেয়, স্থির করিতে না পারিয়া, চাকরের দ্বারা পুলিসের কর্ম্মচারীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। চারিজন কনষ্টেবল ও সব্ইন্স্পেক্টর আসিয়া মণিলালের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মণিলাল সব্ইন্স্পেক্টর বাবুকে আপনার বৈঠকখানা গৃহে লইয়া গেলেন, ক্ষীরোদও তথায় গেলেন।

দারোগা। মহাশয়ের জমিদারী মধ্যে একটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে শুনিয়া থাকিবেন, তাহারই তদন্তে আমি আসিয়াছি। শুনিলাম, মহাশয় জমিদার,—আপনার দ্বারা এ খুনের অনেক কিনারা হইতে পারে।

মণিলাল। আমিও সে সংবাদ অদ্য প্রাতঃকালেই শুনিয়াছি এবং সেই বিষয় লইয়া ক্ষীরোদ বাবু ও আমি আন্দোলন করিতেছিলাম। হরিসর্দ্দার নামক আমার একজন প্রজা, রাত্রিতে খুন হইয়াছে। লাস এখনও তাহারই গৃহে। আমি লোক পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহারা লাস পাহারা দিতেছে। আপনাকে সংবাদ দিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছি, সে এখনও ফেরে নাই।

দারোগা। তাহা হইলে বোধ হয়, আমরা বাহির হইয়া আসিবার পর লোক গিয়াছে। আচ্ছা, হরি সর্দ্দারের আর কে কে গৃহে ছিল জানেন?

মণিলাল। ক্ষীরোদবাবু আমার নায়েব। তিনি আপনার প্রশ্নের সমুদয় উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন।

দারোগা। মহাশয়ের নাম কি ক্ষীরোদবাবু?

ক্ষীরোদ। আজ্ঞে হাঁ।

দারোগা। আপনি হত্যাস্থানে গিয়াছিলেন?

ক্ষীরোদ। গিয়াছিলাম।

দারোগা। গিয়া কি দেখিলেন?

ক্ষীরোদ। দেখিলাম, হরিসর্দ্দার রক্তাক্ত-কলেবরে গৃহমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহে আর কেহ নাই।

দারোগা। দেখিয়া কি করিলেন?

ক্ষীরোদ। দেখিয়াই পাড়ার কয়েকজন লোককে লাস রক্ষা করিতে বলিলাম।

দারোগা। আপনাকে এ সংবাদ প্রথমে কে দিয়াছিল?

ক্ষীরোদ। গদাই, সে ভূতনাথের প্রজা। সে কোন কর্ম্মোপলক্ষে হরি সর্দ্দারের নিকট আসিয়াছিল, আসিয়াই সে এই ব্যাপার দেখিয়া আমার নিকট ছুটিয়া আসে।

দারোগা। আপনি কি গদাইকে চিনিতেন? আর সে মণিবাবুর নিকট না আসিয়া আপনার নিকট আসিল কেন?

ক্ষীরোদ। গদাইকে চিনি, সে আমাদের জমিদারীর বাহিরে থাকিলেও যেস্থানে সে বাস করে, আমাদের জমিদারী হইতে দুইরসি তফাৎ মাত্র; সুতরাং আমি যখনই সেই অঞ্চলে যাই, তখনি গদাইয়ের সহিত দেখা হয়।

দারোগা। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সঙ্গে আসুন; হরিসর্দ্দারের বাড়ী কোথায়, সন্ধান করিয়া এবং খুনের যদি কিছু কিনারা করিয়া দিতে পারেন, আমি বড়ই বাধিত হই। ইহারই মধ্যে খবর অনেক দূর গিয়াছে।

ক্ষীরোদবাবু দারোগাকে সঙ্গে লইয়া হরি সর্দ্দারের বাড়ী গেলেন এবং দারোগা যথাযথ সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষীরোদবাবুকে অব্যাহতি দিলেন। গ্রামে ভাল মন্দ সকল রকমেরই লোক আছে। ক্ষীরোদবাবু চলিয়া গেলে, দারোগা সকলকে ডাকাইয়া, এই খুনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গদাইয়ের অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। পাড়ার জনৈক লোক দারোগাকে বলিল, "মহাশয়! গদাইকে খুঁজিতেছেন, গদাই ভূতনাথবাবুর নিকট গিয়াছে। আপনি তথায় গেলে তার দেখা পাবেন।"

দারোগা কনষ্টেবল-সমভিব্যাহারে মজিলপুর গেলেন। ভূতনাথবাবু তখনও স্নান-আহার করেন নাই। এমন সময় দারোগা সমভিব্যাহারী লোকদিগকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভূতনাথবাবুকে দেখিয়া দারোগা অভিবাদন করিলেন। ভূতনাথবাবুর সৌম্যমূর্ত্তি দারোগার অন্তরে যেন প্রতিভাত হইল। তিনি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! মণি বাবুর জমিদারীতে হরিসর্দ্দার নামক জনৈক লোক খুন হইয়াছে শুনিতেছি। খুনের সংবাদ-দাতা গদা আপনারই এইখানে আসিয়াছে। তাহাকে আপনিই আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন।"

"গদাই আমার নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছে। আপনার আহারাদির সমাপন হইলে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিব।

দারোগা। আজ্ঞে না, আমি আর আহারাদি করিব না, সামান্য জলযোগ করিয়া দিন কাটাইয়া দিব।

ভূতনাথ। কেন, আমি খবর পাইয়াই আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছি। আপনার কি ইহাতে কোন আপত্তি আছে?

দারোগা। আপনি আমার জন্য অনর্থক কষ্ট পাইবেন। মফঃস্বলে প্রায়ই আমাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয়; সুতরাং, অনাহারে থাকা একপ্রকার আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আর এখন তাদৃশ কোন ক্লেশ হয় না।

ভূতনাথ। যদি বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে, আমারই এইখানে আহারাদি করুন। রন্ধনাদি সমস্তই ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে।

দারোগা। আচ্ছা, তাহাই হইবে। আপনার বাড়ীতে আহার করিব, তাহার আর আপত্তি কি? আপনি স্বজাতি, দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্য জমিদার। ইহা ত আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

ভূতনাথ আর কথায় উত্তর না দিয়া চাকরকে গামছা, তৈল, কাপড় প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। চাকর সমুদয় উপস্থিত করিল। দারোগাবাবু স্নান করিতে গেলেন। যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেন, সেইখানে একজন বিধবা-রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে অবগাহন করিতেছে, দেখিতে পাইলেন।

দারোগাবাবু তাহার ক্রন্দনের তথ্য অবগত হইবার জন্য একজন কনষ্টেবলকে পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য যে, কনষ্টেবলেরা দারোগাবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে। দারোগার আদেশ না পাইলে তাহারা আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছে না। যে কনষ্টেবল ঐ স্ত্রীলোকটীর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল, সে পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল, এবং দারোগা বাবুকে বলিল, উহারই স্বামী হত্যা হইয়াছে; সেইজন্য সে রোদন করিতেছে। দারোগা পুনরায় ঐ স্ত্রীলোকটীকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন সে তিনটার সময় ভূতনাথ বাবুব বাড়ীতে উপস্থিত থাকে।

দারোগাবাবু স্নানান্তে ভূতনাথবাবুর গৃহে আহারাদির সমাপন করিলেন, এবং দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া তদন্তে বসিলেন। তদন্তে যাহা যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তাঁহার একরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ক্ষীরোদই এই হত্যাকাণ্ডের নেতা। তাহারই দ্বারা এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় সম্পাদিত হইয়াছে। কনষ্টেবলেরা এখনও আহার করে নাই। দারোগা বাবু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি আহারাদির সমাপন করিয়াছ? তাহারা বলিল, "হুজুর আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি, আদেশ পাইলেই আহারের বন্দোবস্ত করিব।"

দারোগা। এখনও আহার হয় নাই, আমাকে এতক্ষণ কেন বল নাই? আহারের জন্যও কি আমার হুকুম চাই?

ভূতনাথ বাবু চাকরকে সিধা আনিয়া দিতে বলিলেন। চাকর সিধা আনিয়া দিলে কনষ্টেবলেরা তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। প্রায় দুই ঘণ্টার পরে দারোগা বাবু কনষ্টেবলদের অনুসন্ধান লইলেন এবং জানিতে পারিলেন, তাহারা আহারাদি সমাপন করিয়া তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। অনতিবিলম্বে ভূতনাথ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া দারোগা বাবু স্বদলে থানায় গমন করিলেন এবং ডায়ারীর কপি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট যথা-নিয়মে প্রেরণ করিলেন।

এই ঘটনার ৫।৬ দিন পরে ইন্‌স্পেক্টর স্বয়ং এই মোকদ্দমার তদন্ত করিতে আসিলেন। প্রথমে মণি বাবুর নিকট, তৎপরে ভূতনাথ বাবুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিলেন, এবং যখন দেখিলেন, দারোগার রিপোর্টের সহিত তাঁহার তদন্ত ঐক্য হইল, তখন তিনি ক্ষীরোদ বাবুকে ধৃত করিবার আদেশ দিলেন। চারিজন কনষ্টেবল এই কার্য্যের জন্য বাহাল হইল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু থানায় ফিরিলেন, এদিকে সব্-ইন্‌স্পেক্টর ক্ষীরোদ বাবুকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

ক্ষীরোদ যে প্রকৃতির লোক, পাঠকগণ তাহা বিশেষ রূপ অবগত আছেন। তিনি যে মণিলালকে নানা কুপরামর্শ দিতেন, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। ক্ষীরোদ এখন পুলিস-সোপরদ্দ হইয়াছে; এক্ষণে কিরূপে তিনি আপনার নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবেন, তাহারই ভাবনা ভাবিতেছেন। একবার মনে করিতেছেন, মণিলালকে এ চক্রে জড়াইব; আবার মনে করিতেছেন, মণিলাল অর্থ সাহায্য করিব বলিয়াছেন, যদি তাঁহাকে এ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত করিতে যাই, অর্থের দ্বারা সাহায্য করে এমন লোক কেহ নাই। আবার মনে করিতেছেন, কেন আমারও ত অনেক টাকা আছে, সেই টাকা দ্বারা হইবে; কিন্তু আমি যাইব, মণিলাল থাকিবে, প্রাণে ইহা সহ্য হইবে না। আমার শ্যালক আছে, সেও বিচক্ষণ। সে কি আমার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিবে না? আমার জন্য না হউক, তাহার ভগিনীর খাতিরেও আমার প্রাণ রক্ষার জন্য সে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে। সেই ভাল।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দারোগার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি এ হত্যা-বিষয়ের কিছুই জানেন না। মণিলাল এ বিষয়ে কিছু জানিলেও জানিতে পারেন। ভূতনাথ বাবু আপনাকে যে সকল কথা

বলিয়াছেন, সে সমস্তই মিথ্যা। তাঁহার সহিত আমার বচসা হয়, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাকে পাকে চক্রে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত করিতেছেন। কয়েক দিন ভূতনাথ বাবুর লোক উপর্য্যুপরি বিনা-অপরাধে মণি বাবুর লোকদিগকে প্রহার করে। আমি এই সকল বিষয় লইয়া ভূতনাথ বাবুকে দুই একটী কড়া কথা বলিয়াছিলাম; সেই কারণে তিনি আমার এই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন।

দারোগা। আমি সে সমস্ত বিষয়ই অবগত আছি, আপনার পক্ষে কোন প্রমাণ পাই নাই। আপনার কথার উপর নির্ভর করিয়া, মোকদ্দমার কিনারা হইতে পারে না। আচ্ছা, আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া মণি বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইতেছি। তাঁহার নিকট যতদূর শুনিবার, শুনিয়াছি; এবং তিনি এ বিষয়ে যতদূর জানেন, বলিয়াছেন। গ্রামের লোক প্রমাণ করিতেছে, যে, মণিলালের বিন্দুমাত্র দোষ নাই। আপনি দোষী, তাহারা এই কথাই বলে।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় মণি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দারোগা বাবু তাঁহাকে পুনরপি সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বের মত উত্তর পাইলেন। আর তাঁহাকে মিছামিছি বিরক্ত ও ব্যস্ত করিতে দারোগা বাবুর ইচ্ছা হইল না। তাই মণি বাবুকে বিদায় দিলেন।

ক্ষীরোদ বাবু আর কোন কথা দারোগা বাবুকে তখন বলিলেন না। মনে করিতে লাগিলেন, এখন সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া কোন প্রয়োজন নাই, আদালতে উকিলের জেরায় যেরূপ দরকার, তৎকালোচিত উত্তর দেওয়া যাইবে। মণিলালকে কিন্তু পাক-চক্রে ফেলিতেই হইবে।

এদিকে দারোগা বাবু ক্ষীরোদ বাবুর জন্য একটী সুন্দর ঘর দেখাইয়া দিলেন, এবং সেই ঘরে তাঁহাকে আশ্রয় লইতে বলিলেন। ক্ষীরোদ বাবু ঘর দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহাকে হাজত ঘরে প্রবেশ করিতে হইতেছে। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ অরণ্যে রোদন কে শুনিবে? কর্ম্ম-ফলভোগ তাঁহার কপালে লেখা, তা' না হইলে এমন দুর্ম্মতিই বা হইবে কেন?

ক্ষীরোদ বাবু ব্যাকুল হইয়া দারোগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জামিনে কি খালাস হইতে পারি না?' দারোগা বাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, "কোন মতেই নহে।"

ক্ষীরোদ। আপনাকে খুসি করিব, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

দারোগা। কি জানেন, ক্ষীরোদ বাবু! আর যে কোন উপায় নাই। উপায় থাকিলে আপনার মত লোককে আমি এত কষ্ট দিতাম ?

ক্ষীরোদ বাবু সে দিবস রাত্রি হাজতে রহিলেন। পরদিন মোকদ্দমা রুজু হইল।

একাদশ অধ্যায়।

কলিকাতা যাইবার আয়োজন।

শরতের ব্যারাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছে, ডাক্তারেরা শরৎকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। এতদিনে চারুর মুখ শুকাইয়া আসিয়াছে।

শরতের এখন ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়, চক্ষুতে আর সে ভাল দেখিতে পায় না। কাণে শুনিতে পায় না। চারুবালা পূর্ব্বের মত শুশ্রূষা করিতেছে। এখন তাহাকে আরও অধিকক্ষণ শরতের কাছে থাকিতে হয়। সতীশের সহিত দেখা শুনা তাহার বড় অল্পই হয়।

ভূতনাথ বাবুর চিন্তা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারও শরীর দিন দিন অসুস্থ হইতেছে। তিনি সকল বিষয়েই অমনোযোগী হইয়াছেন। সতীশ বিষয়-আশয় সমস্তই দেখিতেছে; কিন্তু কিছুই আর ভাল লাগে না।

গোমস্তা নায়েব মহোদয়দিগের এখন অত্যাচার বড়ই। বিষয়ের আয় নিজেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, সতীশ বাবুর হাতে দেয়। সতীশ খাতাপত্র দেখিতে সময় পান না; শরতও পিতার চিন্তায় ব্যস্ত। সুতরাং গোমস্তা মহোদয়দিগের আর আমোদের অবধি নাই। সতীশকে এখন তাঁহার গুণধর কর্ম্মচারীদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

সতীশ যাহা কিছু পান, তাহাই লইয়া পিতা এবং ভ্রাতার সহিত কলিকাতা যাইবেন, মনস্থ করিয়াছেন। চারুও সঙ্গে যাইবে।

গোমস্তারা সংবাদ পাইয়া একবারে আনন্দে বিভোর হইয়াছে। তাহারা মনে করিল, এ ব্যাটারা সব কলিকাতায় চলিয়া গেলে, একদিন 'মন খুলে আমোদ আহ্লাদ করা যাবে। তাহাতে'যত টাকা ব্যয় হয়, সমস্তই বিষয়ের আয় হইতে খরচ করা যাবে। বিষয় ত এখন আমাদের, ভাবনা কিসের? এত বড় একটা জমীদারীর কর্ত্তা হ'য়ে একদিন আমোদ প্রমোদ যদি ক'র্‌তে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।

অদ্য কলিকাতা যাওয়া স্থির হইল। সকাল হইতে চারু সমস্ত উদ্যোগ করিতে লাগিল। গৃহস্থালী সমুদয় দ্রব্য একে একে গুছান হইল। বিছানাপত্র যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে, তৎসমস্তই শৈবালের সাহায্যে বাঁধিয়া অন্যান্য দ্রব্যের সহিত একত্র রাখিল। সতীশকে আর কিছুই দেখিতে হইল না। সতীশ চারিখানি পাল্‌কী ঠিক করিয়া রাখিল। সতীশের পোষাক ইত্যাদি চারু আগেই সব গুছাইয়া রাখিয়াছিল; কেবল হোমিওপ্যাথির চেষ্টটী ও কেতাব পত্র সতীশ গুছাইয়া লইল, এবং চারুকে বলিল, এগুলিও আমাদের সঙ্গে যাইবে। দুই তিনজন বিশ্বাসী চাকরকে সতীশ অগ্রেই বিছানাপত্র লইয়া ষ্টেসনে যাইতে বলিয়াছে, এবং ষ্টেসন মাষ্টারকে একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছে, যেন তাঁহাদের পৌছিবার অগ্রেই সে সমস্ত বুক করিয়া রাখা হয়। জিনিষ পত্র যথা-সময়ে ষ্টেসনে পৌছিল। ষ্টেসন-মাষ্টার পত্র পাইয়াই অতি যত্নের সহিত সমস্ত দ্রব্য বুঝিয়া লইয়া, দুইজন প্রহরীকে সমস্ত দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য মোতায়েন করিলেন। ষ্টেসন-মাষ্টার মনে মনে একটু আহ্লাদিত হইয়াছেন; মনে করিতেছেন, আজ একটা দাঁও পাওয়া গিয়াছে। সে দিন কোন কোন ব্যক্তির কাজে অবহেলা দেখিয়া বড় সাহেবকে যে রিপোর্ট লিখিতেছিলেন, আনন্দের হিড়িকে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। বাহিরে পাল্কী অপেক্ষা করিতেছে। একে একে সকলে পাল্কিতে উঠিলেন। শরৎ অতি ধীরে অনেক কষ্টে পাল্কিতে উঠিল। সেইটুকু যাইয়াই হাঁপাইয়া পড়িল।

পূর্ব্ব হইতে কলিকাতার বাড়ী ঠিক ছিল। হারাণ বাবুকে পত্র লিখিয়া সতীশ দুই খানি বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

মগরাহাটের ষ্টেসন-মাষ্টার মহাশয়কে সতীশ কলিকাতা যাইবার কালীন ১০৲ দশ টাকার একখানি নোট দিয়াছিল, ষ্টেসন-মাষ্টার সেই আমোদে গাড়ি দশ মিনিট দেরী করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রাত্রি ১১ টার মধ্যে সকলে কলিকাতার বাসাতে পৌছিলেন, রাত্রির মধ্যেই চারু সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল। বিছানাপত্র সমস্ত ঠিক ঠাক্, যেখানে যেটী রাখিলে ভাল দেখায়, সেই খানে সেইটী বসাইয়া দিল। সতীশকে আর কোন পরিশ্রম করিতে হইল না। বলা বাহুল্য, সুশীলা ও শৈবাল সঙ্গে আসিয়াছিল। সুশীলাকে আর কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। চারু তাঁহাকে কোন কাজ করিতে দেয় না। সুশীলার মনে শান্তি নাই, অহোরাত্র তাঁহার মনে বিভীষিকার ছায়া পড়িতেছে, তাঁহার শরীর চিন্তায় জর জর। সুশীলা অবলা, কিসে কি ভাল হয়, তিনি তাহার কিছুই বুঝিতেন না। সতীশ যাহা করিত, সুশীলার চক্ষুতে ভাল লাগিত। সুশীলার শরীর ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; এতদিন একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেন, কেবল চারু ও শৈবালের শুশ্রূষায়, তাহাদের ঐকান্তিক যত্নে, তাহাদের আশা-বাক্যে জীবন ধারণ করিতেছেন মাত্র।

সেদিনকার রাত্রি এই প্রকারে অতিবাহিত হইল। চারু একবারও চক্ষুর পাতা ফেলিল না। সুশীলাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া—স্বহস্তে ব্যজন করিয়া নিদ্রিত করিল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। চারিজন চাকর ও তিনজন চাকরাণী সঙ্গে আসিয়াছিল। এত লোক থাকিতেও চারু স্বহস্তে গৃহের কাজকর্ম্ম করিত, কেবল মধ্যে মধ্যে সাহায্য লইত। চাকর চাকরাণীর কাজকর্ম্ম চারুর আদৌ মনে ধরিত না। এখানে আসিয়াও মনে করিয়াছিল, সেইরূপ পরিশ্রম করিবে; কিন্তু শ্বশুর, দেবরের শুশ্রূষা করিয়া সংসারের সকল কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে চারু অতি অল্প সময় পাইত। পাছে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া চারু আবার ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এই ভয়ে সতীশ চারুকে বেশী পরিশ্রম করিতে দিত না।

ডাক্তার মহোদয়েরা প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত দেখিতেছেন; কিন্তু ভূতনাথ বাবু অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিলেও, শরতের ব্যাধির কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। বরঞ্চ রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় এমন হইল, বুঝি বা শরৎ ইহজন্মের মত বিদায় গ্রহণ করে। ভগবানের কৃপায় এবং ডাক্তারদিগের চিকিৎসায় সে যাত্রা রক্ষা পাইল; কিন্তু সেইদিন হইতে শরৎ আর কাহারও সহিত পূর্ব্বের মত স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারিত না। পিতা কথঞ্চিৎ সুস্থ থাকিলেও

শরতের এই অবস্থা অবলোকন করিয়া একবারে মর্ম্মাহত হইলেন। সুশীলাও একবারে শোক-বিহ্বল, কাহারও সহিত কথা কন না, নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করেন এবং ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর ছায়া হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়া সরলা সুশীলার হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং পরক্ষণেই ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠেন। আর চারু ভাবিয়া ভাবিয়া আধখানা হইয়া গিয়াছে। অমন ফুল্লারবিন্দ-বদন, একবারে ম্রিয়মান, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, কেশ তৈলশূন্য-আলুলায়িত।

সতীশের কথা শুনিবে?—সতীশ পাগল-প্রায়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সকলেই প্রায় এক-দশাগ্রস্ত। কেহ সতীশের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত নহে, অথবা তাহার তত্ত্ব লইবার এখন কেহ নাই। সে এখন অকূল পাথারে ভাসিতেছে। তাহার মস্তিষ্কের ঠিক নাই, তিনি হিতাহিতবিবেচনা-শূন্য-প্রায়। একবার ডাক্তারের নিকট, একবার পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট, কখন বিডন উদ্যানে, কখন চারুর অঙ্কে, কখন বা সৌধশিরে উন্মত্তের মত দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। জ্বালায়—অন্তরের জ্বালায় নিষ্পেষিত সতীশ চিন্তার অকূল সমুদ্রে তৃণবৎ ভাসমান! সতীশচন্দ্র দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কখন অতি বিকট চীৎকারে মেদিনী কম্পমান করিতেছে!

চারু দৌড়িয়া আইস, নহিলে সতীশকে আর পাওয়া যাইবে না। তোমার হৃদয়নিহিত স্নিগ্ধ প্রেমবারি সিঞ্চন কর, একবার অধরে অধরোষ্ঠ স্থাপন করিয়া প্রেমের উৎস প্রবাহিত কর; নহিলে নিদারুণ শোকের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণে সতীশ বিলীন হইয়া যাইবে!

সতীশ বড়ই বিহ্বল, বড়ই শোকে মুহ্যমান। এক একবার যখন হৃদয়-বেগ আর রাখিতে পারিত না, সতীশ চীৎকার করিয়া উঠিত, "চারু! চারু! কোথায় তুমি?" চারু ছুটিয়া আসিত, সতীশকে বক্ষে ধারণ করিত, অধরে অধর দিয়া হাস্যমুখে সতীশের শোক ভুলাইয়া দিত, সতীশের চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিত। সতীশ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, আবার সে দৌড়িয়া শরতের গৃহে প্রবেশ করিত।

চারু শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তায় জর্জ্জরীভূত হইলেও, হৃদয়ের অপরিসীম বল না থাকিলে, চারুকেও সতীশের দশা প্রাপ্ত হইতে হইত! তাহা হইলে ভূতনাথ বাবুর সংসারে কি ভয়ানক দশা হইত, তাহা অনুভব করিয়াও কষ্ট পাইতে হয়!

চারু মনে করিত, "আমি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছি, এ অবস্থায় শোক দুঃখ একবারে লুকাইয়া ফেলিতে হইবে, শান্ত স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে এবং সতর্কতার সহিত সব দিক দেখিতে হইবে। নহিলে হঠাৎ বিপৎপাতের সম্ভাবনা। আমি যদি এ সময়ে হৃদয়কে পাষাণ করিতে না পারি, আমি যদি স্রোতের তৃণের মত, শোক দুঃখে আপনাকে ভাসাইয়া দিই, তাহা হইলে অমঙ্গল আপনিই ডাকিয়া আনিব। অতএব চিত্ত! তুমি পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হও।" অত্যন্ত দুঃখের সময় দারুণ মনঃকষ্ট আসিলে, চারু এই বলিয়া আপনার মন বুঝাইত এবং হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ করিয়া অবাধে সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিত।

চারুর এত পরিশ্রম, এত যত্ন, এত আত্মত্যাগ, সকলই বিফল হইতে লাগিল! সে বুঝি আর শরৎকে বাঁচাইতে পারিল না! ডাক্তারেরা ঘন ঘন আসা বন্ধ করিল! এক প্রকার নিরাশার বায়ু গৃহের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে সঞ্চালিত হইল। এইবার চারু একটু বিচলিত হইল। শরৎ একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়াই পরক্ষণেই আবার মুদিত করিতেছে, তাহার একটী বারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এইরূপ অবস্থায় প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিল। রাত্রি দ্বি-প্রহর। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কেবল এক এক বার কাকের অশুভ নিনাদ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময় শরৎ মৃদু অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'মা, বাবা, দিদি, দাদা! জন্মের মত বিদায়'—শরৎ আর কথা কহিতে পারিল না! দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল! কেহ চীৎকার করে নাই, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল মাত্র; কিন্তু চারু উঠিয়া দেখিল, আর নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে না। এ কি হইল! স্বয়ং উঠিয়া চারু সতীশের মুখের কাছে হস্ত স্থাপন করিল। কিন্তু নিশ্বাসের কোন চিহ্নই পাইল না। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া এক ঘটী জল লইয়া আসিল, এবং সতীশের হাতে পায়ে ও মুখে সিঞ্চন করিয়া মূর্চ্ছা অপনোদন করিল। সতীশকে বলিল, দেখ, এখন শোক করিলে কার্য্য নষ্ট হইবে! তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র শব-সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া ফেল! শৈবাল! তুমি একবার এইখানে বসিয়া থাক, আমি মা ও বাবাকে অন্যত্র লইয়া যাই। এই বলিয়া চারু অনেক কষ্টে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিল না। এদিকে সতীশ পাড়ার কয়েকজন স্বজাতীয়ের সাহায্যে শব লইয়া চলিয়া গেল।

এত বড় ব্যাপার হইয়া গেল, কিন্তু কেহ রোদন করিল না। রোদনের ক্ষমতা থাকিলে, মেদিনী আজ জলে প্লাবিত হইত। কিন্তু হায়! ভূতনাথ বাবু ও সুশীলার হৃদয় শোকের অঙ্কুশাঘাতে এরূপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, কাঁদিবার আর শক্তি ছিল না।

যামিনী প্রভাত হইয়াছে। শরতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইয়াছে। শোকের আবেগ, উন্মত্তের অবস্থা, একটু হ্রাস হইলে পর, সুশীলা ও ভূতনাথ বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং কখন উচ্চ, কখন অনুচ্চ, এইরূপ রোদনধ্বনিতে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

প্রকৃতির কার্য্য অটুট রহিল। চন্দ্র সূর্য্য আপনার কার্য্য ভুলিল না, —ভুলিল কেবল আমাদের সতীশচন্দ্র, আর অভাগা ভূতনাথ বাবু ও সুশীলা। তুমি আমি সকলেই যাইব, কিন্তু প্রকৃতি হাস্যবদনে প্রতিনিয়ত অপ্রতিহত ভাবে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে আপনার কার্য্য সাধন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ক্ষীরোদের কারাদণ্ড।

অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও ক্ষীরোদ বাবু রক্ষা পাইলেন না। উকিল-ব্যারিষ্টার বিনিয়োগ করিবার অর্থও প্রচুর ছিল, কিন্তু দারোগা অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিলে, বিচার-কর্ত্তা ক্ষীরোদ বাবুকে তিন মাসের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন। প্রকৃত আসামী পলাতক হইয়াছিল, কাশীতে সকলেই ধরা পড়ে, বিচারে তাহাদের সাত বৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে। মণিলাল বাবুর জমিদারী আবার শান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর সে প্রকার ষড়যন্ত্র ঘটে না। ক্ষীরোদ বাবু নাই, আর জাল জুয়াচুরী করিবে কে? মণিলাল বাবু ক্ষীরোদ-বিহীন হইয়া কয়েক দিন মনঃকষ্টে ছিলেন। মনকে প্রবোধ দিয়া আবার শান্ত হইয়াছেন। তবে দেশে লোকের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নের হ্রাস হইয়াছে, সে কেবল মন্ত্রী ক্ষীরোদ বাবু নাই বলিয়া। জগতে এমন অপকর্ম্ম নাই, যাহা ক্ষীরোদ বাবু

কর্ত্তৃক সম্পাদিত না হইতে পারে। ব্যভিচার, নরহত্যা, লোকের সর্ব্বনাশ, তাঁহার অনায়াস-সাধ্য। মণিবাবুকেও এই সকল কুকর্ম্মের দীক্ষা দিতে-ছিলেন।

আহা! এমন সুহৃদ্ কাছছাড়া হইয়াছে, মণিলালের দুঃখের আর অবধি নাই। কবে ক্ষীরোদবাবু কারামুক্ত হইবেন, রোজ দিন গণণা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দুইমাস অতীত হইয়া গেল, ক্ষীরোদবাবুর কারা-মুক্তির দিন ক্রমে সন্নিকট হইল। মণিবাবু প্রত্যহই মনে করেন, একবার ক্ষীরোদ আসিলে হয়, দেখিব—ভূতনাথ কিরূপে বিষয় রক্ষা করে। আমাদের সহায় ভগবান্; নতুবা ভূতনাথ বাবুর অবস্থা ক্রমে ক্রমে কি মন্দ হয়? সাধের শরৎ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছে। নায়েব গোমস্তাগুলাও ত প্রায় হাতে আসিয়াছে। আহা! এই উপযুক্ত সময়! ক্ষীরোদ, তোমা-বিহনে অবস্থা অনুকূল হইয়াও বুঝি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়।

মণিলাল এখনও লোকের সর্ব্বনাশ করিতে শিখে নাই; নহিলে অবস্থা এত অনুকূল হইলেও কোন কাজ হাঁসিল করিতে পারিতেছেন না। ক্ষীরোদ ছাড়া হইয়া তুমি এক পাও চলিতে পার না,—ক্ষীরোদ না থাকিলে তুমি তোমা-ছাড়া হইয়া যাও। মণিলাল তোমার কষ্ট আর দেখা যায় না!—ইচ্ছা হয়, তোমাকে ক্ষীরোদের নিকট রাখিয়া আসি। কিন্তু হায়! সে স্থান তোমার নহে, তোমার জন্য স্বতন্ত্র স্থান শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে; তথায় যাইয়া আনন্দে দিন যাপন করিও!

মণিলালের গৃহে তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। মণিলাল স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রীর কথা তিনি কখনও অমান্য করেন না। স্ত্রী তাঁহার মনের মত, তাই এত আদরের সামগ্রী। ক্ষীরোদের কারাবাস-কাল হইতে মণিলালের স্ত্রী নগেন্দ্রবালা ক্ষীরোদ-বিহীনে আকুল-প্রাণ, তিনিও ক্ষীরোদের কারামুক্তির দিন গণনা করিতেছেন।

অনেক সময়ে নির্জ্জনে তিনি কত অশ্রুপাত করেন। কত শোকের উচ্ছ্বাস, কত বিরহের দীর্ঘশ্বাস, নগেন্দ্রের শয়ন কক্ষে প্রত্যহ বিলীন হয়, লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। সেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-শোধ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন এবং দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিয়া মনে করেন, ভূতনাথকে যেন সম্মুখে পাইয়া পদতলে নিষ্পে-ষিত করিতেছেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গৃহ-

প্রাঙ্গন কাঁপাইয়া ভূতনাথের প্রতি অজস্রগালি বর্ষণ করিতে থাকেন। মণিলাল একদিন সে চীৎকারে ভয় পাইয়া দৌড়িয়া উদ্বেগের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্ত্রীর সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী-মূর্ত্তি দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন, আবার পরক্ষণে মৃদু পাদসঞ্চারে নগেন্দ্রবালার নিকটবর্ত্তী হইয়া, বলিতে লাগিলেন "প্রিয়ে! এত রাগ কাহার উপর? ভূতনাথের আর বাকী কি? অমন সোণার পুত্র তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়াছে! নিজেও মৃত্যুশয্যায় শায়িত! শীঘ্রই নিষ্কণ্টক হইবে! আমাদের ভবিষ্য আকাশ ফাল্গুনী পূর্ণিমার ন্যায় পরিষ্কার!—চিন্তা কি? মনে কর না যে, ভূতনাথের সমস্ত বিষয় আমার অধিকারে।"

"দেখ, আমি তাহার ওরূপ মৃত্যুতে আহ্লাদিত নহি, তাহার মাংস শৃগাল কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করাইতে পারিলে আমার রাগ যায়। যে ক্ষীরোদ আমার আত্মীয়ের আত্মীয়, যাহার প্রতাপে রিস্‌ড়া থরহরিকম্পমান, যাহার জন্য আমরা সকলেই এ তুচ্ছ প্রাণ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারি, ভূতনাথ কি না সেই প্রিয়তম জনের সর্ব্বনাশ সাধন করিল! তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? এরূপ অপমান তুমি জমীদার হইয়া অবাধে সহ্য করিতেছ! ধিক্! তোমাকে শত ধিক্! যাও, এই মুহূর্ত্তে তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া আমাদের অপমানের প্রতিশোধ দাও।"

মণিলাল। তুমি কি ক্রোধে একবারে বুদ্ধি হারাইয়াছ? শিরশ্ছেদ কি সহজ কথা? এ কি মগের মুলুক যে, কথায় কথায় লোকের মাথা কাটা যায়? ক্ষীরোদ স্বহস্তে হত্যা করে নাই, সে-ই রাজার বিচারে রক্ষা পাইল না, তা'তে আমি যদি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করি, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে!

নগেন্দ্র। না না, আমি তোমাকে তা' বলিতেছি না, স্বহস্তে কেন, অপরের দ্বারাই করাও না। না হয় তোমাকে ছ'মাসের জন্য কারাগারে যাইতে হইবে। আবার ত ফিরিয়া আসিবে, আবার তোমার ঐ চাঁদমুখ দেখে কত আমোদ কর্‌ব। অনেক দিন কাছ ছাড়া হ'লে ভালবাসা আরও দৃঢ় হ'য়ে যা'বে।

মণিলাল। তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পরমেশ্বর ভূতনাথকে যে ভোগ ভোগাইতেছেন, সে ত রক্ষা পাইবেই না। তবে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন? তুমি স্ত্রীলোক সকল বিষয় তলাইয়া বুঝিতে পার না।

নগেন্দ্র। না, আমি কেন বুঝ্‌ব? তুমি সব বুঝ। ক্ষীরোদ বাবু না থাক্‌লে তোমার যে কি দুর্গতি হ'ত, বলা যায় না। ভাল ব'ল্লে মন্দ ধ'রে নাও—না, তোমাকে আর কোন কথা ব'লবো না।

মণিলাল। তুমি ক্ষীরোদের টান্‌টা এত টান কেন বল দেখি। কিছুই ত বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

নগেন্দ্র। নাও ঢের হ'য়েছে, ন্যাকাম রেখে দাও, নিজের কাজে মন দাওগে। তুমি কি ঠাউরেছ বল দেখি।

মণিলাল। আমি তোমাকে চিন্‌তে পাল্লুম না। তুমি যে ক্ষীরোদকে কি চোখে দেখেছ, বল্‌তে পারি না। আমার জন্য তোমার একটুকু টান নাই; সারাদিন কেবল ক্ষীরোদ ক্ষীরোদ ব'লে অজ্ঞান হও। তোমাকে চিন্‌তে পাল্লুম না।

নগেন্দ্রবালা মণিলালের কথা শুনিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং সেই রোদনস্বরে সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিল, "তুমি আমায় সকল বিষয়ে সন্দেহ কর। ক্ষীরোদ বাবু আমাদের এত আত্মীয়, প্রাণ দিয়া জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখেন, এক পয়সা কখন তছ্‌রূপ করেন না; তাই তাঁর টান এত টানি। নইলে সে আমার কে, যে, তার নাম দিন রাত না কল্লে প্রাণে বাঁচি না?"

মণিলাল জল হইয়া গেলেন। তিনি যে নগেন্দ্রবালার উপর একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে তাহা প্রশমিত হইল। নগেন্দ্রবালার অধরপ্রান্তে মণিলাল প্রেম-বিস্ফারিত-লোচনে চুম্বন করিলেন। পাখি আবার পড়িতে লাগিল।

মণিলাল চলিয়া গেলে, নগেন্দ্রবালা আপন মনে বলিতে লাগিল "আমি যে ক্ষীরোদকে প্রাণ দিয়াছি, মণিলালের সাধ্য নাই যে, তাহা জানিতে পারে। আহা! কবে আবার ক্ষীরোদ আস্‌বে? যার জন্য প্রাণ বড়ই ছট্‌ফট্‌ করে, সে এলে এবার ব'লব, আর যেন সে আমাকে এমন ক'রে কাঁদিয়ে না যায়। এবার তাকে কাছ-ছাড়া ক'রব না, কু-মতলবে যেতে দিব না। যা' ইচ্ছা করে, করবে মণিলাল। মণিলালকে দেখ্‌লে আমার হাড়-শুদ্ধ জ্ব'লে উঠে। ষড়যন্ত্র ক'রে তা'কে স্থানান্তরিত করতে হ'বে।"

এইরূপ চিন্তা স্থিরিতে করিতে নগেন্দ্রবালার মন আরও নিরয়গামী হইল। সে আবার বলিতে লাগিল 'আচ্ছা একবারে নিষ্কণ্টক হইলেই ত

ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে যে বুক্‌টা কেমন ধড়াস ধড়াস ক'রে উঠে, হাত কাঁপ্‌তে থাকে! আমার দ্বারা না হয়, ক্ষীরোদকে কাণে মন্ত্র দিয়ে, তার দ্বারা এই কাজ কর্‌ব।"

মণিলাল! তুমি যাহাকে সুহৃদ্‌ বিবেচনা কর, সেই তোমার সর্ব্বনাশের পথ অন্বেষণ করিবে। নগেন্দ্রবালা কুলটা, ক্ষীরোদচন্দ্র তাহার প্রেমে আবদ্ধ, পাপিষ্ঠ তোমাকে কলুষিত করিতেছে! তোমার সুখে দুঃখে যে বিজড়িত ছিল, যে তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারিত, ক্ষীরোদের অসৎ পরামর্শে,—কুটিল-চরিত্র, নির্ম্মম, নীচ, পশ্বাধম ক্ষীরোদের সহবাসে সে তোমাকে ভুলিয়াছে, তুমি তাহার বিষ হইয়াছ!—তোমার বক্ষঃস্থলে শাণিত কৃপাণ বসাইয়া তোমাকে আকর্ণ বিদীর্ণ করিতে পারিলে তাহার আত্মা এখন তৃপ্ত হয়!

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুনরায় ষড়যন্ত্র।

ক্ষীরোদচন্দ্র কারামুক্ত হইয়াছে। পাপের স্রোত আবার খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। আবার প্রজাপীড়ন, পরস্বাপহরণ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হইয়াছে। মণিলাল মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। আর তাঁহাকে কাজ কর্ম্ম দেখিতে হয় না, ক্ষীরোদ সমস্তই নিজে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই জমীদার, মণিলাল নাম মাত্র। মণিলাল পথে বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে, আর ক্ষীরোদকে দেখিলে ভয়ে কে কোথায় লুকাইবে, তাহাই অন্বেষণ করিয়া অস্থির হয়। ক্ষীরোদ বাহির হইলে লোকে মনে করে "এই রে ব্যাটা কার সর্ব্বনাশ কর্‌তে বাহির হ'য়েছে! এত লোককে ভগবান নেয়, এ ব্যাটাকে নেয় না! এর কুষ্ঠিতে বুঝি মৃত্যু লেখেনি।"

ক্ষীরোদের কারামুক্তিতে মণিলাল আহ্লাদে আটখানা হ'য়েছেন—নগেন্দ্রবালা আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছে—তাহার বুকের পাটা দশ হাত বাড়িয়া গিয়াছে। কখন মনে করে, এবার মণিলালের রক্তপান ক'রে ক্ষীরোদকে

রাজা ক'রবো, আর 'আনন্দে করিব পান সুধা নিরবধি।' আমরা বলি, সুধা নহে বিষ।

একদিন গভীর রাত্রিতে ক্ষীরোদ মণিলালের গৃহে প্রবেশ করিতেছে, সম্মুখে একজন চাকর নিদ্রা যাইতেছিল; দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় চক্ষু মুদিত করিয়া একপার্শ্বে পড়িয়া আছে, এমন সময় পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে ভীতিবিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিল 'কে ও'? ক্ষীরোদ থামিল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। চাকর পুনরায় আর একটু উচ্চস্বরে বলিল 'কে তুমি?' তখন ক্ষীরোদ নিকটে আসিয়া বলিল "রাম-চরণ! তুমি চুপ কর, কাহাকেও বলিও না, তোমায় পুরস্কার দিব।" রাম-চরণ দ্বিরুক্তি করিল না, আবার চক্ষু মুদিত করিল। বাটীর উত্তরে একটী সুন্দর প্রকোষ্ঠে ক্ষীরোদের বিলাস-ভবন। সেই প্রকোষ্ঠেই নগেন্দ্রবালার সহিত আমোদ আহ্লাদ চলিয়া থাকে। প্রকোষ্ঠ সুন্দররূপে সজ্জিত। পার্শ্বে বাতায়ন সন্নিকটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। ক্ষীরোদ মৃদুপদসঞ্চারে সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল, এবং তথায় নগেন্দ্রবালাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "পোড়ারমুখী একবার আস্‌লে হয়, তার তেজ আজ ভাঙ্‌ব। আমাকে আস্‌তে ব'লে অপমান করলে!" এমন সময়ে নগেন্দ্রবালা গজেন্দ্র-গমনে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। ক্ষীরোদ তাহাকে দেখিয়া একবারে জল হইয়া গেল, তাহার ক্রোধ হওয়া দূরে থাক, তাহাকে দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল—অভিমান-ভরে বলিল,—"নগেন্দ্র! আমি কতক্ষণ এসেছি, কিন্তু তোমার দেখা নাই। তোমার আর সে টান নাই।"

"তুমিও বিমুখ হ'লে, তবে আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না। আস্‌তে একটু দেরী হ'লে কি ভালবাসা কমে যায়? এই কি পুরুষের শাস্ত্রে লেখে?"

"না নগেন্দ্র, তোমার প্রতি কি বিমুখ হ'তে পারি? তুমি হৃদয়ে গাঁথা। ও ঠাট্টা কচ্ছিলুম, কিছু মনে ক'র না।"

"ভূতনাথের বিষয় কি এখনও হস্তগত হয় নি? কবে করবে? আর যে ও ভাবনা ভাব্‌তে পারি না।"

ক্ষীরোদ স্বগত বলিল, 'তোমার সাদর পীরিত কেবল বিষয় হস্তগত করবার জন্য। মণিলাল পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত না, তুমি আমার হ'য়ে সুপারিশ্‌ না ক'রলে কি বিষয়গুলা হাত কর্ত্তে পারতুম? স্বার্থসিদ্ধি হ'য়েছে, এখন মণিলালকে মারতে পারলেই পথ পরিষ্কার হ'য়ে

য়ায়।' প্রকাশ্যে বলিল, 'দেখ নগেন্দ্র! ভূতনাথের অস্তিত্ব জগৎ হ'তে লোপ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিষয় সম্পূর্ণ করায়ত্ত কর্‌ব। এখন বাড়াবাড়ি কর্‌তে গেলে, আমাদের ষড়যন্ত্র সতীশ বুঝ্‌তে পার্‌বে। তা' হ'লেই আমাদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হ'য়ে যা'বে।"

"আর একটি কথা বলিতেছিলাম। এই রাত্রিতে ভয়ে তোমার কাছে আসা কত অসমসাহসিকতার কাজ বল দেখি! প্রাণটা হাতে করিয়া আসিতে হয়! এক কাজ কর্‌লে হয় না? তা' হ'লে আর এ ভয় ভাবনা থাকে না, স্বচ্ছন্দে দিবারাত্রি তোমার ঐ চাঁদমুখ দেখ্‌ব, আর সুখে দিন কাটাব।"

"কি কাজ নগেন্দ্র!"

"মণিলালকে যমের বাড়ী পাঠান।"

ক্ষীরোদ মনে মনে বলিল "এর চেয়ে আর সুখের বিষয় কি হ'তে পারে? যা' মনে করিতেছিলাম, যা' ভাবিতেছিলাম, নগেন্দ্র তুমি তাহারই পোষকতা করিতেছ! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?" প্রকাশ্যে বলিল, "আমার দ্বারা সে কাজ হবে না। তুমি যদি সাহায্য করিতে পার, তবে আমিই সে কাজ সাধন করিতে পারি।"

"সাহায্য কি প্রকার?"

'তোমাকেও সঙ্গে থাকিতে হইবে।'

"এ কাজ একদিনে হ'বে না। নানা উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে, নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হইবে।"

এইরূপে সেদিনকার রাত্রি প্রভাত হইল। ক্ষীরোদ পরদিন মনে করিল "সমস্ত বিষয়গুলি হস্তগত করিতে হইলে জাল নথিপত্রে মণিলালের সহি লইতে হইবে। সমস্তই ত প্রস্তুত হইয়াছে, বিষয়ও এক রকম হস্তগত হইয়াছে, কেবল বাকী মণিলালের সহি ও রেজেষ্টারী।"

"এক উপায় আছে, মণিলালকে মদ ধরাইতে হইবে। কাগজ পত্র সহি করিবার সময় এখন ত ভাল করিয়া দেখে না; একটু মদ খেলে দিন দরিয়া হ'য়ে যাবে, তখন দ্বিগুণ সুবিধা হ'বে।"

ক্ষীরোদ যখন গণ্ডদেশ করতলন্যস্ত করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, মণিলাল তখন তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলেন এবং ক্ষীরোদকে এইরূপে চিন্তিত দেখিয়া তিনি বলিলেন "ক্ষীরোদ বাবু! আজ তোমাকে এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন? আজ কি শরীর অসুস্থ?"

"হাঁ, একটু অসুখ হ'য়েছে। ডাক্তার রামধন বাবুর নিকট পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম, তিনি উপদেশ দিলেন,—প্রত্যহ একটু একটু হুইস্কি (Whisky) ব্যবহার করিতে। আমার যে ব্যাধি, না কি ইহাতেই সারিয়া যাইবে। তাই মনে করিতেছি, হিন্দুর ছেলে হ'য়ে মদটা কেমন ক'রে স্পর্শ ক'রব ?"

"কেন শাস্ত্রেই আছে, ঔষধার্থে সুরাপান করিলে পাপ হয় না।"

"তা এক কাজ করা যা'ক, কলিকাতায় একজন লোক পাঠাইয়া বারটা হুইস্কি আনান যা'ক, প্রত্যহ একটু একটু ক'রে খাওয়া যাবে।"

"তাই ঠিক, আজই পাঠাও।"

* * * * *

মণিলালের গৃহে সুরাদেবী স্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন একটুর পরিবর্ত্তে অনেক খানি সুরা ক্ষীরোদ বাবু প্রত্যহ উদরস্থ করিতেছেন এবং সেই সুরা-সুন্দরীর কৃপায় নগেন্দ্রবালার সহিত আমোদ আহ্লাদটা পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মণিলাল বাবুর শরীরও দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে অসুস্থ হইয়াছে, তিনিও একটু একটু সুরা ধরিয়াছেন।

এইরূপে ক্রমে সুরার মজলিস জমিল। এইবার আনুষঙ্গিকগুলাও জুটিতে লাগিল। আমোদের উৎস পুরা মাত্রায় খুলিয়া গেল। মণিলাল ভাবিল "ক্ষীরোদের মত সুহৃদ্ জগতে আর কে আছে, যে আমাকে এত আনন্দ একাধারে দিতে পারে ?"

একদিন ক্ষীরোদ বাবু বলিলেন, "আজ একটু বেশী গোছ টানিতে হ'বে। নহিলে সুবিধা হয় না। ভূতনাথের বিষয়গুলা সমস্তই হস্তগত হ'য়েছে, আর ভাবনা কি ? রীতিমত ব্যবস্থা করিতে পারিলে বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা আয় হইতে পারে। এত বিষয় পাওয়া গেল, আর একদিন বেশী রকম আমোদ আহ্লাদ করা যা'বে না ?"

মণিলাল। তুমিই আমার পরম সুহৃদ্। নহিলে কখন কিরূপ আমোদে আমার হৃদয় নৃত্য করে, তুমি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না।"

এইরূপ কথোপকথন শেষ হইলে ষোড়শোপচারে সুরাদেবীর সেবা চলিতে লাগিল। মা যখন সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্ক অধিকার করিলেন, তখন ক্ষীরোদ বাবু জাল দলিল পত্র বাহির করিয়া, মণিলালের দ্বারা সমস্ত সহি করাইয়া লইলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র একজন পাকা জালিয়াৎ। দলিল পত্রের একর্প

নকল করিতে পারিতেন যে, দেখিলে উহা কথনই জাল বলিয়া মনে হয় না। এই প্রকারে ভূতনাথ বাবুর সমস্ত বিষয় জাল করিয়াছেন।

ক্ষীরোদ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! তুমি মিথ্যা সত্য করিতে পার, সত্য মিথ্যা করিতে পার! আপনার স্বার্থের জন্য—অপরের প্রাণ অনায়াসে লইতে পার। তোমাকে যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে! তুমি মূর্ত্তিমান পাপ। তোমাকে ভয় না করে, এমন লোক জগতে অতি অল্প। তুমি যে দিক দিয়া ভ্রমণ কর, সে দিকের অনেক লোক তোমার পাপময় নিশ্বাস প্রশ্বাসে অর্দ্ধমৃত হইয়া যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শোচনীয় অবস্থা।

শরতের মৃত্যুকাল অবধি সতীশচন্দ্র আর কাজ কর্ম্ম তেমন উৎসাহের সহিত করিতে পারে না। মজিলপুরে জমীদারীর আয় দিন দিন যেরূপ হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই যে তাহাদিগকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে, তাই ভাবিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সকল অমঙ্গলজনক ব্যাপারের প্রতীকার করিবার জন্য সতীশ এক দিনও ব্যস্ত হয় নাই।

জমিদারীর অবস্থা এই, অন্যদিকে পিতার শারীরিক অবস্থা দিন দিন এত হীন হইতেছে যে, তিনি আর বেশী দিন জীবিত থাকিবেন কি না, ঘোরতর সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই, লোকের সহিত অনেক কষ্টে দুই একটী কথা কহিতে পারেন। শরীর এত দুর্ব্বল ও দেখিতে এত কৃশ হইয়াছেন যে, তাঁহাকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না। এত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের চারুর অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার যত্ন, উৎসাহ, ঘোরতর পরিশ্রম, এ সকলের কিছুই হ্রাস হয় নাই। শ্বশুর-ঠাকুর শোকে মৃতপ্রায়, স্বামী মুহ্যমান, শাশুড়ী সুনীলা হতচেতন,

এ অবস্থায় যদি চারুও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইত, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, সংসার কি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিত? চারু মনে করে "পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই প্রাণতুল্য পরিজনের এ ঘোরতর বিষাদমূর্ত্তি অবলোকন করিতেছি! ভগবান! আমার জীবন উৎসর্গ করিলে যদি ইঁহাদের এ নিদারুণ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, আমি পূর্ণানন্দে তাহা করিতে প্রস্তুত। নাথ! কেন তুমি এ পাপিনীকে গৃহে স্থান দিয়াছিলে? এক-দিনের জন্যও তোমাদিগকে সুখী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু! তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতাম,—যে-হেতু জানি, তুমি এ ভয়ানক যন্ত্রণায় একমাত্র সহায় সম্বল; কিন্তু আমি যদি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে ইঁহাদের দশা কি হইবে? না, আমি তোমাকে প্রত্যাশা করি না। তবে কাহার কাছে যাইব? কে এমন সুহৃদ আছেন, যিনি এ নিদারুণ অব-স্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে পারেন? মা! তুমিও ত আমাকে ছেড়েছ! তুমি শরৎকে বড় ভালবাসিতে, তুমি তাহার মৃত্যু না দেখ্‌তে পেরে তাকে কোলে ক'রে এ পাপ রাজ্য থেকে লইয়া গিয়াছ! এ সময় যদি তুমি থাক্‌তে, তা' হ'লেও কতক আশ্বাস পাইতাম। না, তুমি গিয়াছ, বেশ হইয়াছে! তোমাকেও এ পাপীয়সী দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিত! তুমি যে আমার সতীশকে দেখে আনন্দ করতে, সে আনন্দের পথে আমি কণ্টক রোপণ কর্ত্তাম! তুমি সে নিদারুণ কষ্ট সহ্য কর্ত্তে না পেরে জন্মের মত আমায় ছেড়ে চলে' যেতে, সে কষ্ট এখন সহ্য কর্ত্তে পার্‌তুম না।

"না, না, আর্ না। মন! কেন তুমি এ অমূলক চিন্তাকে আশ্রয় দিতেছ? অবলা পাইয়া কি এত বাদ সাধিতে হয়? আমার অভাব কি, আমার ভাবনা কি, আমি ত রাজরাণী! আমার হৃদয়রাজ্যে সতীশচন্দ্র বিরাজ করিতেছে, আমার কিসের অভাব, আমার কিসের কষ্ট? নাথ! যখন মন চঞ্চল হ'বে, তুমি তখন আমার হৃদয়মন্দিরে আবির্ভূত হইও, তাহা হইলে আর আমার কিছুরই অভাব থাক্‌বে না। না,—নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌লে কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা করা হয়। যাই প্রাণেশ্বর যেখানে আছেন।

"নাথ! কেন তুমি এত ভাবছ, তুমি এরূপ নিশ্চিন্ত হ'লে সংসারের এ নিদারুণ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হ'বে? উঠ, চিন্তা পরিত্যাগ কর। এস দুইজনে প্রাণ-পণে পিতা মাতার শুশ্রূষায় জীবনপাত করি। যত্নে তাঁহাদের রক্ষা করিতে পারিব, প্রাণের সহিত তাঁহাদের শুশ্রূষা করিব। তাঁহাদের

মলিন বদন প্রফুল্ল করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবানের কাছে কেঁদে গিয়ে প্রাণের দুঃখ জানাইব। তিনি আমাদের প্রতি কি কৃপাদৃষ্টি করিবেন না? ভয় কি, তিনি আমাদের সহায় হইবেন, আমাদের হৃদয়ে বল দিবেন। আমরা তাঁ'র যদি প্রকৃত সন্তান হই, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি আমাদের আবদার শুনিবেন। একবার প্রাণভরে ডাক—হৃদয়ের ভিতর তাঁর আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে একবার মা ব'লে ডাকে দেখি; আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না, বিষণ্ণ বয়ান মুহূর্ত্ত মধ্যে পূর্ণানন্দে পূর্ণ হ'য়ে যা'বে।"

সতীশ। তুমি আছ তাই আছি, নহিলে আমার অস্তিত্ব এ জগৎ-সংসার হইতে কতদিন বিলুপ্ত হইত। তুমি আমাকে ভগবানে ভক্তি শিখাইয়াছ, তুমি ঐশীশক্তি প্রভাবে আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছ।

চারু। আমি ছার মনুষ্য—আমার প্রশংসা করিও না। গুণময়ী যিনি, তাঁহারই প্রশংসা কর; তাহাতে আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। ধর্ম্মকথা বারান্তরে হইবে। এক্ষণে সাংসারিক দুই একটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে। দেখ, কাল থেকে যেন বাবার ব্যায়রাম কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ডাক্তারেরা কি বলেন?

সতীশ। ডাক্তারেরা এখনও আমাকে সাহস দিতেছেন; কিন্তু শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দিন দিন যেরূপ কৃশ হইতেছেন, তাহাতে আমার ভাল বোধ হয় না। চারু! পিতাকে কেমন ক'রে বাঁচা'ব? এমন কি উপায় আছে, যাহা অবলম্বন ক'রলে তিনি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বেন?

চারু। উপায়, উপায় একমাত্র ভগবানের কৃপা। জন্ম মৃত্যুর কথা কে বলিতে পারে? জন্মিলে মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চয়। যতদিন শরীর আত্মাকে ধারণ করিতে সক্ষম হয়, ততদিন জীবিত থাকা যায়। ব্যাধি আসিয়া যখন শরীরকে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলে, সে শরীরে তখন আর আত্মা থাকিতে পারেন না, দেহান্তরে প্রবেশ করেন। কিন্তু ব্যাধির আধার আমরা, আমরাই শরীরকে নষ্ট করিয়া ফেলি, এবং অসাধ্য ব্যাধির প্রশ্রয় দিয়া অযথা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকি। নাথ! ব্যাধিগ্রস্ত শরীরও ব্যাধিশূন্য হয়—চিকিৎসার গুণে। আমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতেই তিনি ব্যাধিমুক্ত হইতে পারেন, আর অন্য উপায়—ভগবানের প্রতি নির্ভর।

সতীশ। বাবা এতক্ষণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া থাকিবেন, চল তাঁহাকে দেখিয়া আসি। মা'রও শরীর ভাল নাই, তাঁহাকে কোনও কাজ করিতে দিও না। কেবল ভাবনায় তাঁহার শরীর দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছে।

এইরূপ কথোপকথনের পর প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতেছেন, এমন সময় সুশীলার করুণক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ত্বরিতপদে উভয়ে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, পিতার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, দৃষ্টি স্থির হইয়া গিয়াছে! সতীশ এ দৃশ্য দেখিয়া একবারে মর্ম্মাহত হইলেন; চারুবালা তৎক্ষণাৎ পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল এবং সতীশকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল।

কিন্তু হায়! ডাক্তার আসিয়া আর কি করিবে? তাঁহার চক্ষু আর স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল না! ধীরে ধীরে আত্মা দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া গেল! আর সুশীলা? আহা! তিনি কি এ ভীষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পারেন? তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। ডাক্তার আসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে পারিলেন না।

চারু আর থাকিতে পারিল না, এ দৃশ্য দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় মুক্তকেশে একবার পিতার নিকট একবার মাতার ক্রোড়ে যাইয়া উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে কত অসংলগ্ন বাক্যপূর্ণ রোদন-ধ্বনিতে গৃহ কম্পমান করিল। সতীশও পাগলপ্রায়! পাড়ার কেহ গৃহে প্রবেশ করিল না।

এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে, চারু একটু প্রকৃতিস্থ হইল এবং সতীশকেও একটু সুস্থির করিয়া সৎকারের জন্য পাড়ার লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিল।

সমস্ত ফুরাইল! পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ হইল। দুইদিন অনাহারে তাহারা উভয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া মজিলপুরে আসিল!

চারু! তোমার কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নাই, তুমি কিরূপে সুখী হইবে? তোমাকে চিরদিন দুঃখের দারুণ কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে, সেইজন্য তোমার জন্ম! সহ্য করিতে পার সুখী হইবে, নচেৎ বিক্ষোভিত সমুদ্রে তৃণকণার ন্যায় ছিন্ন-হৃদয় হইয়া চিরদিন নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, জন্মের মত প্রজ্বলিত শোকাগ্নিতে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাকিবে!

এ দুঃখ-সাগরে সতীশচন্দ্র অকূল পাথার দেখিলেন। পরিজনবর্গ একে একে বিদায় গ্রহণ করিল, দগ্ধ-হৃদয় সতীশচন্দ্র সহায়-সম্বলহীন হইলেন। চারু! তুমি যদি এ অবস্থায় সতীশের একমাত্র অবলম্বন না হইতে, তাহা হইলে ঘোরতর শোকোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত সতীশচন্দ্র একবারে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভয়ানক পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না। সতীশ তোমার মুখ দেখিয়া এ নিদারুণ শোক ভুলিতেছে, তোমার শান্তিময়ী উপদেশ-বারি-সিঞ্চনে তাহার ভগ্ন হৃদয়ে একটু একটু আশার সঞ্চার হইতেছে!

প্রায় এক মাস কাল শোক দুঃখে অতিবাহিত হইল। সতীশ হৃদয়-বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া বিষয়-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়া জমিদারীর হিসাবপত্র বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে আবার এক মাস কাল পর্য্যবসিত হইল।

একদিন সতীশচন্দ্র বসিয়া বসিয়া নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন প্রজা আসিয়া বলিল "মহাশয়! বিগত মাস হইতে ক্ষীরোদ বাবু আমাদের নিকট খাজানা আদায় করিবেন। তিনি বলিলেন, আপনার সমস্ত বিষয় আপনার পিতা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন। জমিদারীর তিলমাত্র আপনার আর অধিকারে নাই। একথা কতদূর সত্য, মহাশয়ের নিকট জানিতে আসিয়াছি।"

সতীশ। বল কি? আমার পিতা বরাবর পীড়িত ছিলেন, তাঁহার এমন শক্তি ছিল না যে, তিনি উইল প্রস্তুত করেন, বিষয়-বিক্রয় ত দূরের কথা! ওঃ! বুঝিয়াছি, ইহার মধ্যে কোন গূঢ় ষড়যন্ত্র হইয়াছে। যাহা হউক, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার উত্তর আমি পরে দিব।

ইহা শুনিয়া প্রজা চলিয়া গেল। সতীশচন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া চারুবালাকে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিল এবং এতদবস্থায় কি করা বিধেয়, তদ্বিষয়ে উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

চারু। বিষয়-সম্পত্তি কাগজ-পত্র বাহির কর, দেশের পাঁচজন ভদ্র লোককে দেখাও, তাঁহারা যা' সৎপরামর্শ দেন, তাহাই কর। কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ বিধেয় নহে। বিশেষতঃ আমরা এক্ষণে সহায়হীন, এ অবস্থায় বিবাদ করিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা।

সতীশ। চারু! তোমারই পরামর্শমত কার্য্য করিব; কিন্তু যদি জাল-

পাট্টা প্রস্তুত করিয়া ক্ষীরোদ আমার বিষয় আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি করিব?

চারু। তাহা হইলেও বিবাদ নিষ্প্রয়োজন। রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে বিষয় পুনঃপ্রাপ্তির আশা হইতে পারে, কিন্তু যখন অনেক ব্যয়-সাপেক্ষ, আর তাহাতে শত্রু-সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মাত্র, তখন তাহাও নিষ্প্রয়োজন।

সতীশ। দেখ, ঐ সিন্দুকের মধ্যে আমাদের বৈষয়িক কাগজ পত্র আছে, বাহির করিতে পার?

চারু তাড়াতাড়ি উহা বাহির করিতে গেল, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহা বাহির করিতে পারিল না। সতীশচন্দ্র তখন স্বয়ং উহা অন্বেষণ করিতে লাগিল, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া চারুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চারুর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে একটুমাত্র চিন্তার রেখা পড়ে নাই, সে একটুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিল—"নাথ! কেন এত আকুল হইতেছ? আত্মীয় স্বজন সকলই ত হারাইয়াছি! বিষয় গিয়াছে বলিয়া কি এত ভাবিতে হয়?"

"না, তা' ভাবিতেছি না। ভাবিতেছি—অনন্যোপায় হইয়া কিরূপে কালাতিপাত করিব? কে এই অসহায় অসহায়ার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে?"

"কে চাহিবে, এখনও বুঝাইতে হইবে? যাঁহার সংসার, তিনিই মুখ তুলিয়া চাহিবেন—তাঁহার সংসার-ক্রীড়া-ক্ষেত্রে আমরা মৃৎপুত্তলিকা ব্যতীত অপর কিছুই নহি। তিনি যেমন রাখিবেন, তেমনই থাকিব! ভাবনা কি?"

"চারু! তাই বলিয়া এত বড় বিষয় অবাধে পরিত্যাগ করিব? পাষণ্ড ক্ষীরোদ অনায়াসে জাল করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে থাকিবে?"

"নাথ, তুমি ভুল বুঝিতেছ। সংসার ক্ষণভঙ্গুর। অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রকৃতির ধারাবাহিক নিয়ম, নিয়মের ব্যত্যয় হইতে পারে না। সুখ আমাদেরই ঘরে বাঁধা থাকিবে এমন নহে,—আর সংসারের সুখ সুখই বা বলি কেন? সংসার সুখের স্থান নয়, ইহা কর্ম্মক্ষেত্র। কার্য্যের অবসানে মানবের তিরোধান প্রকৃতির ধর্ম্ম। সুতরাং আমার আমার করিবার কিছুই নাই। চিত্ত স্থির ও ধীর রাখা মানুষের কর্ত্তব্য।

সতীশ। বুঝিলাম, কিন্তু দুষ্টের শাসন আমাদের কর্ত্তব্য; নচেৎ অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করিবে কিরূপে?"

চারু। মনুষ্য জ্ঞানী, কিন্তু আপনার কর্ম্মদোষে অজ্ঞানী। তাই যাওয়া

আসা করিতে হয়। যখন কর্ম্মফল কাটিয়া যাইবে, তখন অজ্ঞানী আবার জ্ঞানী হইবে।

সতীশচন্দ্র অন্তরে আনন্দলাভ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল "ভগবানের কৃপায় সংসারে আর আমার কিছুরই অভাব নাই। আমার মত সুখী কে আছে? চারু! তোমার মত স্ত্রী যা'র, এ সংসার তা'র আনন্দের নিকেতন, অমৃতের খনি! সে চিরদিন নিরবধি আনন্দ-সুধা পান করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করে। ধন্য ভগবন্! তুমি আমার ভাগ্যে এরূপ স্ত্রী দিয়াছিলে, তাই এখনও সংসারে আছি; নতুবা কোথায় উধাও হইয়া যাইতাম, তাহার কিছুই স্থির থাকিত না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নিদারুণ ভাবনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসার সুখ-দুঃখ-পূর্ণ। সংসার বলিতে গেলেই এমন একটী স্থান বুঝায়, যেখানে সুখ দুঃখ নিত্য ক্রীড়া করিতেছে। মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে নাই। অথবা সুখই বা বলি কেন—নিয়ত উন্নতির অবস্থা, যে অবস্থায় অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহার অস্তিত্বও চিরদিন নহে। তোমার ঐশ্বর্য্য তোমার মনে। তোমার চাকচিক্যময় সৌধশ্রেণী দেখিতে দেখিতে কুটীরে পরিণত হইবে। তোমার ঐ সোণার সংসার, তোমার ঐ নব-পরিণীতা ভার্য্যা, যাহাদের দেখিয়া তোমার হৃদয়খানা দশ হাত ফুলিয়া উঠিয়াছে, যাহাদের বিষয় নিয়ত ভাবিয়া শূন্যমার্গে কতশত সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছ, সময়ে তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তোমার অমন সুন্দর মুখশ্রী, অমন সুগোল সুঠাম অঙ্গ-সৌষ্ঠব, আর কিছুদিন পরে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইবে! সময় যাবতীয় পদার্থকে নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে। তুমি যত বড়ই হও না কেন, রাজ-রাজেশ্বর হও, বা দিল্লীশ্বর হও, সময় তোমার সমস্ত হরণ করিবে, ধূলিকণার সহিত তোমাকে সমান করিয়া দিবে।

কিন্তু আবার বলি, এমন কয়জন লোক আছে, যাহার অবস্থার ক্রমাবনতির সহিত আপনার হৃদয় মন সমান ভাবে রাখিতে পারে? যাহার হৃদয় সংসারের সামান্য ঘটনায় বিচলিত হয়, সে যে সর্ব্বস্ব হারাইলে, আপনার মন অবিচলিত রাখিবে, ইহা মনে স্থান দেওয়া যায় না। ঐশ্বর্য্য-ধনমদে মত্ত সকলেই বুঝি; কিন্তু বলি,—সহস্রের মধ্যে একজনও কি বুঝিতে পারে না যে. এ অবস্থা চিরস্থায়ী নয়—পতন অনিবার্য্য? ভাল মন্দে জগৎ পরিপূর্ণ, মন্দের অস্তিত্ব বেশী হইলেও ভালর অস্তিত্ব আছেই; সুতরাং আপনার অবস্থার আপনি সমালোচনা করিতে সক্ষম। যে বুঝে, সেই বাঁচিয়া যায়, নচেৎ অবনতির ঘোরতর বৃশ্চিক-দংশনে আপনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে

আমাদের সতীশচন্দ্র আজ ভিখারী! ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম এমন কি ভদ্রাসন পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ ক্ষীরোদ আত্মসাৎ করিয়াছে! সতীশ বিচলিত হইলেও, চারুবালার উপদেশে, গুণবতীর হৃদয়-প্রসূত সদুপদেশাবলী প্রভাবে, সতীশ গঠিত হইয়াছে। তাই সতীশ ধূলিকণায় পরিণত হইলেও হৃদয়ের বলে সকলই অবাধে সহ্য করিতেছে!

সতীশ আর মজিলপুরে নাই। দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে আদরের ভৃত্য, দাসী সকলই গিয়াছে—কেবলমাত্র শৈবাল সঙ্গী হইয়াছে। শৈবাল জন্মাবধি ভূতনাথ বাবুর আশ্রিত। সুতরাং ভূতনাথ বাবুর পরিবারই তাহার আপনার পরিবার। সে দাসীবৃত্তি করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, সমস্তই পুতু পুতু করিয়া আপনার একটী জীর্ণ সিন্দুকে রাখিয়া দিয়াছে। সতীশ ও চারু শৈবালকে বড় ভালবাসে। যখনই শৈবাল শারীরিক অসুস্থ হইত, চারু অতি যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিত এবং তাহারই যত্নে অল্প দিনের মধ্যে শৈবাল রোগমুক্ত হইত। শৈবাল বিধবা, জাতিতে কায়স্থ। ভূতনাথ বাবুই মজিলপুরে তাহার একটী বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের তিন বৎসর পরেই সে বিধবা হইল। চারু সেই অবধি তাহাকে কাছছাড়া করিত না, তাহার আত্মার তৃপ্তির জন্য কত উপদেশ দিত। সে চারুর উপদেশে সকল দুঃখ ভুলিত। হিন্দু-বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যই তাহাদের জীবনের সার। কিন্তু নানা বিপাকে, অশিক্ষিত সংসারে পড়িয়া কত শত বালবিধবা নির্ম্মল সোণার চরিত্র বিসর্জ্জন দেয়!

আমাদের শৈবালের কিন্তু সেরূপ হয় নাই। না হইবারই কথা।

চারু তাহাকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, যে উপদেশে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহার প্রভাবে সে দেবকন্যা সাবিত্রী সমান হইয়াছে।

সতীশ ও চারু তাহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করে, সুতরাং পরস্পরে কেহই কাহারও ছাড়া হইতে পারে না।

সতীশচন্দ্র যখন বাটী হইতে আসিয়া একটী সামান্য গৃহে মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় বাস করিল, তখন সতীশের কাছে দুইশত টাকা আছে মাত্র। ঐ দুইশত টাকা এবং চারুর অলঙ্কার জমিদার-পুত্রের সম্বল। যদিও দিনকতক সংসার এক রকম চলিতে লাগিল; কিন্তু অর্থ-নিঃশেষের সঙ্গে সঙ্গে সতীশ আপনার ভবিষ্যৎ অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। যখন সতীশ নির্জ্জনে আপনার নিদারুণ অবস্থার বিষয় ভাবিত, তখনই তাহার মুখ একবারে শুকাইয়া যাইত; কিন্তু তাহাকে এরূপ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে হইত না। চারুর যেন মাথার উপর টনক নড়িত, অমনি চারু কোথা হইতে আসিয়া সতীশের সম্মুখে দাঁড়াইত। সতীশের চিত্ত আবার প্রফুল্ল হইত, নিজের অবস্থা ভুলিয়া গিয়া সতীশ স্বর্গসুখ অনুভব করিত।

চারু। নাথ! কেন তোমাকে প্রত্যহই এত বিষণ্ণ দেখি? বিষণ্ণ হইবার কোন কারণ ত আমি পাই না। আমাদের অবস্থার হীন হইয়াছে বলিয়া যদি এত ভাব, তবে তোমাকে আর কত বুঝাইব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবস্থার পরিবর্ত্তন বিধির লিখন, তাহাতে তোমার আমার হাত নাই। তবে কেন মিছে দুঃখ করা। যতদিন হাত পা থাকিবে, যতদিন শরীরে বল থাকিবে, নিশ্চয় জানিও, তোমাকে তিলার্দ্ধ কষ্ট পাইতে দিব না। আর সংসারের কষ্ট আমি কষ্ট বলিয়া মনে করি না। জানি, কেবল তাঁহার বিচ্ছেদেই কষ্ট হয়, দিনান্তে তাঁহার হাসিমুখ দেখিতে না পাইলে সে দিন ভাল যায় না, সে দিন বাস্তবিকই বড় কষ্টে থাকি। ইহা ছাড়া মানুষের আর কি কষ্ট আছে, আমি বুঝিতে পারি না।

সতীশ। মনে করি আর ভাববো না, কিন্তু ভাবনা যেন আপনি আসিয়া পড়ে। তোমাকে যতদিন না হৃদয়ে রাখ্‌তে পারব, ততদিন বোধ হয় আর ভাবনা যাবে না।

চারু। ভাবনা যাবে, হৃদয়াসনে নাথকে বসাও, তাঁহাতেই আপনার অস্তিত্ব বসাইয়া দাও, ভাবনা আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে।

সতীশ। তা' পারি না; চাহি তোমাকে হৃদয়ে রাখিতে;—চাহি তোমাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে। তুমি হৃদয়ে বসিলে আমি সমস্ত ভুলিয়া যাই। তোমার আবির্ভাবে আমার হৃদয় এত শীতল হয় যে, আনন্দে আমার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহির্গত হয়,—আমি আপনাহারা হইয়া তোমাময় হইয়া যাই। এই অবস্থার অবসানে আবার দুঃখের উদয় হয়। তাই বলিতেছিলাম, চাই আমি তোমাকে—তুমি সর্ব্বক্ষণ আমাতে থাক, আমি নিশ্চিন্ত থাকিব।

চারু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার ভাবিবার অন্য বিষয় আছে;—আমার ভাবিবার বিষয় তুমি। যতক্ষণ আমাকে ভাবিবে, ততক্ষণ ক্ষণ-স্থায়ী সুখ থাকিবে; কিন্তু আমা-ছাড়া হ'য়ে মন যখন ভগবানে বসিবে, তখন আর, একবার শোক একবার আনন্দ ভোগ করিতে হইবে না,—নিরবচ্ছিন্ন সুখ-পয়োধি মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয় ডুবাইয়া আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে। আর এ সংসারের ক্ষুদ্র ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সংসারের এই ক্ষুদ্র ভাবনাগুলা আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দাও, তোমাকে তা' হ'লে দুই ভাবনায় আর হাবুডুবু খেতে হ'বে না। একটা ভাবনার ভার আমি নিলে, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে সার ভাবনা ভাব্‌তে পারবে। এখন বলি শোন, আজ থেকে আমি তোমার ভাবনা কেড়ে নিলাম, আজ থেকে তোমার এতে তিলার্দ্ধ দাবী দাওয়া থাকবে না—সম্পূর্ণরূপে আমি এখন এ বিষয়ের একমাত্র অধিকারিণী হইলাম।

সতীশ। তা'ই হ'ল, তোমাকেই দিলাম; কিন্তু অমন কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগ্‌লে আমার অঙ্গে ঘা লাগে।

চারু। আবার ভাবনা? বলিতেছ, ভাবনা তোমাকে দিলাম। যখন তোমার স্বত্ব তাহাতে কিছুমাত্র আর রহিল না, তখন সেধে ঘা খেলে চল্‌বে কেন? আহা দুঃখ হবে বৈ কি! লাক টাকার ভাবনা-খানা এত দিনের পর বিনা-পণে বিকিয়ে গেল!!

সতীশ। সব পারি, ভাবনা ছাড়িতে পারি, ভগবানকে হৃদয়ে বসাইতে পারি, কিন্তু তোমা-ছাড়া হইতে পারি না। হৃদয়ে জায়গা করবো, প্রশস্ত আসন পেতে দেবো, উভয়ে একত্র বস্‌বে। তা' যদি না পার, তবে এত-পরিশ্রম ক'রে যে স্থান প্রস্তুত কল্লাম, একবার সংসারের ঢেউ লাগিলেই সব ভেঙ্গে চুরে যাবে।

চারু। আমি এমন কি সৌভাগ্য ক'রে এসেছি যে, স্বামীর হৃদয়ে স্থান পাব? যদি তোমার পুণ্যবলে তাই হয়, এর চেয়ে জগতে আর কি সুখের বিষয় হ'তে পারে?

সতীশচন্দ্র আজ আনন্দে বিভোর হইয়াছে। নীচ ভাবনা নিষ্কাশিত করিয়া দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে। হৃদয়েই স্বর্গ, হৃদয়েই নরক। দুনিয়ার ময়লা আবর্জ্জনা হৃদয়ে স্থান দিলে হৃদয় নিরয়গামী হয়; তাই হৃদয় নরকাগ্নিতে নিয়ত প্রজ্বলিত হইতে থাকে। আবার এই সকল অপ্রীতিকর অসার আবর্জ্জনা বিদূরিত করিলে দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, কোন স্থান শূন্য থাকে না, কোন না কোন পদার্থ শূন্যস্থান অধিকার করিয়া লয়। যেন চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণ।

দিনে দিনে সতীশচন্দ্র অতি দীন অবস্থায় পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু হৃদয়ের বলে, চারু-মুখ-কৌমুদীর স্নিগ্ধ সুধা বিকীরণে সতীশচন্দ্র সদা আনন্দে পূর্ণ।

চারুর হাতে এক কপর্দ্দকও রহিল না। তবে এখনও উপায় আছে— নিজের অঙ্গাভরণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই অলঙ্কারগুলি বিক্রীত হইতে লাগিল। ইহাতে চারুর দুঃখের পরিবর্ত্তে বরং আনন্দ হইল। কারণ চারু ভাবিত,—"অলঙ্কার অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। এগুলা গেলে আমি বাঁচি,— ভাবনা-শূন্য হইয়া স্বামী-সেবা করিতে পারি।"

একদিন রাত্রিতে সতীশচন্দ্র আহারাদি সমাপ্ত করিয়া গৃহে বসিয়া আছে, এমন সময় চারু সংসারের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সতীশ বলিল "চারু! আজ তোমার এত দেরি হইল কেন। তুমি ত প্রত্যহ আরও সকালে আইস, আজ এত দেরি কেন?"

চারু। আজি একটী বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ঘোষেদের বউয়ের বড় অসুখ, তাই একবার তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ীতে বৃদ্ধা শাশুড়ী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। কর্ত্তা কয়েকদিন হইল, কলিকাতায় গিয়াছেন। ছেলেদের ভাত জল দেয়, এমন কেহ ছিল না। তাই তাদের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এলুম। এই জন্য দেরি হ'য়েছে।

সতীশ। শুনে বড় সুখী হ'লেম। চারু! পরোপকারের ন্যায় আর ধর্ম্ম নাই। প্রাণ দিয়া পরের উপকার করিতে পারিলে, অনন্ত সুখের

অধিকারী হওয়া যায়। আহা! শুনেছি, তাহাদের সংসারে বড় কষ্ট। ইচ্ছা হয়, কিছু কিছু সাহায্য করি; কিন্তু কিছুই সঙ্গতি নাই।

চারু। কেন, সঙ্গতি নাই কিসে? আমার এখনও যে দুই একখানি গহনা রহিয়াছে, তাহাই বিক্রয় করিয়া ঘোষেদের সময়ে সময়ে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করিব। আমার হাতে দশ টাকা ছিল, সমস্ত দিয়া আসিয়াছি। আবশ্যক হইলে আরও দিব, বলিয়া আসিয়াছি।

সতীশ। চারু! তোমার হাতে ত কিছুই ছিল না! তবে কি ঐ টাকা তোমার পূর্ব্ব-সঞ্চিত?

চারু। কেন, আমার গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহাতে দুই মাস সংসার চলিয়াছে, বাকী দশ টাকা অপরের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি।

সতীশ। হা অদৃষ্ট!

চারু। আবার ভাবনা! তুমি সমস্ত ভাবনা আমাকে বিক্রয় করিয়াছ। তাহাতে ত তোমার তিলার্দ্ধ অধিকার নাই! তবে কেন এ উচ্ছ্বাস?

সতীশের মন উঠিল না। সতীশ মনে করিল, "চারু ভুল বুঝিতেছে। গহনার ভরসা কত দিন! যখন সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যাইবে, টাকা কোথা হইতে আসিবে? হ'তেও পারে, চারু কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি এইরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? তাহা কখনই হইতে পারে না।" প্রকাশ্যে বলিল "চারু! ভাবনা পরিত্যাগ করিয়াছি সত্য, কিন্তু গহনা বিক্রয় করিয়া চিরজীবন ত চলিতে পারে না; একদিন না একদিন সমস্তই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন কি করিবে?"

চারু। আমি ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কোন কাজ করি না। ভবিষ্যতের উপায় করিয়াছি।

সতীশ। আমি ত খুঁজিয়া পাই না। শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে।

চারু। কেন, আমি শিল্প-কাজ জানি। ভাল ভাল রেশমী কাপড়ে ফুল তুলিয়া দিব। ঘোষেদের কর্ত্তা বলিয়াছেন, তিনি সেইগুলি কলিকাতার কোন দোকানদারকে বিক্রয়ার্থ পাঠাইবেন। অনেক দোকানদারের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে। এইরূপে বিক্রয়লব্ধ টাকার দ্বারা

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। আরও এক উপায় আছে। ঘোষেদের বাহিরবাটীতে একটী মেয়েস্কুল স্থাপনা করিব। এ পাড়ায় অনেকগুলি মেয়ে আছে। প্রত্যেকে যদি চারি আনা হিসাবে প্রতি মাসে দেয়, তাহা হইলে মাসিক আমাদের ৭।৮ টাকা হইবে। এই আট টাকা ও শিল্প-কার্য্যের দরুণও ১০।১২ টাকা পাইব। ১৮।১৯ টাকায় আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে।

সতীশ। তুমি পরিশ্রম করিয়া আমাদের অন্ন-সংস্থান করিবে, আর আমি পুরুষ হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিব?

চারু। ইচ্ছা করিলে চাকরীর চেষ্টা করিতে পার। কিন্তু পরিশ্রম করিলে পাছে তোমার শরীর অসুস্থ হয়, সেই ভয়ে তোমাকে গৃহছাড়া করিতে চাহি না। আর এক কথা। তোমাকে দেখ্‌লে আমি ভাল থাকি—আমার সাহস দ্বিগুণ বাড়ে—সকল কাজ মনোযোগের সহিত করিতে পারি—পরিশ্রম করিতে কষ্ট হয় না। তুমি কাজ কর্ম্মের জন্য বাহির হইলে, পাছে উৎসাহ-ভঙ্গ হই, সেই ভাবনা।

সতীশ। কেন, তুমি ত গৃহে একলা থাক্‌বে না? শৈবাল তোমার আদরের সামগ্রী—সে ত তোমার কাছেই থাকিবে। তাহা হইলে ভয়ের কারণ কি?

চারু। আমি ত ভয়ের কথার উল্লেখ করি নাই। তোমাকে পাইলে—তোমাকে সম্মুখে দেখিলে, আমি হাতে স্বর্গ পাই। তোমার মুখখানি না দেখ্‌তে পেলে, আমার হৃদয়খানা একবারে অন্ধকারে ডুবে যায়। তাই তোমাছাড়া হ'লে এত কষ্ট পাব।

সতীশ। কাগজে দেখিলাম, শ্রীরামপুরে কাগজের কলে একটী ৩০৲ টাকা বেতনের চাকরী খালি আছে। কাল একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব। যদি সুবিধা হয়, সেইখানেই চাকরী করিব। ইহাতে তোমার মত কি?

চারু। বাড়ী থেকে যাওয়া আসা হ'বে ত? তা' যদি হয়, আমার কোন আপত্তি নাই। তবে যদি তোমাকে বেশী পরিশ্রম করিতে হয়, চাকরীর কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক।

সতীশ। আচ্ছা, তোমারই প্রস্তাবমত কার্য্য করিব। কিন্তু একটী কথা বলিতেছিলাম। যদি আমাদের উপায় মাসিক ৪০।৫০ টাকা হয়, তাহা

হইলে আমাদের সংসার ত বেশ সচ্ছল হইবে। তবে কেন বাকী গহনা গুলো বিক্রয় করিবে?

চারু। এই কথা! গহনা আমি দেখিতে পারি না। ও গুলো যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল। ও গুলো অহঙ্কার বৃদ্ধি করায়, আর চোরের উপদ্রব বাড়ায়। সুতরাং গহনাগুলা যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল।

পর দিবস সতীশ শ্রীরামপুর যাত্রা করিল। রিষড়া হইতে শ্রীরামপুর অর্দ্ধ ক্রোশের কিঞ্চিদধিক। সেখানে গিয়া সতীশ বড় সাহেবের সহিত দেখা করিল, এবং বলিল, "কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমি চাকরীর জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। তবে কখনও কোন আফিসে কাজ কর্ম্ম করি নাই।"

"আচ্ছা, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দেও। তুমি যে কাজের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলে, তাহার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। পনর টাকা বেতনে একটী চাকরী খালি আছে, আমরা তোমাকে তাহাই দিতে পারি। কিরূপ কাজ কর, দেখিয়া তোমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারি।"

"আমি স্বীকৃত হইলাম। কবে আসিব? কোন্ সময়ে আসিতে হইবে?"

"প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময়। ৫টার সময় অবসর পাইবে। স্বীকৃত আছ?"

"আছি।"

"কাল হইতে ঠিক সময়ে প্রত্যহ আসিও। কামাই করিলে, আমরা নাম কাটিয়া দিব।"

"কোন ক্রটী হইবে না।"

এই কথা বলিয়া সতীশ বাটী প্রত্যাগমন করিল। চারু উৎসুক হৃদয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "কার্য্য সফল হইয়াছে ত?"

"হইয়াছে। কিন্তু বেতন ১৫৲ টাকা। আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছি।"

"এত অল্প বেতনে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম! আমার তৃপ্তি হইল না।"

"অলস হইয়া বাড়ী বসিয়া থাকিলে বাতে ধরিবে। আমি তোমার আমার ভাবনা বিক্রয় করিয়াছি, পরিশ্রম বিক্রয় করি নাই। পরিশ্রম করিব। অলস হইতে প্রবৃত্তি হয় না। কোন বিষয়ে আমার ভাবনার অধিকার নাই সত্য, কিন্তু অলসভাবে দিনযাপন বড়ই কষ্টকর।"

চারু। সে ভাল কথা। দেখ শৈবাল বলে, সে এক এক দিন রন্ধন করিবে। আমি পরিশ্রম করিতে যে কাতর, তা' নয়। তবে তার ইচ্ছা হইয়াছে, তা'ই আমি স্বীকৃত হইয়াছি। তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

সতীশ। না। আমি কি তোমার কাজে আপত্তি করিতে পারি? আমার বিশ্বাস—তোমার মত গৃহিনী-পণা কেহ জানে না। জানিও, তুমি যাহা করিবে, তাহা আমার অনুমোদিত।

এইরূপে দুঃখের সংসারে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইল। এ দিকে চারুবালাও বিবিধ রেশমী কাপড়ে নানা প্রকার ফুল তুলিয়া বিক্রয়ার্থ ঘোষ-কর্ত্তা দ্বারা কলিকাতায় প্রেরণ করিতে লাগিল। ইহাতে চারুর মাসিক ১০।১২ টাকা হইতে লাগিল। বালিকা-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। চারু রীতিমত পরিশ্রমের সহিত বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করে। গ্রামের সকলে উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত আপনাদের কন্যাগুলিকে চারুর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। চারু বিদ্যালয় উপলক্ষে পনর টাকা পাইতে লাগিল।

সংসারের কাজ কর্ম্ম চারু আর ততদূর দেখিতে পারে না। শৈবাল এক্ষণে বিধিমতে সাহায্য করিতেছে। চারু মাঝে মাঝে শৈবালের মুখপানে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলে "শৈবাল! মা! তুই যদি না থাক্‌তিস, তা' হ'লে আমাদের কি হ'ত? শৈবাল! মা! তুই আর-জন্মে আমার কন্যা ছিলি, এ জন্মেও তোর মত মেয়ে পেয়ে আমার সুখের অবধি নাই।"

"মা! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মত মা যেন জন্ম-জন্মান্তরে পাই মা! তোমাকে মা ব'ল্লে আমার প্রাণ জুড়ায়। তোমাকে যখন প্রাণভরে ডাক্‌তে পারি, তখন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব চলে যায়।

"শৈবাল! তোকে বড় কষ্ট দিই, আমার প্রাণটা সেইজন্য কেমন করে। তোর মত ননির পুতুলকে এত কাজ কর্ত্তে দিতে পারি? দেখ শৈবাল! কাল থেকে আমি দু'টা থেকে ৫টা অবধি স্কুলে যা'ব। গৃহের কাজ কর্ম্ম আমিই ক'র্ব্বো, তোর পরিশ্রম আর দেখ্‌তে পারি না।"

"না মা! তোমাকে দেখে আমার গতরে বল পাই। তুমি বল, এত পরিশ্রম করি; কিন্তু আমি ত কিছুই টের পাই না। তবে কেন বল, আমি বড় পরিশ্রম করি?"

"না, আর ব'ল্‌ব না। তোমার যা ভাল' লাগে, তাই ক'রব।"

দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িত সতীশচন্দ্র এইরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। দারিদ্র্যের অঙ্কুশাঘাত বীর-হৃদয় কখনও বিচলিত করিতে পারে না। চারু! যে হৃদয়, লইয়া তুমি সংসারে পদার্পণ করিয়াছ, দারিদ্র্য-সমুদ্র-সমুত্থিত উত্তাল তরঙ্গমালা তোমার দেবোপম হৃদয়-উপকূলে দারুণ আঘাত করিলেও, সে উপকূল অবিচলিত থাকিবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

শৈবাল—নিরুদ্দেশ!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনাবলীর পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে চারুর সংসারে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে অধম বাঙ্গালী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও উৎসাহের অভাবে বিফল-মনোরথ হয়। নিজের স্বার্থের জন্য স্বোপার্জ্জিত অর্থের কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয়, এরূপ লোকের সৎকার্য্যের ধারণা বড়ই অল্প। আপনি আনিব, আপনি খাইব, পরকে কেন দিব?—এ ভাব দেশময়—প্রতিগৃহে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই আত্ম-স্বার্থ-প্রভাবে বাঙ্গালি এত অবনত—পরের দাস! যে দেশে সৎকার্য্যের প্রতি উৎসাহ নাই, লোকে আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে শিখে নাই, চারু! কেন তোমার সে দেশে জন্ম হইল? তুমি বঙ্গের অতীত বস্তু—তুমি স্বার্থময় ভূমির উপযুক্ত নও! তাই তোমার কোমল হৃদয়ে দারিদ্র্যের অঙ্কুশাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে!

হায়! যখন বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, তখন উৎসাহে গ্রামের লোক দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার উন্নতি-কল্পে একবারে মাতিয়া উঠিল; কিন্তু যখনই বুঝিল, ইহাতে অনেক স্বার্থ-ত্যাগ-স্বীকার করিতে

হইবে, তখন ক্রমে উৎসাহ নির্ব্বাণপ্রায় হইতে লাগিল। আর কেহ তাঁহাদের নির্ম্মলা, প্রমীলা, নলিনী, মৃণালিনীকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। দিনে দিনে বালিকার সংখ্যা হীন হইতে লাগিল, ক্রমে বিদ্যালয়ের একবারে পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

চারুর সাংসারিক আয় প্রায় দশ টাকা কমিয়া গেল! এখন নির্ভর ৭।৮ টাকার উপর!

যে দীন হীন, তাহার উপর লোকের অত্যাচার যেন একচেটিয়া। ক্ষমতাপন্ন লোকের উপর অত্যাচার খাটে না,—জানে, রোগের মত ঔষধ প্রদান করিবে। তাই অত্যাচারের শ্রাদ্ধ গড়ায় দীন হীনের উপর।

এ গেল লোকালয়ের কথা। আবার অন্যদিকে দেখ, যে দিনান্তে পাঁচটী পয়সা উপার্জ্জন করে, চারিটী ভবিষ্যতের ভাণ্ডারস্বরূপ রাখিয়া দেয়, একটিতে উদরপূর্ত্তি করে, তাহার গৃহেই চোর ডাকাইত আসিয়া বহুকষ্ট-সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করে। অথবা যে দরিদ্র, কায়-ক্লেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, ভগবান্ তাহারই সংসারের ভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। যে ভক্ত, ভগবানের অত্যাচার তার উপর বেশী। মানুষ এতদুর দুর্ব্বিনীত যে, তাহাকে নিয়ত কশাঘাত না করিলে সংশোধিত হয় না। এই কারণ কশাঘাতের যন্ত্রণা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই আপনার অবস্থা বুঝিতে পারে; আর সহ্য করিতে না পারিয়া ভগবানের একান্ত অনুগত হইয়া পড়ে। এইরূপে একবার তাঁর পদানত হইতে পারিলে আর তার ভাবনা থাকে না। একবার হৃদয় পদস্থ হইয়া গেলে আর বিচলিত হয় না। তাই ভগবান বিধিমতে চারুর পরীক্ষা করিতেছেন, নহিলে এ হীন অবস্থার উপর চারুর আবার সংসারের ভার বৃদ্ধি হইবে কেন?

প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, চারুর একটী সুন্দর সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। চারু একমাস সূতিকা-গৃহে বাস করিয়া, পুত্রটীকে বুকে পুরিয়া, একবার সতীশের কাছে, একবার শৈবালের কাছে আসিয়া কত আমোদই প্রকাশ করে! চারু তাহাকে কোথায় রাখিবে, কেমন করিয়া রাখিলে, সে কিরূপে ভাল থাকে, তাহারই ভাবনায় দিবারাত্রি ব্যস্ত।

দেখিতে দেখিতে বালকের নামকরণ-ক্রিয়া শেষ হইল। এখন হইতে তাহাকে সুশীলকুমার বলিয়া ডাকা হইতে লাগিল। একটী সন্তানের বৃদ্ধিতে সংসারের অনেক খরচ বৃদ্ধি হইল।

খরচের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে, দিন আর চলে না।

শৈবাল এই দারুণ অবস্থা সহ্য করিতে পারিল না। নিজের জীর্ণ বাক্স হইতে প্রায় দুই শত টাকা বাহির করিয়া চারুর হাতে দিল। চারু এই টাকা লইতে কোন মতেই স্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু শৈবাল অনেক মিনতি করিয়া, অনেক বুঝাইয়া, টাকাগুলি লইতে চারুকে সম্মত করিল। চারু শৈবালের স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল! এবং মনে মনে বলিল "শৈবাল দেব-কন্যা। নহিলে স্বোপার্জ্জিত ধন কিরূপে অকাতরে বিতরণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল?" যাহা হউক, চারু কখন যদি এই লইয়া কথা পাড়িত, শৈবাল নানা কথা পাড়িয়া ভুলাইয়া দিত।

এইরূপে আবার দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। আবার সংসারের অবস্থা হীন হইতে লাগিল। সতীশ কাজকর্ম্ম অতি যত্নের সহিত করিতেছে। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কথা বলিলেই সাহেব চটিয়া যান। সুতরাং গতিক বুঝিয়া সতীশও সাহেবকে আর কোন কথা বলে না।

দেখিতে দেখিতে বালক সুশীলকুমার সাত বৎসরে পদার্পণ করিল। এ বৎসর হইতে চারু তাহার লেখা পড়ার ভার লইয়াছে। সুশীল এখন চারুপাঠ প্রথমভাগ পড়িতেছে। চারুর ইচ্ছা, সুশীল ভাল করিয়া বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করে, তাই এ পর্য্যন্ত তাহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে নাই। চারু ইদানীন্তন বিদ্যালয়ের ভাব-গতি দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ দিন দিন বালক বালিকারা যেরূপ দুঃশীল হইয়া যাইতেছে, তাহাতে উত্তরকালে যে তাহাদের দ্বারা স্বদেশের বা সংসারের কোন উপকার সাধিত হইবে, তাহা কোন প্রকারেই আশা করা যাইতে পারে না। তাই মনে মনে বলিল "আমি যত্নে উপদেশ দিয়া পুত্রকে মানুষ করিব,—আর বিদ্যালয়ে গিয়া কুসঙ্গের কুহকে পড়িয়া সোণার চরিত্র বিসর্জ্জন দিবে! এ প্রাণে তাহা সহ্য হইবে না।"

বালক যখন নয় বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন সুশীলকুমার "মেঘনাদবধ কাব্য" পড়িতেছে। ব্যাকরণ চারুর কাছেই শিক্ষা করিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্রেও বালকের ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। চারু সতীশকে বলিল "দেখ, সুশীল আরও তিন বৎসর আমার কাছে পড়িবে। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে তুমি

তাহাকে একটু একটু ইংরাজী শিক্ষা দেও, কারণ সে এখন ইংরাজী সহজে শিখিতে পারিবে। তাহার সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে; অঙ্ক, জ্যামিতি প্রভৃতি বেশ বুঝিতে পারে। আমার বোধ হয়, এখন সুশীল অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজী শিখিয়া ফেলিবে।”

সতীশ। আমারও তাই ইচ্ছা। সুশীল বড় ভাল ছেলে, বড় শান্ত, কখনও তাহার মুখে উচ্চ কথা নাই। চারু! সুশীলের চরিত্র তুমিই গঠিত করিয়াছ; তাহার চরিত্রে কি কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে?

এখন হইতে সুশীল পিতার নিকট ইংবাজী শিক্ষা করিতেছে। এক মাসের মধ্যেই সে প্যারী বাবুর ফাষ্টবুক (প্রথম পুস্তক) শেষ করিল, দ্বিতীয় পুস্তক শেষ করিতে কিছু বেশী সময় লাগিল। ফলে ৬।৭ মাসের মধ্যে ৪ নং রয়াল রিডার পড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সুশীল দিন দিন বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু ক্রমে সংসারের কষ্ট এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, চারু এক বেলা আহার করিত,—আপনি না খাইয়া আর সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইত।

চারুর শিল্প কাজ আর চলে না। ঘোষেদের কর্ত্তা গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চাকরীর জন্য গিয়াছেন; সুতরাং চারুর ফুলতোলা কাপড়গুলি আর বাজারে বিক্রয় করাইবার জন্য দেওয়া হয় না,—কারণ পাড়াতে আর এমন সুহৃদ কেহ নাই। এখন আয় একুনে পনর টাকা। এই পনর টাকার মধ্যে কি সংসার স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে? কাজে কাজেই চারুকে কোন কোন দিন অনাহারে থাকিতে হয়।

শৈবাল এতদিন কিছুই বুঝিতে পারে নাই। গোপনে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিল, চারু মাসের মধ্যে ১৩।১৪ দিন অনাহারে থাকে। শৈবালের প্রাণে আর সহ্য হইল না, গোপনে কত অশ্রু ত্যাগ করিল, আকাশ পাতাল কত কি ভাবিল; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল “দাসীবৃত্তি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিব, তাহা হইতে আপনার ভরণ পোষণের জন্য যৎসামান্য রাখিয়া সমস্তই চারুকে পাঠাইয়া দিব।” বলিল “আমার দ্বারা যদি মার কষ্ট না ঘুচিল, তবে বাঁচিয়া সুখ কি? মা! তোর কষ্ট আর দেখিতে পারি না। বুক ফাটিয়া যাইতেছে! তোর জন্য সকল কষ্ট অবাধে সহ্য করিতে পারি; কিন্তু তোর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।”

আবার ভাবিল "তাই ত, যাই কোথায়? স্ত্রীলোকের যে পদে পদে বিপদ্! যাই কোথায়? অ্যাঁ! তবে কি উপায় হবে না? মা! মা! তবে কি তোর কষ্ট ঘুচাতে পার্ব্বনা? জগদীশ! হৃদয়ে বল দেও, আমার সহায় হও। যদি চারুর জন্য বিপদে পড়ি, তবে এ তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, কিন্তু এ কষ্ট আর চক্ষে দেখিতে পারিব না। আজই যাব, আজ রাত্রিতেই বাড়ী হইতে বাহির হইব। সঙ্গে কেবল একখানি কাপড় ও পাঁচটী টাকা লইব।—কিন্তু যা'ব কোথায়? কার কাছে? কে এমন সুহৃদ্ আছে, আমাকে চাকরাণী করিবে?—বাঙ্গালায় কি কেউ নেই? কেউ কি পরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবে না? পথে যাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁরই কাছে হাত জোড় ক'রে বল্‌ব, 'ওগো! মা আমার না খেয়ে খেয়ে আধখানা হ'য়ে গেছে, তাই আমি বেরিয়েছি। আমাকে তোমাদের চাকরাণী কর। যা' কিছু দেবে, তা' মাকে পাঠিয়ে মার কষ্ট লাঘব ক'র্‌ব'। —না, এ ত ঠিক নয়। বঙ্গদেশ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। কু-সন্তানে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া বিপাকে ফেলিতে পারে, এমন পাষণ্ডের অভাব নাই। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র, বন উপবন স্বর্গ মর্ত্ত্য! কাতরে তোমাদের সম্বোধন করিতেছি,—বলিয়া দেও, আমার আর কি উপায় হইবে! আমার মার কষ্ট কিরূপে ঘুচিবে!—কেহ উত্তর দিলে না। ওঃ! বুঝেছি, তোমরাও বিমুখ!—না! না! না! মোহ! এখন আমাকে আক্রমণ কর' না! সাহস! এস, তুমিই এক্ষণে আমার একমাত্র সহায়—তুমিই আমার জীবনের সহচর।—এই যে, একখানা ছুরি দেখিতেছি না? হাঁ, ছুরিই বটে। বেশ হ'য়েছে। ছুরি! তুমি আমার বুকে থাক। আক্রমণকারীর রক্তপান করিবে বলিয়া পিপাসিত হইয়াছ? এস, তোমার সে বাসনা চরিতার্থ করি।" বক্ষঃস্থলে ছুরি লুক্কায়িত রাখিয়া শৈবাল আবার বলিতে লাগিল "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! না, আর অলীক চিন্তার প্রশ্রয় দিব না। আচ্ছা, এক কাজ করিলে হয় ত? আমার দুর-সম্পর্কীয় এক মাসী আছেন, তাঁহারই কাছে কেন যাই না? তিনি আমার একটী চাকরী করিয়া দিবেন।"

গভীর রাত্রিতে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একাকিনী শৈবাল চারুর গৃহ পরিত্যাগ করিল। একাকিনী সেই রাত্রিতে শৈবাল শ্রীরামপুর ষ্টেসনে আসিল। ত্রিশবিঘার একখানি টিকিট ক্রয় করিল। সেই রাত্রির শেষেই

বাঁশ-বেড়িয়ায় কোন জমিদারের গৃহে গিয়া দ্বারে আঘাত করিল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। শৈবাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তখন ভোর পাঁচটা। গৃহিনী সুপ্তোত্থিতা। শৈবালকে দেখিয়াই গৃহিনী একটু স্তম্ভিত হইয়া বলিল "শৈবাল! তুমি এত ভোরে কোথা হইতে আসিলে? হঠাৎ এখানে আসিলে যে? কোন কি বিপদ হইয়াছে? সতীশ বাবু কি কিছু বলিয়াছেন?"

শৈবাল। না, কিছুই নয়। আপনিই আসিয়াছি। তাঁহাদের সংসারে বড় কষ্ট; তাই চলিয়া আসিয়াছি। আমাকে কোথাও একটী কাজ করিয়া দেও, আমি সেইখানে থাকিয়া নিজের ভরণ পোষণের সংস্থান করি। এ পৃথিবীতে আমার আপনার বলিবার আর কেহ নাই;—মাসি মা! আমার এই উপকারটী কর।

বিনোদিনী। তুমি আসিয়াছ, বেশ হইয়াছে। সিংহীদের বাড়ী এক চাকরী খালি আছে। তাঁহারা এক ব্রাহ্মণী অন্বেষণ করিতেছে, তা স্বজাতি মিলিলে ব্রাহ্মণী রাখিবে না। কিন্তু তুমি কি পারিবে?

শৈবাল। কেন, আমি দশ বার জনের রান্না রাঁধিতে পারি। তাঁদের বাড়ী কি আরও বেশী লোক আছে?

বিনোদিনী। না, মোটে ছয়জন। তা তুমি তা'হ'লে পারবে। শুনেছি, তাহারা সাত টাকা মাহিনা দিবে,—আর খাওয়া পরা যা' দরকার, তা' সমস্তই দিবে। আমি বলিয়া কহিয়া আরও এক টাকা বাড়াইতে পারি।

শৈবাল। মাসি মা! এ দুঃখের সময় তুমি আমার মুখ তুলে না চাইলে, কে আর চাইবে? আমাকে যত শীঘ্র পার, সেই কাজটী করিয়া দেও।

বিনোদিনী। তা' বেশ, বেলা হইলে কর্ত্তাকে বলিব। হাত মুখ ধুইয়া এখন একটু বিশ্রাম কর। অনেক পথ এসেছ, বড় কষ্ট হ'য়েছে!

এই প্রকার কথোপকথনের পর, বিনোদিনী গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল। যাইবার সময় শৈবালকে হস্তমুখ-প্রক্ষালনার্থ গৃহমধ্যে যাইতে অনুরোধ করিল।

বিনোদিনী গৃহে প্রবেশ করিয়াই কর্ত্তাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইল। কর্ত্তা উত্তরে বলিলেন "তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

আত্ম-প্রতিমা-বিসর্জ্জন।

সতীশের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। শৈবালের আকস্মিক গৃহ-পরিত্যাগের কারণ কেহই নিরাকরণ করিতে পারিতেছে না। চারু ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল-প্রায় হইয়াছে। সতীশ শৈবালের অন্বেষণার্থ নানা দিকে লোক পাঠাইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা কেহই শৈবালের কথা বলিতে পারিল না। শৈবালের কথা অনেককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, সকলেই সম-স্বরে "জানি না" বই আর কোন উত্তর দিতে পারিতেছে না। এই প্রকার গোলযোগে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। যাহারা শৈবালের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, একে একে তাহারা সকলে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু হায়! কেহই শৈবালের খবর বলিতে পারিল না। চারু দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইল,—সতীশও যারপর-নাই দুঃখিত হইল।

সংসারে যেরূপই দুর্ঘটনা সমুপস্থিত হউক না কেন, বিষাদের মেঘ বা ঘোরতর দুঃখ-সাগর সংসারকে যেরূপেই আবৃত বা প্লাবিত করুক না কেন,—মানুষ অল্পদিনের মধ্যে বিস্মৃতির গর্ভে সে সমস্তই নিক্ষেপ করিয়া দেয়, আবার সংসারে পূর্ব্ব শ্রী আনয়ন করে, পূর্ব্বের মত আবার আমোদ আহ্লাদে দিন অতিবাহিত করিতে থাকে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম; মানুষ সে জন্য দোষী হইতে পারে না। এরূপ খানিক আমোদ, খানিক সুখ না থাকিলে, মানুষের জীবন ধারণ করা একবারে কঠিন হইয়া পড়িত, সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত এবং হয়ত সংসারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইত!

শৈবালের গৃহত্যাগের পর যদিও দিন কয়েক চারুর সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা সমুপস্থিত হইয়াছিল, দুই মাস পরে আবার সংসার পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, পূর্ব্বের মত সুখে দুঃখে সংসার চলিতে লাগিল। শৃঙ্খলা-ভ্রষ্ট সংসার শৃঙ্খলা-বদ্ধ হইল সত্য; কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া চারুর অন্তর এক একবার নৈরাশ্যের উষ্ণ-শ্বাসে বিদগ্ধ হইয়া যাইত।

একে একবেলা আহার, তাহার উপর এই চিন্তা; চারুর সোণার কান্তি মসী-সদৃশ হইল। চারুর আর সে শ্রী নাই; দিন কয়েক পরে যে জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হইবে, তাহার ছায়া এখন হইতে অনুভূত হইতেছে।

আহা। ক্ষুদ্র প্রাণী কত সহিবে? প্রকৃতি! তোমার ক্রোধ কি প্রশমিত হইবে না? চারুর দুঃখে কি তোমার চক্ষুতে জল আসে না? না,—আসিবে কেন? তুমি যে পাষাণ! পাষাণে কি নখের আঁচড় লাগে!

এক দিন রবিবারে চারু ও সতীশ একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, বেলা প্রায় নয়টা বাজিবে—এমন সময় ডাক পিয়ন "একখানি পত্র ও মনি-অর্ডার আছে" বলিয়া গৃহস্বামীর নাম ধরিয়া তারস্বরে ডাকিল। সতীশ দ্বারের নিকট আসিয়া পত্র ও মনিঅর্ডার চাহিয়া লইল। সতীশ মনিঅর্ডার খানি এদিক ওদিক দু'পিঠ দেখিয়া তাহার প্রেরক কে, তাহা চিনিতে পারিল না। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সতীশ টাকাগুলি ও পত্র খানি লইয়া চারুর নিকট আসিল। পত্র খানি চারুর নামেই ছিল। চারু তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পড়িল।——

"শ্রীচরণ কমলেষু—

পৃথিবীতে মার দুঃখ দেখে কোন্ সন্তান দুঃখ-অপনোদন-কল্পে আপনার তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প না হয়? কিন্তু আমি আপনার পাষণ্ড কন্যা, এখনও পৃথিবীতে থাকিয়া আপনার সংসারের কষ্ট দূর করিতে পারিলাম না!

আসিবার সময় না বলিয়া এতদূর চলিয়া আসিয়াছি, এ অসম-সাহসিক কার্য্যের জন্য জগতের লোকের নিকট নিন্দনীয় হইব সত্য; কিন্তু জানি, আপনি আমাকে চরণে ঠেলিবেন না। সেই সাহসে ভর করিয়া এরূপ কাজ করিয়াছি,—ক্ষমা করিবেন।

মা! আপনার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি এখানে আসিয়া পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। মাসে যা পাইব, সমস্তই আপনাদের নিকট পাঠাইব—আর যেন সেরূপ একবেলা আহারে, কোন দিন বা অনাহারে দিন না কাটে! আজ তিন মাসের মধ্যে এই চব্বিশ টাকা পাইয়াছি, সমস্তই পাঠাইলাম। এবার মাসে মাসে পাঠাইব, মনে করিতেছি। এ বাড়ীর কর্ত্তা বড় অমায়িক লোক। তিনি বলিয়াছেন, আগামী মাস হইতে দশ টাকা মাহিনা দিবেন। আসিয়া অবধি আপনাদের সংবাদ না পাইয়া অতিমাত্র চিন্তিত

সপ্তদশ অধ্যায়।

আছি। আহা! সুশীল-কুমারকে কতদিন দেখি নাই। সে, আপনি ও বাবা কেমন আছেন, জানিতে বড় ইচ্ছা; কিন্তু উপায় নাই। ইতি শ্রীচরণে নিবেদন।—অভাগিনী, শৈবাল।”

চারু। শৈবাল বাস্তবিকই দেব-কন্যা। নহিলে আমাদের জন্য সে এত ব্যথা অনুভব করিবে কেন? পত্রে কোন ঠিকানা দেয় নাই, আমরা জানিয়া তাহাকে লইয়া আসি, সেই ভয়ে চিঠিতে ঠি লেখে নাই। দেখ, পত্রের খাম খানায় পোষ্টাপিসের মোহর আছে কিন্তু ভাল অনুভব হ'চ্ছে না। দেখ দেখি।

সতীশ। না, বুঝিতে পারিতেছি না। মোহর ভাল উঠে নাই চারু! সে আদর্শ-রমণী,—আমাদের সংসারের অতীত বস্তু! আমরা কি পুণ্য ক'রেছি যে, শৈবালের মত নারীরত্নকে অনুদিন নিকটে দেখিব!

চারু। পরের জন্য যে এতদূর করিতে পারে, সে সত্যই সংসারের অতীত বস্তু। কিন্তু তার কষ্ট যে আর সহ্য করিতে পারি না। বাছা খেটে খেটে যে অস্থি-চর্ম্ম সার হ'য়ে যাবে! হা অদৃষ্ট! অনুসন্ধান পেয়ে কোন ফল হইল না!

এই বলিয়া চারু অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া সুশী কুমারকে ডাকিল। সুশীল তখন অন্য গৃহে পড়িতেছিল। মাতার আ শুনিয়া বালক দৌড়িয়া আসিল। বালক নিকটে আসিলে চারু বলি "সুশীল! তোমার দিদির সংবাদ পেয়েছি, তিনি ভাল আছেন। তুমি কেমন আছ, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।”

সুশীল। মা! দিদি কবে আসবেন? তাঁর জন্য বড় মন কেমন করে! তাঁকে আনতে লোক পাঠাও না?

চারু। বাবা! তিনি কোথায় আছেন, ঠিকানা লেখেন নাই। বোধ হয়, পুনরায় পত্র আসবে। এবারে তাঁর ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে।

সুশীল। মা! তিনি অনেক দিন গেছেন, আমাদের কি তাঁর মনে পড়ে না মা? আমাদের এত ভালবাসতেন, আমাদের ছেড়ে তিনি কেমন করে র'য়েছেন?

চারু। বাবা সুশীল! তিনি আমাদের আপনার লোক, আমাদের ভাল না বেসে কি থাকতে পারেন? তখন যেমন ভালবাসতেন, এখন তেমনই ভালবাসেন। বিদেশে গেলে কি ভালবাসা কমে

বিদেশে ...র এত কি কাজ? আমাদের কাছে থাকলে থাকি, তিনি ত তা' জানতেন?

...। তিনি আমাদের কষ্ট দেখে, বিদেশে গিয়ে চাকরী ক'রছেন। শীঘ্রই বোধ হয়, ফিরে আসবেন।

সুশীলকুমার আর কিছু প্রশ্ন করিল না। দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে ...ল। আবার পাঠাগারে প্রবেশ করিল।' চারু গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত হইল।

ভাবনায়, চিন্তায়, শোকে সেদিনকার দিন কাটিয়া গেল। পরদিবস ...শীলকুমার প্রাতঃকালে উঠিয়া গৃহ-প্রাঙ্গনে অন্য দিনের মত দৌড়াদৌড়ি ...রিল না। ঘরে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে করিতে এক একবার অনুচ্চ স্বরে রোদন করিতেছে। চারু গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা লক্ষ্য করে নাই। ক্রমে বেলা হইলে যখন চারু সুশীলকে স্নান আহার করিবার জন্য ডাকিল, তখন বালক রোদনস্বরে উত্তর দিল, "মা, আমার মাথা ধরেছে, আজ আর খেতে ইচ্ছে নেই—নাব না।"

"কেন বাবা হঠাৎ তোমার মাথা ধরিল?" বলিয়া চারু সুশীলের ...রে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুশীলের চোখ দুটা ফুলা ...গা—সম্মুখে যে পুস্তকখানি ছিল, সেখানি ভিজা! চারু সুশীলকে জিজ্ঞাসা ...ল "সুশীল বাবা! তুমি কি কাঁদছিলে?"

"হ্যাঁ মা! বড় মাথা ধ'রেছিল। এখন একটু কম।"

"আমাকে কেন বল নাই বাবা?"

"মনে ক'রেছিলাম, শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবে। তাই মা! তোমাকে কিছু বলি নাই।"

"গাটা ছেঁকছেঁকে বোধ হচ্ছে। তোমার বাবা ওঘরে আছেন, তাঁহাকে একবার হাত দেখাইগে চল।"

উভয়ে সতীশের ঘরে প্রবেশ করিল। সতীশ হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পড়িতেছিল। চারু ও সুশীলকুমারকে দেখিয়া পুস্তক বন্ধ করিল। চারু বলিল "দেখ, সুশীলের গা বড় ছেঁকছেঁকে বোধ হচ্ছে। একবার হাতটা দেখ দেখি।"

সতীশ হাত দেখিয়া বলিল "সুশীলের একটু জ্বর হয়েছে, আজ আ... কিছু খেতে দিও না।"

চারু সুশীলকে সেই ঘরে শয়ন করাইয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজের কাজে ... মন আজ বড় চিন্তাকুল! এক একবার যেন অজ্ঞানক